তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নববর্ষ।

১

পুরাতন বর্ষশেষ আইল নবীন,
স্মৃতিলীন হল হায় পুরাণো সে দিন!
ছিলে যে সাথের সাথী, বন্ধু হে বিদায়!
নবীন অতিথি এস, স্বাগত তোমায়।

২

গেছে কত ব্যথা ক্লেশ, অতৃপ্ত বাসনা,
সুখ-আশা গেছে ভেঙ্গে, অসিদ্ধ সাধনা;
নববর্ষে ধর আজি উদ্যম নূতন,
নবোৎসাহে গড় পুন নূতন জীবন।

৩

ঘুচুক্ অভাব দৈন্য দুঃখ পাপভার,
অবিশ্বাস, ভ্রান্তিপাশ, সংশয়-আঁধার;
নিবে যাক্ শোকানল চিরদিন তরে
কালের ইন্ধনে যাহা জ্বলে ঘরে ঘরে।

৪

খর্ব্ব হোক্ বৃথা গর্ব্ব মান অভিমান,
জাতিকুল ভেদাভেদ বিচ্ছেদ-নিদান;
বাঁধুক্ জগতজনে মৈত্রের বন্ধন
একপ্রাণ রাজাপ্রজা, সধন নির্ধন।

৫

আলস্য প্রমাদ লোভ, যাক্ এ জঞ্জাল,
ক্ষমা দয়া ধৃতি হৃদি থাক্ চিরকাল;
অনাচার অত্যাচার হোক্ নিবারিত,
হউক্ সত্যের জয়, মিথ্যা পরাজিত।

৬

আধি ব্যাধি অমঙ্গল যাক দূরে যাক্,
স্বাস্থ্য কান্তি মকরন্দে জীবন জুড়াক;
যুদ্ধ বিগ্রহের হোক্, হোক অবসান,
উড়ুক্ ধরণীমাঝে শান্তির নিশান।

৭

দুর্জয় বিষয়-তৃষ্ণা যাক্ থেমে যাক্,
বিবেক বৈরাগ্য দুই থাক্ কাছে থাক্;
শক্তি অপরাজিত, দেবভক্তি সাথে,
পথের চিরসম্বল থাক্ সাথে সাথে।

৮

গিয়াছে কতই ব্যথা বুকে বজ্র হানি,
সম্মুখে কি আছে দেব, কিছুই না জানি;
সুখদুখ যাই দেও, সুধা বা গরল,
মানি লব, ইচ্ছা তব হউক্ সফল।

গীতাপাঠ।

ভূমিকা।

(শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত।)

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে—ভগবদ্গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা—উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে—ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই।

পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকছটা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে—আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমার দীপ্তি পাইতেছে। উহা হইতে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উদ্‌গীরিত হইতেছে তাহাতে আমাদের দেশের বায়ু পবিত্র হইতেছে; আর সেই বাষ্পনিচয়ের শ্বেতাভ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শান্তিবারি যাহা আমাদের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাহা অমরত্বের সোপান। আমার শরীর যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন—কোনো কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে যখন আমার মন উঠিতেছে না, সেই সময়ে একছিটা অমৃত আমার গায়ে লাগিল; তাহা এই যে, "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানং অবসাদয়েৎ" আত্মার বলে আত্মাকে টানিয়া তুলিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। তাহারই বলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুটীরের যে কিছু সম্বল তাহা আশপাশ হইতে কথঞ্চিৎপ্রকারে জড়ো করিয়া থাল সাজাইয়া আনিয়াছি—শান্তিনিকেতনের সজ্জনসেবায় তাহা বিনিয়োগ করিয়া ধন্য হইব—ইহারই প্রত্যাশায়। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া—শান্তিনিকেতনের সুকুমার বালকগণের খেলাধূলা এবং পাঠাভ্যাসের সরল মাধুর্য্যের মধ্যে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ভক্তিমান্ নিষ্ঠাবান্ আচার্য্যগণের কর্ম্মদক্ষতা সহৃদয়তা এবং সদাশয়তার মধ্যে, স্বস্থানে স্থির দণ্ডায়মান বনস্পতির মধ্যে, পুষ্পগন্ধী বনকাননের মধ্যে, স্বচ্ছন্দবিহারী গো মৃগ পক্ষীগণের মধ্যে, দিগন্তব্যাপী বনান্তশোভিত প্রান্তরের মুক্ত সমীরণের মধ্যে, পরমপুরুষ পরমাত্মার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণমনহৃদয়ের সহিত নমস্কার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

ভগবদ্‌গীতার প্রথম পইঠাতেই সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার সে যে সাংখ্য তাহা কি এই সাংখ্য অর্থাৎ যাহা সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে আর্য্যাচ্ছন্দে সূত্রপরম্পরায় গ্রথিত হইয়াছে—সেই সাংখ্য? না তাহার অধিক আর কিছু? এবিষয়ে মীমাংসার জন্য দার্শনিক পুরাতত্ত্বের অন্ধকার হাতড়াইয়া বেড়াইবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের মূল বচনগুলি সমস্তই গীতার অনুমোদিত। এই জন্য গীতার ব্যাখ্যায় সহসা প্রবৃত্ত না হইয়া ভূমিকা স্বরূপে সাংখ্যদর্শনের ভিতরের কথাটা বিবৃত করা আবশ্যকবোধে অগ্রে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। সমগ্রভাবে সাংখ্যদর্শন পর্য্যালোচনা করিবার স্থানও এ নহে, কালও এ নহে, আর, যাহা কর্ত্তৃক তাহা হইতে পারা সম্ভবে সে মানুষও আমি নহি। আমার বিবেচনায়, আমাদের দেশের ভাষ্যকারদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে সাংখ্যের নিগূঢ় মর্ম্মকথাটি সোজাসুজিভাবে সুকৌশলে বাহির করিয়া আনাই সংকল্পিত অভীষ্ট সাধনের সুচারু পন্থা—সেই পন্থা অবলম্বন করাই এস্থলে আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। সাংখ্যকারিকার প্রথম সূত্র এই:—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্‌ জিজ্ঞাসা"

আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ বাহ্যবস্তুঘটিত, আপনাঘটিত এবং দেবতাঘটিত এই ত্রিবিধ দুঃখের কিরূপে বিনাশ হইতে পারে তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। "তদভিঘাতকে দৃষ্টে হেতৌ সা অপার্থাচেৎ" যদি বল "দুঃখ বিনাশের উপায় তো কাহারো অবিদিত নাই; চিকিৎসাদি দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে, প্রিয়সম্মিলনাদির দ্বারা মনোগ্লানি নিবারিত হইতে পারে, দেবার্চ্চনাদিদ্বারা দৈবকোপ নিবারিত হইতে পারে—এ তো সকলেরই জানা কথা; জানা কথার জিজ্ঞাসা নিরর্থক।" "না।" ন "ঐকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ" সাধিতব্য বিষয় এখানে দুঃখের শুধুই যে কেবল বিনাশ তাহা নহে, পরন্তু দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ—দুঃখ যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও ভোক্তাপুরুষের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে না পারে তাহারই জন্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। ও সকল লৌকিক উপায়দ্বারা হইতে পারে কেবল দুঃখের আংশিক এবং ক্ষণিক বিনাশ, তা বই ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

"ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি!" কি তেজের কথা! এ কালের কোনো ইংরাজি অধ্যাপক ওরূপ একটা কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন কি? তাহা যদি করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর শুনিতে হইবে এই যে, From the sublime to the ridiculous there is but a step আশ্চর্য্যরস এবং হাস্যরসের মধ্যে কেবল এক পা ব্যবধান। তিতুমিয়াবীরের অসামান্য সাহস দেখিয়া একদিকে যেমন আমরা আশ্চর্য্যসাগরে নিমগ্ন হই, আর এক দিকে তেমনি আমাদের মনে হাস্যসাগর উথলিয়া ওঠে—কিছুতেই রোধ মানে না। পাড়ালোকের ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবার যাঁহার ক্ষমতা নাই সেইরূপ একজন চিকিৎসক যদি বলেন যে যমকে কিরূপে বিনাশ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইতেছে—তবে তাঁহার স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটাও বিবেচ্য। তিতুমিয়াবীরের দুঃসাহসিকতা তাহার পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ তাই তাহা

শোভা পায় না—কিন্তু অভিমন্যুকে কিম্বা নেপোলিয়ন বনাপার্টকে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃসাহসিকতা শোভা পাইয়াছিল। পঁচিশজন সৈন্যের ভেঁপুর জোরে নেপোলিয়ন দশহাজার অষ্ট্রেলীয় সৈন্যের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বিগত শতাব্দীর ইউরোপীয় যোদ্ধাগণের দেখা কথা। তেমনি, একালের একজন অমুকানন্দ স্বামী যিনি নামের আনন্দেই আনন্দে আছেন, আর, সেইজন্য দুঃখনিবৃত্তির উপায়চেষ্টা যাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, তাঁহার মুখে ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা শুনিলে আমাদের হাসি পাইতে পারে; কিন্তু কপিল মুনির মুখ হইতে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ জোরালো কথা বাহির হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য, কথাটা যাহা বলিলেন তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, তদ্গতচিত্তে তাহার ভিতরে তলাইতে চেষ্টা করা। কপিল মুনি জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, "যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়" কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল মুনি হইতেন না—তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের গ্রন্থসমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ। দশ আনা সত্যের সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ আনা মিথ্যা মিশ্রিত না থাকিলে সত্য ইঁহাদের মনঃপূত হয় না। লেখকের নিগূঢ় মর্ম্মকথাটার ভালমন্দ বিচার সমালোচকের ক্ষমতাবহির্ভূত; এইজন্য সমালোচক ভাষা বেশভূষার ভালমন্দ বিচারের খোরাক না পাইলে লেখকের প্রতি খড়্গহস্ত হ'ন। কাজেই একালের কৃতবিদ্য লেখকেরা একটি সহজ-শোভন অকৃত্রিম সত্য প্রকাশ করিতে হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বোঝা বোঝা কৃত্রিম বেশভূষায় সাজাইয়া দাঁড় করাইতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাঠকগণের দৃষ্টি-পথে বাহির করিতে সাহসী হ'ন না। কপিল মুনি যদি বেন্থাম্ হইতেন তবে তিনি বলিতেন—অধিকাংশ লোক কিসে সুখী হইতে পারে তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। বেন্থামের এটা দেখা উচিত ছিল যে, সুখই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাঁহাদের সুখের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্চে আপনাদিগকে অধিকাংশ অপেক্ষা সুখসৌভাগ্যশালী বলিয়া জানা, আর জাঁকজমক করিয়া লোককে তাহা জানানো; অধিকাংশ লোকের শ্রীসমৃদ্ধি ওসকল ব্যক্তির প্রাণে সহিবে কেমন করিয়া—উঁহারা চা'ন্ অধিকাংশ লোক তাঁহাদের পদতলে গড়াগড়ি যা'ক্। এইজন্য সুখের অনন্যভক্ত উপাসকদিগের মুখে অধিকাংশ লোকের সুখের জন্য কাজ করিবার কথা শোভা পায় না; শোভা পায় শুধু এই কথা যে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ঋণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। কেননা সুখভোগই যদি মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে ভোক্তাদিগের আপনার আপনার সুখসমৃদ্ধিই সে উদ্দেশ্যের একমাত্র সাধনোপকরণ তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; তবেই অধিকাংশের সুখসৌভাগ্য সে উদ্দেশ্যের পথের কণ্টক। জর্ম্মান দেশের সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ কাণ্ট্ আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়াছিলেন যদিচ,—কিন্তু তাঁহার দুইমুখা কথাগুলির ভাব আঁকড়িয়া পাওয়াই সুকঠিন। কাণ্ট্ বলেন যে, অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞা পালন করাই—Categorical Imperative-এর কথা শোনাই—ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ। কাণ্ট্ যদি বলিতেন যে অন্তর্যামী পুরুষের আজ্ঞাপালন করাই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ, তবে তাঁহার কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিতাম; কিন্তু তাহা বলিতে তিনি ইতস্তত করিয়াছেন অতিমাত্র। কাণ্ট্ তাঁহার নিজের কথার অসম্পূর্ণতা নিজে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াও তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে পারিয়া ওঠেন নাই। এটা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞার সঙ্গে যদি কোনো প্রকার কার্য্যপ্রবর্ত্তক শক্তি সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই নহে। রাজাজ্ঞার সহিত যদি রাজবল বা প্রজাগণের রাজভক্তি সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা যেমন জনসমাজের কোনো উপকারে আসে না, তেমনি অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞার সঙ্গে কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি সংযুক্ত না থাকিলে তাহাতে কোনো ফল দর্শিতে পারে না। কাণ্ট্ আর কোনো কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন যে, নিয়মের প্রতি ভক্তিই কর্ত্তব্য কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। কাণ্টের এ কথায় আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে পারে না। রাজনিয়মের প্রতি ভক্তি রাজভক্তি ছাড়া আর যে কি তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। যদি বল যে, সাধারণতন্ত্র-রাজ্যের রাজা নাই অথচ রাজনিয়ম আছে—এমত স্থলে রাজনিয়মকে রাজা অপেক্ষাও বড় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি সমর্পণ করা সকলেরই উচিত। কিন্তু একটা প্রাণশূন্য বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বকে ভক্তি করা উচিত বলিলেই তো আর তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি যায় না। আমেরিকার রাজ-সভাপতি Lincoln-এর তুল্য সাধারণতন্ত্রের মস্তকশ্রেণীয় লোকেরা যদি ভক্তির উপযুক্ত পাত্র হ'ন, তবে সাধারণতন্ত্রের রাজনিয়মের প্রতি ভক্তি বলিলে—হয় বুঝায় সেই মস্তকশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি ভক্তি, নয় বুঝায় ওয়াশিংটনের ন্যায় দেশের পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি, তা বই, দণ্ডবিধির প্রতি ভক্তি যে কিরূপ পদার্থ তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। নিয়মের

প্রতি ভক্তি না বলিয়া কাণ্ট্ বলিতে পারিতেন অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি ভক্তি। কিন্তু কাণ্ট্ ধর্ম্ম-নিয়মের গোড়ায় প্রকৃতিকেও যেমন স্থান দিতে নারাজ—প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মাকেও তেমনি স্থান দিতে নারাজ। তিনি বলেন ধর্ম্মের নিয়ম আত্মার স্বনিয়ম Autonomy; পুনশ্চ বলেন যে, আপনার নিয়মে নিয়মিত হওয়ার নামই ধর্ম্মের নিয়মে নিয়মিত হওয়া, আর, তাহারই নাম স্বাধীনতা। কাণ্টের এ কথা যদি সত্য হয়—ধর্ম্মের নিয়ম যদি আমার আপনার নিয়ম হয়, তবে তাহার প্রতি আমার ভক্তি যাইবে কেমন করিয়া? পুত্রের প্রতি পিতার ভক্তি যেমন একটা অসঙ্গত কথা, আপনার নিয়মের প্রতি আপনার ভক্তি সেইরূপ একটা অসঙ্গত কথা ইহা কে না স্বীকার করিবে? প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরের ঐশী শক্তির নামই প্রকৃতি; অন্তর্যামী পুরুষ বলিলে ঈশ্বর এবং ঐশীশক্তি দুইই এক সঙ্গে বুঝায়। আমাদের শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের প্রেরণা, অন্তর্যামীপুরুষের প্রেরণা এবং প্রকৃতির প্রেরণা এ তিনের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। আর, ঐশীশক্তি যেহেতু সমস্তেরই কারণ—তাহার উপরে যেহেতু আর কোনো কারণ নাই, এইজন্য ঐশীশক্তির প্রেরণাকে অহেতুকী প্রেরণা বলিলে কোনো দোষ হয় না, আর সেই অহেতুকী প্রেরণাকে অন্তর্যামীপুরুষের অহেতুকী আজ্ঞা বলিলেও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারো বিলম্ব হয় না। কিন্তু যে ভাষায় সে আজ্ঞা বিশ্বভুবনে প্রচারিত হয়, সে ভাষা সংস্কৃত ভাষাও নহে, ইংরাজী ভাষাও নহে, জর্ম্মান্ ভাষাও নহে—সে ভাষা হ'চ্চে রজোগুণের প্রবর্ত্তনা বা দুঃখের উত্তেজনা। উদরে যখন ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন সেই অহেতুকী আজ্ঞার বা অহেতুকী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া জীব অন্ন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। পরের দুঃখ দেখিয়া যখন আপনার দুঃখ উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেই অহেতুকী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য সেই দুঃখের প্রতিবিধান চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই—অথচ যদি সুখের উদ্দেশে ভূরিভোজনে প্রবৃত্ত হই, তবে সেরূপ কার্য্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণামূলক নহে; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা আমার দুষ্প্রবৃত্তির প্রেরণা-মূলক। আমার মনে দীন-দরিদ্রের প্রতি লেশমাত্রও দয়া নাই অথচ যদি আমি জাঁকজমকের সহিত দানকার্য্যে প্রবৃত্ত হই তবে সেরূপ কার্য্যও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণামূলক নহে তাহা অহঙ্কারের প্রেরণামূলক। এক কথায় বলিতে হইলে এইরূপ বলাই সঙ্গত যে, ঐ প্রকার নিম্নশ্রেণীর কার্য্য সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিকৃতির সহেতুকী প্রেরণা অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু প্রকারান্তরে বা গৌণ রূপে যাহা মূল প্রকৃতি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার প্রবর্ত্তনাকেও যদি প্রকৃতির প্রেরণা বলা যায়, তবে সেভাবে সবই প্রকৃতির অহেতুকী প্রেরণামূলক। কেননা বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ বিকৃতি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপরোক্ষ কারণ বা সাক্ষাৎ কারণ হইলেও সর্ব্ব স্থলেই মূল প্রকৃতি সকল কার্য্যের মূল কারণ।

এত কথা উঠিল কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রের ভেদাভেদের মোটামুটি রকমের একটা আদর্শ শ্রোতৃবর্গের বিবেচনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিবার উদ্দেশে। ভারতে যে সময়ে কপিল মুনি বিরাজমান ছিলেন সে সময়ে নারদ মুনির ঢেঁকি যে চুপ করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। গ্রীক দেশে যে সময়ে Sophist শ্রেণীর তার্কিক-দিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশের জ্ঞানী মহলেও ঐরূপ একটা ঝড় উঠিয়াছিল—এমন কি ঈশোপনিষদের পাতার মধ্যেও তাহার প্রাবল্যের কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। সে ঝড়ে যে সকল সারবান্ বৃক্ষ হ্যালে নাই টলে নাই তাহাদিগকে লইয়া যোজন-ব্যাপী ছায়া বিস্তার করিয়া মহা প্রকাণ্ড এক বনস্পতি দণ্ডায়মান—ইনি কি কপিল মুনি? ইঁহার চরণে ভূয়োভূয়ো নমস্কার। কল্পনার স্বপ্নে এইরূপ একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের আবির্ভাব কিছুই বিচিত্র নহে। গ্রীকদেশীয় Stoic শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানীরা দুঃখকে মঙ্গলের বেশে সাজাইয়া দাঁড় করাইবার জন্য বিস্তর আয়াস পাইয়াছিলেন। কপিল মুনি ওরকমের কোনো সাজানো কথার দিক্ দিয়াও যা'ন নাই; তিনি শুধু কেবল সাধক-গণের হিতার্থে অকৃত্রিম সত্যের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিলেন যে, দুঃখ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য,—ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ই জিজ্ঞাসার বিষয়। আমরা যদি একালের মহাপণ্ডিতগণের কথার ভেল্কিবাজিতে না ভুলিয়া কপিল মুনির ঐ কৃত্রিমতাশূন্য সত্য কথাটির ভিতরে স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, দুঃখের প্রতীকার সাধনই জীবের মুখ্য সাধন—অধিকন্তু যে সুখসাধন বলিয়া একটা কথা আমরা কথোপকথনচ্ছলে সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা প্রকৃতপক্ষে, সাধন বলিতে যাহা আমরা বুঝি ঠিক্ তাহা নহে। ভূমি চাস করাই কৃষিকার্য্যের সাধন; কিন্তু শস্যের উৎপাদনকে স্বতন্ত্ররূপে সাধন বলা যাইতে পারে না; কেননা কৃষিকার্য্য সুনিষ্পন্ন হইলেই শস্যরাজি কোনো সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। চাষ কার্য্যের ন্যায় দুঃখের প্রতীকারই সাধনের মুখ্য অঙ্গ—সুখ-ভোগ শস্যোৎ-পত্তির ন্যায় প্রকৃতিজাত ফল। তা ছাড়া, কৃষিকার্য্য শস্যোৎপত্তির একটা সহকারী কারণ বই প্রধান কারণও নহে; বিনা কৃষিকার্য্যেও শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎ-

পর হয় ইহা সকলেরই দেখা কথা—যেমন ঘাসের শস্য। আর সে যে অযত্নসুলভ শস্য, তাহা গো-মহিষদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ প্রকৃতি মাতার স্তন্য দুগ্ধ। একটি অভিনব বালক সুখ যে কাহাকে বলে তাহার কোনো খবরই রাখে না, অথচ তাহার বারো মেসে সুখ কেমন নির্ম্মল নিষ্কণ্টক এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত। কিন্তু সেই বালকের পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তখন সে তাহার প্রতীকারচেষ্টায় ব্যস্তসমস্ত না হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। যখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়—তখন সে অন্নের জন্ত লালায়িত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধপোষ্য বালকের দুঃখ-নিবারণও সাধন সাপেক্ষ। আপনারই বা কি, আর, অন্যেরই বা কি, চাসারই বা কি, আর রাজারই বা কি, পণ্ডিতেরই বা কি, আর মুর্খেরই বা কি, দুঃখ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। দুঃখ নিবারিত হইলে সুখ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, সুখের জন্য স্বতন্ত্ররূপে সাধন করিবার প্রয়োজন নাই। তা শুধু না—লজ্জাবতী লতার পত্রাবলী যেমন নিকটাগত ব্যক্তির স্পর্শ সহে না, সুখ তেমনি ভোক্তাপুরুষের লক্ষ্য সহে না; সুখের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিলেই সুখ মাথা হেঁট করিয়া ভূতলে নিপতিত হয়। কর্ম্মশীল চাসাভূসাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, স্বাস্থ্য বলিয়া যে পায়ে শিকলি দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার মতো একটা পক্ষী আছে, তাহা তাহারা মূলেই জানে না। ভোগী শ্রেণীর রাজা রাজড়াদিগের অস্বাস্থ্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ঐ বনের পাখীটিকে তাঁহারা পিঞ্জরে পুরিয়া তাহাকে ঘড়ি ঘড়ি জারক ঔষধ এবং পুষ্টিকর অন্নপানীয় এত পরিমাণে খাওয়া'ন যে, দুই দিনেই তাহার প্রাণবধ হইয়া যায়। এই সকল রাজা রাজড়ারা—বিশেষতঃ ইউরোপ অঞ্চলের রাজকীয় নাচ্‌মজলিসের অধিনায়কেরা সুখের সাধনে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাহার ফল কি পা'ন? ইংরাজেরা যাহাকে বলে Satiety এবং আমরা যাহাকে বলি অতৃপ্তি অরুচি এবং অবসাদ তাহাই তাঁহারা লাভ করেন। এ রোগের একমাত্র ঔষধ হচ্চে সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দুঃখ-নিবারণের উপায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া; তাহা হইলে ভোগ এবং কর্ম্ম দুয়ের সামঞ্জস্যের দ্বার দিয়া সুখ অলক্ষিত ভাবে আসিয়া তোমার ঘরের লোক হইয়া যাইবে; তাহার পরিবর্ত্তে তুমি যদি সুখকে জোড়হস্তে সাধ্য-সাধনা করিয়া ঘরে আনিতে চেষ্টা কর তবে সুখ তোমার উপরে এমনি রুষ্ট হইবে যে, সে জন্মেও তোমার ঘরের চৌকাট মাড়াইবে না। সুখের উপাসনা এবং সাধ্যসাধনার পরিবর্ত্তে রাজা রাজড়ারা যদি নগর-পল্লীর পথঘাট পরিষ্কার করাইয়া পুরবাসীদিগের রোগ-শোকের মূলোচ্ছেদ করেন—পুষ্করিণী খনন করাইয়া পল্লীগ্রামস্থ দীন দুঃখীগণের জলকষ্ট নিবারণ করেন—যথা যথাস্থানে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া পথিকগণের পথকষ্ট নিবারণ করেন—চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দীন দরিদ্রগণের রোগ প্রতীকারের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখেন—লোকের অজ্ঞান এবং কুসংস্কার নিবারণের জন্য বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত করেন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মালয় উন্মুক্ত করেন—তাহা হইলেই তাঁহাদের রাজভোগ এবং রাজ-কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়া দাঁড়ায়, আর, সেই সামঞ্জস্যের দ্বার দিয়া পরমানন্দ অনাহুত আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পথ পায়; তা বই প্রতী-হারী পদাতিক দ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজা রাজড়ারা কাঙালের কথায় কর্ণপাত করিবার পাত্র নহেন—সুতরাং দুঃখ তাঁহাদের ললাটে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। রাজা রাজড়াদের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সজ্জনেরা অনেক পরিমাণে সুখী। মনে কর একটি সামান্য শ্রেণীর গৃহস্থ ব্যক্তি যথানিয়মে কাজ কর্ম্ম করে খায় দায় থাকে; যৎস্বল্প অর্থ যাহা সে উপার্জ্জন করে তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারের ভরণপোষণ এবং বাসাচ্ছাদনাদি কার্য্য দিব্য নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়। একদিকে যেমন অনায়াসেই তাহার দুঃখ নিবৃত্তি হয় আর একদিকে তেমনি সে অল্পেতেই সুখী হয়। তাহার সুখভোগ এবং কর্ম্মোদ্যম দুয়ের মধ্যে এইরূপ দিব্য সৌসামঞ্জস্য। সে সুখে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে যে সুখে আছে এ কথা অন্যে বলে—সে আপনি তাহা বলে না। সে বলে "আমি অতি দীন দুঃখী—আমাকে প্রত্যহ দশটা থেকে চারিটা পর্য্যন্ত গাধার মত খাটিতে হয়—তা নহিলে আমার সংসার চলে না।" সে যে সুখে আছে একথা তাহার নিজের মনে আমল পায় না এই জন্য যেহেতু দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না। আর, সে যে বলিল "আমাকে প্রত্যহ গাধার মতো খাটিতে হয়" এটা তাহার অত্যুক্তি; কেননা গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন তাহার হাতে কোনো কাজ না থাকে তখন সে গ্রীষ্ম-তাপে যত না ছটফট্ করে—ভোজনান্তে শয্যায় গা ঢালিয়া তা অপেক্ষা দ্বিগুণবেগে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—দিনের মধ্যে হাই তোলে বিশ ত্রিশ বার, আর বলে "ছুটি ফুরাইলে বাঁচি"! প্রকৃত কথা এই যে, যাহাতে তাহাকে পথের ভিখারী হইতে না হয় তাহার প্রতিবিধানের কর্ত্তব্যতাই তাহার কর্ম্ম-চেষ্টার গোড়ার

প্রবর্ত্তক। এই জন্য প্রতিদিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় পরিহার্য্য দুঃখের প্রতিই তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়, তা বই, সে যে যথাবিহিতরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখে আছে তাহার প্রতি তাহার লক্ষ্যই হয় না। নিম্নশ্রেণী লোকের সুখভোগের পরিসর যেমন স্বল্পায়ত্ত, তাহার দুঃখনিবারণোপযোগী কর্ম্মচেষ্টারও পরিসর সেইরূপ স্বল্পায়ত্ত। জনসমাজে মস্তকশ্রেণীর লোকদিগের ভোগের পরিসর যেমন সুবিস্তীর্ণ, তাঁহাদের দুঃখনিবারণ-ক্ষম কর্ম্মচেষ্টার পরিসরও সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ। রাজার সংসারও যেমন বৃহৎ রাজ্যও তেমনি বৃহৎ, এই বৃহৎ সংসার এবং বৃহৎ রাজ্যের দুঃখমোচনের জন্য আকবর সাহের ন্যায় উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে রাজভোগ এবং রাজকার্য্যের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না; আর সেই সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলেই সুখের আগমন-দ্বারে কপাট পড়িয়া যায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুঃখনিবারণোপযোগী কর্ম্মচেষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখকে নাগাল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটাও একটা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদি সুখের আরাধনা এবং সাধ্যসাধনা করা যায়, তাহা হইলে সুখ অচিরে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাই বলেন যে দুঃখই—রজো-গুণই—কর্ম্ম-চেষ্টার প্রবর্ত্তক; আর, যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করিতে হয়, তেমনি কর্ম্ম-দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়। যাঁহারা মনে করেন যে, নৈষ্কর্ম্মই আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জীবনের আদর্শ ছিল—দুই ছত্র গীতার পাতা উল্টাইলেই তাঁহাদের সে ভুল জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটি গুরুতর কথার পর্য্যালোচনায় এখনো হাত দেওয়া হয় নাই—সে কথা এই যে, কপিল মুনি বলিতেছেন—ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ভিন্ন সামান্য রকমের দুঃখনিবারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ফলদায়ক নহে। এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাহা আগামী-বারে বলিব, আজিকের মতো এ যাহা বলিলাম এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা।*

একটি গান যখনি ধরা যায় তখনি তার রূপ প্রকাশ হয় না—তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কি এবং তার অন্তরাটা কোন্‌দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল—ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই যে আঘাত দেবার কাজ, এ একটা সমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে—হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপ-লব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাত প্রতিঘাত ও সত্য মিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা প্রশাখার পথ খুঁজতে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্চে যার মধ্যে সত্যের মূর্ত্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্চেনা—কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে,—হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর ত অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারেনা—তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চল্‌তেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বল্‌ছিলুম ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা সমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে—কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না? এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবেনা?

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজটা বিশেষ-ভাবে আমারই। সেই খননকরা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি—কিন্তু যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে, তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝরনাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিষ—তার উপরে আমা-

---

* ১২ই মাঘে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

এই শিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এইরকম দুই অধ্যায় আছে। যত দিন বাধা দূর করবার পালা, ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারিদিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন কি, চারিদিকের বিরুদ্ধ, ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌছন যায় যেখানে বিশ্বের মর্ম্মগত চিরন্তন সত্যউৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিষ সকলেরই জিনিষ—সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অনুবর্ত্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্য পরিবর্ত্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে, পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক্ থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্ব্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল, তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সঙ্কটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয়নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্চি এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্চি এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থামতে পারিনে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড় করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয়-সাধনের বর্ত্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্ম্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু চন্দন তরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনি প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনি আপনার সকলের চেয়ে সত্য সাধনাকেই ব্রহ্মসাধনাকেই নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম্ম প্রবল ধর্ম্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম্ম নয়। এই ধর্ম্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহুশতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল, তখনকার ধর্ম্মইতিহাস আমরা দেখতে পাইনে। কারণ সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেই মুসলমান অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমান ধর্ম্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ কর্ত্তে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এই জন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয়, আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয়, আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক, রবিদাস, কবির, দাদু প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করচেন

তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম্মইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্ম্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক্ তার মর্ম্মে গিয়ে কখনো বাজেনা, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়-ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে, না, শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম যে দিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন ত মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল ভারতবর্ষের সত্য-সম্বল নেই অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি!

কিন্তু তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহুদিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধন-ভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে—ভয় নেই, কোনো অভাব নেই—এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। অনেকদিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মরচে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাকা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মত বোধ হয়েছিল।

কিন্তু বিরোধ নয়। বর্ত্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্ম-সমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্ব-পৃথিবীর পক্ষে এখনো এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান করে দেবে এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠ্‌চে।

✓ ব্রাহ্মসমাজকে, তার 'সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারত-বর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বল্‌তে যে কি বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে।

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
> যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,—
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
> তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়—এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে—আমাদের চৈতন্য সেখানে পরমচৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করচে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র জানা নয়, সর্ব্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্চে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকেই ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা; জীবনের এমন পরিপূর্ণতা, জগদ্বাসের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে!

কালের বহুতর আবর্জ্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে জিনিষ ত একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে মনুষ্যত্বের কোনো একটা চরম তাৎপর্য্য থাকে না—সে একটা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মত প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ. পুনর্ব্বার তাকে বৃহত্তর করে পূর্ণতর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল—সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার

তার কাছ থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ করে সত্য করে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন? আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক্ ও বিষয়ের দিক্ সমান ওজন রেখে চল্‌তে পারেনি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম—তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম—তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্য্যন্ত একেবারে পরিষ্কার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্য্যাপ্ত করে তুল্‌তে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্ম্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিষ জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিক্‌তে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজ্‌তে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্ব্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না—আপনাকে পোষণ করবার জন্যে রক্ষা করবার জন্যে আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জ্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল—এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চল্‌ছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্যরাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায়নি বটে, তবু তার সর্ব্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা; কোথায় বাঁধা, এই সমস্ত বন্ধন কোন্ খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্য্যবসিত য়ুরোপ তা দেখে নি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্ব্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্বইতিহাসে বিশ্বধর্ম্মে সর্ব্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্য বাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনি উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারিদিকে রাজত্ব করছিল আচার বিচার বাহ্য অনুষ্ঠান এবং ভক্তিরস মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সে দিন রামমোহন রায় যখন অমর ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকার সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠ্‌ল, এ আমাদের আপন জিনিষ নয়, এ আমাদের বাপ পিতামহের সামগ্রী নয়, বলে উঠ্‌ল এ খৃষ্টানি, এ'কে ঘরে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে গল্পের বিলাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে' আপনাকে বিফল করতে চায় তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন কি, সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ বলে' প্রতিভাত হন।

এদিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করচে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্চে, আপনার চেয়ে বড়কে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্ম্মের ক্ষেত্র পৃথিবীজোড়া, এবং সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল "আমি," তার মন্ত্র ছিল, জোর যার মুলুক তার; সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে

চলেছিল তার বাহন ছিল, পণ্য-সম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্য দান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউবা বলে স্বাজাত্য, কেউবা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউবা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্য দান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে ভয়ে শান্ত রাখ্‌তে চেষ্টা করে, এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসচে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলচে—কিন্তু এ কথা একদিন জান্‌তেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না;—প্রয়োজন-বোধকে যত বড় নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড় সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্যান্ত কিছুই টিঁক্‌তে এবং টেঁকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুল্‌তে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থ ভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুল্‌তে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্ব্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠ্‌তে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূরকালের দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কখনই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্ম্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখ্‌তে পেয়েছি কিন্তু তাই বলে তাকে আমরা ছোট করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি যেন—বুঝ্‌তে পারি যেন তুষারশৃঙ্গ এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়চে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করচে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা, অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্ম্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্য্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্দ্রকল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(ষষ্ঠ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবার অনুকূলে যখন আমরা সমস্ত যুক্তি সংগ্রহ করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব একপ্রকার সন্তোষজনকরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি, তখন আর একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত। সেই বাধাটিকেও অতিক্রম করা আবশ্যক। কল্পনা যখন সেই অজ্ঞাত-রহস্য মৃত্যুকে চিন্তা করে, তখন ভয় না করিয়া থাকিতে পারে না। প্যাস্কাল বলেন, যত বড় তত্ত্বজ্ঞানী হউন না কেন,—একটা বড় তক্তার উপর দিয়া চলিবার সময় কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও, তাহার নীচে যদি একটা অতলস্পর্শ গহ্বর থাকে, তাহা হইলে তাঁহার হৃৎকম্প না হইয়া যায় না। কোন আশঙ্কা নাই যুক্তিতে জানিলেও, কল্পনা তাঁহাকে ভীত করিয়া তুলে। মৃত্যুর সান্নিধ্যে আমরা যে ভয় পাই, ইহাও কতকটা কল্পনার ভয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তা সত্বেও এই ভয়কে দমন করা সহজ নহে। তত্ত্বজ্ঞানীও এই ভয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পান না; তবে তিনি এইমাত্র জানেন, এই ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হয়; এবং তিনি কতকগুলি সুদৃঢ় আশা-লতাকে অবলম্বন করিয়া সক্রেটিসের ন্যায় এই ভয়কে অতিক্রম করেন। আমাদের কল্পনা, শিশুর ন্যায়। উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের শাসনাধীনে রাখিয়া কল্পনাকে শিশুরই ন্যায় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মনে করিয়া দেখ একটা ভীষণ অতলস্পর্শকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। এই অজানা অনন্তকালের সম্মুখে আসিয়া আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। অতএব, যতটা পারি আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয় হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, কল্পনাকে বশীভূত করা আবশ্যক। এই কথাটি যেন আমরা

সর্ব্বদা মনে রাখি যে, যেমন জীবনে তেমনি মরণেও ঈশ্বরই আত্মার ধ্রুব অবলম্বন; আর ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ন্যায়—তাহাই মঙ্গল।

আমরা এখন জানিয়াছি প্রকৃত ঈশ্বর কিরূপ। আমরা ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বরের বিশ্ববিমোহন দুইটি মুখ সন্দর্শন করিয়াছি, সে কি?—না, সত্য ও সুন্দর। ঈশ্বরের স্বরূপগত যে সর্ব্বোচ্চ ভাবটী আমাদের নিকট প্রকাশ পায় সেটি—ঈশ্বরের পবিত্রতা। ধর্ম্মনীতি ও মঙ্গলের জন্মদাতারূপে, স্বাধীনতার মূলতত্ত্বরূপে, ন্যায় ও মৈত্রীর মূলাধাররূপে, দণ্ডপুরস্কারের বিধাতারূপে, ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, "পাবনের পাবন", "পাবনং পাবনানাং"। এরূপ ঈশ্বর শুধু কতকগুলি সূক্ষ্ম-গুণ-মাত্র-সার ঈশ্বর নহেন; তিনি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট পুরুষ—যিনি আমাদিগকে তাঁহার নিজের আদর্শে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি আমাদের অদৃষ্টের নিয়ন্তা, যাঁহার বিচারের উপর আমরা নির্ভর করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রীতিই আমাদিগকে যাবৎ শুভকর্ম্মে প্রণোদিত করে; ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের ন্যায়কে পরিচালিত ও পরিশাসিত করে। তিনি অসীম এই কথা যদি আমরা পুনঃপুনঃ স্মরণ না করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিব। আবার যদি তাঁহার অসীম স্বরূপের মধ্যে এরূপ কতকগুলি উপাধি না থাকে যাহাতে করিয়া তাঁহার সহিত আমরা একটা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি—তাহা হইলে তিনি আমাদের পক্ষে না থাকারই সামিল হইয়া পড়েন; কেননা, তাঁহার সেই সকল উপাধি আমাদেরও জ্ঞানের ও ভাবের মূলসূত্র।

এইরূপ পূর্ণ পুরুষের চিন্তা করিয়া, মানুষের মনে যে ভাব হয়, সেই ভাবই প্রকৃত ধর্ম্মভাব।

অন্য যাহাদিগের সন্নিধানেই আমরা গমন করি, তাহাদের যেরূপ গুণ, সেই গুণ অনুসারেই আমাদের মনে বিচিত্র ভাবসমূহ জাগিয়া উঠে। তবে যাঁহাতে সকল গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাঁহার সন্নিকর্ষে আমাদের কি কোন বিশেষ ভাবের উদয় হইবে না? যখন আমরা ঈশ্বরকে অনন্তস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করি, সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া উপলব্ধি করি, যখন আমরা স্মরণ করি, ধর্ম্মনিয়মের মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছা বিদ্যমান এবং এই ধর্ম্মনিয়মের পালন ও লঙ্ঘনের সহিত তিনি দণ্ড পুরস্কার সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার দুর্দ্দম্য ন্যায়, এই সকল দণ্ডপুরস্কার যথাযথরূপে সকলের প্রতি বিধান করিতেছে, তখন তাঁহার এই রাজ-মহিমা সন্দর্শনে আমাদের চিত্ত ভয় ও ভক্তির ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার পর, যখন আমরা ভাবিয়া দেখি, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না,—আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়া তিনি আমাদের কত সুখে সুখী করিয়াছেন, নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য তিনি এই চমৎকার ব্রহ্মাণ্ড আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, অন্য জীবনের সম্মিলনে যাহাতে আমাদের জীবন সংবর্দ্ধিত হয় এই জন্য তিনি আমাদিগকে জনসমাজ দিয়াছেন, চিন্তা করিবার জন্য বুদ্ধি দিয়াছেন, ভাল বাসিবার জন্য হৃদয় দিয়াছেন, কর্ম্ম করিবার জন্য স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন আর একটি মধুর ভাবে আমাদের এই ভয় ও ভক্তির ভাব অনুরঞ্জিত হয়; সেই ভাবটি—প্রেম। প্রেম যখন দুর্ব্বল ও সসীম জীবের প্রতি প্রযুক্ত হয় তখন সেই প্রেম প্রিয় জনের তুষ্টিসাধন করিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করে, সে প্রেম প্রিয়জনের নিকট হইতে কোন উপকার প্রত্যাশা করে না। যখন আমরা কোন সুন্দর বা গুণবান পাত্রকে ভালবাসি, তখন প্রথমে একথা ভাবি না,—এই প্রেম আমার প্রেমাস্পদের কিংবা আমার নিজের কোন কাজে আসিবে কি না। এই প্রেম যখন আবার সত্য সুন্দর মঙ্গলের আধার সেই ঈশ্বরে উত্থান করে, তখন তাঁহার পূর্ণতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহাকে যে প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করি তাহা আরও কত বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হইবার কথা।

যিনি অনন্তগুণে আমাদের প্রেমাস্পদ তাঁহার দিকে আমাদের আত্মা স্বভাবতই বিকশিত হইয়া উঠে।

ভক্তি ও প্রীতি লইয়াই আরাধনা। এই দুই ভাব ব্যতীত প্রকৃত আরাধনা হইতেই পারে না।

যদি ঈশ্বরকে শুধু সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া, শুধু দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রভু বলিয়া, শুধু ন্যায়ের প্রবর্ত্তক ও পাপের শাস্তা বলিয়াই দেখা যায়, তাহা হইলে মানুষ তাঁহার মহিমা-ভারে প্রপীড়িত, ও নিজের দুর্ব্বলতায় অভিভূত হইয়া পড়ে; ঐশ্বরিক বিচারের ভয়ে সর্ব্বদাই কম্পমান হয়, আর এই জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি, আপনার প্রতি বীতরাগ হইয়া সমস্তই দুঃখময় বলিয়া অনুভব করে। ইহা ঐশ্বরিক স্বরূপের একটা দিকমাত্র। Port Royal এই দিক্ পানেই ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহার "প্যাস্কালের চিন্তাবলী" পাঠ করিয়া দেখ। অতি-নম্রতা প্রদর্শন করিয়া (Pascal) প্যাস্কাল দুইটি জিনিস ভুলিয়া ছন;—একটি, মানুষের পদগৌরব,—আর একটি —ঈশ্বরের করুণা। আবার পক্ষান্তরে, যদি ঈশ্বরকে শুধু করুণাময় বলিয়া, প্রশ্রয়দাতা স্নেহময় পিতা বলিয়াই ভাবি, তাহা হইলে আর এক প্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়িতে

হয়। ভয়ের স্থানে প্রেমকে বসাইলে, ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্পে-অল্পে ভক্তিও অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা। তখন আর ঈশ্বর প্রভু নহেন; এমন কি, পিতাও নহেন; কেননা, পিতৃভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি-মিশ্র ভয়ও জড়িত আছে; তিনি তখন শুধু সখা,—এমন কি, স্থল-বিশেষে, প্রণয়ী। প্রকৃত আরাধনায়, ভক্তি, ও প্রেমের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ হয় না;—এই স্থলে ভক্তি প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

এই আরাধনার ভাবটি বিশ্বজনীন। তবে, লোকের প্রকৃতি-অনুসারে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়; এমন কি অনেক সময়ে, ইহা আপনাকে আপনি জানে না; কখন কখন, বিশ্বপ্রকৃতির ও জীবনক্ষেত্রের মহান দৃশ্যসমূহ দেখিয়া মানুষের হৃদয় হইতে এই ভাবটি উচ্ছ্বাস-বাক্যরূপে স্বতঃ বাহির হইয়া পড়ে; কখনও বা তাহার নীরব আত্মার মধ্যে নিস্তব্ধ ভাবে সমুত্থিত হয়। এই আরাধনার ভাবায় ভ্রান্তি হইতে পারে, আরাধনার পাত্রসম্বন্ধেও ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু আসলে ইহা সেই একই জিনিস। ইহা আত্মার একটা স্বতোনিঃসৃত অনিবার্য্য আবেগ। তাহার পর, যখন ইহার প্রতি বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, তখন আমাদের বুদ্ধি ইহাকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া প্রতিপাদন করে এইমাত্র। যখন আমরা ভাবি, তিনি পবিত্র স্বরূপ, তিনি আমাদের কার্য্য ও মনোগত অভিপ্রায় সকলই জানিতেছেন, এবং তিনি পরম ন্যায়ানুসারে আমাদের সেই সকল অভিপ্রায় ও কার্য্যের বিচার করিবেন,—তখন তাঁহার সেই বিচারকে ভয় করা অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত আর কি হইতে পারে? আবার যিনি পূর্ণমঙ্গল, যিনি সমস্ত প্রেমের প্রস্রবণ, তাঁহাকে প্রীতি করা অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত আর কি হইতে পারে? গোড়ায়, আরাধনা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; পরে বুদ্ধি তাহাকে কর্ত্তব্যে পরিণত করে, কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এইমাত্র। (ক্রমশঃ)

সাধুবাক্য।

হে বৎস! যদি দেবাধিদেবের সেবাব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া থাক তবে প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মাকে প্রস্তুত কর।

হৃদয় তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত কর, নিরন্তর নির্ব্বাক ধৈর্য্যে সহ্য করিয়া যাও। বিঘ্ন বিপত্তিতে অধীর হইও না।

একান্ত ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় কর—তাঁহা হইতে দূরে যাইও না, ভক্তবৎসল তিনিই তোমার পরিণাম সুন্দর শান্তিময় করিয়া দিবেন।

হে অনন্ত পথের যাত্রী, সুখ দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় লাভ ক্ষতি যাহা কিছু সেই নিখিলনাথের দান তাহাই প্রফুল্ল চিত্তে বহন কর—অবস্থাবৈগুণ্যে কাতর হইও না।

সুবর্ণের পরীক্ষা বহ্নিদাহের দ্বারাই হয়, ঈশ্বরের বরপুত্রগণই দুঃখের নিকষ পাথরে আপন পরিচয় প্রকাশ করেন।

সেই করুণানিধানের প্রতি নিতান্ত নির্ভরপরায়ণ হও, তিনিই তোমার সহায়। সত্য পথের পথিক হও; এবং তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

হে ভীরু, দূরে যাইও না, সেই পরম প্রভুর কৃপা প্রতীক্ষা করিয়া থাক, তোমার পতনের আশঙ্কা দূর হইয়া যাইবে।

হে বিশ্বাসী, হে ঈশ্বরভীরু, কেবলমাত্র তাঁহাতেই বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি কখনো তোমাকে বিফলমনোরথ করিবেন না।

হে ভক্ত, হে প্রভুবৎসল, নিরাশ হইওনা, তিনি তোমাকে অক্ষয় আনন্দ, নিয়ত শান্তির অধিকারী করিবেন।

Ecclesiasticus II.

ঈশ্বরভক্তের প্রলোভন এবং বিপদের অন্ত নাই, তবুও ভক্তবৎসল নিয়তই সেই বিপদ সমূহ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন।

তিনি তাহার প্রতি অণু পরমাণু অতি যত্নে সাদরে রক্ষা করেন, তাহার তিলমাত্র ক্ষতি হইতে দেন না।

Psalm XXX IV. 19. 20

হে দীন হৃদয়, হে প্রভুর কৃপাভিখারী, তোমরাই ধন্য, পরিণামে তোমরাই স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে পারিবে।

হে আর্ত্ত, হে বিপন্ন, তোমরাই ধন্য, পরম প্রভুর নিকট তোমাদের নিত্য সান্ত্বনা সঞ্চিত আছে।

হে বিনম্র, হে ভক্তিনম্র, তোমরাই ধন্য, কেননা এ বসুন্ধরার যথার্থ অধিকারী তোমরাই।

হে ভক্তিপিপাসিত, ধর্ম্মব্যাকুল, ধন্য তোমরা, দীনবন্ধু তোমাদের সকল অভাব মোচন করিবেন।

হে করুণাকাতর হৃদয়, তোমরাই ধন্য, কেননা তোমরাই দয়াময়ের স্নেহপাত্র।

বিশুদ্ধহৃদয় পুণ্যচরিত্র সাধু, তোমরাই ধন্য কেননা পরম দেবতা তোমাদের হৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত।

নির্ব্বিরোধ বিশ্ববন্ধু, তোমরাই ধন্য, কেননা তোমরাই যথার্থ ঈশ্বরের সন্তান নামের যোগ্য।

ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা দুঃখ দৈন্য অত্যাচার সহ্য করিতে

বিমুখ নহেন তাঁহারাই ধন্য কেননা পরিণামে তাঁহারাই স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হয়েন।

St. Matthew.

পত্র পুষ্প কিশলয়ে বর্দ্ধনোন্মুখ দ্রাক্ষালতিকার ন্যায় আমার এই মানব জীবন, প্রভু পরমেশ্বর তাহার রক্ষক। যে শাখায় ফল ধরেনা তিনি তাহা কাটিয়া ফেলেন, আবার যে শাখায় ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে তিনি সযত্নে শোধন করিয়া দেন, যেন তাহা পত্রপুষ্পে ফলসম্পদে আরও পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।

ক্ষণস্থায়ী দুঃখ ক্ষণিকের জন্য আসিয়া চলিয়া যায় কিন্তু চিরদিনের কাজ করিয়া যায়; আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, আমরা আপাতরমণীয় ক্ষণিক বাহ্য বস্তু ছাড়িয়া অন্তরবিরাজিত নিত্য সত্য এবং চিরন্তনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে শিখি।

Corinthians

সাধু যোহন বলিয়াছেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া, হে প্রভুপ্রিয়, ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাক তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন। মহাত্মা যীশু বলেন, ধৈর্য্যে আপন আত্মাকে স্থির কর কেননা আপন আত্মার অধিকারী হওয়াই মানব জীবনের দুর্লভ সার্থকতা। যতই আমরা ধৈর্য্য অর্জ্জন করিতে পারিব আমাদের দুর্ব্বল মানবাত্মা ততই বলশালী, ততই ঐশ্বর্য্যবান হইবে।

St. Francis de Sales.

কেবল মাত্র জীবনের গভীর এবং মহৎ দুঃখে ধৈর্য্য অভ্যাস করিলে চলিবেনা, প্রতিদিনের অবশ্যম্ভাবী তুচ্ছ দুঃখ বিরক্তি অসন্তোষে অধিক ধৈর্য্য অভ্যাস করিতে হইবে। এই জীবনপথে কত জনের সহিত পরিচয় হয় যাঁহারা দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত কিন্তু দুঃখের কষ্ট বহন করিতে অধীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহারা কেহ বলেন দারিদ্র্য বরণ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি হইত না যদি সে অবস্থায় আমার সন্তানগণকে যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং বন্ধুগণকে অতিথিসৎকার করিতে পারিতাম। কেহ বলেন আমারও কোনই আপত্তি হইত না যদিনা অপর দশজনে মনে করিত তাহা আমার দোষেই হইয়াছে। অপরে বলেন নিন্দাভাজন হইতে তিনি কোন ক্রমেই অস্বীকৃত নহেন যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার বন্ধুবর্গ কেহই তাঁহার অপযশে আস্থাবান নহেন। কেহ কেহ আছেন দুঃখের একদিক গ্রহণ করিয়া অপরদিক বর্জ্জন করিতে চাহেন, পীড়িত হইলে রোগযন্ত্রণা সহ্য করেন কিন্তু তাঁহার পীড়ার জন্য আত্মীয়বন্ধুর যে কষ্ট যে অসুবিধা হইতেছে তাহাতে অধীর হইয়া পড়েন। হে শিষ্য, যদি পীড়া বহন করিতেই হয় তবে তাহা সমগ্রভাবে বহন কর। পরমপ্রভু পীড়ার সহিত যে যন্ত্রণা যে অসুবিধা যে ক্ষতি প্রেরণ করেন তাহা সমস্তই নত মস্তকে শান্ত বিনীত সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর। যিনি দুঃখ বিধান করেন তিনিই তাহা নিবারণ করিয়া থাকেন, উভয় অবস্থাতেই ধৈর্য্যে অবিচলিত থাকিও। যদি তিনি দুঃখ দূর করিয়া দেন তবে নম্র হৃদয়ে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিও, যদি তাঁহার ইচ্ছায় দুঃখ বিপত্তি অধিকতর হয় তবুও সেই পবিত্রনাম হৃদয়ে নিরন্তর স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিও।

Ibid

অবোধ মানবহৃদয় কিছুতেই সন্তুষ্ট হয়না। কেবল যে যে দুঃখ অভাব অস্বচ্ছল অবস্থায় তাহার সৃজনকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে তাহা নহে প্রাচুর্য্যের দিনেও অসন্তোষ প্রকাশ করে। যে দিন অতুল ঐশ্বর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে কোন অভাবই নাই সেদিন সেই আতিস্বচ্ছলতাই তাহার নিকট ভার বলিয়া বোধ হয়। যেদিন বসুন্ধরা অনুর্ব্বরা হয়, বীজের অনুরূপ শস্য লাভ হয়না, দ্রাক্ষালতিকা এবং আম্রবৃক্ষ আশানুরূপ ফল দান করেনা, বিশ্বপালকের নিকট সেই বৎসর দোষভাজন, পঞ্চভূত নিন্দিত, এমন কি, আকাশ এবং বাতাসকেও তাঁহারা অব্যাহতি দেননা। কিন্তু বিষয়বিমুখ ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি সুখদুঃখে কি অভাবপ্রাচুর্য্যে সকল অবস্থাতেই একান্ত মনে নিরন্তর সেই মহিমাময়ের সাধুবাদ করিয়া থাকেন। দুঃখ সুখের আবর্ত্তনময় অবস্থার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যদি আমাদিগকে অগ্রসর হইতে না হয়, যদি কেবলমাত্র দুঃখ কিম্বা কেবল মাত্র সুখই আমাদের ভাগ্যে ঘটে কেমন করিয়া তবে হৃদয় দৃঢ় হইবে। কেবলমাত্র সুখ বিলাস আমাদের হৃদয়কে গর্ব্বিত এবং নিরন্তর দুঃখ বেদনা হৃদয়কে পরিশ্রান্ত করিয়া তোলে। সেই প্রভু যাহাতে তুষ্ট আমাদের হৃদয়ও যেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তিনি যাহা দান করেন তাহাই যেন আনন্দে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে পারি। যিনি ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন তিনি দারিদ্র্যেরও সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করুন। প্রাচুর্য্য এবং দারিদ্র্য উভয়ই আমাদের মঙ্গলকারী হউক। আধ্যাত্মিক জীবনে যদি আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে না পারি কেবলমাত্র যদি হৃদয় সরস এবং ভক্তিনম্র রাখিতে পারি তবে বিমর্ষ হইবার আবশ্যক নাই। হৃদয়ে অপার্থিব আনন্দের বীজ রোপন কর; যাহার হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছার অপ্রতুলতা নাই তাহার অভাব কখনও অপূর্ণ থাকেনা।

St. Leo the Great.

মঙ্গলময় বিধাতা যে বিপত্তি দুঃখই বিধান করুন না কেন তাহা যদি আমরা বিশ্বস্ত হৃদয়ে গ্রহণ করি এবং নম্রতার সহিত বহন করি তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। বর্ষার ন্যায় দুঃখ আধ্যাত্মিক জীবনের শরৎকালকে প্রচুর শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ এবং লাবণ্যময় করিয়া তোলে। মানবহৃদয় স্বভাব-দুর্ব্বল, তাহা প্রথমেই দুঃখকে বিভীষিকা জ্ঞান করে কিন্তু অন্ধকার অভ্যস্ত হইলে ক্রমে যেমন চারিদিক দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভয় দূর হইয়া যায়, তেমনি দুঃখের প্রথম অনিশ্চিত সংশয়ের পর যখন বিশ্বাস দৃঢ় হয় তখন নবীন আশার সঞ্চার হয়—এবং দুঃখক্লেশ সহজে বহনীয় হয়। দুঃখ যদি তোমার পরমপ্রভুর দান বলিয়া গ্রহণ কর, তবে তাহা সহ্য করা কঠিন হইবেনা, দুঃখের সকল বিরস তিক্ততা দূর হইয়া যাইবে। প্রতীক্ষা করিয়া থাকিও যথাসময়ে তিনি তোমার চিত্তে সান্ত্বনাসুধার অভিষেক করিবেন। সে সান্ত্বনা তোমার আত্মাকে উন্নত পবিত্র, তোমার বিশ্বাসকে দৃঢ়, তোমার ভক্তিকে সরস এবং আপ্লবিত করিয়া দিবে।

দুঃখ অবসানে তুমি যে পরমা শান্তি অর্জ্জন করিবে দেবআশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহা তোমার জীবনকে চিরদিন মঙ্গলের পথে রক্ষা করিবে, সে শান্তি সুপবিত্র এবং মহান তাহার সহিত পৃথিবীর ধূলিমলিনতার কোন সংস্পর্শই থাকে না।

Fenelon

দাদূ।

(উপক্রমণিকা)

এই সাধক কবীর-পুত্র কমালের শিষ্য। ইনি সেই হিসাবে আকবরের অনেক পূর্ব্বের—কিন্তু দবিস্তান মতে ইনি আকবরের সমসাময়িক লোক। দবিস্তানের মত আমার মনে হয় ভ্রান্ত—তাহার কারণ ইঁহার জীবনী আলোচনায় প্রকাশ করা যাইবে।

ইনি কাশীর সমীপস্থ জৌনপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও আজমীঢ়ের নিকটস্থ "নরাণে" গ্রামে দেহত্যাগ করেন। ইনি জাতিতে মুচি ছিলেন—পূর্ব্বের নাম ছিল মহাবলী। কূপ হইতে জল তুলিবার নিমিত্ত যে চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র (মোটক) ব্যবহার করা হয়—ইনি তাহাই নির্ম্মাণ করিতেন। কমাল ইঁহাকে ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। কমাল অদ্ভুত সাধক। কমাল সাধনার গভীরতম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তাঁহার কাছে মহাবলী কি যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন তাহা বলা যায় না—কিন্তু ইঁহার জীবন একেবারে ফিরিয়া গেল। ইনি কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন না। এবং জানার সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু তপস্যার অগ্নিতে ইনি জ্ঞানের ও প্রেমের গভীরতম ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য ভাবে তত্ত্বরাজ্যে এক অপরূপ প্রত্যক্ষ-অনুভূতি লাভ করিলেন। ইঁহার প্রথম রচনাগুলি নিতান্ত গ্রাম্য ভাষাতে রচিত ছিল। তাহার কতক এখনও পাওয়া যায়। সে গুলি বড়ই তাজা ও জীবন্ত ভাবে পূর্ণ। সে গুলির পরে ইনি "বাণী" কহিতে লাগিলেন। "বাণী" গুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অতিশয় গভীর। গভীর সাহিত্যরস ও সাধনরস একেবারে অত্যন্ত সংহত হইয়া "বাণী"তে ফুটিয়াছে। তাহার পরে তাঁহার গানগুলি (শব্দাবলী) রচিত হয়। ইনি কবীরের শিষ্যের শিষ্য, কাজেই কবীরের বহু কথাই ইনি আবার নূতন করিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু ইঁহার লেখায় খুব একটু নূতনত্ব আছে। তাহা ছাড়া তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাপ্ত সম্পদও অসাধারণ। ইঁহার সঙ্গীত শক্তি খুব গভীর ছিল।

ইনি বিবাহিত ছিলেন। পরে বিপত্নীক হইয়া আর বিবাহ করেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান সকল ধর্ম্মেই ইঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কাহারও সঙ্গে ইনি বিরোধ করেন নাই। অত্যন্ত দয়ালু ও সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে দয়াল বলিত। ইনি সকলকে "দাদা" "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন বলিয়া ইঁহাকে সকলে "দাদূ" নাম দিয়াছিল। ইনি সন্ন্যাসীর মত কোন নাম গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইনি যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে কোন সঙ্কোচ বা ভয়ের ভাব নাই। অত্যন্ত সাহস ও স্পর্দ্ধার সহিত সব কথা বলিয়াছেন। সাধনায় যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা সাজাইয়া বলিবার মত আশাও ইঁহার ছিল না এবং সঙ্কোচ করিয়া বলিবার মত সংশয়ও ইঁহার ছিল না।

ইনি ব্রহ্মকেই গুরু বলিয়া জানিতেন। তাহা ইঁহার প্রথম অঙ্গ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ব্রহ্মই অলক্ষ্য হইয়া রহিয়াছেন—তিনিই আবার গুরু হইয়া আপনাকেই আপনি গম্য করাইতেছেন। বাহিরে তিনি বিশ্ব রূপে গুরু, অন্তরে তিনি অপরূপে গুরু। কিন্তু দাদূর শিষ্যেরা ইঁহার লেখাতে এখন ব্যক্তি-গুরুবাদ ভীষণ ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। ইনি আল্লা, নারায়ণ, রাম, খোদা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, সম্প্রদায়গতদেবতা বা পুরুষবিশেষকে বুঝান নাই। সকলের আরাধ্য পরমব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছেন।

ইঁহার শিষ্যেরা প্রায়ই এখন অত্যন্ত বিদ্যাহীন ও

ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ। বরং ইঁহার "পন্থা"র বাহিরে অনেক মর্ম্মজ্ঞ সাধক আছেন। কাশীর পরলোকগত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় দাদূ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে অনেকেই প্রভূত উপকার পাইয়াছেন। আমি তো বিশেষ ভাবেই ঋণী।

দাদূ।*

প্রথম অঙ্গ।

১

গৈব মাহিঁ গুরুদেব মিলা
পায়া হম পরসাদ।
মস্তক মেরে কর ধর্যা
দেখা হম অগাধ॥

অন্তরের মধ্যে মিলিলেন গুরুদেব, পাইলাম আমি প্রসাদ, মস্তকে আমার ধরিলেন কর, দেখিলাম আমি অগাধ।

২

সত গুরু সো সহজই মিলা
লিয়া কণ্ঠ লগাই।
দায়া ভঈ দয়ালকী
দীপক দিয়া জগাই॥

সহজই মিলিয়া গেলেন সেই সদ্‌গুরু, কণ্ঠে করিলেন আলিঙ্গন; দয়া হইল সেই দয়ালের, দীপক দিয়া দীপ দিলেন (তিনি) জাগাইয়া।

৩

দাদূ দেব দয়ালকী
গুরু দিখাঈ বাট।
তালা কুংজী লাই করি
খোলে সবই কপাট॥

হে দাদূ, দয়াল দেবতার পথ দেখাইলেন গুরু। তালা চাবী আনিয়া সকল কপাটই দিলেন খুলিয়া।

৪

সত গুরু অংজন বাহি করি
নৈন পটল সব খোলে।
বহরে কানোঁ সুননে লাগে
গূংগে মুখসোঁ বোলে॥

সদ্‌গুরু হাতে অঞ্জন লইয়া (আমার) নয়নের সকল পটল দিলেন খুলিয়া। বধির শুনিতে লাগিল কানে, বোবা বলিতে লাগিল মুখে॥

৫

দাদূ সতগুরু সব দিয়া
আপ মিলায়ে ঐন।

হে দাদূ, সদ্‌গুরু সকলই দিলেন, আপনি মিলাইলেন নয়ন।

৬

সতগুরু কীয়া ফেরী করি
মনকা ঔরৈ রূপ।
দাদূ পংচৌ পলট করি
কৈসে ভয়ে অনূপ॥

(১) সদ্‌গুরু মনকে ফিরাইয়া করিয়া দিলেন এমন আর এক (বিচিত্র) রূপ। হে দাদূ, পঞ্চেন্দ্রিয়কে পালট করিয়া, কি জানি কেমন করিয়া হইয়া গেল অনুপম।

(২) সদ্‌গুরুর হাতের (রূপের) প্রভাবে মালা হইয়া গেল বিচিত্র রূপের। হে দাদূ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পালট করিয়া হইয়া গেল কেমন অনুপম। †

---

* অনুবাদক মহাশয় যথাসাধ্য মূলের অনুগত অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি, কাব্যভাষার প্রণালীর অনুসরণ করিয়া গদ্যরীতিকে অনেক স্থলে পরিহার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা মূলের রসটুকু অনুবাদে অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। মূলে যেখানে ভাবের গভীরতাবশত অর্থের অস্পষ্টতা আছে সেখানে অনুবাদে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা না করাই উচিত। কারণ, কবি কি বলিয়াছেন তাহাই আমরা চাই, অনুবাদক কি বুঝিয়াছেন তাহার গুরুত্ব তত বেশি নহে। কারণ অনুবাদক ভুল বুঝিতেও পারেন। তা ছাড়া গভীর তত্ত্বমূলক কবিতা ভিন্ন পাঠকে ভিন্ন রূপেই বুঝিবেন ইহাই স্বাভাবিক; তাহার পথরোধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে যে স্থলে বিশেষ ভাবে বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক, সেখানে অনুবাদক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া দিয়াছেন। সম্পাদক।

† দাদূর মতে সকল আকার ও রূপের মালাই এই জগতে চলিয়াছে। প্রত্যেকটি রূপ ও আকার সেই অসীম অগম্য ব্রহ্ম হইতে উঠিয়া আবার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। এই যে রূপের পর রূপ, আকারের পর আকার চলিয়াছে, ইহারা এক অনুপম অসীম রূপ-মালার অক্ষগুটিকার মত, একের পর একে ছন্দে ছন্দে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে যাত্রা করিয়াছে। গৃহের বাহিরে যেমন নানা রূপ আকার চলিতে থাকিলে রুদ্ধ গৃহের মধ্যে কোনো ছিদ্রপথে তাহার বিচিত্র সুন্দর প্রতিচ্ছায়ার পরম্পরা অতিশয় সুন্দর ভাবে ও ছন্দে চলিতে থাকে তেমনি বাহিরের জগতে না দৃষ্টি করিয়া অন্তর গুহাতে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ইন্দ্রিয়-রন্ধ্র-পথ-যাত্রা অতি সুন্দর ছন্দে অন্তরে একটি মালার মত ফিরিতেছে। ইন্দ্রিয়কে এইরূপে অন্তরে ফিরাইয়া অন্তরধ্যানকে 'ইন্দ্রিয় পলট' বলে। সাধক ইচ্ছা করেন, যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বোধ ব্রহ্মরূপের সাক্ষী মালা হইয়া অন্তরে প্রেমে ও ব্রহ্মধ্যানকে নিয়ত করে। এ বিষয়ে পরে বিশদ করিয়া লেখা হইবে।

৭

সতগুরু সবদ সুনাই করি
ভাবই জীব জগাই।
ভাবই অন্তর আপ করি
অপনো অংগ লগাই॥

হে সদ্‌গুরু, (তোমার) শব্দ শ্রবণ করাইয়া ইচ্ছা হয় জীবকে কর জাগ্রত, ইচ্ছা হয় আপনার অন্তরে লইয়া আপনার অঙ্গে লও লগ্ন করিয়া।

৮

বাহর সারা দেখিয়ে
ভীতরি কিয়া চূর।
সতগুরু সবদো মারিয়া
জান ন পাবই দূর॥

বাহিরে দেখিতেছ আস্ত, অন্তরে করিয়াছেন চূর্ণ। সদ্‌গুরু (যখন) শব্দ * দিয়া মারেন, তখন দূর তাহা জানিতেই পারে না।

৯

গুরু সবদ মুখসোঁ কহা
ক্যা নেরে ক্যা দূর।
দাদূ সিখ শ্রবনন সুনা
সুমিরন লাগা সুর॥

গুরু আনন্দে করিলেন শব্দ উচ্চারণ; কিবা নিকট কিবা দূর। শিষ্য দাদূ শুনিল (মাত্র) তাহা শ্রবণে, (কেবল) স্মরণে লাগিয়া রহিল সেই সুর।

১০

সবদ দূধ ঘৃত রামরস
মথি করি কাঢ়ই কোই।
দাদূ গুরু গোবিংদ বিন
ঘট ঘট সমঝি ন হোয়॥

শব্দ দুগ্ধের মধ্যে রামরস ঘৃত, কচিতই কেহ লয় তাহা মন্থন করিয়া। হে দাদূ, গুরু গোবিন্দ বিনা ঘটে ঘটে হয় না সেই রসটি প্রত্যক্ষ।

১১

ধীব দূধমেঁ রমি রহা
ব্যাপক সবহী ঠৌর।
দাদূ বকতা বহুত হৈঁ
মথি কাঢ়হিঁ তে ঔর॥

ঘৃত রমণ করিতেছেন দুগ্ধের মধ্যে, ব্যাপক তিনি সকল স্থানেই। হে দাদূ বক্তা আছেন অনেক, কিন্তু মন্থন করিয়া বাহির করিবার লোক আলাদা।

১২

মথি করি দীপক কীজিয়ে
সব ঘট ভয়া প্রকাস।
দাদূ দিয়া হাথ করি
গয়া নিরংজন পাস॥

মন্থন করিয়া কর দীপক, সকল ঘট হইল প্রকাশ। দীপক হস্তে লইয়া দাদূ গেল নিরঞ্জনের পাশ।

১৩

দীয়ে দীয়া কীজিয়ে
গুরুমুখ মারগ জাই।
দাদূ অপনে পীউ কা
দরসন দেখই আই॥

মুখ্যগুরুর পথে যাইয়া (তাঁহার) দীপ হইতে কর (তোমার) দীপটি (দীপ্ত); হে দাদূ আসিয়া দেখ আপন প্রিয়তমের দর্শন।

১৪

দীয়েকা গুন তেল হৈ
দীয়া মোটী বাতি।
দীপের গুণ (আসল) তেল,
দীপ তো শুধু মোটা পলিতা মাত্র।

১৫

নিরমল গুরুকা গ্যান গহি
নিরমল ভগতি বিচার।
নিরমল পায়া প্রেমরস
ছুটে সকল বিকার।
নিরমল তন মন আতমা
নিরমল মনসা সার।
নিরমল প্রাণী পংচ করি
দাদূ লংঘে পার।
নির্মল গুরুর জ্ঞান গ্রহণ করিয়া
নির্মল ভক্তির বিচার।
নির্মল পাইল প্রেমরস,
ছুটিল সকল বিকার।

---

* অন্তরের একটি গভীর ভাব যখন ছন্দে ও সুরে উচ্চারিত হইয়া ওঠে তখন তাহাকে বলে "শব্দ"। এই জন্য সঙ্গীতকে সাধকরা বলেন "শব্দ"। জগত ব্রহ্মের একটি গভীর আনন্দের ভাব হইতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সেই যে আনন্দকে তিনি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, ধ্বনিতে ছন্দে ছন্দে বিকশিত করিয়া করিয়া তুলিতেছেন তাহাই "আদি শব্দ"। সঙ্গীতে ভাবকে ও আনন্দকে প্রকাশকরার একটি বেদনা আছে। তাহাই ব্রহ্মের "বরনাকো অঙ্গ"॥ উপনিষদে —স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

নির্ম্মল তহু মন আত্মা
নির্ম্মল মানস মাঁৰ ;
নির্ম্মল করিয়া পঞ্চপ্রাণ
দাদূ উতরিল পার।

১৬

পরাপরী পাসই রহই
কোই ন জানব তাহি।

তিনি পাশেই পরাপরী * রহিয়াছেন, কেহই দেখিতেছে না তাঁহাকে।

১৭

মুখহিযেঁ মেরা ধনী
পরদা খোলি দেখাই।
আতমসোঁ পরমাতমা
পরগট আনি মিলাই।
ভরি ভরি প্যালা প্রেমরস
আপন হাথ পিলাই।

আমার মধ্যেই আমার প্রেয়সী, পরদা খুলিয়া দিলেন দেখাইয়া, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মা, প্রত্যক্ষ দিলেন মিলাইয়া। ভরি ভরি প্যালা প্রেমরস, আপন হাতে করাইলেন পান।

১৮

সরবর ভরিয়া দহ দিসা
পংখী প্যাসা জাই।
মানস সরোবর মাঁহি জল
প্যাসা পিবই আই॥

সরোবর ভরিয়া রহিয়াছে দশদিক (অথচ) পক্ষীটি চলিল পিয়াসী। মানস সরোবরের মধ্যে জল, হে পিয়াসী আসিয়া কর পান।

১৯

সুখী নদী তল সুরতি-বতি॥
শুষ্ক নদীর তলে রহিয়াছে প্রেমানন্দ রস। †

* একেবারে এক পাশ হইতে আর এক পাশ সকল দিক দিয়া অণুতে অণুতে ও তন্তুতে তন্তুতে অনুপ্রবিষ্ট ও অধিপ্রবিষ্ট থাকিলে তাহাকে 'পরাপরী' বলে। ইংরাজিতে through and through বলিলে কতকটা বুঝায়।

† চিত্রকর তাহার বর্ণকে গুলিয়া তবে চিত্র করে। তাহার যেমন বর্ণের আবশ্যক তেমনি জলেরও আবশ্যক। ব্রহ্ম এই বিশ্বে লোকলোকান্তরে ও ঋতুতে ঋতুতে যে কী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিচিত্র সৃষ্টি-তুলি বুলাইয়া চলিয়াছেন তাহা কিছুতেই যায় না বুঝানো। চিত্র-সৃষ্টিকর তাহার অশক্ত শুষ্ক বর্ণকে জলে গুলিয়া লয়। ব্রহ্ম তাঁহার অখণ্ড শক্তিকে কোন্ রসে গুলিয়া বিশ্ব-চিত্র-কর্ম করিয়া লন? তিনি প্রেমানন্দরসে তাঁহার অখণ্ড শক্তি গুলিয়া এই বিশ্ব চিত্র করিয়া চলিয়াছেন। এই বিশ্বের সৌন্দর্য্যের সুষমার ও শৃঙ্খলার মূলে প্রেমানন্দ রস। এই জন্য কবীর বলেন "আমি না থাকিলে বিশ্ব নাই, কারণ তিনি তাহা হইলে বিশ্ব করিতেই পারেন না। আমি না হইলে তাঁহার প্রেমের আশ্রয় নাই—প্রেম না হইলে তাঁহার শক্তি কোথায়?"

এই সৃষ্টির মূলে একটি গভীর বেদনা আছে। জ্ঞানদাস বৰেলী বলেন "চোখের জলে মসী গুলিয়া তিনি বিশ্বপ্রেম-পত্র লিখিয়া চলিয়াছেন।" এ বিষয়ে অন্য অধ্যায়ে আবার দেখা যাইবে।

সুফী ধর্ম্ম।

(E. G. Browne সাহেবের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।)

সুফী ধর্ম্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নয়। এমন কি, প্রথমে কাহারা সুফীমত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও আমরা জানিনা। আরব দেশের মরুভূমিতে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল; একটি তেজস্বী মহাত্মা সমস্ত আসিয়াকে আলোড়িত করিলেন; বিরোধ, কোলাহল, কলহ, দ্বন্দ্ব চারিদিকে জাগিয়া উঠিল; পূর্ব্বতন রাজবংশীয়দিগকে বিপর্য্যস্ত করিল; পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন সকল স্থানান্তরিত হইল; পুরাতন বিশ্বাস সকল বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেড় শত বৎসর পরে যখন এই গোলমাল কতকটা থামিয়া গেল এবং যখন এই সংঘাতের ফলে পুরাতন মতবিশ্বাসের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আকার প্রাপ্ত হইয়া সুস্পষ্ট রূপে গোচরীভূত হইল, তখন সুফী ধর্ম্ম দেখা দিল।

কখন ইহার গোড়াপত্তন হইল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায়না। আমার মনে হয় এই ধর্ম্মের ব্যাবহারিক অংশ অর্থাৎ সন্ন্যাস, পার্থিবসুখ বিসর্জ্জন, ভগবানের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল; তাহার পর উহার তাত্ত্বিক অংশ যথা, অদ্বৈত বাদ, মায়া বাদ, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা, সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। এক কথায়, সুফীরা সাধক হইবার পূর্ব্বেই সাধু হইয়াছিল। এই মতের পক্ষে কেবল যে সুফী দিগের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা নহে, সমগ্র মরমীধর্ম্মের *

* হিন্দুস্থানে এইরূপ গূঢ়গভীর ভাবুকতার ধর্ম্মকে "মরমী" বলিয়া থাকে এবং এইরূপ ভাবের ভাবুককে "মরমিয়া" বলে। যে ধর্ম্মের মূল মর্ম্মগত, যাহা শাস্ত্রগত জ্ঞানগত নহে, তাহাকে কেবল মর্ম্ম দিয়াই বুঝা যায় এইজন্য তাহার ভাষা ও ভাব বাহিরের লোকের পক্ষে অস্পষ্ট।

(mysticism) ইতিহাস সাধারণত ইহার সমর্থন করে। কত সহজে ভক্তি ধ্যানে গিয়া পৌছায়, ধ্যান ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে ও সমাধিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয় তাহা যে কেবল এই ধর্মের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে, ১৪ শতাব্দীর জর্ম্মান্ মরমিয়াদের (mystic) মধ্যে, রোমান্ ক্যাথলিক মহাত্মাগণের মধ্যে এবং ফরাসী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান মরমিয়াগণের মধ্যে ধর্ম্ম-জীবনের যে তিনটি রূপ আছে তাহার সহিত উল্লিখিত তিনটি রূপের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। প্রথমত, শরিয়ৎ বা আচার-নীতি। সংসারের স্থিতিরক্ষার জন্ম এবং মনুষ্যজাতিকে গন্তব্যপথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশে ঈশ্বর কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল আচারনীতি পালন করিয়া চলিলে হয় তো অন্ধভাবেও মানুষ ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার পরে আরো উচ্চতর পদ্ধতি তরীকৎ বা ঈশ্বর সাধনার পথ; এই পথের যাত্রী স্বর্গের সুখ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফল লাভের প্রত্যাশা করে এবং কেবল নিয়মপালন অপেক্ষা জীবনের আরো উচ্চতর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই পথ বড় দুর্গম এবং কঠিন, অতি অল্প লোকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত এই পথ ধরিয়া চলে; কিন্তু যে অল্প কয়েকজন চলে তাহারা সেই চরম লক্ষ্য, পরম চরিতার্থতা, হকীকৎ বা সত্যকে লাভ করে। এই তিনটি রূপের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা একটি গল্পের দ্বারা পরিষ্কার হইবে। একজন সুফী গুরু তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "যাও, ঐখানে যে তিন জন লোক বসিয়া আছে উহাদিগের প্রত্যেককে একে একে মারিয়া আইস।" সেই ব্যক্তি প্রথমে একটি আচারপরায়ণ লোকের নিকট গিয়া তাহার গালে একটা ঘুষি মারিল। সেও ফিরিয়া তাকাইয়া ঠিক সেই ওজনের একটি কিল ফিরাইয়া দিল; কারণ, ইস্লাম নীতি শাস্ত্রে আছে—"প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে আঘাত ফিরাইয়া দিবে।" ইহার পর সেই শিষ্য একটি সাধনপন্থীর নিকট গেল এবং তাহাকেও আঘাত করিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, রাগে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল; তিনি ঘুষি পাকাইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু হঠাৎ মনে হইল যেন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া গেলেন এবং স্পষ্ট বুঝা গেল যে আঘাতকারীকে মার ফিরাইয়া দিবার কিম্বা গালি দিবার প্রবল ইচ্ছাটাকে অতি কষ্টে দমন করিলেন। সে অবশেষে একজন সত্যসাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তির নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আঘাত করিল। ইঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যে সেই আঘাত, অপমান, এমন কি আঘাতকারীর সেইখানে উপস্থিতিসম্বন্ধেও যেন তাঁহার কোনো জ্ঞান নাই। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি রহিলেন, ধ্যানপুলকিত ভাবে আত্মা নিমগ্ন, বাহিরের কোনো চেতনাই নাই। মানুষের সঙ্গে সুফীদের ব্যবহারের আদর্শ যেরূপ উচ্চ ঈশ্বরের সম্বন্ধেও সেইরূপ। মহম্মদীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফজিল আইয়াজ্ নামে একজন সুফী বলিয়াছিলেন "আমার সমস্ত প্রেমের দ্বারা আমি ভগবানেরই উপাসনা করি, কেননা তাঁহার উপাসনা না করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।" কোনো ব্যক্তি একজন সুফীকে মানুষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ এবং অধম কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন—"যে ব্যক্তি ভয়ে কিম্বা ফল লাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে।" তিনি বলিলেন—"তুমি কিরূপ ভাবে তাঁহার উপাসনা কর?" সুফী উত্তর করিলেন—"প্রেমের প্রেরণায়, তাঁহার প্রেমই আমাকে তাঁহার অনুগত এবং দাস করিয়াছে।" ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিসর্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা সুফী ধর্ম্মের মধ্যে যে কত প্রবল উপরি উক্ত উপাখ্যানই তাহার সাক্ষীস্বরূপ।

একজন দরবেশ একদিন আবুল খালিদ্ খুজোবানির নিকট বলিলেন, "ভগবান যদি আমাকে স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে একটি স্থান নিজের ইচ্ছামত বাছিয়া লইবার ক্ষমতা দেন তবে আমি নরকেই যাইব, কারণ আমার হৃদয় তো স্বর্গকামনা করেই কিন্তু নরক কেবল ভগবানের মঙ্গল-অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই আছে।" আবুল খালিদ্ দরবেশকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"দাসের আবার পছন্দ কি? তিনি যেখানে যাইতে আদেশ করিবেন সেই খানেই যাইব, যেরূপ হইতে বলিবেন সেইরূপই হইব।"

সাদী বলেন, "একজন দরবেশকে একটি চিতাবাঘ এমন দারুণ ভাবে আহত করিয়াছিল যে তাঁহার ক্ষত কোনো ঔষধ প্রয়োগে সারিবে এরূপ আশা ছিল না। তিনি সমুদ্রতীরে বসিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন। কেন তিনি ধন্যবাদ দিতেছিলেন একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমি যে কেবল বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, পাপে নিমগ্ন হই নাই এই করুণার জন্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

রুস্তেম্ প্রকৃত মহত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তোমার ভাই যত বড়ই অপরাধ করুক না কেন তাহাকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু নিজে তাহার প্রতি এমন ব্যবহার কখনো করিও না।

হিন্দুস্থান প্রচলিত এই "মরমী" ও "মরমিয়া" শব্দকে আমরা mysticism ও mystic শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিব।

সম্পাদক।

যাহার জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, ইহাই যথার্থ মহত্ব।”

আবু সৈয়দ ইব্‌ন্ আবিল্ খাইয়র্, আবিসেন্নার নিকট সুফী ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, মাথার ভিতর যা কিছু আছে যথা, সংস্কার, কল্পনা, পূর্ব্ব বিশ্বাস ইত্যাদি সমস্ত দূর করা, যাহা হাতে পাওয়া যায় তাহা নিঃশেষে দান করা, যাহা ঘটে তাহাই অকাতরে বহন করা ইহাই সুফী ধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

এই তো গেল সুফী ধর্ম্মের ব্যাবহারিক বা নৈতিক দিক্‌টা; এখন আমরা ইহারই অন্তর্গত মত বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হইব।

পূর্ব্বকালের মুসলমান সন্ন্যাসীরা কেহই তত্বজ্ঞানী, কবি কিম্বা রীতিমত প্রচারক ছিলেন না। তাঁহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, আত্মার শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পার্থিব সুখভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যশ কিম্বা ধনসম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না। এই জন্য পরবর্ত্তী কালের লেখকগণ, যাঁহারা তাঁহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের উপদেশাদি সূত্র এবং গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদেরই পুস্তকাদির মধ্য হইতে ঐ সন্ন্যাসীদিগের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সমসাময়িক লোকেরা ইহাঁদিগকে একেবারে নাস্তিক না হৌক, অন্তত বিধর্ম্মী মনে করিত; এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে ইহাঁদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে; এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা অকাতরে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হুসেন্ ইব্‌ন্ মন্‌সুর, যাঁহাকে হাল্লাজ্ বা পশমপরিষ্কারক বলিত তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহাঁকে নানা প্রকার শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া পঙ্গু করিয়া তাহার পর ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। ঈশ্বরনিন্দা অপরাধে ইহাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। কারণ সুফীরা যাহাকে যোগ বা নিজের অস্তিত্ব ভগবানের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়া বলে সেই ভাববশে তিনি মাতোয়ারা হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—“আমিই সত্য আমিই ঈশ্বর।” যখন সকলে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া “আমি সত্য নই তিনিই সত্য” এই কথা বলিতে বলিলে তখন তিনি উত্তর করিলেন—“হাঁ, তিনিই তো সব, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে হারাইয়াছ; হুসেন আপনাকে হারাইয়াছে, বিন্দু অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু সমুদ্র যেমন তেমনিই আছে।”

যদিও সমসাময়িক লোকেরা তাঁহার নিন্দা করিয়াছে তথাপি পরবর্ত্তী কালে সকলেই তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তিনি দেখিতেন যে, তিনিই প্রেমিক এবং তিনিই প্রিয়। এই দু'য়ের মাঝখানে তাঁহার আমির কোঠাটি একেবারে শূন্য। যদিও পূর্ব্বতন ইস্‌লাম মরমিয়াদিগের (mystic) বাক্য এবং কর্ম্ম হইতে সুফীধর্ম্মের মোটামুটি তাৎপর্য্য বোঝা যায় তথাপি উহা তখনো পর্য্যন্ত জগতের তত্ববিদ্যার মধ্যে গণ্য হইবার উপযোগী একটি পরিপূর্ণ সুনির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি লইয়া গড়িয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তীকালের তত্বজ্ঞানীরা উহার ঐ অভাব পূরণ করিলেন। তাঁহারা প্লেটোপ্রবর্ত্তিত ভাববাদের মধ্যে একবারে আকণ্ঠনিমজ্জিত ছিলেন এবং পূর্ব্বগামীদিগের ঐ সকল মরমী বাক্য হইতে উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া উহাকে একটি আকার একটি পরিপূর্ণতা দান করিলেন। এই সকল তত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে চিন্তার অনেক প্রকার পর্য্যায় দেখা যায়। কাহারো ঈষৎ প্লেটোতত্বমিশ্রিত মুসলমানী ভাব, কাহারো প্লেটোতত্ব-ঘেঁষা অদ্বৈতবাদ।

যে সকল তত্বজ্ঞানীরা সুফীধর্ম্মকে সম্পূর্ণতা দান করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে সেখ্ মহিয়ুদ্দীন ইব্‌নুন্ আরাবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ইংরাজী ১১৬৫ সালে স্পেন্‌দেশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার প্রায় ৪০ বৎসর বয়স তখন তিনি প্রথম প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসেন, এবং চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কখনো মিশর দেশে কখনো আরব দেশে কখনো তুরস্ক দেশে পর্য্যটন করিয়া কোথাও বা দীর্ঘকাল বাস করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। ১২৪০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার রচিত বহু এবং বিরাট গ্রন্থাদি সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোক, বিশেষতঃ পারস্যদেশবাসীরা, অনেকেই পাঠ করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের রচনা আর কখনো এত প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হয় নাই। ১৪ শতাব্দীর সকল সুফী কবিরাই তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

বারান্তরে সুফী ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

যন্ত্র ও জীব।

যন্ত্র কাজ করে কিন্তু জীবের ন্যায় তাহারও আহার জোগাইতে হয়। আহার হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া জীব সেই শক্তিকে নানা কার্য্যে পরিণত করে, আর, বাষ্পীয় যন্ত্রে কয়লা পোড়াইয়া তাহার অগ্নির তেজে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করা হয়, সেই বাষ্প কাজ করে—কখনো গাড়ী টানে, কখনো জল তোলে, কখনো বা

ইট ভাঙিয়া সুরকী প্রস্তুত করিয়া দেয়। এ যন্ত্রের আহারই হইল কয়লা। আবার অনেক যন্ত্র আছে তাহাতে বল ব্যয় করিয়া বৈদ্যুত উৎপন্ন করা যায়;—জলের পরিবর্ত্তে এ গুলি বৈদ্যুত-শক্তি প্রদান করে। এই বৈদ্যুত আবার আর এক যন্ত্রের সাহায্যে কাজের আকার ধারণ করিতে পারে। ডাইনামো যন্ত্রের চাকা ঘুরাইয়া যদি কিছু বল ব্যয় করি, ডাইনামো আমাদিগকে বৈদ্যুত প্রদান করিবে, সেই বৈদ্যুতে আমরা অনেক কল চালাইতে পারি;—সে আমাদের গাড়ী টানিবে, পাখা চালাইবে, ছাপাখানার কাজ করিবে—তাহা দ্বারা আরো কত কাজ যে করা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবের অখ্যাতি আছে যে সে আগে আহার করে তার পর কাজ করে। কিন্তু কাজ চাহিলেই আহার যোগাইতেই হইবে। যন্ত্র যে এমন ভালমানুষ, কাজ চাহিলে সেও আহারের দাবী করিয়া বসে।

যন্ত্র ও জীবের মধ্যে এইখানে একটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা উভয়েই শক্তিকে হয় কার্য্যে পরিণত করে না হয় অন্য আকার প্রদান করে। এক প্রকারের শক্তিকে আর এক প্রকারে পরিণত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন প্রায়ই উপস্থিত হয়। আমার হাতে আছে বৈদ্যুত-শক্তি কিন্তু আমার গাড়ী চালাইবার প্রয়োজন। আমি ইলেট্রিক-মোটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুত-শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া এ কাজটি নিষ্পন্ন করিতে পারি—মোটার বৈদ্যুত-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিয়া দেয়। অনেক সময় আবার রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিতে হয় কিম্বা যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুত শক্তিতে পরিণত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যেখানে যাহা সুবিধা সেই শক্তিকে কাজে আনিতে হয় বলিয়া এরূপ প্রণালী আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যন্ত্রের ব্যবহার ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

কোথাও কোনো একটা পরিবর্ত্তন ঘটিলেই বুঝিতে হইবে, একটা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে এবং একটা কিছু ক্ষয় পাইয়াছে। আর এক কথায়, একদিকে শক্তিলাভ অথবা কোনো ক্রিয়া ঘটিয়াছে এবং অপর দিকে কিছু ব্যয় হইয়াছে। বাষ্প-চালিত এঞ্জিন্ কয়লা পোড়াইয়া সেই কয়লার শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে—তাহাতে একদিকে যান্ত্রিক শক্তি ব্যক্ত অন্য দিকে কয়লা ব্যয়।

জীবের সম্বন্ধেও এই কথাটা খাটে। ঘোড়া যাহা খায় তাহা হইতে রাসায়নিক শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে দৈহিক বলে পরিণত করে ও সেই বল কার্য্যে ব্যয় করে। কিন্তু যন্ত্র অপেক্ষা জীব এ কার্য্য [illegible]রূপে করে। অশ্ব আহার গ্রহণ করিয়া যে অনুপাতে কাজ দেয় যন্ত্র তাহা পারে না। যন্ত্রের সম্বন্ধে এ অনুপাতটী অনেক কম। কিন্তু তবু আমাদিগকে অশ্বকে ছাড়িয়া যন্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অশ্বকে প্রতিপালন এবং রক্ষা করিতে যেরূপ সাবধানতার প্রয়োজন হয় ও উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় তাহাতে কোনোরূপেই পোষায় না। জীবের শক্তি ব্যবহারে অসুবিধা অনেক আছে। যেখানে অত্যধিক শক্তির প্রয়োজন সেখানে জীব-শক্তির সাহায্যে কাজ চলে না। যন্ত্রের একটা বিশেষ গুণ এই যে তাহাতে অল্প স্থানের মধ্যেই বহু পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় বলিয়া প্রচণ্ড শক্তিকেও ব্যবহারে আনিতে বিশেষ দুঃখ পাইতে হয় না। এঞ্জিন উদ্ভাবিত না হইলে শত শত অশ্ব জুড়িয়া রেলগাড়ীকে এরূপ দ্রুতবেগে চালানো কথঞ্চিৎই সম্ভব হইত না।

তবে জীবগণের মধ্যে মানুষ একটি কার্য্য করিতে পারে যাহা আজ পর্য্যন্ত কোনো যন্ত্রই পারে নাই, কোনো দিন পারিবে এরূপ আশাও করা যায় না। মানুষ ভাবিতে পারে এবং ভাবিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিতে পারে—যন্ত্র এই স্থানে জীব-শক্তির নিকট হার মানিতে বাধ্য। কাজ মাত্রেরই জন্য ব্যয় করিতে হয়। মানব নামক জীব-যন্ত্রটি যে মানসিক শ্রম করে তাহার জন্যও ব্যয়ের প্রয়োজন আছে। মানুষ তাহার আহার হইতেই মানসিক শক্তিও লাভ করে। মস্তিষ্কে বল না থাকিলে মানসিক পরিশ্রম করা চলে না।

কতকগুলি লোক আছে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তত তীক্ষ্ণ নহে অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক অপেক্ষা তাহারা কম আহার করে না—অনেক সময়ে অধিকই খাইয়া থাকে। ইহারা এবং যাহারা অলস তাহারা খায় কিন্তু কাজে তাহার প্রতিদান করেনা। অলস ব্যক্তিও আহার্য্য হইতে লব্ধ শক্তিকে কোনো না কোনো রূপে ব্যয় করে বটে কিন্তু তাহাকে কার্য্য বলা চলেনা—উদ্দেশ্য যাহাতে নাই তাহা কার্য্য নামবাচ্য নহে—তাহা শক্তির অপব্যয় মাত্র। যন্ত্রেরও এ দোষ আছে। যে পরিমাণ শক্তির উপাদান ব্যয় করা হয় যন্ত্র হইতে সে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় না, খানিকটা অপব্যয় হইয়া থাকে। জীবই হোক আর যন্ত্রই হোক গ্রহণ ও প্রদানের অনুপাত যাহাতে যত অধিক তাহাই তত [illegible]। [illegible]

সের দানা খাইয়া পাঁচ মাইল যায় সে, যে অশ্ব সেই পরিমাণ দানা খাইয়া দুই মাইল মাত্র যায় তাহা অপেক্ষা ভাল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা দেওয়া যায় তাহার অধিকাংশই যে যন্ত্র হইতে কার্য্যকরী শক্তিরূপে ফিরিয়া পাওয়া যায় সেই যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যন্ত্র নির্ব্বাচনের নিয়ম এই।

জগতে কোনো পদার্থকেই তো নিখুঁৎ দেখা যায় না। ডারউইনের মতানুসারে জীবলোক নিকৃষ্টতর অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার উন্নতি দিন দিন চলিতেছে। মানব দেহে এখনো কত অভাব রহিয়াছে। কালক্রমে অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে অনেক অভাব ঘুচিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানের অনেক অভাব ভবিষ্যতে দূর হইবে।

যন্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যন্ত্রও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে; এবং ইহাও জানা যায় যে জীব-জগতের অভিব্যক্তির অনেক নিয়ম যন্ত্রের সম্বন্ধেও খাটে—যন্ত্রের যে ক্রমিক উৎকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা জীবজগতের অভিব্যক্তির নিয়মানুসারেই।

কাটা, ঘষা, চিরিয়া লওয়া, আঘাত করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ যদি একটি মাত্র অস্ত্রের সাহায্যে করিতে হয় তাহা হইলে কিরূপ অসুবিধা ঘটে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অসুবিধা আছে বলিয়াই এবং এই অসুবিধাকে বোধ করা হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের পৃথক পৃথক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। জীবজগতে, পদ, মুখ, হস্ত, পাকস্থলি হৃদয় প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যতই অভাব বোধ হইয়াছে ততই ক্রমে ক্রমে সেগুলির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এক একটি অস্ত্র যেমন এক একটি কার্য্যের জন্য, আর একটির জন্য নহে—করাত যেমন চিরিয়া লওয়ার জন্য, আঘাত দিয়া পেরেক বসাইবার জন্য নহে—ঠিক তেমনি ভাবে জীবের এক একটি অঙ্গ এক একটি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। পা আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহাকে কলম ধরিয়া লিখিতে বলিলে সে বেচারার প্রতি অত্যন্ত জুলুম করা হইবে। এইরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এই সুফল ফলিয়াছে যে সকল কার্য্যই ভালরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে। একটিকে দশটির উপযোগী করিয়া গড়িতে গেলে সেটি ভালরূপে কোনোটিরই উপযোগী হয় না। জীব-জগত এইরূপে প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক অনুপযোগী এবং অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ দূরীভূত হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয়গুলি ব্যবহৃত হইয়া কেবল যে রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

জীব-জগতের এই কথাটি অনেকের নিকটেই নূতন নহে, বরঞ্চ পুরাতন বলিয়াই বোধ হইবে। যন্ত্র সম্বন্ধেও এইরূপটি ঘটিয়াছে। আর ঘটাও আশ্চর্য্য নহে, কারণ যন্ত্রেও শক্তিকে রূপান্তরিত কিম্বা কার্য্যে পরিণত করা হইয়া থাকে যাহাতে জীব আপন শক্তিকে যতদূর সম্ভব বাগে আনিতে পারে এবং কাজ সুসিদ্ধ হয়। সেই চেষ্টাতেই জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অপচয় ও উপচয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা যাহাতে যতদূর সম্ভব কমিয়া যায় যন্ত্রের ক্ষেত্রে এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং যন্ত্র তদনুসারেই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে জলীয়-বাষ্প-চালিত যন্ত্র লওয়া যাইতে পারে। প্রথম যখন জলীয় বাষ্পের সাহায্যে নৌকা চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তখন এই উদ্দেশ্যে এরূপ একটি নৌকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে সেটিকে দেখিলে এখনকার লোকে হাসিবে। কিন্তু এ হাসির কোনো মূল্য নাই। দারউইন বনমানুষ হইতে মনুষ্যের অভ্যুদয়ের কথা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বনমানুষের চালচলন, অঙ্গভঙ্গি, আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমরা হাস্য করিয়া থাকি। অপ্রয়োজনীয় ও অসুবিধাজনক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি লোপ পাইয়া এবং প্রয়োজনীয় গুলির উন্নতি সাধিত হইয়া বনমানুষজাতীয় জীব হইতে যেমন মানুষ হইয়াছে, প্রথমকার ষ্টীম্ নৌকাখানির অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া, প্রয়োজনীয় অনেক অংশের উৎকর্ষ সাধন করিয়া এবং নূতন অনেক অংশ যোগ করিয়া বর্ত্তমান কালের ষ্টীম্‌বোট্ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাই আরো উন্নতি লাভ করিয়া ষ্টীমারে পরিণত হইয়াছে। জাহাজে সেই ষ্টীম্ এঞ্জিন্ আরো উন্নত আকারে ব্যবহৃত হয়।

জীব-জগতের অভিব্যক্তিতে আরো একটা কারণ কাজ করিয়াছে। সেটি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় যে জয়লাভ করিয়াছে সেই বাঁচিয়া গিয়াছে। যে জীব জীবন-সমরে তাহার সমসাময়িকদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই তাহাকেই লয় পাইতে হইয়াছে। জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই রক্ষা পাইয়াছে।

যন্ত্রের ইতিহাসেও এইরূপই দেখা যায়। প্রতিযোগিতায় অনেক নূতন পুরাতনকে হটাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যন্ত্ররাজ্যে পরিবর্ত্তনে কালের ব্যবধান অত্যল্প বলিয়া এ ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অপ্রয়োজনের ভার কোথাও সহ্য হয় নাই—জীব-জগতেও না, যন্ত্রেও না।

অভিব্যক্তির আইনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে সকল বস্তুকেই একটা না একটা বিশেষত্ব লাভ করিতেই হইবে কিম্বা একটা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য তাহার আবশ্যকতা থাকা চাইই, তাহা না হইলে তাহার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

এ ছাড়া হিসাবনিকাশের কথা তো আছেই। যন্ত্র, গ্রহণ ও প্রদানের মধ্যে হিসাব মিটাইয়া রক্ষা পায়, তাহা না পারিলে পায় না। জীবকেও এই হিসাব মিটাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে হয়। এইখানে জীবকে যন্ত্রের কোঠায় নামিয়া আসিতে হইয়াছে। যে হিসাব মিটাইতে পারে না তাহার পতন নিশ্চিত।

নববর্ষের প্রার্থনা।

এই চামেলি ফুলের মত
শুধু সৌরভে মাথা ফুটে থাকা হোক্
মোর জীবনের ব্রত!
আহিক ভাবনা কেন ফুটে আছে,
আপনি পূর্ণ আপনার কাছে,
প্রভাতের পানে আঁখি মেলিয়াছে
জ্যোতি সুধাপানে রত।

যেন অমনি শুভ্রতায়
আজি অনাবৃত করি হৃদয় আমার
দলগুলি খুলে যায়!
সরল সহজে আলোকে বাতাসে
শ্যামল স্নেহের বক্ষের পাশে
সব বাধা টুটি' আপনা প্রকাশে
সফল পূর্ণতায়!

যেন এমনি ধরণীপরে
ধীরে দিন অবসানে ক্ষীণ জীবনের
চ্যুতদলগুলি ঝরে!
যেন এ ক্ষণিক বাঁধনের ডোর
একে একে সব টুটে যায় মোর
পরাণ অমৃত-গন্ধ বিভোর
মরণেরে লয় বরে'!

আশ্রম সংবাদ।

শান্তিনিকেতন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্রানুশীলনের নিমিত্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদের কয়েকটি সমিতি আছে।

"প্রবন্ধ পাঠ সভা" নামে একটি সমিতি গত ফাল্গুন মাসে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। ২৪এ ফাল্গুনের অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্বার্কপ্রবর্ত্তিত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর গত ১লা, ৮ই ও ১৫ই চৈত্র পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "গীতা পাঠের ভূমিকা" বিষয়ক প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব পাঠ করিয়া গত ২২এ চৈত্রে গীতা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "বাংলা বিশেষ্য পদের একবচন" নামক একটি প্রবন্ধ ৫ঠা চৈত্র তারিখে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

ছাত্রদের সাহিত্য সভায় চৈত্রমাসে "বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস," "বঙ্গসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" ও "নিয়মনিষ্ঠা" এই তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সভার নিয়ম অনুসারে কোনো ছাত্র নির্দ্ধারিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আলোচনা উত্থাপন করেন; তারপরে উপস্থিত বালক ও অধ্যাপকগণ ঐ আলোচনায় যোগদান করিয়া থাকেন।

চৈত্র মাসে ছাত্রদের ইংরাজী তর্ক সভার দুইটমাত্র অধিবেশন হইয়াছে। এই দুইদিনের প্রথম দিনে সভার বিধি ব্যবস্থা আলোচিত হয়; দ্বিতীয় দিনে "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা ভাল" এই বিষয়ে তর্ক চলিয়াছিল। চারিজন ছাত্র উক্ত বিষয়ের পক্ষে অপর চারিজন ছাত্র উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। তিনজন বিচারক বক্তা ও লেখকদের বক্তব্য শুনিয়া থাকেন। বিচারকদের মতে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষীয় বালকদের বক্তৃতা অধিকতর যুক্তিপূর্ণ হওয়ায় তাহারা জয়লাভ করিয়াছে।

এখানে ছাত্রদের সাহিত্যানুশীলন চেষ্টা আর একটি আকারও ধারণ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বড়, মাঝারি ও ছোট বালকদের হস্তলিখিত তিনখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। বালকদের উপযোগী রচনায় এবং তাহাদের অঙ্কিত নানা চিত্রে ভূষিত হইয়া শোভন আকারে পত্রিকাগুলি মাসে মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বড়দের দ্বারা পরিচালিত "শান্তি" পত্রিকা ইতিমধ্যে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। মাঝারি বালকদের মাসিক পত্র "বাগানের" প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। ছোটদের "প্রভাতের" দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে।

বিগত বাসন্তীপূর্ণিমা রজনীতে স্থানীয় মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মোপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি সংক্ষেপে সোজা কথায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন।

আশ্রমবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বহুদিনযাবৎ ভারতের মধ্যযুগের মহাপুরুষদের ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার আলোচনার ফলে আমরা "কবীর" ৩ খণ্ড লাভ করিয়াছি। তৎপ্রণীত "দাদূ" অচিরে প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

জ্যোতিঃ। শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

কাব্য রচনায় গ্রন্থরচয়িত্রীর এই প্রথম চেষ্টার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা কষ্টকল্পনা নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই বাহুল্যবর্জ্জিত নিরলঙ্কার কবিতাগুলি স্বচ্ছ, সরল ও সরস হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব লেখিকার নিজের সামগ্রী এবং তাহার মধ্যে তাঁহার কবিপ্রকৃতি সহজেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই কবিতাগুলিতে মননশক্তির সহিত ভাবুকতার সুন্দর স্বাভাবিক সম্মিলন ঘটিয়াছে।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্তবাদ।

প্রথম প্রপাঠক।

পরিচয়।

বেদান্তদর্শন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা উচিত, অতএব অদ্য আমি আপনাদের নিকটে তৎসম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিব।

আলোচ্য দর্শনের নাম বেদান্ত হইল কেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে অনেক সংবাদ জানা যাইবে। বেদ ও অন্ত এই দুইটি কথা লইয়া বেদান্ত শব্দ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এখানে বেদ শব্দের অর্থে কোনো মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু অন্ত শব্দের অর্থে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই বুঝায়;* এবং অন্ত শব্দের অর্থ শেষ। অতএব বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের শেষ, অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদান্তে যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ভাবে বেদের শেষ ভাগেই আছে; অতএব বেদের শেষ অংশের নাম বেদান্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ বলা হয়। ইহার মধ্যে মন্ত্র ভাগ প্রাচীন এবং ব্রাহ্মণ ভাগ তাহার পরবর্ত্তী; এই হিসাবে মন্ত্রকে বেদের পূর্ব্বভাগ, এবং ব্রাহ্মণকে তাহার অন্ত বা শেষ ভাগ বলিতে পারা যায়। আমরা বেদান্ত বলিতে সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ নামে যে গ্রন্থগুলি বুঝিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই এই ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকায়, এইরূপে তাহাদিগকে বেদান্ত বলিতে পারা যায়। অপর কথায় পূর্ব্বোক্তরূপে মূলত ব্রাহ্মণই বেদান্তশব্দবাচ্য, এবং ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া উপনিষদ্‌গুলিকেও বেদান্ত বলা যায়; কিন্তু ব্যবহারত সমগ্র ব্রাহ্মণকে বেদান্ত না বলিয়া উপনিষৎ-সমূহকেই বেদান্ত-নামে অভিহিত করা হয়।

আবার কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগে বেদকে বিভক্ত করা যায়। বেদের এই দুই ভাগের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড আদি ও জ্ঞানকাণ্ড অন্ত। অতএব এই জ্ঞানকাণ্ডকে এইরূপে বেদান্ত বলিতে পারা যায়, এবং এই জ্ঞানকাণ্ড ও পূর্ব্বোক্ত উপনিষৎ একই।

প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে নানাবিধ কর্ম্মের বিধান করিয়া শেষে আত্মতত্ত্বপ্রভৃতি জ্ঞানবিষয়ক বিবিধ কথা আলোচিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশ কাণ্ডে দর্শ-পূর্ণমাস প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মের আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষ চতুর্দ্দশ কাণ্ডটিতে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে; এই কাণ্ডটির নামই সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের প্রথম দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম ও অবশিষ্ট আট অধ্যায়ে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই শেষ আট অধ্যায়েরই নাম ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মবিধান করিয়া তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ ঐতরেয় আরণ্যকের পাঁচটি আরণ্যকে মহাব্রত নামক কর্ম্মের আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যকে জ্ঞান

* "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্"—আপ. প. সূ. ১. ৩৩।

আলোচনা করা হইয়াছে, এই জন্য প্রথম আরণ্যকটিকে কর্ম্মকাণ্ড এবং পরবর্ত্তী আরণ্যক দুইটিকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। * শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতাতেও পূর্ব্ববর্ত্তি উনচল্লিশটি অধ্যায়ে কর্ম্ম ও শেষ চত্বারিংশ অধ্যায়টিতে জ্ঞান আলোচিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিকে কর্ম্মকাণ্ড, এবং অন্তিম অধ্যায়টিকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। † এইরূপ অন্যত্রও প্রায়ই দেখা যাইবে যে, অগ্রে কর্ম্ম ও তাহার পর জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কাশী হইতে প্রকাশিত ১ সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহের একখানি টীকাতে বেদান্ত শব্দের দুইটি ব্যুৎপত্তি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। একটি পূর্ব্বোক্ত বেদের অন্ত বেদান্ত, অপরটি বেদের অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যাহাতে, তাহা বেদান্ত। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটির তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বেদের চরম শেষ সিদ্ধান্ত বেদান্ত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজিতে রহিয়াছে, এই জন্যই তাহার নাম বেদান্ত। অন্ত শব্দের অর্থ নির্ণয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ; স্থানান্তরে শঙ্কর, রামানুজ, আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য্য) প্রভৃতি আচার্য্যগণও নির্ণয় অর্থে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। ২ সিদ্ধান্ত ৩ শব্দের অন্ত শব্দও এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, অন্ত শব্দের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ শেষ, চরম এই অর্থ হইতেই ক্রমে নির্ণয়, নিশ্চয় অর্থ হইয়াছে। যাহাই হউক, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহটীকার এই দ্বিতীয় অর্থটি কল্পনাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

বেদান্ত শব্দটি কোনো প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদের মধ্যে দেখা যায় না। শ্বেতাশ্বতর ৪ ও মুণ্ডক ৫ এই দুই খানি প্রাচীন, এবং মহানারায়ণ ৬ ও কৈবল্য ১ প্রভৃতি পরবর্ত্তী উপনিষদে ঐ শব্দ আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ২ ইহা আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বেদান্ত বলিতে মূলত উপনিষৎ বুঝিতে হয়। ৩ উপনিষদেই বেদান্তবাদের মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—যদিও ইহার বীজ ও অঙ্কুর মন্ত্রাত্মক সংহিতার মধ্যেই প্রকাশিত। সংহিতায় যাহা সূক্ষ্মাকারে ছিল, বেদান্ত বা উপনিষদে তাহাই বিপুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদান্ত বলিতে যখন প্রধানত উপনিষৎকেই বুঝিতে হয়, তখন তাহার সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা না বলিলে চলে না। এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমত আমরা ঐ উপনিষৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে আরম্ভ করিব।

বেদান্তবিদ্‌গণ বলেন যে, উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ বিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য (মণ্ডন মিশ্র) স্বকীয় বৃহদারণ্যকভাষ্য‍বার্ত্তিকে উ প নি ষ ৎ শব্দের ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া তিনটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ:—উপ-উপসর্গ ও নি-উপসর্গ-পূর্ব্বক সদ্ ধাতু হইতে (ক্বিপ্-প্রত্যয়ে) উ প নি ষ ৎ পদ হইয়াছে। উ প উপসর্গের অর্থ সামীপ্য, নি উপসর্গের অর্থ নিঃশেষ অথবা নিশ্চয়, এবং সদ্ ধাতুর অর্থ বিশরণ (অর্থাৎ হিংসা,) গতি, ও অবসাদন (অবসন্ন করা।) সুরেশ্বরাচার্য্য সদ্ ধাতুর এই ত্রিবিধ অর্থ ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—(১) ব্রহ্মবিদ্যা যেহেতু এই জীবকে অদ্বৈত ব্রহ্মের সমীপে লইয়া গিয়া ইহার অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত কার্য্যকে নিঃশেষ রূপে নাশ করে, সেই জন্য তাহার নাম উপনিষৎ। (২) অথবা যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা জীবের অনর্থমূল অবিদ্যাকে নিঃশেষ রূপে বিনাশ করিয়া অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জীবরূপে গ্রহণ করায় বুঝাইয়া দেয় (গ ম য় তি,)—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিহত হইলে জীব "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই জন্য তাহার নাম উপনিষৎ। (৩) অথবা যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যাকে উচ্ছন্ন করায়, প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ তন্মূলক রাগ দ্বেষ প্রভৃতিকে অ ব সা দি ত করে, সেই জন্য তাহার নাম উ প নি ষ ৎ।"

কঠোপনিষদ্-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"যে·

---

* "কর্ম্মকাণ্ডং সমাপর্য্য বেদো জ্ঞানং বিবক্ষতি॥
আরণ্যকং দ্বিতীয়ং যৎ তৃতীয়ঞ্চ তদাত্মকম্।
জ্ঞানকাণ্ডং ততঃ সোপনিষদিত্যভিধীয়তে॥"

ঐ. আ. ২. ১. ১।

† "একোনচত্বারিংশতাধ্যায়ৈঃ কর্ম্মকাণ্ডং নিরূপিতং। ইদানীং কর্ম্মাচরণশুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানকাণ্ডমেকেনাধ্যায়েন নিরূপ্যতে।"

বাজসনেয়ি সংহিতা ভাষ্য মহীধর।

১ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত পুঁথী।
২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২. ১৬।
৩ এই অর্থেই প্রযুক্ত কৃতান্ত শব্দও উল্লেখ্য।
৪। ৬. ২২।
৫। ৩. ২. ৬।
৬। ১০. ৬; ১০. ৮।

১। ৩, ২২।
২। ১৫. ১৫।
৩। বেদান্তসারে সদানন্দ যতি ইহাই বলিয়াছেন—"বেদান্তো নাম উ প নি ষ ৎ-প্রমাণম্।"

সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি লৌকিক ও বৈদিক বিষয় সমূহে বীতরাগ হইয়া (ব্রহ্ম) বিদ্যার নিকটে উপস্থিত হন ও তন্নিষ্ঠ হইয়া নিশ্চয়ের সহিত তাহাকে ভাবনা করেন, (ব্রহ্মবিদ্যা) তাঁহাদের সংসার বীজস্বরূপ অবিদ্যাকে বিশরণ অর্থাৎ হিংসা বা বিনাশ করে, এই জন্য সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ বলা হয়। তিনি স্থানান্তরে আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সমীপে লইয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়াও বিদ্যাকে উ প নি ষ দ্ বলা যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার নাম উ প নি ষ ৎ হওয়ায়, যে সকল গ্রন্থে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা বা উ প নি ষ ৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ সমূহকেও অভেদ ব্যবহারে গৌণভাবে উ প নি ষ ৎ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য কোনো কোনো স্থানে উপনিষৎ শব্দ সাধারণ বিদ্যা বা দ র্শ ন (তত্ত্ব) অর্থে ধরিয়াছেন। * এক স্থানে † তিনি যোগ অর্থেও ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উ প নি ষ ৎ পদে যখন তিনি সেই নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তখন এই দুইটি অর্থের কোনোটিই উল্লেখ করেন নাই, তখন তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রহ্মবিদ্যাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন উপনিষৎ শব্দের আরো একটি অর্থ রহস্য। এই অর্থ সাধারণপ্রচলিত কোষেও আছে, ‡ এবং শঙ্করাচার্য্যও উপনিষদ্ ভাষ্যে স্থানে স্থানে এই অর্থ ধরিয়াছেন। ॥ ব্রহ্মবিদ্যা যে অতিরহস্য অতিগুহ্য, ইহা যে সকলের নিকট প্রকাশ পায় না, ইহা যে, অতিগভীর অতিনিগূঢ় তাহা প্রসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে র হ স্য বি দ্যা বলিতে পারা যায়, এবং তজ্জন্যই ইহাকে রহস্য বাচক উ প নি ষ ৎ শব্দে অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উ প নি ষ ৎ কে স্পষ্টতই বে দ গু হ্য অর্থাৎ বে দে র র হ স্য বলা হইয়াছে। ¶

ব্রহ্মবিদ্যাকে রহস্য বলিবার একমাত্র কারণ এই যে, তাহা অতিগম্ভীর, অতিদুর্জ্ঞেয়; প্রকাশ করিলেও সাধারণ লোকে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; সাধারণ ব্যক্তি অনেক সময় এই তত্ত্ব শুনিয়া তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে। "তাঁহার পা নাই, অথচ তিনি দ্রুত গমন করেন; তাঁহার হাত নাই, অথচ গ্রহণ করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন; এবং তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন;" "তিনি অচল হইলেও মন অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী;" ১ "তিনি চল, তিনি অচল; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি এই সমস্তের অভ্যন্তরে, এবং তিনি ইহার বহির্ভাগে;" ২ এই সকল কথার তাৎপর্য্য সাধারণ ব্যক্তিরা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাহারা এই সমুদয় কথাকে অসম্ভব বলিয়া একবারে উড়াইয়া দিতে পারে, এবং এইরূপে প্রকৃততত্ত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহারা শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ ঐ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থূলদর্শী অসংস্কৃত-চিত্ত সাধারণ লোকের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন, এবং সেই জন্যই ঐ তত্ত্ব বা বিদ্যাকে গুহ্য বা র হ স্য বলা হইয়াছে। উপনিষৎ সমূহে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, সহজে কেহ ঐ বিদ্যা লাভ করিতে পারেন নাই, আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যায় উপদেশ লাভ করা যাইত না। আচার্য্য শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আবশ্যকমত অল্প বা দীর্ঘকাল-যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠান করাইয়া এবং তাহাতেই শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে সংস্কৃত করিয়া গভীর তত্ত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তাহার পর সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিতেন এবং শিষ্যও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেন। যত দিন শিষ্য উপযুক্ত না হইতেন ততদিন আচার্য্য সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁহার নিকটে প্রচ্ছন্ন করিতেন, কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না। উপনিষদে ইহার দৃষ্টান্ত শত শত রহিয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপ রহস্য বলিয়াই অনেক সময়ে তাহা অ র ণ্যে র মধ্যে আলোচিত হইত, এবং তাহা হইতেই কতকগুলি বৈদিক গ্রন্থের নাম আ র ণ্য ক হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় অন্যান্যও যে সকল কর্ম্ম প্রভৃতির তত্ত্ব রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তৎসমুদয়ও অ র ণ্যে আলোচিত হইত, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থগুলিকেও তজ্জন্য আ র ণ্য ক নামে অভিহিত

* বৃহ. আ. ৪. ২. ১, ছান্দোগ্য ৮. ৮. ৪, ৫; তৈ. উ. ১. ৩. ১; ছান্দোগ্য ১. ১৩. ৪।

† ছান্দোগ্য. ১. ১. ১০।

‡ "ধর্ম্মে রহস্যুপনিষৎ"—অমর।

॥ 'ব্রহ্মোপনিষদং বেদ"—এই ছান্দোগ্যোপনিষদের (৩. ১১. ৩) ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "ব্রহ্মোপনিষদং বেদ গুহ্যং বেদ।" দ্রষ্টব্যঃ—তৈ. উ. ১. ৩. ১; ১১. ৪; ২.৯. ১; বৃহ. আ. ৫. ৫. ৪।

¶ 'তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্"—শ্বেতা. উ. ৫. ৬। "বেদেষু গুহ্যা যা উপনিষদঃ—"ইতি নারায়ন কৃত দীপিকা।

১ শ্বেতাশ্ব. ৩. ১৯।

২ ঈশা. ৪।

করা হইয়া থাকে, * এবং র হ স্য শব্দে তাহাদেরও উল্লেখ দেখা যায়। †

আ র ণ্য ক নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার অ ধি কা ং শ ই ‡ ব্রাহ্মণের মধ্যে। ব্রাহ্মণের ঐ বিশেষ বিশেষ অংশগুলি অরণ্য মধ্যে আলোচিত হইত বলিয়া সেই অংশগুলিকে সাধারণ আ র ণ্য ক নামেই উল্লেখ করা যায়, তাহার সহিত ব্রা হ্ম ণ শব্দ আর ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এই সকল আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই এক দেশ। শতপথ ব্রাহ্মণেরই চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষৎ বলা হয়, কেননা, ঐ ব্রাহ্মণের ঐ অংশ অরণ্যেই পঠিত হইত বলিয়া তাহা আরণ্যক, পরিমাণে বৃহৎ বলিয়া তাহা বৃহৎ, ¶ এবং রহস্য বলিয়া তাহা উপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট স্বরূপ, ॥ এবং ইহারই শেষ সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠকের নামই তৈ ত্তি রী য় উ প নি ষ ৎ। ঐতরেয়-আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত, এবং এই ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদকেই (আরণ্যক) ঐ ত রে য় উ প নি ষ ৎ বলা হইয়া থাকে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

রহস্য গ্রন্থসমূহের অরণ্যে অধ্যয়ন করিবার বিধি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্পষ্টই দেখা যায়। ঐতরেয় আরণ্যকের সর্ব্বশেষ খণ্ডেও (৫. ৩. ৩) তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

স দ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন সং স দ্ শব্দ, ও প রি ষ দ্ শব্দ যেমন সভা বুঝায়, উ প নি ষ ৎ শব্দও সেইরূপ ঐ ধাতু হইতেই উৎপন্ন, এবং ইহাও তাহাদের ন্যায় সভাকেই বুঝায়, তবে ইহা সাধারণ সভা নহে, ইহা র হ স্য সভা; মহর্ষিগণ এইরূপ র হ স্য স ভা তে ই, ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিতেন, এবং তাহা হইতেই ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা ও তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থাবলীর নাম উ প নি ষ ৎ হইয়াছে। কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Dr. Paul Deussen) এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। আমার নিকটে এ ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না। উ প নি ষ ৎ শব্দ কোনো স্থলে সভা বুঝাইতেছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সং স ৎ প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে দি বি ষ দ্ শব্দেরও অর্থ কোনোরূপ সভা ধরিতে হয়। যিনি বলিতে চাহেন যে, উ প নি ষ ৎ শব্দ প্রথমে র হ স্য স ভা, তাহার পর র হ স্য বি দ্যা -ব্রহ্মবিদ্যা, এবং তদনন্তর র হ স্য গ্র ন্থ কে (উপনিষৎকে) বুঝাইয়াছে, তাঁহাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে; কেবল প্রতিজ্ঞায় বস্তুসিদ্ধি হয় না। ইনি এক সোপান নীচে নামিয়া আবার পূর্ব্বোক্ত স্থানেই উঠিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতীয় ব্যাখ্যাকারগণ উ প নি ষ ৎ শব্দে যে র হ স্য বি দ্যা অর্থ করিয়াছেন ইনিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই অর্থের জন্য তাঁহাকে আর একটি অধিক অর্থ (সভা) স্বীকার করিতে হইয়াছে॥

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

* "অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে। অরণ্যে তদধীয়াত্যেবং বাণ্যং প্রবক্ষ্যতে॥"—তৈত্তিরীয়ারণ্যক-সায়ণভাষ্য, উপক্রমণিকা।

† "এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ......"—গোপাল ব্রাহ্মণ, ১. ২. ৯; এখানে র হ স্য শব্দে আ র ণ্য ক ই বুঝিতে হইবে—শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী, ত্রয়ীপরিচয়, ৫৮।

‡ অধিকাংশই এই জন্য বলিতেছি যে, সামবেদের মন্ত্র ভাগেরই মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র আ র ণ্য ক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

¶ "সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদ্ আরণ্যকম্, বৃহত্ত্বাদ্ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ শাঙ্করভাষ্য উপক্রমণিকা।

॥ "ব্যাখ্যাতা...মন্ত্রা ব্রাহ্মণ ভাগাশ্চ, ইদানীং তচ্ছেষভূতম্ আরণ্যেঽনুবাক্যং তত্রং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—তৈ. আ. ভট্টভাস্কর ভাষ্য-উপক্রমণিকা।

বিজয়ী।

আজিকে হৃদয় পুনঃ এসেছে ফিরিয়া বক্ষে মম
সগৌরবে, বিশ্বজয়ী অশ্বমেধ তুরঙ্গমসম
জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়া। আজ সাধ্য নাই আর
বাঁধিয়া রাখিতে তারে সঙ্কীর্ণ এ অঙ্গনে আমার
কোনমতে; যে পেয়েছে আত্মবিজয়ের মহানন্দ
অমৃতের আস্বাদন, নির্ম্মুক্ত সে, কোনো বাধাবন্ধ
নাহি রহে কোথাও তাহার; সে যে পবনের মত
বিশ্ববন্ধু, সিন্ধুর মতন দৃপ্ত উদ্যোগী নিয়ত,
নির্ম্মল আলোকপ্রায় প্রসারিত গগনে ভুবনে,
অসীম আকাশসম পরিব্যাপ্ত অনন্ত জীবনে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নববর্ষ।

আজ আমরা পুরাতন বর্ষ অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিয়াছি।

আজ আমাদের হিসাব লইবার দিন। দেখিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ আদর্শকে আমরা আশ্রয় করিয়াছি

তাহাকে আমাদের জীবনে কতদূর সফল করিতে পারিয়াছি।

এই জন্য প্রথমেই আমাদিগকে সুস্পষ্ট করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের ব্রাহ্মধর্মের কি আদর্শ? এই ধর্মের দুই দিক আছে, এক আধ্যাত্মিক এক সামাজিক। প্রথম, আধ্যাত্মিক সাধন, অর্থাৎ যে সমস্ত সাধনে আত্মশক্তি উপার্জ্জন করা যায়। সেই সাধনার আরম্ভেই আমাদের সংযম চাই কেন না প্রবৃত্তি বলবতী। কামনা দুষ্পূর—কিছুতেই তার আশা মেটেনা। 'অস্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ' কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা আরো জ্বলিয়া ওঠে।

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

এই হেতু সংযমদ্বারা প্রবৃত্তি সকলকে বশে আনিতে হইবে, নতুবা আমাদের সমূহ দুর্গতি। ব্রত অনুষ্ঠান ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাস—নানা সাধনা তপস্যা, ইহার উদ্দেশ্যই প্রবৃত্তি সংযম।

এই ত গেল একদিক কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আর এক দিক আছে, সে সামাজিক। তাঁর আদেশ পালন শুধু আপনার জন্য নয়। সমাজের হিতের জন্য তোমাকে জাগ্রত থাকিতে হইবে—সাধনা করিতে হইবে।

দেখ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কি বিস্তীর্ণ! আমাদের সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, কত প্রকার অভাব রহিয়াছে দূর করিতে হইবে, কত কুসংস্কার আছে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কত দুঃখ দারিদ্র্য রহিয়াছে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে হইবে—ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

এই জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান একতা। আমাদের মধ্যে সেই জাতীয় মঙ্গলের মূল পদার্থটিরই একান্ত অভাব। জাতিভেদে আমরা আপনাদের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন—হিন্দু হিন্দুতে দলাদলি, হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য, আমাদের জাতীয় জীবন গঠন হইবে কোথা হইতে। জাতীয় মঙ্গলের দ্বিতীয় প্রধান উপকরণ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। সেই মহৎ কার্য্যের ভার লইতে আজও আমরা কেহ যথার্থ ভাবে প্রস্তুত হই নাই।

এমন কত বলিব! বস্তুত সামাজিক মঙ্গল-সাধনব্রত আমরা যথার্থভাবে গ্রহণ করি নাই বলিলেই হয়। সমাজের মধ্যে আমাদের উন্নতির বাধাজনক কত সহস্র আবর্জ্জনা জমিয়াছে সর্ব্বত্রই আমাদের মনুষ্যত্ব কেবল বাধাই পাইতেছে। বর্ণাশ্রম এক বাধা, লোকাচার এক বাধা, শাস্ত্রের অন্ধ অনুশাসন এক বাধা। এ সমস্তকে ভাঙিয়া ফেলিয়া আমাদের চিত্তকে আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই আজ সচেষ্ট হইয়া উঠিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের যাহার যাহা সামর্থ্য—সেই পরিমাণে এই মহৎ মঙ্গলকার্য্যে আমাদের প্রত্যেককে মিলিতেই হইবে! প্রতি জনে কিছু না কিছু জোর দিয়ে টানিলেই সমাজরথ উন্নতির পথে সহজে ধাবিত হইবে। আমি যতটা পারি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট—সাধু যার চেষ্টা ঈশ্বর তার সহায়! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। চেষ্টা বর্ত্তমানে বিফল হয় হইলই বা, বিফলতার মধ্য দিয়াই সাফল্য একদিন অভাবনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

যিনি কল্যাণকারী তাঁহার কখনই দুর্গতি হয় না। যে উদারহৃদয় মহাত্মা বঙ্গে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এই বিদ্যালয়ে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—যাঁহারা অনাথ বালক বালিকা বিধবাদের জন্য আশ্রমালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—যে সকল সাধু-পুরুষ অন্ধ ও মূকদের শিক্ষাদানে কায়মনে যত্নশীল, যে বীরাঙ্গণা বিধবাদের ভরণপোষণ শিক্ষা উপযোগী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন—তাঁরা ধন্য—তাঁদের সৎকার্য্য জয়যুক্ত হউক—ঈশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

মহাপুরুষ ঈসাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অনুশাসন কি, তিনি উত্তর কারলেন, পরম পিতা পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিবে আর তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত ভালবাসিবে—ধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠ নিয়ম। ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা—ধর্ম্মের এই দুই প্রধান অনুশাসন। প্রেম ও সেবা এই দুই উপকরণে মিলিয়া ব্রহ্মপূজা সম্পূর্ণ হইবে।

এই ব্রহ্মপূজায় আত্মশক্তি ও দেবভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। এই জন্য একদিকে সর্ব্বতোভাবে শক্তির সাধনা, আর একদিকে সেই শক্তির মূলে যিনি আছেন প্রীতিযোগে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, এ দুইই আবশ্যক। একদিকে বাহিরে কর্ম্মের দ্বারা শক্তির ক্ষেত্রে আর একদিকে অন্তরে ভক্তির দ্বারা আনন্দের ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ যোগসাধন করিতে হইবে।

অদ্যকার নববর্ষের শুভদিনে এই মহাব্রত এই ব্রহ্মপূজা যেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারি,

যিনি আমাদের চির দিনের পরমমঙ্গল তিনি আমাদিগকে সেই মঙ্গলবুদ্ধি প্রেরণ করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রেমের লক্ষণ কি, কি?

প্রেমের প্রথম লক্ষণ সহবাসের ইচ্ছা। যিনি যাঁহাকে ভাল বাসেন, তিনি তাঁহার সহবাসের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া সুখী হন।

কিন্তু যিনি পরমেশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের সহবাস কেমন করিয়া লাভ করিবেন? মানুষ কীটানুকীট হইয়া সেই মহান্ অনন্তের সহবাস কেমন করিয়া লাভ করিবে? পরিমিত মানবের পক্ষে কি অনন্তের সহবাস সম্ভব?

তিনি অনন্ত বলিয়াই তাঁহার সহবাস সম্ভব। অনন্ত কাহাকে বলে? সকলই যাঁহার মধ্যে। সকলই সেই অনন্ত পুরুষের অন্তর্গত। যদি সকলই তাঁহার অন্তর্গত না হয়, যদি তাঁহার বাহিরে কিছু থাকে, তাহা হইলে, তিনি কেমন করিয়া অনন্ত হইলেন? আমরা তাঁহার মধ্যে। তবে সহবাস হইবেনা কেন?

তিনি নিরাকার। নিরাকারের সহবাস কেমন করিয়া হইবে? নিরাকারের সহবাস যেরূপ হয়, সাকারের সহবাস সেরূপ হয় না। কেননা, সাকার পদার্থের মধ্যে যতই কেন সন্নিকর্ষ থাকুক না, উহার মধ্যে আকাশের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। আমার পার্শ্বস্থ বন্ধুর মধ্যে ও আমার মধ্যে আর কিছুই ব্যবধান না থাকিলেও আকাশের ব্যবধান অবশ্য থাকিবে।

তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত বলিয়া যদি বিশ্বাস কর, তবে সহবাস হইবে না কেন? সহবাস অর্থ কি? সঙ্গে থাকা। নিকটে থাকা। তিনি যত নিকটে, এত নিকটে আর কে?

কিন্তু তিনি যে নিকটে, তিনি যে সঙ্গেই আছেন, ইহা প্রকৃত ভাবে কে বিশ্বাস করে? বৃদ্ধ বলিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী; যুবা বলিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, বালক বলিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, নর নারী সকলেই বলিতেছে তিনি সর্ব্বব্যাপী কিন্তু কে প্রকৃত ভাবে বিশ্বাস করে যে; তিনি সর্ব্বব্যাপী?

সাকারবাদী বিশ্বাস করেন যে, মূর্ত্তিতে তাঁহার দেবতা অধিষ্ঠিত। হে ব্রহ্মোপাসক! তোমার দেবতা কোথায়? তাঁহাকে সকল পদার্থে কি দেখিবে না? এই যে অসীম শূন্য ইহা কি তাঁহার সত্তায় পূর্ণ দেখিবে না? বিশ্বাসেই সহবাস। প্রেমিক বিশ্বাসী সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসেই থাকেন।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেমাস্পদের সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি প্রেম। যাহা কিছু তোমার প্রিয়তম বন্ধু সম্বন্ধীয় তাহা প্রেমের চক্ষে দেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বন্ধুর গৃহ, বন্ধুর সন্তানগুলি, সকলই তোমার প্রেমের বিষয়।

মা তাঁহার শিশুটিকে কত স্নেহ করেন! মাতৃস্নেহ কি গভীর! স্নেহের এমন দৃষ্টান্ত কি জগতে কোথাও আছে? শিশু সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সকলই মা প্রেমের চক্ষে দেখেন। শিশুর বস্ত্র, শিশুর পুতুল, সকলই মার প্রেমের বিষয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানরত্ন হারাইলে, শিশুর সামগ্রীগুলি মা বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করেন।

পতিপ্রাণা সতীর পক্ষে তাহাই। স্বামীর বস্ত্র, স্বামীর পাদুকা, স্বামীর দোয়াত, স্বামীর কলম, স্বামী সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সকলই তিনি প্রেমের চক্ষে দেখেন। বিদেশগত স্বামীর হস্তলিখিত পত্রখানি আসিলে, তিনি প্রেমাশ্রুবিন্দুতে সিক্ত করিয়া উহা পাঠ করেন। ঐ পত্রখানি গোপনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কতই আরাম লাভ করেন। পতিহস্তলিখিত লিপিখানি তাঁহার কত প্রিয়!

পরমেশ্বরের এই জগৎ। সুতরাং ঈশ্বরপ্রেমিকের নিকট এ জগৎ প্রেমাস্পদ। রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু সকলেই তাঁহার প্রেমাস্পদ। কেননা, সেও তাঁহার সন্তান, সেও তাঁহার প্রিয়। সেই জন্য, জগতের মহাপুরুষগণ মহাপাতকীকেও ভালবাসিয়াছেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ সেবা। যিনি যাঁহাকে ভালবাসেন, তিনি স্বভাবতঃ তাহার সেবা করিতে ভাল বাসেন। ঈশ্বরপ্রেমিক তাঁহার প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের সেবা করিতে চান। কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা কি সম্ভব? তাঁহার কি দুঃখ আছে, কি অভাব আছে, যে জন্য তাঁহার সেবা সম্ভব হইতে পারে? মহাত্মা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের সেবার অর্থ তাঁহার সন্তানদের সেবা, জীবের সেবা।

যীশু বলিয়াছেন যে, অতি সামান্য ব্যক্তির সেবা করিলে আমার সেবা করা হয়। যীশুর এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? সহানুভূতিতে, প্রেমে অতি সামান্য দীনহীন জনের সঙ্গে তিনি এক হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বলিয়াছেন যে, অতি দীনহীন জনের সেবা করিলে, আমার সেবা করা হয়। সামান্য দীনহীন ব্যক্তিদের সহিত তিনি প্রেমে এক হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের সেবায়, অতি কাঙ্গাল দীন দুঃখীর সেবায় তাঁহারই সেবা। ভালবাসায় মানুষ এক হয়। সন্তানের সেবা করিলে কি মাতার সেবা করা হয় না?

জগতের মাতা প্রেমেতে তাঁহার সন্তানদের সহিত এক। সুতরাং জীবের সেবায় তাঁহারই সেবা।

প্রেমের চতুর্থ লক্ষণ এই যে, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কথা বলিতে ভালবাসে। ভক্তজন ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

ভগবদ্গীতায় ভগবদ্ভক্তিরূপে বলা হইয়াছে ;—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃপরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

যাঁহাদের চিত্ত আমাতে, ও যাঁহারা মদ্গতপ্রাণ, তাঁহারা আমার গুণ সকল পরস্পরকে বলেন, ও সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করেন, এবং উহাদ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

আমরা কি তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে অন্তরের সহিত ভালবাসি ? কত সময় বৃথা কথায়, পরনিন্দায় কাটিয়া যায়। জীবন নষ্ট হয়। তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার কথায়, সময় অতিবাহিত করিতে পারিলে অধ্যাত্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারি।

প্রেমের পঞ্চম লক্ষণ কি ? অনুকরণ। অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার মত চলে, ফেরে, হাসে, কাঁদে। ভক্ত সেইরূপ ভগবানের অনুকরণ করেন। ভগবানের জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ ভক্তের মধ্যে ক্রমে ক্রমে আসিতে থাকে। ভক্ত তাঁহার প্রেমাস্পদের ন্যায় ক্রমে ক্রমে, অধিকতর পবিত্র, তাঁহার ন্যায় দয়াবান, তাঁহার ন্যায় ক্ষমাশীল হইতে থাকেন। ভক্ত ক্রমে তাঁহার মত সংসারাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন ; অথচ তাঁহারই মত সংসারের মধ্যে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে, সংসারের কার্য্য করেন। তিনি অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত ক্রমে তাঁহার মত হইতে থাকেন।

প্রেমের ষষ্ঠ লক্ষণ, স্বার্থত্যাগ। আমরা কি করিতেছি ? কত সৈনিক পুরুষ, সামান্য অর্থের জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে যায়। আমরা তাঁহার জন্য কি করিতেছি ? কুমারী কব বলেন, কত নারী, কত পুরুষের প্রেমে পড়িয়া, আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান করিতেছে। আমরা তাঁহার জন্য কি করিতেছি ? মানুষ মানুষের জন্য যাহা করে, আমরা কি তাঁহার জন্য তাহার শতাংশের একাংশ করিতেছি ?

ধর্ম্মজগতের মহাত্মারা, ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের জন্য, কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, কত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা কি পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিব ? সেই প্রেমময়ের প্রেমের খাতিরে প্রত্যেক সাধককে, দৈনিক জীবনে, আত্মবিনাশ সহ্য করিতে হয়। নতুবা হয় না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষশেষ।*

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে ? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক—তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ ; শেষ বলতে যে কি বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না ; বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করচে—আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করচে। তোমরা এই যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করচ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি—তোমরা কেবল নিচ্চ এবং খাচ্চ—আর আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আস্‌চি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করচি ;—ঘরে যা সঞ্চয় করে বসেছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না—সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে ; আজ কিছু যাচ্চে, কাল কিছু যাচ্চে—অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্ব্বাচলের যাত্রী, সূর্য্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ—সেইদিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করচেন তাঁকে তোমরা পূর্ব্ব মুখ করেই প্রণাম কর। আমরা পশ্চিম অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি—সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আস্‌চে—সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্ব্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ—একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ—কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই—একদিকে যিনি শিশুর, আর একদিকে তিনিই বৃদ্ধের। একদিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্চেন, আর একদিকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্চেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষের উপাসনাকালীন বক্তৃতার সারমর্ম।

হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না—ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়—বিরাম যে কেবল কর্ম্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায় এই কথাটি আজ এই চৈত্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-কাশে যেন মূর্ত্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্চে। স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি জগতে যা-কিছু চলে যায় ক্ষয় হয়ে যায় তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্চেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্ব্বেই আমি বলেছি তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন নূতনকে পাচ্চ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্চেই! এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তাহলে কিজন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ঙ্কর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তাহলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরত না আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্চি জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলি একটি পাওয়াতে এসে ঠেকচে—সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্চে সেখানে দেখচি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড় একটি আশ্চর্য্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া, তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই পাইনি পাইনি কান্নাটা থেকে যায়—অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুন্‌তে পাইনে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুন্‌তে দেয় না।

কিন্তু একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কি গভীর পাওয়া, কি বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবামাত্র মৃত্যুভয় চলে যায়—তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে, যা-কিছু যাচ্চে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্চে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে—সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন নূতনকে পায় না—তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই ত পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলি আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিষ থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে সব ঘুচ্‌লেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেই জন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এই জন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে মৃত্যু আছে। যদি না থাক্‌ত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখ্‌তুম, সত্যকে দেখ্‌তুম না। কিন্তু বিষয় কেবলি মেঘের মত সরে যাচ্চে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্চে বলেই যিনি সরে যাচ্চেন না, মিলিয়ে যাচ্চেন না তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্চি।

তাই আমি বলচি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বদ্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখ। কিছুই থাক্‌চে না, সবই চলেছে এইটিই লক্ষ্য কর। মন শান্ত করে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্চে এমন একটি থাকা স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগচ্চে ততই দেখতে পাচ্চি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে তার হিসাব রাখতে কে পারে, তা অনেক তা অসংখ্য; কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে সমস্ত দিয়ে যাঁকে পাচ্চি তিনি এক। গেছে গেছে এ কথাটা যতই কেঁদে বলি না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠ্‌চে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগচে সেখানে ভাল করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্চে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও—দেখ, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণু-পরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু একজায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কল-শব্দ নেই চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সঙ্গীতে বিলীন হয়ে রয়েছে,—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে দিয়েছেন এজন্যে আমি আমার মানব জীবনকে ধন্য মনে করচি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ যে কোল সেই বক্ষে সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করচি। একদিকে অনেককে হারিয়েও আরেকদিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাইনি, যা পেয়েছি এবং চাইনি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্য্যের মধ্যে যখন দেখ্‌তে পাচ্চি তখন তাদের দুঃখ বেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠ্‌চে—কেননা, আমি যে দেখ্‌তে পাচ্চি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি—আমার যা কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্চে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি—একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন, এমন আনন্দ আর কিছু নেই এমন অভয় আর কি হতে পারে!

আজ আমার মন তাঁকে বল্‌চে, বারে বারে খেলা শেষ হয় কিন্তু হে আমার জীবন-খেলার সাথী, তোমার ত শেষ হয় না। ধূলার ঘর ধূলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়, কিন্তু যে-তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে-তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ সেই-তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বল্‌তে পেরেছি খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে; দেখ্‌তে পাচ্চি ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করচ,—সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করচি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তা হলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জ্জনার আঘাতে পদে পদে ধুলোর উপরে পড়তে হয়—এবার সে সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়াতাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠিনে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও! যত বিঘ্ন দূর কর, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, যা কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্চে সব লয় করে দাও—হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপ্নভঙ্গ।

গোপনে যা ছিল নয়নে ভাসিল
পরিয়া আলোক সাজ।
আঁধারের তলে মণিহেন জলে
ভুবনে চেতনরাজ।
এই চেতনায় নিজ ভাবনায়
যে পারে করিতে লয়
মোহ অন্ধকার কাটি গিয়া তার
ভাসে একাকারময়।
একের আলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে
দেখে সে আপনরূপ,
আলোকে আঁধারে হেরে বারে বারে
আপনারে অপরূপ।
ক্রমে যাওয়া-আসা আলো হয়ে ভাসা
আঁধারে হওয়া সে লীন;
এই জ্যোতিকোষে কে বাজায় বোসে
আলো আঁধারের বীণ্!
এ যে প্রাণতম আত্মা অনুপম
মানব জীবন সার।
গুপ্ত লোক হতে আলোকের পথে
ছড়ায় চেতনাধার।
হের হে আপন মরম গোপন
চরম পরম ধন্।
হৃদয় ভেদিয়া উঠে প্রকাশিয়া
ভাঙিয়া মোহ স্বপন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

অন্তরের নববর্ষ।*

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করেনি—এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক্!

এই যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল—কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না,—আকাশভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল;—কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল—তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজ্‌ল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে—সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হচ্চে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায়নি—আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যে দিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিণ বাতাসে নবীনতার আশীস মন্ত্র পড়ে দেয় সে দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখনি অনায়াসে শুক্‌নো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে—ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়। এই যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়—কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু মানুষ ত পুরাতন আবরণের মধ্য থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আস্‌তে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয় বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; সেই তার অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মত আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে—এবং সেই তার প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মত দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশিদিনের সন্তান নয় তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে প্রাচীন। কেন না সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত;—যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হচ্চে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাক্‌তে পারচে না। সে আপনার শত সহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে—সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শত সহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে,—যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার রত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে: কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেল্‌তে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলচে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারদিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাক্‌লেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জ্জনা সঞ্চিত হতে থাকে—প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সে গুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার—সেই জন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্ম্মস্থানে গিয়ে পড়ে—তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, প্রভু, তুমি আমাকেই মারচ—বলি, আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা কর—কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব এ আমি গ্রহণ করব না।

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করচে। প্রকৃতির কত লক্ষ কোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসজ্জিত সুসংহত করে না তুলচে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণ-

গুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা—ততক্ষণ তার যুদ্ধ অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলচে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্চে এবং সুষমার পরিবর্ত্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারিদিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্চে।

সেই জন্যে বিশ্বজগতের যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মত অবিশ্রাম চলেছে, একদিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেই জন্যেই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই—সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না—তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়—বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেই জন্যে আমি বলচি, এই প্রত্যূষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ নির্ম্মলতা, এই যে পাখীর কাকলীর স্বাভাবিক মাধুর্য্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়—যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ, যেন মনে না করি এ'কে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্ম্মলতা আমারই নির্ম্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি;—মনে যেন না করি, স্তব পাঠ করে নামগান করে কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ করে আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্ত্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকেও আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন এই কথাটিকে সত্য রূপে মনের মধ্যে চিন্তা কর। একবার ধ্যান করে দেখ সেই নববর্ষের কি ভীষণরূপ! তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলচে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্ব্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মত বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখীর গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে—আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্য্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন—তিনি তাকে সহজ জীবন দেননি। সেই জন্যেই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়;—তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলচি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষকে পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে ত সহজ দান নয়। আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি, তবে মাথা তুল্‌তে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি, তোমার এ ভার বহন করতে পারিনে প্রভু,—মনুষ্যত্বের অতি বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর!

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন তাইত মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্ম্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্যেই তার উপরে এত দাবি। এই জন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব্ব করে চল্‌তে হয়, এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসম্বরণ!

মানুষ যখনি মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে—তখনি বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর! তখনি তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মত আর ত সে ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চল্‌তে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও! একটি দরজার পর আরেকটি দরজা ভাঙ, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ কর,—তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক্!

এই যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র—সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্ব্বলকণ্ঠে বলি, আমার বল নেই সেইটেই আমার মোহ। দুর্জ্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনি-

ককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শাণিত অস্ত্র সব ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলচে। সে সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়চি; ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষত বিক্ষত করচে। এ সমস্ত ত সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এস, এস, দলে দলে বাহির হয়ে পড়—নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্ব্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠেছে—সমস্ত অবসাদ কেটে যাক্, সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক্—জয় হোক্ তোমার, জয় হোক্ তোমার প্রভুর।

না, না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সাম্‌নে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মত গ্রহণ কর।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্ত্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু যুদ্ধ চল্‌চে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি—তা যদি না আসতুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সঙ্গীত বাজিয়ে তুলেছে—তোমার মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্ম গ্রহণ করেছি; তোমার এত দান এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে শান্তি চাইতে দাঁড়াইনি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকাবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, ততই তোমার আদেশ আরো তীব্র, আরো কঠোর হয়ে ওঠে। কেন না, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও! পাঠাও তোমার মৃত্যুদূতকে ক্ষতিদূতকে! জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে—সে ত সহজে মোচন করা যাবে না—তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু কত মিথ্যা আর বল্‌ব, বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব, বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুলব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক্—সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র কর। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি—তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্য-সুপ্ত তারগুলোকে কঠিনবলে আঘাত করুক তাহলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসঙ্গীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তাহলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখ্‌তে পাব—তাহলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠের ভূমিকা।

সাংখ্যের গোড়াতেই আছে, দুঃখনিবৃত্তি কি উপায়ে হইতে পারে তাহারই জিজ্ঞাসা—তাই গতবারে ঐ কথাটির পর্য্যালোচনা যত পারি সংক্ষেপে সমাধা করিয়া তাহারই উপরে আমার চরম বক্তব্য কথাটির গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম। আজ যাহা বলিব তাহাও ভূমিকারই মধ্যে ধর্ত্তব্য।

শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, ভূমিকা সমগ্র অট্টালিকা নহে—তাহা ভিত্তিমূল মাত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণবিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, আর অট্টালিকার দোষগুণ-বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণবিচারস্থলে কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা শোভা পায়; তাহা এই যে, ভিত্তিমূল দৃঢ় কি অদৃঢ়; তা বই ভিত্তিমূল সুশ্রী কি বিশ্রী, অথবা বাসের উপযোগী বা অনুপযোগী এরূপ জিজ্ঞাসা শোভা পায় না। কিন্তু ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন গৃহনির্ম্মাতার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার হাতের এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যটি চুকাইয়া ফেলিয়া মনকে হাল্‌কা করিবার জন্য—দুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে গতবারে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম তাহা আর একটু বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা না করিলে

সেদিনকার কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি অনেকে অনেক প্রকার ভুল বুঝিবেন।

মনুষ্যের দুঃখ বেশীর ভাগ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। শারীরিক রোগ বরং মনুষ্যের গায়ে সহে, কিন্তু মানসিক শোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহার বিষানল লোককে—বিশেষতঃ অবলা লোককে—পাগল করিয়া ছাড়ে। একে তো তাহাকেই সাম্‌লানো ভার, তাহাতে সে আবার সঙ্গী যুটাইয়া আনে শারীরিক রোগের দল-কে-দল। পাপজনিত আত্মগ্লানি আবার সকলকে জিতিয়াছে। তাহা যে কিরূপ ভয়ানক দুশ্চিকিৎস্য অন্তর্দাহ, মহাকবি সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ্ এবং তাঁহার সহপাপিনী লেডি ম্যাক্‌বেথ্ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার, প্রেমপীড়িত হৃদয়ের মর্ম্মাধিষ্ঠিত বিচ্ছেদানলের দহনজ্বালার সহিত মৃত্যুর যে কতটা নিকট সম্বন্ধ, ঐ মহাকবির রোমিও জুলিয়েট্ তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাকি রাখে নাই। তা ছাড়া, জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার দুঃখ আছে—যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা মহাপুরুষ, এবং ব্রাহ্মণপুত্র চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াঘ্যাঁসা দুঃখ। সহস্রের মধ্যে এক-আধ জন অসামান্য মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া উঠে, তখন আর-আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হয়। এই অতলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত কম্পমান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে। আত্মার এই গোড়াঘ্যাঁসা দুঃখের নিবৃত্তির নামই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি—কেননা এই দুঃখ নিবারিত হইলেই মনুষ্যের আর কোনো দুঃখ থাকে না।

গতবারে গোড়াতেই আমি সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে তাহার ভিতরের মর্ম্মকথাটি টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহাকেই বা আমি বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা, কাহাকেই বা বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার, সে কথাটি আমার মনের মধ্যে চাপা রহিয়া গিয়াছে; তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

আমাদের দেশের পণ্ডিতমহলে কাপিল দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য, এবং পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তা বলিয়া তাহা দুই সাংখ্য নহে—পরন্তু একই সাংখ্যের আগেরটি বীজ এবং শেষেরটি ফল। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই লেখা আছে "সাংখ্য যোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ" সাংখ্য স্বতন্ত্র এবং যোগ স্বতন্ত্র এ কথা বালকেরাই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। "একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" সাংখ্য এবং যোগ এই দুই শাস্ত্রকে যাঁহারা একেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেখেন তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। ভগবদ্গীতার এই কথাটির মর্ম্ম শিরোধার্য্য করিয়া আমি কাপিল দর্শনকে বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা বা বীজ; যোগশাস্ত্রকে বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার বা ফল। বীজ হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফল ফলাইয়া তোলা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন ফলার্থী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না, তেমনি নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তোলা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসুব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের সমস্ত স্মৃতিপুরাণ এবং বিশেষতঃ পাতঞ্জল দর্শন, কপিল মুনির নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তুলিয়া সাংখ্য দর্শনের সার্থক্যসম্পাদন করিয়াছে।

কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপনার অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখদুঃখাদি গুণদ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা। প্রকৃতি অবিদ্যা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন এবং বিদ্যামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে মুক্তি-ধামে পৌঁছাইয়া দ্যান্। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার পথই অবলম্বনীয়, তত্ত্ববিদ্যাই ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু বিদ্যা পদার্থটা কি? কাপিল সাংখ্যের মতে তাহা আর কিছু না, প্রকৃতিকে আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা; আর উহার মতে, ঐপ্রকার বিদ্যার পরিপক্ব অবস্থায় জীবাত্মার বুদ্ধির অভ্যন্তরে যখন এইরূপ বিবেক উৎপন্ন হয় যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং সে আপনি স্বতন্ত্র, তখন তাহারই বলে জীবাত্মা সমস্ত সুখ দুঃখাদির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতির আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই পুরুষার্থসাধনের একমাত্র পন্থা। কপিল মুনির এই মোট মন্তব্য কথাটি যদি বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় বিজ্ঞমণ্ডলীর কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ কথাটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু উহাতে আমাদের দেশের তত্ত্ব-পন্থীদিগের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। কেহো-

পনিষদে আছে যে, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে; আবার, ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ—তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত। প্রকৃত কথা এই যে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রদর্শিত শুষ্ক জ্ঞানের পথ পুরুষার্থরূপী চরম গম্যস্থানে পৌঁছিবার পক্ষে ব্যাঘাত-জনক বই সুবিধাজনক নহে।

সাংখ্যের মতে বিদিতব্য তত্ত্ব সবিস্তারে বলিতে গেলে পঁচিশটি, সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটি,—ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত জগৎ এবং জ্ঞাতা পুরুষ। নিশাবসানে শয্যা হইতে গাত্রোত্তোলন করিবার সময় প্রতিদিনই আমরা ঐ তিনটি তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; প্রতিদিনই প্রাতঃকালে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে কার্য্যরূপী ব্যক্ত জগৎ, কারণরূপী অব্যক্ত জগৎ এবং দর্শকরূপী আপনি এই তিনটি মৌলিক তত্ত্ব আমাদের সাক্ষাৎ-জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে সহজেই এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, এই যে প্রভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিদিনই উলটিয়া পালটিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে—ইহার প্রকরণ পদ্ধতিইবা কিরূপ? আর ইহার চরম উদ্দেশ্যই বা কি? প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্ত হইবার সময় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া স্থূল হইতে স্থূলে অনুলোমক্রমে অভিব্যক্ত হয়; এবং অব্যক্ত হইবার সময় স্থূল হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে প্রতিলোমক্রমে পর্য্যবসিত হয়। চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি আপনার অধিষ্ঠাতা দ্রষ্টাপুরুষের ভোগ এবং মুক্তির উদ্দেশেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হ'ন।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে জ্ঞাতা পুরুষ প্রকৃতির কে, যে, তাহার ভোগমোক্ষের উদ্দেশে কার্য্য না করিয়া প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না? সাংখ্যদর্শনে ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, দুগ্ধ পানের জন্য বাছুরকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিলে গাভীর স্তন হইতে যেমন আপনাআপনি দুগ্ধক্ষরণ হইতে থাকে, সেইরূপ অধিষ্ঠাতা পুরুষের ভোগমোক্ষের উদ্দেশে প্রকৃতি স্বভাবতই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কপিল মুনির এ কথাটা সমীচীন নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বেদান্তদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের কথা-প্রসঙ্গে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে তিন প্রকার—বিজাতীয় ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, ঐক্যও তিন প্রকার,—বিজাতীয় ঐক্য, স্বজাতীয় ঐক্য এবং স্বগত ঐক্য। অচেতন বৃক্ষ এবং সচেতন জীবের মধ্যে প্রাণবত্তাঘটিত ঐক্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিজাতীয় ঐক্য, এবৃক্ষ এবং ওবৃক্ষের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বজাতীয় ঐক্য, আর, বৃক্ষ এবং শাখাপত্রের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বগত ঐক্য। শেষোক্ত স্বগত ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ঐক্য তাহাতে আর ভুল নাই। বাছুর যখন গোরুর গর্ভে বিলীন ছিল, তখন উভয়ের মধ্যে স্বগত ঐক্য ছিল আত্যন্তিক; আর বৎস প্রসবের পর হইতে সেই স্বগত ঐক্যের টান, সোজা কথায় রক্তের টান, উভয়ের মধ্যে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে; এই জন্যই বাছুরকে দুগ্ধপানার্থে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে গোরুর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে। কিন্তু কাপিল সাংখ্যে প্রকৃতি এবং জ্ঞাতাপুরুষের মধ্যে যখন ওরূপ স্বগত ঐক্যের বন্ধন স্বীকৃত হয় নাই, তখন কেন যে জ্ঞাতাপুরুষের ভোগমোক্ষ সাধনের জন্য প্রকৃতি হইতে জগৎকার্য্য অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে থাকিবে—ইহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাপিল সাংখ্যের ঐ অঙ্গহীন কথাটির অঙ্গপূরণের জন্য এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রেই প্রকৃতি ঐশীশক্তিরূপে প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে। কাপিল দর্শনের মত যাহাই হউক্ না কেন, কিন্তু আমাদের দেশের আর-আর সকল শাস্ত্রেরই ভিতরের কথা এই যে, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে মর্ম্মান্তিক প্রাণের টান রহিয়াছে, আর তাহারই প্রবর্ত্তনায় জগৎসংসারের কার্য্য চলিতেছে।

দর্শনমহলের বাদবিতণ্ডা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আমরা যদি আমাদের প্রাণের টানের মধ্য দিয়া সাংখ্যের ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনটি মূলতত্ত্বের প্রতি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি, তাহা হইলে মাতৃক্রোড়স্থিত বালক যেমন মুখে কথা বলিতে না জানুক্, কিন্তু মনে মনে এটা বেস্ জানিতে পারে যে, আমি মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছি, তেমনি আমরা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানকালে যখন আমাদের আপনা-আপনাকে লইয়া এই পরমাশ্চর্য্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, তখন আমরা আমাদের অন্তঃকরণের গোড়াঘ্যাঁসা অভাবের সহিত একযোগে পরমাত্মার পিতৃভাব এবং মাতৃভাবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করি। এবিষয়ে আমি অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এইটুকু কেবল বলিতে ইচ্ছা করি

যে, আমরা আমাদের আপনার অভাবের বলে এবং পরমাত্মার প্রভাবের বলে পরমাত্মার পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করি—তা বই, যুক্তি তর্কের বলে নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা, আর, এখনও বলিতেছি যে, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই ঐশী শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাহার মধ্যে অবিদ্যা জীবাত্মার অভাবের পরিচায়ক, বিদ্যা পরমাত্মার প্রভাবের পরিচায়ক। পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি বলিতে বুঝায়, আপনার অজ্ঞানময় অভাব এবং পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় প্রভাব, এই দুই তত্ত্বের একসঙ্গে উপলব্ধি। কঠোপনিষদের সেই বচনটি যাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—যথা, যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, আবার, যাহারা বিদ্যায় রত তাহারা আরো ঘোরতর অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, এই বচনটির পরেই উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যাঁহারা একসঙ্গে জানেন, তাঁহারা অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অজ্ঞান শক্তিহীন এবং নিরাশ্রয় এই তত্ত্বটি যখন আমরা নিভৃত নির্জ্জনে বসিয়া মনোমধ্যে উপলব্ধি করি, তখন তাহারই নাম মৃত্যুকে অতিক্রম করা; আর সেই সঙ্গে যখন পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় আনন্দময় প্রভাব উপলব্ধি করি তখন তাহারই নাম অমৃত লাভ করা। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অসহায় এই অভাববোধটি যখন আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে, তখন গাভীর স্তন হইতে যেমন স্নেহামৃত ক্ষরিত হইয়া ক্ষুধাতুর বৎসের অভাব ঘুচাইয়া দ্যায়, সেইরূপ পরমাত্মার প্রেমপূর্ণ প্রভাব হইতে করুণা অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দুঃখ ঘুচাইয়া দ্যায়।

কাপিল সাংখ্যের উপদিষ্ট জ্ঞানপথ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ক্রমে যোগশাস্ত্রের একটি উচ্চ সাধন-পথে উপনীত হইলাম। কাপিল সাংখ্যের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইবে এরূপ কঠোর ভাবে যে, প্রকৃতি ভয়ে এবং লজ্জায় সাধকের নিকট হইতে সরিয়া পলাইতে পথ পাইবে না। যোগের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, মনকে এমন এক স্থানে দৃঢ়রূপে বসাইতে হইবে যেখানে স্থিতি করিলে কোনো দুঃখই সাধককে নাগাল পাইবে না। কিন্তু যোগ-শাস্ত্রের উপদিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সাধনের পথ হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধান কাহাকে বলে?—ভোজরাজকৃত পাতঞ্জলভাষ্যে তাহা লিখিত হইয়াছে এইরূপ:—প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং; প্রণিধান কি? না বিশেষ প্রকার ভক্তি, বিশিষ্টরূপে উপাসনা এবং তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্প্যতীতি প্রণিধানং—বিষয়সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর চরণে প্রণিহিত করা হইতেছে, এই অর্থে প্রণিধান। কাপিল দর্শনের সাধনাঙ্গকে মোটামুটি জ্ঞানযোগ বলা যাইতে পারে, পাতঞ্জল দর্শনের নিম্ন সোপানের সাধনাঙ্গকে কর্ম্মযোগ বলা যাইতে পারে, এবং পাতঞ্জল দর্শনের উচ্চ সোপানের সাধনাঙ্গকে ভক্তিযোগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতে জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম্মযোগে এবং কর্ম্মযোগ হইতে ভক্তিযোগে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ যেমন অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্যের সহিত বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূফী ধর্ম্মমত।

বাহির হইতে দেখা যায় যে সুফীধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত সুফীরা সকল ধর্ম্মকেই উত্তম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে; তাহাদের মত এই যে, সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণরূপে সমস্ত ধর্ম্মই সেই নিখিলের কেন্দ্রস্থিত মহাসত্যের উপলব্ধির পথে চলিয়াছে এবং তাহারই ছায়ামাত্র। অবশ্য সত্যের প্রকাশের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের গৌরবেরও তারতম্য তাহারা স্বীকার করে। একটি সুফীসূত্রে আছে 'মানবসন্তানের যতবার শ্বাস প্রশ্বাস বহে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার পথ ততগুলি আছে।" এই কারণে সুফীধর্ম্মকে পরধর্ম্মসহিষ্ণু এবং সারগ্রহণশীল ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার মধ্যে অনেক সময়ে যে বিশ্বাসের দৌর্ব্বল্য ও ঔদাসীন্য দেখা যায় তাহা সুফীধর্ম্মের মধ্যে নাই এবং উহা নিজেকে অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে নিজের গ্রহণোপযোগী করিয়া লয়।

সুফীরা বলেন "প্রভুই এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহারা নিজের চেষ্টায় নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" কোনও বিশ্বাস, কোনও ধর্ম্ম, কোনও পদ্ধতি কখনও বহুকালস্থায়ী হইতে পারে না যদি তাহার মধ্যে সকল পদ্ধতির, সকল ধর্ম্মের এবং সকল বিশ্বাসের প্রাণস্বরূপ সেই সত্যের

আলোক অন্তত কিছু পরিমাণ না থাকে। যাহার দৃষ্টি আছে সে সকল ধর্ম্মের মধ্য. হইতেই শিখিবার উপযোগী বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। সকল ধর্ম্মেরই একটা চরম উদ্দেশ্য আছে এবং সকলেই সেই এক বস্তুরই সন্ধানে প্রবৃত্ত। সুফীভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 'প্রেমিক অনেক বটে কিন্তু প্রিয় সেই এক।"

ফরিদুদ্দিন অত্তর তাঁহার রচিত "পাখীর ভাষা" নামক একটি মরমিয়া (mystical) কবিতায় লিখিয়াছেন যে সেই রহস্যময় সিমুর্‌ঘ্ পাখী (ঈশ্বরের রূপক নাম) চীনদেশের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এবং ডানা হইতে একটি পালক খসাইয়া সেইখানে ফেলিয়া দিল। সেই একটি পালকে সমগ্র চীনদেশ আনন্দে এবং বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিল, এবং যে-কেহ তাহা দেখিতে পাইল সকলেই তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ নিজের কাছে রাখিবার জন্য লেখায় এবং চিত্রে তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিল। সেই জন্যই মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছিলেন 'জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য চীনদেশেও যাইবে' কারণ, কোন দেশ যদি সুদূর কিংবা জঘন্যও হয় তথাপি সকলে যে সত্যের অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে তাহার নিদর্শন সেখানেও পাওয়া যাইবে।

উমার খাইয়াম লিখিয়াছেন "দেব-দেবীর মন্দির এবং কা-আবা দুই-ই উপাসনার মন্দির; গির্জ্জার ঘণ্টাও উপাসনার বন্দনা গান; কটিবন্ধ এবং গির্জ্জা, মালা এবং ক্রুস্ এই সমস্তই বস্তুত সেই একের উপাসনার চিহ্ন।"

"সবিস্তার" সহরের মাহমুদ তাঁহার রচিত 'রহস্যের গোলাপকুঞ্জ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এমন কি, পৌত্তলিকধর্ম্ম হইতেও তত্ত্ব লাভ করা যায়। তিনি বলেন "মূর্ত্তি যে বস্তুত কি, তাহা যদি মুসলমানেরা জানিতে পারিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে পৌত্তলিকতার মধ্যেও সত্য আছে।" হাফিজ বলেন "আত্ম-উপাসনা অপেক্ষা অন্য যে-কোনও বাহ্য পদার্থের পূজা করা ভাল; কারণ ইহার দ্বারা উপাসক অন্তত আপনা হইতে নিজেকে সর্ব্বজনরটিত এবং গীত অথচ অবর্ণনীয় সেই একের দিকে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হয়।"

যাঁহারা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে রত তাঁহাদিগের প্রধান এবং প্রকৃত গুণ এই যে তাঁহারা প্রেমিক; প্রেম না থাকিলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেননা, অন্য কোন গুণ কিছু কাজেই আসিত না। জামি বলেন—

"হও গো প্রেমের ক্রীতদাস, এই লক্ষ্য রেখো সদা স্থির।
ইহাই পরমধন, কহিছেন যাঁরা জ্ঞানবীর।
আত্ম-মুক্তি তরে বাঁধ আপনারে প্রেমের বন্ধনে;
দাসত্বের চিহ্ন ধর বক্ষে, রবে আনন্দিত মনে।
প্রেমের মদিরা পানে হও প্রাণবান. আত্মহারা,
আর সবে অচেতন, মৃত, আত্মসুখান্বেষী যারা।
প্রেমের মধুর স্মৃতি প্রেমিকেরে তোলে মাতাইয়া;
প্রেমের বিজয়গীতি কণ্ঠে তার উঠে উচ্ছ্বসিয়া।
আনন্দে প্রেমিক যবে প্রেমের মহিমা করে গান,
সুন্দর সে প্রজাপতি, সুকণ্ঠ কোকিল পায় স্থান
সে সঙ্গীতে। পৃথিবীতে যতই করম কর কেন
আমিত্ব নাশিতে প্রেম একমাত্র ইহা ধ্রুব জেনো।
পৃথিবীর প্রেম হতে যারা বলে' ফিরায়োনা মুখ!
তোমারে লইয়া যেতে চিরন্তন সত্য অভিমুখ
ইহাও সহায় হবে। অক্ষরের ধারণা না হলে
রীতিমত, কোরাণ কণ্ঠস্থ কোন্ বলে
করিতে হইবে বল? একজন জ্ঞানীর সকাশে
শিষ্য এক গন্তব্য পথের কথা আসিয়া জিজ্ঞাসে;
তাহার উত্তরে তিনি কহিলেন, 'তোমার পথের
প্রেমের পন্থার সাথে ভেদ যদি রয়েছে মতের
তবে তুমি যাও ফিরে। আগে প্রেমশিক্ষা কর লাভ
তার পরে এসো হেথা! কেমনে করিবে সেই ভাব-
সুধা রস-ধারা পান, বাহ্যরূপ ঘট হতে যদি
মধু করিবারে পান ভীত তুমি হও নিরবধি?
কিন্তু দেখো সাবধান, বাহিরে রূপের প্রলোভনে
লুব্ধ হয়ে পথে বসি বিলম্ব কোরোনা অকারণে।

এখন দেখা যাইতেছে আসল কথা হইতেছে এই যে নিজেকে আমিত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাটাই চরম লক্ষ্য; যতক্ষণ না এই শিক্ষা লাভ হইবে ততক্ষণ অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। উপাসনা, প্রেম, নির্ব্বিচার ভক্তি, এ সমস্তই যত পরিমাণে অহঙ্কার বিলোপের সহায়তা করে তত পরিমাণেই ভাল। এই আমিত্বই সমস্ত পাপ এবং দুঃখের মূল। যাঁহারা এই রোগের যথার্থ প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে অহংই সকল দুঃখের মূল কারণ।

এই আমিত্বই যে সাক্ষাৎ স্বরূপে সমস্ত পাপের কারণ সমস্ত খাটি ধর্ম্ম মাত্রই এই সুস্পষ্ট সত্যটি স্বীকার করিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই আমিত্বটা কি বস্তু এবং কেমন করিয়াই বা তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে। এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে, ঈশ্বর কি, জগৎ কি, এবং অমঙ্গল কাহাকে বলে এইগুলির সম্বন্ধে সুফীদিগের ধারণা কিরূপ তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ এই প্রকৃতির অতীত

কোন অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের ভাব সুফীদিগের মধ্যে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাহ্য জগতের নিত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ থাকিতেও পারে এবং আছেও, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের নিকট কেবল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য বস্তু তাহা নহে, তিনি এক মাত্র নিত্য বস্তু। সুফীর নিকট জাগতিক যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ। "এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার গুণ গান না করে।" তিনি সর্ব্বত্র এবং সকলের মধ্যে আছেন, "আমার কণ্ঠস্থিত তৈজস-নালী অপেক্ষা তিনি আমার নিকটতর" এবং এত সুস্পষ্ট বলিয়াই তিনি অদৃশ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় একজন সুফী বলিয়াছেন "ঈশ্বর কি নয় তাহাই তুমি আগে বল, পরে তিনি কি তাহা আমি দেখাইয়া দিব।" মাহমুদ্ বলেন "জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত আত্মার নিকট সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই পরম ঈশ্বরের গ্রন্থরূপে প্রতিভাত হয়। এবং জামী বলেন—

"কেবলাত্মা তুমি একা, আর যাহা সবই ছায়াপ্রায়,
বিচিত্র এ ত্রিভুবন তোমাতেই এক হয়ে যায়।
বিশ্বচিত্তবিমোহন মাধুরীর পূর্ণতার তরে
সহস্র দর্পণ মাঝে তব প্রতিবিম্ব আসি পড়ে।
কিন্তু তুমি এক, তব সৌন্দর্য্যই বিচিত্র সুন্দর;
অনুপম, অতুলন, এক তুমি মনোমুগ্ধকর।"

বারান্তরে সুফী কবিদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

(ষষ্ঠ উপদেশের অনুবৃত্তি)

আরাধনার যে প্রবৃত্তিটি, আত্মার নিভৃত মন্দিরে অধিষ্ঠিত, তাহাই আভ্যন্তরিক আরাধনা, তাহাই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি।

যে হিসাবে, জন সমাজ, রাজ্যশাসনতন্ত্র, ভাষা ও শিল্পকলাদি মানুষের স্বেচ্ছাসাপেক্ষ—সামাজিক উপাসনা-প্রণালী তাহা অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। এই সকল ব্যাপারের মূল, মানব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। আরাধনার প্রবৃত্তিটিকে যদি তাহার নিজের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, হয়—উহা নিষ্ফল ধ্যানে ও উন্মত্ত ভাবের উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়া সহজেই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, নয়—সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও দৈনন্দিন প্রয়োজন-সমূহের প্রবল প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া যায়। আরাধনার আবেগ যতই প্রবল হয় ততই উহা কতকগুলি ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। তখন আরাধনা একটা প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়মিত আকার ধারণ করিয়া, যে হৃদয়-ভাব হইতে গোড়ায় উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হৃদয়-ভাবের দিকে আবার ফিরিয়া যায়। তখন আরাধনার প্রবৃত্তিটা একটু নিদ্রালু হইলে, আরাধনার সেই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলে; ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে; এবং দুর্ব্বল ও নিরঙ্কুশ কল্পনা-প্রসূত সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হইতে উহাকে রক্ষা করে। অতএব দর্শনশাস্ত্র, আভ্যন্তরিক আরাধনার ক্ষেত্রেই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির স্বাভাবিক ভিত্তি স্থাপন করে।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্র পরমার্থবিদ্যার স্থান দখল করিয়া বসিবে, দর্শনশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে; দর্শনশাস্ত্র আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া, স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। সে উদ্দেশ্য কি?—না, যাহা কিছু মানুষকে উন্নত করিতে পারে, তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাহার সহায়তা করা।

সেই প্রকৃত ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম ঘোষণা করে—ঈশ্বর এক, সমস্ত মানব-জাতি এক, ঐশ্বরিক বিধানের নিকট সকল আত্মাই সমান,—এবং এইরূপে রাষ্ট্রিক একতারও ভূমি প্রস্তুত করে; যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—মানুষ শুধু অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে না, মানুষ শুধু আপনার ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্যেই—আপনার শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; মানুষের আত্মা আছে,—স্বাধীন আত্মা আছে; নভোমণ্ডল-পরিব্যাপ্ত অসংখ্য লোক অপেক্ষা, এই আত্মার মূল্য সহস্রগুণে অধিক; এই জীবন পরীক্ষাস্থলমাত্র; জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুখ নহে, সৌভাগ্য নহে, পদ-মর্য্যাদা নহে। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে সংশোধন করিতে হইবে, আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে; সংসারের কর্ত্তব্য সকল পালন করিয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত দর্শনের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন, যুগপৎ স্বাভাবিক ও আবশ্যক। স্বাভাবিক এই জন্য—উভয়েই যে সকল সত্য স্বীকার করে তাহার ভিত্তি একই; আবশ্যক এই জন্য—উভয়ের দ্বারাই বিশ্বমানবের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উহারা পরস্পর-বিরোধী নহে। ধর্ম্ম এবং দর্শনকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখা—একদেশদর্শী, মতান্ধ, ধর্ম্মোন্মত্ত ক্ষুদ্রচেতাদিগের কাজ। কিন্তু যাহারা

দর্শনের কিংবা ধর্ম্মের প্রকৃত অনুরাগী, তাঁহারা দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে ভেদ না ঘটাইয়া যাহাতে উভয়ে একত্র সম্মিলিত হয় তৎপ্রতি চেষ্টা করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা, ধর্ম্ম ও দর্শন প্রত্যেকেই আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া, সেই একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়,—অর্থাৎ বিশ্বমানবের নৈতিক মাহাত্ম্য প্রতিপাদন ও সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে।

সমাপ্ত

দাদূ।

প্রথম অঙ্গ।

২০

দেবই কিরকা দরদকা
টূটা জোরই তার॥

(তিনিই) বেদনার দেন আঘাত, তিনিই যুক্ত করেন ছিন্ন তন্ত্রী।

২১

দাদূ সাঁচা গুরু মিলা
সাঁচা দিয়া দেখাই।
সাঁচাকো সাঁচা মিলা
সাঁচা রহা সমাই॥

হে দাদূ সাচ্চা মিলিলেন গুরু, সাচ্চা দিলেন দেখাইয়া। সাচ্চার সহিত মিলিলেন সাচ্চা, সাচ্চায় রহিলেন সমাহিত হইয়া।

২২

দাদূ প্যালা প্রেমকো
মহারস মাতা॥

দাদূ প্রেমরসের প্যালা, এই মহারসেই (স্বামী) মত্ত।

২৩

অমর অভয় পদ পাইয়ে
কাল ন লাগই কোই।

অমর অভয় পদ হও প্রাপ্ত, লাগিতে পারে না কোনো কাল (মৃত্যু)।

২৪

অনেক চন্দ্র উদয় করই
অসংখ সূর প্রকাস।
এক নিরংজন নাম বিন
দাদূ নহী উজাস॥

অনেক চন্দ্র করে যদি উদয়, অসংখ্য সূর্য্য করে যদি প্রকাশ, তথাপি এক নিরঞ্জনের নাম বিনা, হে দাদূ, উজ্জ্বল নাহি হয়।

২৫

কধি য়হ আপা জাইগা
কধি য়হ বিসরই ঔর।
কধি য়হ সুছিম হোইগা
কধি য়হ পাবই ঠৌর॥

কবে এই "অহম্" যাইবে মিটিয়া, কবে এই "পর" হইয়া যাইবে বিস্মৃত, কবে "এই" (অহম্) হইয়া যাইবে সূক্ষ্ম, কবে "এই" (অহম্) প্রাপ্ত হইবে ঠাঁই?

২৬

নৈন ন দেখই নৈনকো
অংতর ভী কুছ নাহি।
সতগুরু দরশন কর দিয়া
অরস পরস মিলি মাহিঁ॥

নয়ন নাহি দেখে নয়নকে, অন্তরেতেও কিছুই যায় না দেখা; সদ্‌গুরু হাতে দিলেন দর্পণ, অন্তরেতেই মিলিল অরস, অন্তরেতেই মিলিল পরস।†

২৭

ঘট ঘট রামহি রতন হৈ
দাদূ লখৈ ন কোই॥

ঘটে ঘটে বিদ্যমান রামরতন,
হে দাদূ, লক্ষ্য করে না কেহই।

২৮

জবহী কর দীপক দিয়া
তব সব সুঝন লাগ॥

যখনই হাতে দিলেন দীপক,
তখনই সবই যাইতে লাগিল দেখা।

২৯

মনমালা তহঁ ফেরিয়ে
দিবস ন পরসই রাত।
তহাঁ গুরু বানা দিয়া
সহজে জপিয়ে তাত॥

---

* অসীম যখন অসীমরস পান করিতে চান তখন সীমার পাত্র চাই। আমার "অহং" এই জন্য এক মহামূল্য বস্তু। এই "অহম্" প্যালা দ্বারাই ব্রহ্ম বিশ্বরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত।

† একের মধ্যে অন্যের সমাহিত হওয়াকে বলে "অরস", 'অরস' হইলে কোন জ্ঞান ও রসই থাকে না; কিন্তু ব্রহ্মে 'অরস' হইবেই 'পরস' মেলে। ইহাই ব্রহ্মযোগের বিশেষত্ব। 'পরস' অর্থ ব্রহ্মকে স্বাদে রসে সম্ভোগ করা; অন্তকে স্পর্শ করা। ব্রহ্ম ও ভক্তে সমাধি ও সম্ভোগ একই সঙ্গে কী এক গভীর ভাবে সুসঙ্গত।

মনমালা সেখানে কর জপ, যেখানে দিবসকে নাহি পরশ করে রাত্রি। সেখানে গুরু দিলেন সূত্র, সহজেই কর তাহাতে জপ।

৩০

মন মালা তহঁ ফেরিয়ে
প্রীতম বৈঠে পাস।
অগম গুরুতেঁ গম ভয়া
পায়া নূর নিবাস॥

মন মালা কর সেখানে জপ, যেখানে প্রিয়তম বসিয়াছিল পাশে; গুরুর কৃপার অগম্য হইলেন গম্য, জ্যোতির নিবাস গেল পাওয়া।

৩১

মন মালা তহঁ ফেরিয়ে
আপই এক অনংত।
সহজই সো সতগুরু মিলা
যুগ যুগ ফাগ বসংত॥

মন মালা কর সেখানে জপ, যেখানে আপনিই একা অনন্ত। সহজই মিলিয়াছেন সেই সদ্‌গুরু,—(অতএব মিলিয়া গেল) যুগ যুগ ফাগ ও বসন্ত উৎসব।

৩২

সতগুরু মালা মন দিয়া
পবন সুরতিসো পোই॥
বিনা হাত নিস দিন জপই
মরম জাপ য়োঁ হোই॥

সতগুরু মালা দিলেন মন, (সাধক) গাঁথিল তাহা পবন সুরতি * দ্বারা; বিনা হাতে নিশি দিন চলিয়াছে জপ, এমন করিয়াই হয় মরম জাপ।

৩৩

মন ফকীর মাহেঁ হুআ
ভীতরি লীয়া ভেখ।
সবদ্ গহই গুরুদেবকা
মাঁগই ভীখ অলেখ॥ †

অন্তরের মধ্যেই মন হইল ফকীর, ভীতরেই লইল দীক্ষা। গ্রহণ করিল গুরুদেবের শব্দ, অলেখ মাগিল ভিক্ষা।

৩৪

মন ফকীর সতগুরু কিয়া
কহি সমঝায়া গ্যান।
নিহচল আসন বৈঠিকর
অকল পুরুষকা ধ্যান॥

সদ্‌গুরু করিলেন মনকে ফকীর, কহিয়া বুঝাইলেন জ্ঞান, (মন এখন) নিশ্চল আসনে বসিয়া, (চলিয়াছে) অখণ্ড এক পুরুষের ধ্যান।

৩৫

মন ফকীর ঐসে ভয়া
সত গুরুকে পরসাদ।
জহঁকা থা লাগা তহাঁ
ছুটে বাদ বিবাদ॥

সদ্‌গুরু প্রসাদে মন হইল এমন ফকীর, যে সে যেথানকার সেখানেই রহিল লাগিয়া, ছুটিয়া গেল বাদ বিবাদ।

৩৬

না ঘর রহা না বন গয়া
না কুছু কিয়া কলেস।
দাদূ মনহী মন মিলা
সদগুরুকে উপদেশ॥

না রহিল ঘরে, না গেল সে বনে, না কিছু করিল সে ক্লেশ। হে দাদূ মনেতেই মিলিয়া গেল মন, সদ্‌গুরুর এমন উপদেশ।

৩৭

অহ নিশি লাগা এক সোঁ
সহজ সুরত রস খাই।

অহর্নিশি লাগিয়া রহিল একেরই সঙ্গে, সম্ভোগ করিতে লাগিল সহজ সুরতি রস।

৩৮

ভীতরি সেবা বন্দগী
বাহর কাহে জাই॥

ভিতরেই সেবা ভিতরেই প্রণাম, বাহিরে যাইব কেন?

৩৯

দাদূ মংঝেহী চলা
মংঝেহী উপদেস।
বাহর ঢূঢ়হিঁ বাবরে
জটা বঁধায়ে কেস॥

অন্তরেই চলিল দাদূ অন্তরেই (গুরুর) উপদেশ। বাহিরে খুঁজিয়া মরে পাগল, জটায় বাঁধিয়া কেশ।

৪০

দাদূ পরদা ভরমকা
রহা সকল ঘট ছাই

দাদূ ভ্রমের পরদা সকল ঘটকে রহিয়াছে ছাইয়া।

---

* সুরতি বলিলে প্রেম, আনন্দ, স্ফূর্তি ও শৃঙ্খলার একটী গভীর সমাবেশ বুঝায়।

† অলেখ যাহা বর্ণনা করিয়া লেখায় লেখায় বুঝান যায় না।

৪১

মন লেই মারগ মূল গহি
সতগুরুকো পরমোধ ॥

মনকে পথে লইয়া মূল গ্রহণ করিয়া সদ্গুরুর প্রবোধ (লাভ করিয়াছি)।

৪২

এতা কীজই আপতেঁ
তন মন উনমন লাই।
পংচ সমাধি রাখিয়ে
দূজা সহজ সুভাই ॥

আপনা হইতে এতটুকু কর যে, তনু মন কর উন্মনা, পঞ্চকে কর সমাহিত ; (তাহা হইলে) দ্বিতীয় (যে টুকু হইবার) সহজেই (তাহা) উঠিবে প্রকাশিত হইয়া।

৪৩

জহবাঁতে মন উঠি চলই
ফেরি তহাঁহী রাখি ॥

যেখান হইতে উঠিয়া মন চলে, আবার সেখানেই তাহাকে দেও রাখিয়া।

৪৪

তনহীসোঁ মল উপজঈ
মনহী সোঁ মল ধোই ॥

মন হইতেই মল হয় উৎপন্ন। মন দিয়াই কর তাহা ধৌত।

৪৫

ঘর ঘর ঘট কোল্হু চলই
অমী মহারস জাই ॥

ঘরে ঘরে চলিয়াছে আকারের ঘানী, অমৃত মহারস চলিয়া যায় বহিয়া।*

৪৬

সাহিবকো ভাবই নহী
সো হমতে জিনি হোই।

* ব্রহ্ম অখণ্ডাত্মাকে নানা আকারে পরিণত করিয়া, অখণ্ড বিশ্বকে সীমাবদ্ধ করিয়া, একটী প্রয়াস সঞ্চার করিয়াছেন। ব্রহ্ম পূর্ণানন্দভরে রস সম্ভোগ করিতে চাহেন ; অথচ অসীমতায় ও অনন্তের মধ্যে নাই কোন রস। তাই তিনি আকার ও সীমার মধ্যে বেদনা বেগ গতি ও নিপীড়ন সঞ্চার করিয়া, অসীম সিন্ধুর অন্তর হইতে অমৃত মহারস মন্থন করিয়া লইতেছেন। ঘানিতে যেমন গতি বেগ ও নিপীড়ন থাকাতে অন্তর্নিহিত স্নেহ-রসটি নিস্যন্দিত হইয়া চলিয়াছে, তেমনি আকারে ও গতিতে একটি নিত্য অমৃত মন্থন চলিয়াছে। তাই গ্রহ-চন্দ্র-তারার গতি হইতে শুষ্কপত্রপতন পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ গতিই একেবারে অমৃতের প্রবাহ ছুটাইয়া চলিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ও সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও আকার একেবারে অমৃতরসধারা অজস্র নির্ঝরিত করিয়া চলিয়াছে।

স্বামীকে চাহিবে না আমার অন্তর, সেটা আমার দ্বারা হইতেই পারে না।

৪৭

হৌ কী ঠাহ রহৌ কহৌ
তন্ কী ঠাহর তৌন।
জীকী ঠাহর জী কহৌ
গ্যান গুরুকা পৌন ॥

"আমির" আশ্রয় বল "আছি", (১) "তনু"র আশ্রয় "তাহা," (২) "জীবনের" আশ্রয় বলে "জীবন" ; (৩) এই জ্ঞান গুরুর নিশ্বাস। (৪)

৪৮

সোনেসেতী বৈ ক্যা
মরই ঘনকে ঘাই।
দাদূ কাটি কলংক সব
রাখই কণ্ঠ লগাই ॥

সোনার সঙ্গে কি শত্রুতা যে ক্রমাগতই তাহাকে মারিতেছে ভীষণ হাতুড়ির আঘাত। সব কলঙ্ক কাটিয়া দাদূ তাহাকে রাখে কণ্ঠে।

৪৯

পানী মাহেঁ রাখিয়ে
কনক কলংক ন জাই।
দাদূ গুরুকে জ্ঞান সোঁ
তাই অগিনিমেঁ বাহি ॥

জলের মধ্যে রাখিলে যায় না কনকের কলঙ্ক, হে দাদূ, গুরুর জ্ঞানদ্বারা তাহাকে অগ্নিতে কর দগ্ধ।

১ "আমির" মূলে একটি অখণ্ড "সত্তা বিরাজমান। সেই অসীম "সত্তার" উপরেই "আমি প্রতিষ্ঠিত। "অহম্" ও সেই সত্তার মধ্যে একটি সজাতীয়ত্ব আছে। সেই সত্তা এই অহমেরই বিরাট স্বরূপ।

২ সকল "আকার" ও "বস্তুর মূলেই এক মহাবস্তু আছে। ব্রহ্ম যদি "বস্তু" না হইতেন তবে বস্তুর মূল কোথায়? "ব্রহ্মবস্তু" হইতেই সকল খণ্ড বস্তু তরঙ্গিয়া উঠিতেছে। সকল লহরীর মূলে যেমন একটি স্তব্ধ সমুদ্র বিদ্যমান তেমনি সকল তরঙ্গায়মান আকার ও বস্তুর মূলে এক স্তব্ধ গভীর মহাআকার ও মহাবস্তু বিরাজ-মান। বস্তু ও ব্রহ্মবস্তু সজাতীয়।

৩ "জীবনের" মূলে একটি "মহাজীবন" আছে। সেই এক ব্রহ্মজীবন হইতে সকল জীবন তরঙ্গিয়া উঠিতেছে। উভয় জীবনই এক জাতীয়, ইহারা উভয়েই অহমের এপিঠ আর ওপিঠ।

৪ এই যে জ্ঞান ইহা কৃত্রিম বা উৎপন্ন জ্ঞান নহে। নিশ্বাস যেমন গভীর জীবনের প্রতিক্ষণের উচ্ছ্বাস ও চিরন্তন জীবনের প্রতিক্ষণের সাক্ষী, এই জ্ঞানও তেমনি মহা গুরুর মহাজীবনজ্ঞানের একটি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও নিত্যসাক্ষ্য।

৫০

তৌ দাহু ক্যা কীজিয়ে
বুরী বিথা মনমাহিঁ ॥

কি করিবি তবে দাদূ, নীচতার ব্যথা যে মনের মধ্যে।

৫১

তুঁ মেরা হৈ হউ তেরা
গুরু সিখ কীয়া মংত॥
(ছঃ ১০)

তুমি আছ আমার, আমি আছি তোমার; গুরু শিষ্যে (পরিপূর্ণ) করা গেল এই মন্ত্র।

৫২

দাদূ সাচা গুরু মিলই
সনমুখ সিরজনহার ॥

হে দাদূ, সাচ্চা গুরু যদি মেলেন, তবে সম্মুখেই সৃজন-কর্ত্তা।

৫৩

আপ সবারথ সব সগে
প্রাণ সনেহী নাহিঁ ॥

আপন স্বার্থে সবাই হয় আপন, নাই প্রাণের প্রেমিক।

৫৪

সুখকা সাথী জগৎ সব
দুঃখ কা নাহীঁ কোই।
দুঃখকা সাথী সাইঁয়া
দাদূ সত গুরু হোয় ॥

সুখের সাথী জগৎ, দুঃখের সাথী নাই কেহ। হে দাদূ দুঃখের সাথী স্বামী, তিনিই সত্য গুরু।

৫৫

দাদূকে দুজা নহীঁ
এঁকৈ আত্মারাম ॥

দাদূর দ্বিতীয় কেহ নাই, একই আত্মা ও রাম।

৫৬

সূরজ সম্মুখ আরসী
পাবক কিয়া প্রকাস ॥
দাদূ সাঈঁ সাধুবিচি
সহজহি উপজই দাস।

সূর্য্য (তাঁহার) সম্মুখস্থ দর্পণ, পাবক করিল (তাঁহাকে) প্রকাশ। হে দাদূ, (আমার) স্বামী সাধুর মধ্যে সহজেই দাসরূপে (আপনাকে) করিতেছেন উৎপন্ন। *

৫৭

বৈদ বিচারা ক্যা করই
রোগী রহই ন সাচ ॥

বৈদ্য বেচারা করিবে কি, রোগীই রহিল না সাচ্চা।

৫৮

হে দাদূ অবিচল মংত্র অথয় মংত্র অভয় মংত্র রাম মংত্র নিজসার।

সজীবনিমংত্র সবীরজ মংত্র সুন্দর মংত্র শিরোমনি মংত্র নির্ম্মল মংত্র নিরাকার ॥

অলখ মংত্র অকল মংত্র অগাধ মংত্র অপার মন্ত্র অনংত মংত্র রায়া।

নূর মংত্র তেজ মংত্র জ্যোতি মংত্র প্রকাশ মংত্র পরম মংত্র পায়া ॥

উপদেশ দিখায়া ॥

হে দাদূ, অবিচল মন্ত্র, অক্ষয় মন্ত্র, অভয় মন্ত্র, প্রেম (রাম) মন্ত্র—নিজের সার। সঞ্জীবনী মন্ত্র, সবীর্য্য মন্ত্র, সুন্দর মন্ত্র, শিরোমণি মন্ত্র, নির্ম্মল মন্ত্র—নিরাকার। অলক্ষ্য মন্ত্র, অখণ্ড মন্ত্র, অগাধ মন্ত্র, অপার মন্ত্র, অনন্ত মন্ত্র—বিরাজিত।

দীপ্তি মন্ত্র, তেজ মন্ত্র, জ্যোতি মন্ত্র, প্রকাশ মন্ত্র, পরম মন্ত্র পাইলাম।

উপদেশ (যে লাভ করিয়াছি তাহা) দেখাইয়া দিলাম (জীবনে)।

৫৯

দাদূ সবহী গুরু কিয়া
পশু পংখী বনরাই।
পংচ তত্ত্ব গুন তিনি মেঁ
সবহী মাহি খুদাই ॥

হে দাদূ, সকলই করিয়াছেন গুরু—পশু, পক্ষী, বন-

---

* সেই নিরঞ্জনের কল্যাণরূপ নানা ভাবের সেবায় জগতে দেখা দিয়াছে। সেই "শিবম্" আপনার সেবা সূর্য্যের মধ্যে অগ্নির মধ্যে প্রকাশিত করিয়া তুলিতেছেন। যেখানে তিনি "শিবম্" সেখানে তিনি দাস হইয়া বিশ্বকে সেবা করেন। সূর্য্য যথাকালে প্রতিনিয়ত সর্ব্ববিধ সেবা করে। অগ্নি সর্ব্বত্র আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া যথার্থ ভৃত্যের মত সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকে ও প্রয়োজন হইলে প্রবল শক্তিতে সেবা করে।

অগ্নি ও সূর্য্য তাঁহার যথার্থ সেবক "শিবরূপকেই" প্রকাশ করে। সাধুর অন্তরেও তেমনি 'শিবম' দাস হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন। তাই সাধক সদা জাগ্রত, সদা দীপ্ত, সদা প্রচ্ছন্ন, সদা সক্ষম সেবক। সাধকের সেবাটি তাঁহারই "শিবম্" রূপের দর্পণ।

অগ্নি ও সূর্য্য যেমন আপনার জন্য সকল জ্বালা রাখিয়া সংসারে দেন। জ্যোতি ও প্রাণ, "শিবম" তেমনি সকল সংসারে অমৃত বিতরণ করিয়া আপনি রাখেন জ্বালা। পরে এরূপ ভাব আরও পাওয়া যাবে।

রাজী। পঞ্চ তত্ত্ব ও তিন গুণের মধ্যে এবং সকলের মধ্যেই যে পরমাত্মাই (অধিষ্ঠিত) *

৬০

জে পহলী সত গুরু কহা
নৈনহুঁ দেখা আই।
অরস পরস মিলি এক রস
দাদূ রহে সমাই ॥

সদ্ গুরুর যাহা আদি বাণী, নয়নেও তাহাই আসিয়া দেখিলাম।

অরস পরস † মিলিয়া এক রস, দাদূ রহিল তাহাতে সমাহিত।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

THE ATTITUDE OF THE ADI BRAHMA SAMAJ IN REGARD TO THE PROPOSED AMENDMENT OF ACT III OF 1872.

Being a reply sent on behalf of the Adi Brahma Samaj to the Government Circular asking for an expression of its Views on the proposed Special Marriage Bill,

I. Neither the provisions of the original Act, nor of its amendment, directly touch us, the members of the Adi Brahma Samaj, in asmuch as we have not departed in any essential particular from Hindu usage or custom, and, in the matter of the marriage ceremonial, follow the Vedic ritual, which, we are advised, conforms sufficiently to the present orthodox practice to be legally valid by itself, to say nothing of the sanction it has by this time acquired as an unbroken custom,

2. For the reasons above indicated, however, we think we may fairly claim to represent advanced Hindu feeling or at least a considerable section thereof; and such feeling, was, and still is, opposed to the sections of the original Act now proposed to be amended, as tending to weaken and otherwise harm, the Hindu community as a whole; and therefore welcomes with a corresponding sense of relief the proposed amendments as removing all the objectionable features of this otherwise beneficial statute.

3. This weakening and harmful tendency which we apprehend, and to some extent have actually observed, is a two-fold one.

Firstly, there is the elimination of those individuals whose sensitiveness of conscience and strength of character do not permit of their conforming to orthodox practice in all particulars, though they hold the same beliefs, reverence the same ideals and in general live the same type of social life as their more conservative brethren; thus depriving the Hindu community not only of desirable, but occasionally of most valuable members.

Secondly, there is the temptation for those of weaker moral fibre, who for any reason do not find full satisfaction in and through orthodox conditions, to enter, more or less clandestinely, into illegal connectons, which cannot but have a pernicious and disruptive effect on the whole community in the long run.

4. We are aware that the less advanced sections of the Hindu community are strongly opposed to the proposed amendment; but surmise that, where such opposition does not proceed from blind prejudice pure and simple, it is based on the *misapprehension that legislation of a permissive, and not obligatory,* character is calculated either to make or mar a social system. Had the Hindu community come to such a pass that it was only waiting for some sort of legal sanction to subvert and violate its established and cherished customs and traditions, then the mere absence of such sanction could not have long delayed that undesirable consummation.

5. We of the advanced section have a more robust faith in the inherent soundness of the essentials of our Religious and Social

---

* গুরুই সব বিশ্ব রচনা করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত আছেন। অথবা সমস্ত বিশ্বকে তিনি গুরু করিয়া দিয়াছেন, কারণ সর্ব্বত্র তিনিই সমাহিত আছেন। তিনি পশু পক্ষী বনরাজী পঞ্চতত্ত্ব ও তিন গুণ ও সমস্ত জগতের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রমশঃ আমার চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া আমাকে তিনি দীক্ষা দিয়াছেন।

এই দুই প্রকার অর্থই হয়।

† পূর্ব্বে দেখ।

system ; and therefore welcome any assistance, from within or without, which may help us to shake off effete and meaningless habits and customs which tend to retard that progressive adaptation to changing circumstances without which no institution can hope to survive ; relying on the very access of vitality, which we thereby hope to gain, as the best means of preserving and keeping pure the invaluable ideals, culture and art of life of which we are the inheritors and custodians.

6. In conclusion I beg, on behalf of the section of the Hindu community to whose sentiments I am giving expression, to convey our unqualified approval and entire support of the proposed amendments to Act. III of 1872 ; and would respectfully impress upon Government the desirability of not being led to deviate from its consistent policy of allowing the fullest liberty of conscience and conduct by attaching too much weight to any merely fanatic or sectarian clamour.

SATYENDRA NATH TAGORE.
Minister, ADI BRAHMO SAMAJ.
Jorasanko, Calcutta.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৬২॥৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০৫৬॥ ৬
সমষ্টি	...	৮৪১৯৶
ব্যয়	...	৭৫২৮৸৵৯
স্থিত	...	৮৯০।৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৪০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৪৯০।৩

৮৯০।৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৪০৩৯৸৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২২৭।/০
পুস্তকালয়		১৪০॥৶৯
যন্ত্রালয়	...	৮৬৮॥৶৬
ব্রঃ সঃ স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৭৬৲
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট	...	১০৲
সমষ্টি	...	৫৩৬২॥৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬১২০॥/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৬০।৵৩
পুস্তকালয়	...	৮৬।/৩
যন্ত্রালয়	...	৯৪৬৵৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১১৫।৶৬
সমষ্টি		৭৫২৮৸৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া	৩৸০
„ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	যশোহর	৪৲
„ সুশীলকুমার ঘোষ	বর্দ্ধা	৫৲

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	কুমিল্লা	৩৷৹
„ হরকুমার সরকার	ঘোড়ামারা	৯৷৴৹
„ সতীনাথ রায়	কলিকাতা	২৲
„ গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ হৃদয়নাথ আচার্য্য	কাউরেড়	৩৶৹
„ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩৶৹
সম্পাদক হরিসেনা মণ্ডলী	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	কুচবেহার	৩৲
„ গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	ভাগলপুর	৬৷৶৹
„ রজনীমোহন রায়	কাকিনা	৯৸৶৹
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেবানন্দপুর	৬৸৹
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী	কলিকাতা	১৷৶
সম্পাদক হেমচন্দ্র লাইব্রেরী	খিদিরপুর	১৷৶
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেহালা	৩৲
„ তুলসীদাস দত্ত	কালিঘাট	৩৶৹
„ পঞ্চানন মিশ্র	তোটানালা	২৲
„ ভূজেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	১৷৹
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	১৶৹
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৩৶৹
„ বিনোদবিহারি সেন	বর্দ্ধমান	৷৶৹
„ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
„ অবিনাশচন্দ্র দাস	কলিকাতা	২৶৹
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	৩৲
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১২৲
„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত	„	১৷৹
„ শিশিরকুমার দত্ত	„	১৷৶৹
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	„	৩৲
		১০৬৶৹

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
„ শরৎচন্দ্র চৌধুরী	১৲
„ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১৲
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	১০৲
„ সৌদামিনী দেবী	২৲
„ অলোকা দেবী	২৲
„ ইরাবতী দেবী	১৲
„ ললিতা দেবী	১৲
„ সরোজিনী দেবী	১৲
„ সুহাসিনী দেবী	১৲
শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	১৷৹

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
শ্রীবিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
শ্রীতুলসীদাস দত্ত	২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিণী দেবী	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১০৲
„ বসন্তকুমারী সেনগুপ্তা	৬৲
„ সরলাবালা দাস গুপ্তা	২৲

এককালীন দান।

শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৬৭৴৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় শণিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ঊন-ষষ্ঠীতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্তবাদ।

প্রথম প্রপাঠক।

পরিচয়।

২।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রধান উপনিষৎ গুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। অধিকাংশই বলিবার কারণ এই যে, এরূপও প্রধান উপনিষৎ আছে, যাহা ব্রাহ্মণের মধ্যে নহে। ঈশোপনিষৎ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত নহে, ইহা মন্ত্রের অন্তর্গত; শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতায় চত্বারিংশ অধ্যায়ই ঈশোপনিষৎ। ঐ সংহিতায় পূর্ব্ববর্ত্তী উনচল্লিশটি অধ্যায়ে কর্ম্ম আলোচিত হওয়ায় তাহা কর্ম্মকাণ্ড, এবং শেষ অধ্যায়টিতে জ্ঞান আলোচিত হওয়ায়, তাহা জ্ঞান কাণ্ড। কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত বেদের এখানে অন্ত বা শেষ কাণ্ডই ঐ উপনিষৎখানা হওয়ায় তাহার বেদান্ত নাম গ্রহণে কোন বাধা নাই।

আবার এইরূপও উপনিষৎ আছে, যাহা মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ কাহারই মধ্যে নহে; যেমন গর্ভোপনিষৎ। এই জাতীয় উপনিষদের অস্তিত্ব না মন্ত্র না ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। তথাপি এই সমুদয় গ্রন্থ উপনিষৎ-নামে প্রচলিত আছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—পূর্ব্বে এরূপ একটি সময় আসিয়াছিল, যখন উপনিষদের ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়পূর্ণ কোন গ্রন্থ রচিত হইলেই তাহা উপনিষদের ন্যায় বলিয়া উপনিষৎ-নামে প্রসিদ্ধ হইত। পাণিনির একটি সূত্রেও আমরা ইহার পরিচয় পাই যে, উপনিষদের ন্যায় গ্রন্থও উপনিষৎ বলিয়া খ্যাত হইত। * সময়ে সময়ে সমস্ত সাহিত্যেই এক এক জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। উপনিষদের অনুকরণে যেরূপ উপনিষৎ রচিত হইত, ব্রাহ্মণের অনুকরণেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, এই সকল ব্রাহ্মণ অনুব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। উপবেদের নাম প্রচলিত আছে। পুরাণের অনুকরণে উপপুরাণের উৎপত্তি প্রসিদ্ধ। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে হংসদূত, পদাঙ্কদূত ইত্যাদির রচনাও বিদ্বৎসমাজে অবিদিত নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহু উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। কাল্যুপনিষৎ, তারোপনিষৎ, গোপালতাপন্যুপনিষৎ ইত্যাদি নামে পরবর্ত্তী কালে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, মহম্মদীয় ধর্ম্মমত লইয়াও উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। এই উপনিষৎখানির নাম অল্লোপনিষৎ। ইহা কয়েক পঙ্ক্তি মাত্র। আদর্শ স্বরূপ তাহার শেষটুকু উদাহৃত হইতেছে:—

"অল্লো পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপং দিব্যানি ধত্তে, ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দদুঃ। ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপা আথর্ব্বণী শাখা। হুঁ হ্রীঁ জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্। অসুর সংহারিণীং হুঁ অল্লো রসুরমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লঃ।"

এতৎ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না, এই

---

* "জীবিকোপনিষদা বৌপম্যে"—পাণিনি, ১.৪.৭৯; ইহার একটি উদাহরণ "উপনিষৎ কৃত্য," বৈয়াকরণিকগণ ইহার অর্থ করিবেন—'উপনিষৎ গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ করিয়া।'

উপনিষৎখানি কিরূপ তাহা এইটুকু দেখিলেই স্পষ্ট জানা যাইবে। উপনিষৎখানির শেষে লিখিত হইয়াছে যে, ঐ মন্ত্র "আর্থর্ব্বণ সূক্ত," অর্থাৎ অথর্ববেদের সূক্ত!

এই জাতীয় উপনিষৎকে লইয়াই উপনিষদের সংখ্যা, শুনিয়াছি, দুই শতেরও উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ একশত আটখানি উপনিষদের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং তৎসমুদয় মুদ্রিতও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, ও বৃহদারণ্যক এই দশ খানি উপনিষৎ সুপ্রসিদ্ধ ও প্রধান; শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকি উপনিষদও উপাদেয় ও অতি প্রামাণিক। এতদ্ভিন্ন আ থ র্ব্ব ণ (অর্থাৎ অথর্ব্ব বেদীয়) বলিয়া প্রচলিত অথর্ব্বশিখা হইতে হংস পর্য্যন্ত বত্রিশ খানি উপনিষৎ পূর্ব্বোক্তগুলির সঙ্গে কোন গুণেই সমান না হইলেও ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক ভাল কথা আছে, এবং সেই সকল কথা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। অনেক স্থানে সংক্ষেপে সার কথাও ইহাদের মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। প্রধান প্রধান আচার্য্যগণও সময়ে সময়ে এই সকল উপনিষদের মধ্যে কোন কোন খানির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অবশিষ্ট উপনিষদ্ গুলির মধ্যেও স্থানে স্থানে উপাদেয় বাক্যাবলী দেখা যায়, এবং অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্বও আছে। এই জন্য ঐতিহাসিকের এ গুলিও একেবারে পরিত্যাজ্য নহে।

পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন মুখ্য উপনিষদ্ গুলি সমস্তই যে একজন ঋষির দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; এবং এক এক খানি উপনিষদেরও সমগ্র অংশ যে একজনেরই দৃষ্ট তাহাও বলা যায় না। যেমন ঋগ্বেদে বিভিন্ন বিভিন্ন ঋষির সূক্ত সমূহ একত্র সমাহৃত হইয়াছে, এই উপনিষদ্‌গুলিও সেইরূপ হইতে পারে; কোনো কোনো খানি বা একজনেরও হইতে পারে। এই জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিভিন্ন কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কোনো স্থানে একটি মত খণ্ডন করিয়া আর একটি মত স্থাপিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬-২-১-২) শ্বেতুকেতু ও আরুণির সংবাদ উল্লেখ করিতে পারা যায়। আরুণি বলিতেছেন—"হে সোম্য, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল; কিন্তু তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় অসৎই ছিল, এবং অসৎ হইতে সৎ জাত হইয়াছে।" আরুণি এই বলিয়া শ্বেতকেতুকে পুনরায় বলিতেছেন—"কিন্তু হে সোম্য, কি প্রকারে ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জাত হইয়াছিল? হে সোম্য, অগ্রে একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল।" এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, আরুণি অসদ্বাদ খণ্ডন করিয়া সদ্বাদ স্থাপন করিতেছেন। এরূপ অন্য দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

আবার উপনিষৎ সমূহের স্থানে স্থানে এরূপ গম্ভীর বা জটিল কথা আছে, যাহার সারতত্ত্ব সহজে বুঝা যায় না; অথবা একজন একরূপ ও অপর জন আর একরূপ বুঝেন। কেহ কোনো উপনিষদের এক কথা দেখিয়া তাহাই এক মাত্র সত্য মনে করেন, এবং অপর উপনিষদে তৎসম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে সঙ্কুচিত হন না। স্বয়ং উপনিষদের ঋষিগণের যে শক্তি বা স্বাধীনতা ছিল, তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকগণের সেরূপ শক্তি বা স্বাধীনতা ছিল না। পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্বাধীনভাবে স্বশক্তি প্রভাবে যাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন, তাহাই তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে উপনিষদে স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে অপর ঋষির মতের সহিত বিরোধ হইলেও তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী জনগণের তাদৃশ শক্তি ছিল না, ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন, এবং ঐ অনুসরণ করিতে গিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সকলকেই সমান ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কেননা, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পরস্পরের মধ্যে একের অন্যাপেক্ষায় লঘুত্ব বা গুরুত্ব বা প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য নির্ণয় করিতে তাঁহারা পারেন না। এই জন্য পরবর্ত্তিগণকে সমস্ত উপনিষৎকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতে মতদ্বৈধের নিবৃত্তি হইল না। কথায় সমস্ত উপনিষৎকে প্রমাণ স্বীকার করিলেও কাজে অনেক বাধা উপস্থিত হইল; কেননা, বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ মত রহিয়াছে অথবা প্রতীয়মান হইতেছে। এই বাধার নিষ্পত্তির জন্যই তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত উপনিষদের মধ্যে একটি ঐক্যের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। যদিও বস্তুত উপনিষদে স্থানে স্থানে ভিন্ন মতই রহিয়াছে, তথাপি তাঁহারা সমগ্র উপনিষদের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য ঐ ভিন্ন ভিন্ন মতকেই সমন্বয় করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা তজ্জন্য সমস্ত উপনিষৎ লইয়াই মীমাংসা বা বিচার করিতে লাগিলেন; এবং সেই মীমাংসা বা বিচারের ফলই উ ত্ত র মী মাং সা র আকার ধারণ করিয়াছে।

কর্ম্ম সম্বন্ধেও মতদ্বৈধাদিনিবারণের জন্য যখন কর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন গুলির মীমাংসার প্রয়োজন হয়, তখন তাহারই ফল স্বরূপ পূর্ব্ব মী মাং সা র উৎপত্তি হয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই ভাগের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই কর্ম্মমীমাংসাকে পূ র্ব্ব মী মাং সা, এবং জ্ঞানকাণ্ড তাহার উ ত্ত র বা পরবর্ত্তী হওয়ায় তাহার নাম উ ত্ত র মী মাং সা হইয়াছে। পূর্ব্ব মীমাংসার

প্রণেতার নাম জৈমিনি, এবং উত্তর মীমাংসার প্রণেতার নাম ব্যাস বা বাদরায়ণ। এই জন্য তাঁহাদের নামে যথাক্রমে পূর্ব্বমীমাংসাকে জৈমিনিসূত্র, এবং উত্তর মীমাংসাকে ব্যাসসূত্র নামে উল্লেখ করা হয়। পূর্ব্বমীমাংসার কর্ম্মকাণ্ড বিচারিত হওয়ায় তাহাকে কর্ম্মমীমাংসা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা যায়। এইরূপ উত্তর মীমাংসায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হওয়ায় ইহাকে ব্রহ্মমীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্র নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের তত্ত্বসমূহ ইহাতে সূত্ররূপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম বেদান্তসূত্র।

বেদান্তসূত্রে মোট ৫৫৫টি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং এই প্রত্যেক অধ্যায়েরই এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে, এবং নামগুলি সেই সেই অধ্যায়ের প্রতিপাদিত বিষয়গুলি সূচিত করিয়া দেয়। ঐ নাম কয়েকটি যথাক্রমে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন, ও ফল। সমন্বয়-নামক প্রথমাধ্যায়ে বিবিধ শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অবিরোধ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদান্ত সমন্বয়ে নানাবিধ মত ও শ্রুতির বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে, সাধন-নামক তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন বর্ণিত হইয়াছে, এবং শেষ ফল-নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তি প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এক-একটি অধ্যায় আবার চারি চারি অংশে বিভক্ত, এই অংশ সমুদয়কে পাদ বলা হয়। আবার প্রত্যেক অধ্যায়েই কতকগুলি করিয়া অধিকরণ অর্থাৎ প্রকরণবিশেষ আছে। সমগ্র গ্রন্থে মোট ১৯২টি অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণই কতকগুলি সূত্র লইয়া রচিত। অভিজ্ঞগণ অধিকরণের লক্ষণে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক অধিকরণেই এই কয়টি অংশ থাকিবে ;— যথা, বিষয়, অর্থাৎ বিচার্য্য বস্তু, যাহার বিচার করিতে হইবে ; সংশয়, অর্থাৎ সেই বিষয়টি কি জন্য বিচার্য্য, তাহাতে কোন সংশয় আছে কি না, যদি না থাকে, তবে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন থাকে না, অতএব তাহাতে কি সংশয় আছে, তাহা অবশ্য প্রদর্শনীয় ; পূর্ব্বপক্ষ ; অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিরোধী তর্কের উপস্থাপন, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনে তর্ক ; উত্তর, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্তের স্থাপন ; এবং নির্ণয়, বিচার্য্য বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রদর্শন।

উপনিষৎ সমূহের তত্ত্ববিচারের জন্য ব্রহ্মসূত্রই একমাত্র গ্রন্থ ; ব্রহ্মসূত্রেই উপনিষদ্ বাক্যসমূহ ন্যায়ানুসারে বিচারিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে এরূপ অপর কোনো গ্রন্থের নাম এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবার পর হইতে বেদান্তজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই তাহা আদর করিতেন, এবং সকলেই তাহার নির্বিবাদ প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। খুব সম্ভব এই কারণেই ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় অপর কোন তজ্জাতীয় গ্রন্থের তখন কোন আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

কিন্তু যদিও সেইরূপ অপর গ্রন্থ রচিত হয় নাই, এবং সকলেই তাহাকে পরবর্ত্তী কালে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি মনীষিগণের নব নব চিন্তা প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা স্ব স্ব বিভিন্ন বিভিন্ন চিন্তা-প্রভাবে ঐ বেদান্ত সূত্রেরই বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ দেখিতে পাইলেন, এবং তদনুসারে তাহার ব্যাখ্যাও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অতি প্রাচীন কালের এইরূপ তিন খানি ব্যাখ্যার কথা আমরা জানিতে পারি, যদিও বর্ত্তমান সময়ে এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য স্ব স্ব ভাষ্যে (যথাক্রমে বে· দ· ৩· ৩·৫৩, ও ১· ১· ১) উপবর্ষের রচিত বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। পাণিনির গুরুর নাম উপবর্ষ ছিল, তিনিই ঐ বৃত্তির রচয়িতা হইতে পারেন।১ রামানুজ স্বকীয় ভাষ্যে (বে· দ· ১· ১· ১) বৌধায়নের বৃত্তির কথা বলিয়াছেন, তাঁহার বেদান্ত দর্শনের শ্রী ভাষ্য এই বৌধায়নকৃত বৃত্তি অনুসরণেই রচিত। আর এক খানি বৃত্তি ঔডুলোমি-বিরচিত।* বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত নিম্বার্ক-দর্শনের মুখপত্রে লিখিত আছে যে, নিম্বার্কের বেদান্ত দর্শন-ব্যাখ্যা ঔডুলোমি-কৃত বৃত্তির অনুসরণেই রচিত হইয়াছে। যে ব্যাখ্যা সংক্ষেপে সূত্রের অর্থটুকু প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাকে বৃত্তি বলে।

এই তিন প্রাচীন বৃত্তির পর ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের পূর্ব্বে, এই মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে বেদান্ত সূত্রের আর কোনো ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমি জানি না। ইহার পরেই শঙ্করাচার্য্যের আগমন। ইঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রপাঠকে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

১ শাঙ্কর ভাষ্য "অতএব ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধান প্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।" ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপবর্ষ পূর্ব্বমীমাংসারও বৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাস্কর ভাষ্যে "অতএব উপবর্ষাচার্য্যেণ উক্তং প্রথম পাদে (কর্ম্ম মীমাংসায়াঃ) আত্মবাদং তু শারীরকে বক্ষ্যাম ইতি।"

* ঔডুলোমির মতবিশেষ তাঁহার নামেই বেদান্ত সূত্রে (৪· ৪·) উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুন্দর।*

পশ্চিম আকাশের পারে তখনো সূর্য্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রম শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যা-বেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুল্‌ছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল; যেদিন প্রত্যহ সূর্য্যের উদয় এদেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখীর কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলত; এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আন্ত ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্য্যাবর্ত্তের দিগন্ত-প্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্য্য-পিতামহেরা তাকে একদিনও একবেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেবল ভোগীর মত নয়, ভাবুকের মত নয়। সৌন্দর্য্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন —সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল নদীসঙ্গমে সমুদ্রতীরে পর্ব্বত-শিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানে তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান্‌রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠ্‌ছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোট না করে, ভক্তি-বৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জান্‌তে পারি। অর্থাৎ কেবলি তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান্‌ বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত সৌখীন রকম করে দেখ্‌তে চাই—তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি, সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই এই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোট করে দেখ্‌তে গেলে তার মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়র মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখ্‌তে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠিনে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে, তার সমস্ত ছোটকে আমরা বড় করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়, কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারিনে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এই জন্যে এই বিশাল সন্ধ্যা-কাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি মানব-সংসারে তেমন সহজে দেখ্‌তে পাইনে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্ত্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখচি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনি অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইচে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তাহলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত হয়ে যেতুম। টুক্‌রো টুক্‌রো করে যদি দেখ তাহলে এর মধ্যে কত ঘাত সংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! এই যে আমাদের চোখের সাম্‌নেই ঐ গাছটি এই তারা-খচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ'কে যদি আংশিক ভাবে দেখ্‌তে যাই তাহলে

---

*১৫ই চৈত্র বুধবারে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

দেখতে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে! আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই, কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা কিছু তুচ্ছ যা কিছু ব্যর্থ যা কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করচে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য্য যে কাটাছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডীকাটা জিনিষ নয় বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্চেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্চেন এত বড় বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করচে। সেই শক্তিকে দেখ্‌তে পাই সে অতি ভীষণ. সে কাট্‌চে ভাঙচে টান্‌চে জুড়চে, সে তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্য নিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে, তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে রোদসী রোদন করে উঠ্‌চে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখ্‌লে এমন ভয়ঙ্কর, তারই অখণ্ড সত্যরূপ কি পরম শান্তিময় সুন্দর! সেই ভীষণ যদি সর্ব্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীর সৌন্দর্য্য থাক্‌ত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলি বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্যে থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলচে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ঙ্কর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য্য। জগতে এই মুহূর্ত্তেই যেমন আকাশজোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্ত্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্চে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্চেন—তাঁর ভয়ঙ্কর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলচে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্চে এখনি এ আমরা কত সহজে কি অনায়াসেই দেখ্‌তে পাচ্ছি—আমাদের মনে ভয় নেই ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানব সংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করচে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার ঘাতপ্রতিঘাতের ভয়ঙ্কর ঘাত সংঘাত সর্ব্বদাই বড় করে প্রত্যক্ষ করচি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য হানাহানি কাটাকাটির মন্থন কেবলি চারদিকে চল্‌চে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাক্‌ত তাহলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তনহীন কদর্য্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চল্‌চে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ত-তেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্য্যবেগে উদগত হয়ে উঠ্‌চে; তারই ভয়ঙ্কর পেষণে ঘর্ষণে রাজ্য সাম্রাজ্য শিল্প সাহিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষলাভ করে জেগে উঠ্‌চে। এই সংসারের মাঝখানে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহা সৌন্দর্য্যকেই দেখেন—তাঁরা অমৃতকেই দেখেন—য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমন ভাবে বলেন, যেন, প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন, যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে যেন উপরে ওঠবার কোন বেগ নেই; সেই জন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে পৃথক্ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা ত প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখ্‌তে পাচ্চি—সে ত জড়যন্ত্রের মত একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করচে না। এ পর্য্যন্ত তাকে ত তার পথের কোনো একটা জায়গায় থেমে থাক্‌তে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্প-সংঘাত থেকে চল্‌তে চল্‌তে আজ মানুষে এসে পৌঁচেছে; এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড়, কত প্লাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌চে; আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘন মেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে; যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অদ্ভুত পাখী, কত আশ্চর্য্য জন্তু কোন্ নেপথ্য গৃহ থেকে এই সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্দ্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে

অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে ত যায় নি। থেমে যদি যেত তাহলে এখনি যা কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদিঅন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌ত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলি তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্ত্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারচে। কেবলি তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে করেই এগতে হচ্চে, কেবলি তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্চে। এই জন্যেই এত দুঃখ এত মৃত্যু। কিন্তু সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্চে না, কেবলি ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা এক সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখ্‌তে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়;—এই জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতি ভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্ত্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখ্‌তে পাচ্চি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্চে সুন্দরকে দেখা—এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সবসময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্চে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিন্তু সেই সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করচে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখ্‌চি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখচিনে, সেই জন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্চেন না, সেই জন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

কিন্তু মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখ্‌তে চাও? তাহলে নিজের স্বার্থপর ছয়রিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এস। মানবচরিতকে যেখানে বড় করে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ঐ দেখ শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্চে—তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্চে। কি তার দীপ্তি, কি তার সৌন্দর্য্য, কি তার পবিত্রতা! কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখ! কি দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ঐ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তাহলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ এঁকে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈসাকে দেখ। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কি সুন্দর! শুধু তাই নয়; তাঁর চারদিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সঙ্কীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্ত্তির উপকরণ;—পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখ্‌তে পাচ্চি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখ্‌তে পাই। কেননা সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখিনে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখ্‌ব, ভীষণকে সুন্দর বলে জান্‌ব, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি, তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে, অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড করে এক করে সুন্দর করে দেখ্‌ব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাক্‌ব—নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্য্যকে যখন আমাদের দুর্ব্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য্য ভূমাকে আঘাত করতে থাক্‌বে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে—তখন সেই সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে—সেই সৌন্দর্য্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবেনা। তাই বলছিলুম সুন্দরকে

জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সেত মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনি সুন্দরকে সত্য করে জান্‌তে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্ম্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুফী কবি।

সুফী কবিরাই সুফীধর্ম্মের আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ এবং পরিষ্কার রূপে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। খ্যাতনামা পারসিক কবিদিগের মধ্যে সনাই, সেখ্ ফরিদুদ্দিন অত্তর, মওলানা জলালুদ্দিন রুমি, জামি, ইত্যাদি অনেক কবিরই প্রায় সমস্ত কবিতাই সুফী ধর্ম্মমতের সরস ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। কবি হাফিজ, "লিসানু-উল-গইয়ব"। অর্থাৎ 'অদৃশ্য জগতের জিহ্বা' এই উপাধি পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সুফীধর্ম্মের দুইটি দিক আছে, তত্বজ্ঞানের দিক এবং গূঢ়ভাবুকতার দিক। প্রথম দিকটার হিসাবে ঈশ্বর বিশুদ্ধ আত্মা, শেষ দিকটার হিসাবে তিনি একমাত্র সুন্দর; এবং পার্থিব রূপে, চিন্তায়, এবং কর্ম্মে যা কিছু সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তাহা সেই অনুপম সৌন্দর্য্যের অস্পষ্ট প্রতিবিম্বমাত্র। আমাদের সসীম মন অসীমের ধারণা করিতে পারে না; অসীম আত্মার কোন বিশেষ প্রকাশের উপলব্ধি আমরা কেবল রূপকচ্ছলেই বলিয়া থাকি। কেহ ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজা বলে; কেহ তাঁহার অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পিতা বলে; এবং অন্যান্য মরমীদিগের ন্যায় সুফীরাও তাঁহার সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার রূপে উপলব্ধি করিয়াছে। এই জন্য সুফী কবিদিগের বন্দনা গানের মধ্যে প্রেমিকের প্রণয়বিহ্বল ভাষা স্থান পাইয়াছে, এবং এই জন্যই তাহারা ঈশ্বরকে বন্ধু এবং প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করে। বাস্তবিক তিনিই পরিপূর্ণ সুন্দর এবং নিখিল জগৎ তাঁহারই দর্পণ স্বরূপ।

কিন্তু এই বহির্জগৎ কি দর্পণরূপে সেই সত্য সুন্দরকে কখনও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিয়াছে? না। সুফী ধর্ম্মের সারকথা এই যে 'ঈশ্বরই একমাত্র ছিলেন, তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না'। কালের গতি প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর অব্যক্ত রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। "আমি গুপ্তরত্ন ছিলাম; আমি আপনাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে এই জগৎ সৃষ্টি করিলাম।" উপরি-উক্ত বচনের টীকা স্বরূপ এবং সুফী কবিদিগের অদ্ভুত উপমার উদাহরণ স্বরূপ আমি জামি'র রচিত 'ইউসুফ্-উ-জুলেইখা" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

শুধু এক ছিল আগে; আমি-তুমি ভাবের অতীত,
পরম সুন্দর-শ্রেষ্ঠ সেই এক, দ্বিত্ব-বিবর্জ্জিত।
প্রকাশিত আপনার আলোকেতে আপন নিলয়ে,
অদৃশ্যের মাঝে লীন, সুপবিত্র সার বস্তু হয়ে,
পাপ পরিশূন্য রূপে। ছিল না দর্পণ, মাধুরীর
প্রতিবিম্ব আরোপিতে; চিকুর বিন্যাসে চিরুণীর
ছিলনাক প্রয়োজন; প্রভাতের সমীর চঞ্চল
দোলায়নি কেশগুচ্ছ; দু'নয়নে দেয়নি কাজল
উজলিতে আঁখিতারা; শোভে নাই কিংশুক রঙীন
কপোল কুন্তল তলে; হয় নি সে কারো সম্মুখীন,
নয়ন দেখেনি তারে। শুনিতে কেবলি নিজ কানে
বাক্যহীন ছন্দোবন্ধে আনন্দ বাজিত তার গানে।
কিন্তু যা সুন্দর সে ত কভু নাহি রহিবে গোপনে,
ভক্তের বন্দনাহীন অদৃশ্য সে থাকিবে কেমনে!
টুটিয়া সকল বন্ধ, নিজ অন্ধ কারাগার হ'তে
আপনা প্রকাশ সে যে করিবেই এ বিশ্ব জগতে!
বসন্ত-সুরভি-শ্বাসে হের ঐ যত বন ফুল
পরে কি মোহন বেশ! কণ্টকের মাঝারে অতুল
গোলাপ সে বক্ষ হতে বসন ছিঁড়িয়া দিল খুলি
আপনার মধুরিমা আলোকের পানে দিল তুলি।
তেমনি জানিতে হবে সুদুর্লভ ভাব এলে মনে,
অথবা সৌন্দর্য্য মোহ কিংবা গূঢ় রহস্য গোপনে
হৃদয়ে জাগিলে তারে তুমিও ছাড়িয়া নাহি দাও,
আঁকড়ি ধরিয়া রাখ; কথা কিম্বা রচনাতে চাও
প্রকাশ করিতে তাহা। জগতের মন মোহিবারে
আপনা প্রকাশ সে যে করিবে কে ধরে রাখে তারে?
সুন্দরের ইহাই স্বভাব; যেখানে সে থাকুক্ না কেন,
আপন আধার হতে মহৎ সে, ইহা ধ্রুব জেনো।
পবিত্র স্বরূপ হতে লভি জন্ম, জগতের পরে
সবার অন্তর মাঝে সে কিরণ পড়িতেছে ঝরে।
তাহার একটি রশ্মি বিশ্বমাঝে, দেবতার তরে
প্রেরণ করিল যবে, ধাঁদিল নয়ন ক্ষণপরে
দেবতার; ঘুরিল মস্তক যথা বিশ্ব ঘূর্ণ্যমান।
প্রত্যেক দর্পণ তাঁর দেখাইছে মুরতি নানান্;
সর্ব্বত্র বিচিত্র স্বরে ধ্বনিতেছে তাঁরি জয়-গীতি।
মুগ্ধ স্বর্গশিশু তাঁর জয় গান গাহিতেছে নিতি।

*   *   *   *

প্রতি অণু পরমাণু সকলি সে তাঁরি দরপণ;
তার মাঝে উঠে ফুটে তাঁহার সে মুরতি শোভন।

গোলাপ কুসুম হতে তাঁরি রূপ পড়ে ঠিকরিয়া,
তাই তারে হেরি হয় আত্মহারা বনের পাপিয়া।
বর্ত্তিকা লভিল সেই জ্যোতি হতে আলোটুকু তার,
তাই ত পতঙ্গ তারি মাঝে সঁপে দেহ আপনার।
সমুজ্জ্বল তপনের অন্তরেতে তাঁর দীপ্তি ভায়,
তাই ত কমল ঢেউ-টল-মল মুখ তুলে চায়!
'লয়লী'র প্রতি কেশ মজনু হৃদয় নিল কাড়ি;
সে লাবণ্য ফুটেছিল তার মুখে, সে যে রূপ তাঁরি।
তাঁহার মাধুরী পূর্ণ রহিয়াছে হের বিশ্বময়,
পৃথিবীর রূপে তারই ঈষৎ পাইবে পরিচয়।
যেথা যত আবরণ, তার মাঝে রয়েছেন তিনি,
যে হৃদয় প্রেমে নত, তারে সেই লইয়াছে জিনি।
তাঁরি প্রেমে ধায় সবে তাঁহারেই লভিবার তরে।
মুকুর হইয়া ধর তাঁর রূপ তোমার ভিতরে।
তুমি গুপ্ত থাক, হোক্ একমাত্র তাঁহারি প্রকাশ;
তোমারে আচ্ছন্ন করি তাঁর প্রেম করুক বিলাস।
তিনিই পেটক, আর তিনি সুরক্ষিত ধন রত্ন;
'তুমি' 'আমি', যাহা কিছু আসে যায় সবই মিথ্যা স্বপ্ন!
ক্ষান্ত হও বাক্য মোর! এ কাহিনী এ যে অন্তহীন;
কেমনে মহিমা তাঁর বরণিবে বাক্য মোর ক্ষীণ!
সকলের চেয়ে ভাল নীরবে কেবল প্রেম সেবা,
অকাতরে দুঃখ বহি, ভাবি, তিনি সব, আমি কেবা!

সুফীধর্ম্ম সৃষ্টিরহস্যের কিরূপ মীমাংসা করে তাহা উল্লিখিত কবিতাটিতে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। আদি-কালে এই বহু বিচিত্রের অস্তিত্বের পূর্ব্বে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা পরম সুন্দর পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বর, স্তব্ধ এবং আত্মগতরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে কেন উদয় হইল এ কথার উত্তর দেওয়া মানবজ্ঞানের সাধ্যাতীত। যাহা কিছু সুন্দর তাহাই আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল, এই উদাহরণের দ্বারা জামি এ রহস্য সম্বন্ধে নিজের মীমাংসাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সুন্দর সে যেমন আপনার রূপ সকলকে দেখাইবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকে, তেমনি কোন সুন্দর ভাব যদি কোন লোকের মনে উদয় হয় তবে সে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এই প্রকাশ-বেদনা সেই পরমসুন্দরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আছে, কারণ এই প্রকাশ-বেদনাই সেই পূর্ণ এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যময় একের প্রধান গুণ। মানিয়া লইলাম প্রকাশ চাই-ই, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে? কোনো বস্তুকে জানিতে হইলে তাহার বিপরীতস্বভাব বস্তুর সহিত তাহাকে পাশাপাশি বসাইতে হয়। যেমন অন্ধকার না থাকিলে আমরা আলোর ধারণা করিতে পারিতাম না। কিন্তু সুফীমত-অনুসারে 'অন্ধকার আছে' এই ধারণাটাই ভুল ধারণা। বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কোন জিনিষ নাই; অন্ধকার বলিলেই বুঝায় আলো নাই। এই মতটি মানিয়া লইয়া পুনর্ব্বার বলিতেছি, কোন বস্তুকে জানিতে হইলে তাহাকে তাহার বৈপরীত্যের মধ্যে দেখিতে হয়।

সুফীদিগের পাপের রহস্যের মীমাংসাটিও ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। ঈশ্বর আপনাকে জানাইতে চাহিলেন; তিনি অপাপবিদ্ধ, এই জন্য পাপ আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে জানা যায়। এই পাপের রহস্য এবং সৃষ্টির রহস্য দুইই বস্তুতঃ এক। সুফীরা কি তবে দ্বৈতবাদী? না। ঈশ্বর যখন একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ এবং একমাত্র সত্য, তখন পাপ শুধু যে অমঙ্গল তাহা নহে, একেবারে 'নাস্তি'। অন্য রূপে বলিতে গেলে পাপ বা অমঙ্গল প্রকাশ-চেষ্টা-সংঘটিত একটি মায়া। বস্তুত তাহা অসত্য, এবং ক্ষণস্থায়ী। জলালুদ্দিনরুমি বলেন, "জগতে পরিপূর্ণ মিথ্যা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ পাপের অস্তিত্ব আপেক্ষিক।"

এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে এই পরিদৃশ্যমান, জড় বা অচিরস্থায়ী জগৎ, যাহাতে আমরা বিচরণ করিতেছি, ইহা বস্তুটা কি? উহা আর কিছুই নহে কেবল 'নাস্তি'র উপর সেই 'অস্তি'র প্রতিবিম্ব; আকারহীন শূন্যতার মধ্য হইতে দৈবঘটিত একটি স্বপ্নরূপ; ঈশ্বরের সত্তাকে প্রত্যক্ষীভূত করিবার জন্য মঙ্গল এবং অমঙ্গলের একটি সংঘাত। কেবল-মাত্র পঞ্চভূতের সমষ্টি লইয়াই যে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব তাহা নহে, যিনি মনের মন ইহা তাঁহারই মনের একটি প্রকাশ। একটি উপমার সাহায্যে এই ভাবটি পরিষ্কার হইবে। আমরা ক্ষুদ্র জলাশয়ের উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, এই প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমরা প্রকৃত সূর্য্য কিরূপ তাহার কতকটা আভাস পাই। কিন্তু কেবল সূর্য্যের কতকগুলি গুণের পরিচয় পাই, তাহার সার বস্তু-টুকু পাই না। যে পরিমাণে উহা সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করে, সেই পরিমাণে উহা সত্য, এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু সত্য আছে তাহার জন্য উহা সূর্য্যের নিকট ঋণী। এককথায় উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহার অস্তিত্ব সূর্য্যের প্রকাশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সূর্য্য আপনার তেজ আকর্ষণ করিয়া লইলেই উহা একে-বারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সূর্য্য কিন্তু উহার অধীন নহে, উহা না থাকিলেও সূর্য্যের কিছুই আসে যায় না, এবং নিজের তিলমাত্র ক্ষতি না করিয়াও সূর্য্য বারবার অনায়াসে নিজের প্রতিমূর্ত্তি ঐ জলাশয়ের মধ্যে প্রতি-বিম্বিত করিতে পারে। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধও ঐরূপ।

এখন এই অচিরস্থায়ী জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং

শিরোভূষণ মানবের স্থান কি তাহা দেখা যাউক। 'গুল-শানীরাজ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

এই 'নাস্তি' সে পরম পরিপূর্ণ 'অস্তির' মুকুর,
এর প্রতিবিম্বে তাঁর অপার মহিমা ভরপুর।
বিরোধ বাধিল যবে 'নাস্তি' আর 'অস্তি' দোঁহা সাথে,
তখনি এ প্রতিরূপ ফুটিয়া উঠিল আয়নাতে।
ছু'য়ের মিলনে হল একের চূড়ান্ত পরকাশ;
এক, এক-ই, বারবার গুণিলেই একত্বের নাশ।
এই গণনার কালে একেতেই ভিত্তি আছে তার,
এক কিন্তু তবু দেখ কত! তারে গুণে ওঠা ভার।
'নাস্তি' দরপণ; বিশ্ব, প্রতিবিম্ব; মানব তাহাতে
প্রাণময় চক্ষুরূপ, সেই চক্ষে প্রতিবিম্ব ভাতে।
তুমি সেই আঁখি, তার মাঝারে আলোকরূপ তাঁরি,
তোমারি নয়নে রহি মুগ্ধ তিনি আপনা নেহারি।
এ বিশ্বই মানব, মানব মাঝে বিশ্বচরাচর,
আর কি করিব ব্যাখ্যা ইহা হতে সরল সুন্দর?
এই রহস্যের গোড়া খুঁজে যবে পাইবে সন্ধান,
দেখিবে তিনিই দৃষ্টি, তিনি দ্রষ্টা, তিনি ছু'নয়ান।

তাহা হইলে মানুষের দুঃখটা কি, এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভই বা হইবে কেমন করিয়া? এই দুঃখের কারণ আবিষ্কার করিলেই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই পরমাশান্তি লাভ হইবে, তত্ত্বজ্ঞানে এই কথা বলে। সেই দুঃখ আপনার প্রতি আসক্তি, উহার প্রতীকার ত্যাগ এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বর লাভ।

যতদিন এই অহং-এর মায়ায় মানুষ নিজের মধ্যে বদ্ধ থাকে, ততদিনই তাহার বাসনার অন্ত নাই এবং পিপাসার শান্তি নাই। মানুষের সহিত সূর্য্য-রশ্মিতে ভাসমান ধূলি-কণার তুলনা করা যাইতে পারে। এই কণার সূর্য্য-অভিমুখ অংশটুকু জ্যোতির্ম্ময়, মর্ত্ত্য-অভিমুখ অংশটুকু অন্ধকার। মানুষ নিত্য এবং অনিত্য, ভাল এবং মন্দ, আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্রন। ঈশ্বরের নিকট হইতে নীচের দিকে তাকাইলে সে কি দেখে? স্বরচিত অনিত্যতার কালো ছায়া দেখিতে পায়; এই ছায়াটি দেখিয়া সে মনে করে উহাই তাহার যথার্থ স্বরূপ, এবং মূঢ়ের ন্যায় তাহাই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে। এই মিথ্যা অহং জ্ঞান, এই মায়া, এই অনিত্য বস্তু, যাহাকে সে অত্যন্ত আদরের সহিত আপনার মধ্যে পোষণ করে, ইহাই তাহার সমস্ত দুঃখ, দৈন্য এবং পাপের মূল। দৃষ্টি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সেই একের দিকে স্থির রাখিয়া, এবং যে অসত্যের অন্ধকার ছায়াকে সে নিজের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া, সত্য কি, তাহাই অনুসন্ধান করা তাহার পক্ষে আবশ্যক। সত্যকে জানিতে পারিলে সে কি দেখিবে? কেবলই মঙ্গল, আর কিছুই নহে। তখন তাহার নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরময় হইয়া উঠিবে। ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই দিব্য দৃষ্টি। এক কথায় ইহাই ঈশ্বরের মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন। তীর্থযাত্রী দেবমন্দিরে পঁহুছিল; প্রেমিকের সহিত প্রিয়ের মিলন হইল। ইহার দ্বারা কি তাহার অস্তিত্ব লোপ হইল? না, সে পরম 'অস্তি'র সহিত মিলিত হইল। সে কি পৃথিবীর সখ্যবন্ধন হারাইল? না, কারণ যাহা কিছু তাহার প্রিয় ছিল তাহা ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব, এবং তাঁহারই সহিত মিলিয়া সে যাহা ছিল তাহা ত রহিলই, এবং তাহা হইতে অনেক বেশী হইল; তাহার যাহা ছিল তাহা রহিল এবং সে আরও অনেক বেশী লাভ করিল। কিন্তু সে কি হইল এবং পাইল তাহা সে মুখে বলিতে পারে না এবং কেহ কানে শুনিতেও পারে না— "এই সকল কপট অনুসন্ধিৎসুরা অজ্ঞানী, কারণ সে যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহা সে প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

আর একটি কথা বলিয়া শেষ করিব; "যে কথা হাজার হাজার বার বলা হইয়াছে তাহাই বলিব।" মস্‌নভি হইতে একটি সুন্দর অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।—

ধাতুরূপে মরে গিয়ে হলেম উদ্ভিদ,
উদ্ভিদে মরিয়া পশু রূপেতে জীবিত।
পাইনু মানব জন্ম পশুরূপ হ'তে।
ভয় কেন তবে? মৃত্যু হরিল কি মতে?
মানব জনম অন্তে হয়ত এবার
প্রকাশিত হব রূপ ধরি দেবতার।
দেবতা হইতে আরো সমুন্নত স্তরে
লভিব কল্পনাতীত রূপ জন্মান্তরে।
আমি তবে 'নাই নাই' বাজে বীণা তারে,
জানিও নিশ্চয় শেষ তাঁহার মাঝারে।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।

হোমরের ইলিয়াড ওলিম্পস্ হইতে পারে কিন্তু তাহা হিমালয় নহে। কাব্যজগতের হিমালয় একা কেবল মহাভারত। রামায়ণ? রামায়ণ বড়জোর বিন্ধ্যাচল। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ। বশিষ্ঠ মুনি বিশ্বামিত্র রাজার মুখের সামনে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া এই যে একটি কথা স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং"—"ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ধিক্ বল—ব্রাহ্মণের তপোবলই বল" এই কথাটিই রামায়ণের মূলমন্ত্র। ত্রেতাযুগে যে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশ বার

নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণসংগ্রহের জন্য দূরে হাতবাড়াইবার প্রয়োজন নাই—রামায়ণই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। দশরথ রাজার অযোধ্যাপুরী ব্রাহ্মণদিগের বেদাধ্যয়নে ত্রিসন্ধ্যা শব্দায়মান—সে মহাপুরীতে ক্ষত্রিয়বীরদিগের ধনুষ্টঙ্কারের কোনো সাড়াশব্দ নাই। রামায়ণের ক্ষত্রিয়কুলতিলক সবেমাত্র দশরথ এবং জনক; তাহার মধ্যে দশরথ রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে জোড়হস্ত—জনকরাজ ব্রাহ্মণেরই সামিল; তা বই, দোঁহার স্বভাব চরিত্রে ক্ষত্রিয়ের কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে দেখা যায় ঠিক্ তাহার বিপরীত। রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও অনেক তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে শস্ত্রকে সার করিয়া কুরুসৈন্যের দ্বিতীয় পদবীস্থ মহারথী হইয়া আপনাকে পরম শ্লাঘান্বিত মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণে বাল্মীকি মুনি ক্ষত্রিয়বলকে হনুমান সাজাইয়া মনে মনে খুবই হাস্য করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; মহাভারতের রচয়িতা ক্ষত্রিয়বলকে দেবতুল্য ভীষ্মে মুর্ত্তিমান করিয়া তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন; তা ছাড়া ক্ষত্রিয়বল যে কিরূপ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী মহাবল—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আগাগোড়া তাহারই জলন্ত কাহিনী।

অর্জ্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অবতার, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধিদৈবিক অবতার। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দুই ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অর্জ্জুনের রথ চালাইবার ভার এবং অধর্ম্মের প্ররোচনা বাক্যের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মপথে চালাইবার ভার। শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে অশ্বের রাশ এবং দক্ষিণ হস্তে অর্জ্জুনের মনের রাশ অপ্রমত্তভাবে ধরিয়া থাকিয়া "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই বাক্যটিকে জগজ্জনের সমক্ষে ফলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মনুষ্যের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের পৃথক্ তিনটি পথ আছে—জ্ঞানের পথ, কর্ম্মের পথ, এবং ভক্তির পথ; তা ছাড়া, একটি মাঝের পথ আছে যাহা ঐ তিন পথের ত্রিবেণীসঙ্গম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শেষোক্ত সঙ্গমতীর্থের পথে চালাইবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ হইতে যাত্রারম্ভ করিলেন। বলিলাম সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ—কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, সাংখ্যদর্শনের মতামত। মানুষের গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র যেমন মূলেই মানুষ নহে, তেমনি সাংখ্যদর্শনের মতামত মূলেই সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরকার কথা নহে। যাহা সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরের কথা তাহা বেদান্তশাস্ত্রেরও ভিতরের কথা। পক্ষান্তরে, সাংখ্যশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত এবং বেদান্তশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত দুয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। সাংখ্যদর্শন এবং বেদান্তদর্শনের মধ্যে যে জায়গাটিতে মতের অনৈক্য সে জায়গাটি বাদ-প্রতিবাদে এরূপ জটিলতাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্যে তোমার আমার ন্যায় সহজ মনুষ্যের দন্তস্ফুট হওয়া ভার; পরন্তু উভয়ের ঐক্যস্থানটিতে বেদান্ত এবং সাংখ্য যেন ঝিনুকের দুইটি কপাট, আর, সেই কপাটের অন্তরালে অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তা সুংগোপিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যশাস্ত্রের সেই সার কথাটিই অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে সাংখ্যবেদান্তের মর্ম্মগত ঐক্যস্থানটির মোটামুটি ভাবের যৎস্বল্প আভাস প্রদর্শন করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

আমি যদি বলি যে, "গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি" তবে "আমরা" এই যে একটি শব্দ আমি মুখে উচ্চারণ করিলাম এ শব্দটি "আমি" শব্দের বহুবচন তাহাতে তো আর ভুল নাই? তবেই হইতেছে যে, উহার অর্থ, অনেক আমি। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমি তো আর অনেক নহি;—এই একঘর লোকের মধ্যে আমি একজন মাত্র বই না; "আমি" শব্দের বহুবচন বসিবে তবে কোথায়? তাহার বসিবার স্থান সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তবে জ্ঞানচক্ষু কিসের জন্য? শোনো তবে বলি:—যাহাকে আমি বলিতেছি "আমি" তাহা আমার জ্ঞানের সঙ্গে অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, একদণ্ডও সে আমার জ্ঞানের সঙ্গ ছাড়া নহে। আমার জ্ঞান যেখানে ধায় সেও সেইখানে যায়। আমার জ্ঞান যখন তোমাতে যায় তখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আটপহুরিয়া সঙ্গীটি তোমাতে দেখা দ্যায়—তুমির মধ্যে আমি দেখা দ্যায়। আমার জ্ঞানের এই আটপহুরিয়া সঙ্গীটির এক মূর্ত্তি আমি আমাতে দেখিতে পাই, তাহার আর এক মূর্ত্তি তোমাতে দেখিতে পাই, তাহার কবিমূর্ত্তি কবিতে দেখিতে পাই, তাহার শাস্ত্রী মূর্ত্তি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে দেখিতে পাই, এমন কি তাহার অর্দ্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্ত্তি পশু পক্ষীতেও দেখিতে পাই, তাহার সুষুপ্তমূর্ত্তি তরুলতাতেও দেখিতে পাই; তা শুধু না—আমার মধ্যেই আমার জ্ঞানের সেই আটপহুরিয়া সঙ্গীটির একমূর্ত্তি দেখিতে পাই প্রাতঃকালের ভজনমন্দিরে, আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই মধ্যাহ্নকালের ভোজনমন্দিরে, আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই অপরাহ্নকালের কর্ম্মক্ষেত্রে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই সায়ংকালের বন্ধুসহবাসে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই রাত্রিকালের বিরামশয্যায়। এ তো দেখিতেছি নানা রঙের নানা আমি; অথচ আবার, "আমি" বলিতে একই সাদা রঙের আমি বুঝায়, তা বই নানা রঙের আমি বুঝায় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, একই সাদা রঙের আমির পক্ষে নানা রঙের আমি হওয়া

কিরূপে সম্ভবে? বেদান্ত বলেন, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি এক অদ্বিতীয় আত্মাতে নানাত্বের ভ্রম হয়। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা-ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন ভ্রম বলিয়া যে একটা পদার্থ তাহা আসিবেই বা কোথা হইতে, থাকিবেই বা কাহার আশ্রয়ে? বেদান্তদর্শন ইহার উত্তর দ্যা'ন এই যে,—ভ্রম "সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং" অর্থাৎ ভ্রম আছে যে তাহাও নহে, নাই যে তাহাও নহে; ভ্রম অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র; তাহা কি যে তাহা বলা যায় না। বেদান্তদর্শন আরো বলেন এই যে, সেই যে ভ্রম বা অবিদ্যা যাহা অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র, তাহা অনাদিকাল জীবকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবেই পূর্ণব্রহ্মও অনাদি, অপূর্ণ জীবও অনাদি, ভ্রমও অনাদি। সাংখ্য বলেন যে, একই চন্দ্র যেমন জলের তরঙ্গে প্রতিবিম্বচ্ছলে নানারূপে ইতস্তত হয়, তেমনি প্রকৃতির বহু বা বিচিত্র কার্য্যকলাপের সাক্ষীস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনার সেই বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বের সহিত আপনাকে জড়াইয়া মনে করেন যে, বুদ্ধি অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদির এই যে সকল কার্য্য এ সকল কার্য্যের আমিই কর্ত্তা। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তিনি কোনো কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন, কার্য্য যাহা করিবার তাহা প্রকৃতিই করে। সাংখ্যের এই যে একটি কথা "চেতন পদার্থের প্রতিবিম্ব" এ কথাটি কবিতার হিসাবে শুনিতে অতি মনোহর, কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাবে এক-প্রকার সোনার পাথরবাটি—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাহাই হউক না কেন, সাংখ্য বেদান্তের এই সকল চিত্তবিভ্রান্তকারী মতামত এবং বাদপ্রতিবাদের পর্দ্দার আড়ালে উঁকি দিয়া দেখিলে একটি অমূল্য সত্যের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পুরাতন আচার্য্যেরা ভাবের চক্ষে সেই সার সত্যটি দেখিতে পাইয়া তাহার নাম দিয়াছেন "অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত।" অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত যে কাহাকে বলে, তাহার একটা মোটামুটি রকমের আভাস প্রদান করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব; তা বই, তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়া বলিবার অবকাশও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই।

মনে কর একজন অসামান্য ওস্তাদ গায়ক গান গাহিতেছেন এমনি চমৎকার যে তাহা শ্রবণ করিয়া ঘরসুদ্ধ লোক বলিতেছে যে, এমন মধুর কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত আমরা কোথাও শুনি নাই। একটি প্রবাদ আছে যে, আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না। গায়ক আপনি মাতিয়াছেন বলিয়াই তিনি শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গায়ককে কে মাতাইয়া তুলিল? ইহার উত্তর এই যে অন্য কোনো ব্যক্তি গায়ককে মাতাইয়া তোলে নাই গায়ক আপনিই আপনাকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। গায়ক আপনারই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা আপনি পান করিতে করিতে আপনিই মাতিয়া উঠিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। এখানে দ্বৈতের ভাব দুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে অবিকল সমান। নাটমন্দির যেমন গুণী গায়ক এবং গুণগ্রাহী শ্রোতা এই দুয়ের সম্মিলনস্থান, গায়কের মনোমন্দিরও তেমনি গুণী গায়ক এবং গুণগ্রাহী শ্রোতার সম্মিলনস্থান; কেননা গায়ক আপনার গানের আপনি কর্ত্তা শুধু না—পরন্তু আপনার গানের আপনি কর্ত্তা এবং আপনি শ্রোতা দুইই একাধারে। দ্বৈতভাব তো দুই ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া গেল সমান; অদ্বৈতভাব কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ? অদ্বৈতভাবও দুই ক্ষেত্রেই সমান। গায়কের মনোমধ্যে একই ব্যক্তি যেমন গানের কর্ত্তা এবং গানের শ্রোতা নাটমন্দিরেও তেমনি একই গান যাহা গায়কের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে তাহাই শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের মন হইতে বাহির হইতেছে। চুম্বকের সান্নিধ্যে লোহা যেমন চুম্বক হইয়া যায়, তেমনি শ্রোতৃবর্গের মন গায়কের সঙ্গে গানে যোগ দিয়া গায়ক হইয়া উঠিতেছে। গান এমনি জমিয়া গিয়াছে যে, গায়ক শ্রোতৃবর্গের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করিতেছেন আর শ্রোতৃবর্গ গায়কের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া গানের ফোয়ারা ছুটাইতেছেন। অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত শুধু কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞানের কথা নহে। তাহা সমস্ত জগতের প্রাণের কথা। উপনিষদে আছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" নিশ্চয়ই আনন্দ হইতে জীবসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবনধারণ করে এবং আনন্দেতেই অভিনিবিষ্ট হয়। এষহ্যেবানন্দয়াতি। গায়ক যেমন আপনার গানে আপনি মাতোয়ারা হইয়া সভাসুদ্ধ লোককে মাতাইয়া তোলেন, পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দে আপনি ভোর হইয়া নিখিল জগৎকে আনন্দায়মান করেন। আর একটি কথা এই যে, জনসমাজের ভাগ্য যখন এইরূপ সুপ্রসন্ন হয় যে, বড়'রা ছোটোদিগকে স্নেহচক্ষে দেখিতেছে ছোটোরা বড়দিগকে ভক্তিচক্ষে দেখিতেছে, সমানে সমানে নানাসূত্রে প্রীতি এবং সদ্ভাব ঘনীভূত হইতেছে, তখন, নানা যন্ত্রের নানা ধ্বনির মধ্য হইতে যেমন নব নব রাগের সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত জাগিয়া ওঠে, তেমনি নানা জনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে মহাশ্চর্য্য একাত্মভাব জাগিয়া ওঠে। সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যসুন্দরমঙ্গলরূপী আত্মার ভাব আপনাতে এবং লোকসমাজে ফুটাইয়া তোলাই সাধনের প্রধান লক্ষ্য; আর সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা সাধনের পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে সর্ব্বকালে

জাগ্রত রহিয়াছেন—এই সত্যটির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের এই যে এ-কটি সারকথা যে "আত্মা অজর অমর এবং স্থির"—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জুনকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন। যদি বল যে,তাহার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এই যে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার বস্তু,তা বই তাহা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার বস্তু নহে। প্রমাণ শব্দের মৌলিক অর্থ মাপা। পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিবার সময় ক্রেতা দোকানের পুঁথি হইতে একখানি পছন্দসই বস্ত্র বাছিয়া লইয়া তাহা প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার ধার ঘেঁসিয়া এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত আপনার দক্ষিণ হস্ত উত্তরোত্তরক্রমে আরোপ করিয়া বলেন যে, এ বস্ত্রখানি এত হাত লম্বা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত ক-হাত লম্বা; তবে তিনি হাসিয়া বলিবেন "একহাত লম্বা।" তাঁহার এ কথায় সন্তোষ না মানিয়া পার্শ্বস্থিত কোনো তর্কালঙ্কার যদি বলেন যে, "ঐ বস্ত্রখানি ক-হাত লম্বা তাহা যেমন তুমি মাপিয়া দেখিলে, তোমার দক্ষিণ হস্ত যে এক হাত লম্বা তাহা তুমি আমাকে সেইরূপ করিয়া মাপিয়া দেখাও" তবে ক্রেতা তাঁহাকে কি বলিবেন তাহা জানি না; কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার ন্যায় তর্কচূড়ামণিদিগের সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে একটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমি অনেকবার অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি; সে কথা এই;—

মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে।

এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥

প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করিতেছে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন—কি? না, ইন্ধন কাষ্ঠে (অর্থাৎ জ্বালানে কাঠে) দাহিকাশক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ করিতে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে যে সকল সার সার জ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে—শ্রোতৃবর্গের উচিত যে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন। কেননা শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আরম্ভমুহূর্ত্তে যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য অনুনাদিত করিয়া দশ শত বীরের দশ শত শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আর, তাহার পরক্ষণেই ভেরী পণব আনক গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল, তখন কুরুসৈন্য দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া শস্ত্র চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জ্জুন ধনুক বাগাইয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার তাহা আমি নিরীক্ষণ করিতে চাই—উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর।" অর্জ্জুনের এই কথামতে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহামহারথীদের সম্মুখ ভাগে রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন "দেখ এই কুরু-সবে একত্রে সমবেত।" অর্জ্জুন কি দেখিলেন? দেখিলেন পিতৃগণ পিতামহগণ আচার্য্যগণ মাতুলগণ ভ্রাতৃগণ পুত্রগণ পৌত্রগণ ভাই বন্ধু সুহৃদগণ যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান। দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন "এই সব আত্মীয় স্বজনকে, কৃষ্ণ যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুখাইয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কম্প ধরিয়াছে, গাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আমার মস্তক বিভ্রান্ত হইতেছে; আর দৈব লক্ষণ দেখিতেছি বিপরীত বিপরীত। আত্মীয় স্বজনকে রণে হত্যা করিয়া মঙ্গল কিছুই দেখিতেছি না। আমি বিজয় চাহি না, কৃষ্ণ, রাজ্য চাহি না, সুখ-সমৃদ্ধি চাহি না। কি হইবে আমার রাজ্যে, কি হইবে ভোগ-বাহুল্যে, কি হইবে বাঁচিয়া থাকিয়া? যাঁহাদের জন্যে আমার রাজ্যের প্রয়োজন, ভোগৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন, সুখ-সমৃদ্ধির প্রয়োজন—তাঁহারাই—পিতৃপিতামহ আচার্য্য ভাই বন্ধুরাই ধন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান, ইঁহাদের হস্তে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল তথাপি ইঁহাদের আমি মৃত্যু কামনা করি না; পৃথিবী কোন্ ছার, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও ইঁহাদের হত্যাকার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিয়া কি আমার লাভ হইবে, জনার্দ্দন! এই সকল আততায়িগণকে হত্যা করিলে লাভের মধ্যে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান সন্ততিগণকে সবান্ধবে হনন করা কোনো ক্রমেই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিয়া কোন্ প্রাণে আমরা সুখী হইব। এরা সবে লোভে হতচেতন হইয়া যদি বা দেখিতেছে না কিন্তু কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহ যে কি ভয়ানক পাপ আমরা তো তাহা জানি! উঃ কি মহাপাপ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি! রাজ্যসুখের লোভে পড়িয়া আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া দিয়া এবং প্রতিবিধানের কোনো চেষ্টা না করিয়া কৌরবগণের হস্তে যুদ্ধে নিহত হওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিয়া শোকের আবেগে বসিয়া পড়িলেন। অর্জ্জুনকে এইরূপ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ-লোচন এবং বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "যুদ্ধস্থলে আর্য্যবিগর্হিত স্বর্গের পথরোধকারী এ পাপ কোথা হইতে তোমাতে আসিয়া উপস্থিত হইল? এরূপ হতোদ্যম ভাব কাপুরুষদিগকেই শোভা পায়, তোমাকে শোভা পায় না কৌন্তেয়। ক্ষুদ্র জনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য

ঝাড়িয়া ফেলিয়া ওঠো, পরন্তপ।" অর্জ্জুন বলিলেন "ভীষ্ম এবং দ্রোণ উভয়েই আমার পূজার্হ—তাঁহারা যদি বা আমার প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কেমন করিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিব? মহানুভাব গুরুগণকে হত্যা করিয়া রক্তকলুষিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করা অপেক্ষা গুরুহত্যা পাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করা শত গুণ শ্রেয়। এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয় ভাল কি পরাজয় ভাল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া সুখ নাই তাঁহারাই যুদ্ধার্থে সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার স্বাভাবিক বলবীর্য্য কৃপাদৌর্ব্বল্যে পর্য্যাকুলিত হইয়াছে। আমি কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নিশ্চিত মতে বলো—আমি তোমার প্রণত শিষ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান কর। যে শোক আমার সর্ব্বশরীর শোষণ করিতেছে, তাহার উপশম হইবে কেমন করিয়া তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি যদি পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হই তাহাতেই বা কি, আর, আমি যদি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করি তাহাতেই বা কি—এ শোক কিছুতেই শান্তি মানিবার নহে। আমি যুদ্ধ করিব না।" এই বলিয়া অর্জ্জুন বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন।

উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনকে এইরূপ বিষাদে ম্রিয়মাণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে সাংখ্যশাস্ত্রের কয়েকটি সার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "অশোচ্যদিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতেছ; এটা জেনো স্থির যে, লোকের মরণ বাঁচনে পণ্ডিতেরা শোক করেন না। শরীরধারীর শরীরে শৈশব যৌবন জরা যেমন অবশ্যম্ভাবী দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী; ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুহ্যমান হ'ন না। আত্মা কোনো কালে জন্মেনও নাই মরেনও না,—শরীর হত হইলে আত্মা হত হ'ন না। শস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইয়া নষ্ট করিতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শোষণ করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, অচল, সনাতন। ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া পণ্ডিতেরা ইঁহার জন্য শোক করেন না। অতএব সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয়—দুইই সমান জানিয়া যুদ্ধে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এ যাহা তোমাকে আমি বলিলাম এ বুদ্ধি সাংখ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তা ছাড়া আরো এক প্রকার বুদ্ধি যোগের মধ্যে পাওয়া যায়—যে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে কর্ম্মবন্ধন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। সে বুদ্ধি কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।"

এখানে এইটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত যে, বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, শুনিতেছেন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ যদি আর কেহ হইতেন, আর, অর্জ্জুন যদি সামান্য একজন শোকসন্তপ্ত গৃহস্থ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন তাহার একটি কথাও যদিচ অসত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্যুতের আলোক যেমন একগুণ অন্ধকারকে দশগুণ করিয়া তোলে, তেমনি বক্তার মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানের কথা শ্রোতার একগুণ প্রাণের বেদনাকে দশ গুণ করিয়া তুলিত, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যে মানুষ স্নেহের পাত্রটিকে বা প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধুকে জন্মের মতো হারাইয়া জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে—তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহার নিকটে নিতান্তই বাজে-কথার সামিল। সে বলিবে যে, "আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্বিকার তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো প্রয়োজন নাই—যাহাকে আমি হারাইয়াছি তাহাকেই আমার প্রয়োজন।" ইহার উত্তরে উপদেষ্টা যদি বলেন যে, "অনিত্য বস্তুর উপরে প্রীতি স্থাপন করিলে সকলেরই এইরূপ দশা হয়, তোমার শুধু নহে।" এ কথার উত্তরে সে ব্যক্তি মুখে না বলুক্—মনে মনে নিশ্চয়ই বলিবে যে, "নেই মামা অপেক্ষা কানামামা ভাল; চিরস্থায়ী অন্ধকার অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী আলোক ভাল; অবিনাশী আত্মা হইয়া অনন্তকাল বিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এক মুহূর্ত্ত যদি আমি সেই হাসি মুখখানি আর একবার চক্ষে দেখিতে পাই তবে কি ধন না লাভ করি; সে ধনের তুলনায় স্বর্গই বা কি, আর মোক্ষই বা কি, সবই আমার নিকটে তৃণতুল্য।" এ রোগের ঔষধ যদি কিছু থাকে তবে, সে ঔষধ বিবেক, বৈরাগ্য এবং সংযম। অবিবেকী ব্যক্তি যে ক্ষণিক সুখের তুলনায় আত্মাকে অবিনাশী অন্ধকার মনে করিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রাম সংস্কৃত ভাষার ক-অক্ষরও জানে না—এরূপ স্থলে শ্যাম যদি তাহাকে সরস সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়া শুনায়—তবে রাম তো বলিবেই যে, "আমার কানের কাছে সঙস্কিড়িমিড়ি করিও না।" প্রকৃত কথা এই যে আত্মা শুধু যে কেবল আছে মাত্র তাহা নহে, আত্মা জ্ঞান প্রেম এবং আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া আত্মাকে পাইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অবিদিত নাই। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো, মরুভূমির উদ্যান। আত্মাকে পাইয়া পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধন রত্ন একদিকে—আর, আত্মা একদিকে—আত্মার তুলনায় সে সব ধন রত্ন অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম। আত্মা যদি কেবল আছে মাত্র হইত তাহা হইলে আত্মাকে জানিবার জন্য কাহারো কোনো মাথাব্যথা

হইত না। বেদান্তশাস্ত্র বলেন যে, আত্মা অস্তি ভাতি এবং প্রিয় এই তিন সাধনের ধন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার স্থির প্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। পুষ্করিণীতে পঙ্ক জমিয়া তাহার জল যখন অব্যবহার্য্য হয়, তখন পুষ্করিণীকে যেমন ঝালানো আবশ্যক, তেমনি, বিবেক বৈরাগ্য এবং এবং সংযম দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক; তা নহিলে আত্মা সাধকের ভোগে আসিতে পারে না। মোট সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে এটা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানা উচিত যে, সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ জ্ঞানে আয়ত্ত করা চাই—কারক বিভক্তি সর্ব্বনাম উপসর্গ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিধিমতে পরিচয় লাভ করা চাই; তাহার পরে সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া ব্যাকরণ জ্ঞানকে কিরূপে ভাষার ব্যবহার-কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হাতে কলমে করিয়া শেখা চাই; তা নইলে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদনে বিদ্যার্থী ব্যক্তির অধিকার জন্মিতে পারে না। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "একে তো ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনো রসকস নাই তাহাতে আবার শব্দের ইঁট কাট জড়ো করিয়া বাক্যের ভিত গাঁথিয়া তোলা এক প্রকার রাজমজুরের কাজ—তাহাতে আমার মন যাইতেছে না, আমি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই আমাকে অধ্যয়ন করা'ন" তবে এটা যেমন বিদ্যার্থী ব্যক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা, তেমনি সাধক যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "তত্ত্বজ্ঞান অতিশয় নীরস, শমদমাদির সাধন অতিশয় কঠোর; এ সকলেতে আমার মন যাইতেছে না—যাহাতে আমি আধ্যাত্মিক প্রেমানন্দ হাত বাড়াইয়া পাইতে পারি, সেই বিষয়ে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন" এটাও উহা অপেক্ষা বেশী বই কম দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সাধনের পাঁচটি সোপান-পংক্তি উত্তরোত্তর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ:—প্রথম পঁইটা শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় পঁইটা বীর্য্য, তৃতীয় পঁইটা স্মৃতি, চতুর্থ পঁইটা সমাধি, পঞ্চম পঁইটা প্রজ্ঞা। গীতার প্রথম উপক্রমেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রতি শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম পঁইটা, যদিচ সে কথাটি হোমিওপাথিক ঘটিকার ন্যায় বিন্দু-পরিমাণ; সে কথা এই যে, আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্বিকার। সংক্ষেপে—আত্মার ধ্রুব অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সাধনের প্রথম পঁইটা। এ বিশ্বাস লোকের মুখে শোনা কথায় বিশ্বাস নহে—পরন্তু আপনার অন্তরতম প্রদেশের জানা কথায় বিশ্বাস। পরিব্রাজক যেমন এটা নিশ্চয় জানে যে, সে যখন গন্তব্য পথে চলিতেছে তখন আকাশস্থিত চন্দ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে না, সাধক তেমনি এটা নিশ্চয় জানিতেছেন যে, তাঁহার শরীর মন এবং বাহিরের বস্তু সকল যখন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীরূপী আত্মা উহাদের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন না—আত্মা স্থির রহিয়াছেন। এ কথা অন্যের মুখে শোনা কথা নহে—পরন্তু সাধকের আপনার অন্তরের জানা কথা। এইরূপ আপনার অন্তরের জানা কথার উপরে ভরপুর বিশ্বাস স্থাপন করাই সাধনের প্রথম পঁইটা। দ্বিতীয় পঁইটা বীর্য্য, অর্থাৎ জ্ঞানের কথাকে কার্য্যে ফলাইয়া তুলিতে হইলে যেরূপ বীরত্বের প্রয়োজন হয় সেইরূপ বীরত্ব। ভাব এই যে, শমদমাদির সাধনে এবং অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অপ্রতিহত উদ্যম এবং উৎসাহই সাধনের দ্বিতীয় পঁইটা। তৃতীয় পঁইটা স্মৃতি; ভাব এই যে, শমদমাদি এবং নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন যখন অভ্যাস-গতিকে সাধকের স্মরণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায় তখন আত্মাতে এক প্রকার অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রসন্নতার সঞ্চার হয়; এইরূপ আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রসাদই সাধনের তৃতীয় পঁইটা। সাধনের চতুর্থ পঁইটা সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা। ভাব এই যে, সাধকের মনে যখন আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রসাদ পরিস্ফুট হয়, তখন সাধকের মন লক্ষ্য-বিষয়ে অবিচলিত ভাবে নিবিষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষ্যবিষয়ে মনের স্থৈর্য্যই সাধনের চতুর্থ পঁইটা। পঞ্চম পঁইটা প্রজ্ঞা, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান। ভাব এই যে, আতস পাথরের অর্থাৎ magnifying glassএর মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মিকে কোনো দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরবাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে—তেমনি, আত্মশক্তি সহকারে মন লক্ষ্য বস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্য বস্তুতে জ্ঞানাগ্নি প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য বস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে। এইরূপ অবস্থায় সাধকের পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান সকল বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বজগৎ দর্শন করে, ইহারই নাম যোগ; ইহাই সাধনের পঞ্চম পঁইটা;—সাধক যখন এই পঞ্চম পঁইটাতে উত্তীর্ণ হ'ন তখন তাঁহার মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। গীতা-শাস্ত্রে দুইরূপ আনন্দের উল্লেখ আছে;—প্রথম, মাঝপথের আনন্দ বা সাধনের আনন্দ; দ্বিতীয়, গম্যস্থানের আনন্দ বা সিদ্ধিলাভের আনন্দ। মাঝপথের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপ:—

"রাগ দ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্ন চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥"

সাধক রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনাকে আপনার বশে রাখিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আত্মপ্রসাদে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্য বস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। ভাব এই যে, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে আত্মার সহজ আনন্দ আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়, আর সেই সহজ আনন্দের গুণে সাধক যাহাতে মন বসাইতে ইচ্ছা করেন তাহাতেই তাঁহার মন ভরপুর নিবিষ্ট হয়। এই গেল সাধকের মাঝপথের আনন্দ। গম্যস্থানের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপ :—

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

সেখানে অর্থাৎ যোগের অবস্থায় সাধক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিতে পা'ন; আর সেখানে স্থিত হইলে সাধক তত্ত্ব হইতে বিচলিত হ'ন না। সেখানে সাধক যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা অপর কোনো লাভকেই তিনি অধিক মনে করেন না; আর, সেখানে স্থিত হইয়া গুরু বিপদেও বিচলিত হ'ন না। আনন্দ সম্বন্ধে মাঝে এ যাহা আমি কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, ইহা পঞ্চম পঁইটার কথা। গোড়ায় আমি যাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি তাহা সবে মাত্র প্রথম পঁইটার কথা। গীতার দ্বিতীয় পঁইটায় কঠোর কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের বিধেয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে। যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত। আগামী বারে কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের পদ্মানদী পার হইবার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্ধের দৃষ্টিলাভ।

অন্ধ হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলে কিরূপ হয় তাহার একটি আশ্চর্য্য বিবরণ ডাক্তার এডওয়ার্ড আয়ার্স্ আলোচনা করিয়াছেন।

"কার্ম্মার্ জন্" নামে এক ব্যক্তির চোখে ছানি পড়ার দরুণ সে জন্মান্ধ ছিল; যখন তাহার চল্লিশ বৎসর বয়স তখন ডাক্তারেরা এই ছানি কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে সে তাহার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি আশ্চর্য্য প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহাভিমুখী পায়রার মত সে পথ খুঁজিয়া বাড়ি আসিতে পারিত; কাহাকেও ধরিতে হইলে কেবল ঘ্রাণ লইয়া সে ব্যক্তি কোন্ পথে গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার অনুধাবন করিত; খুব দক্ষতার সহিত ঘোড়ার ব্যবসায় চালাইত এবং কোন্ জিনিসের কি রঙ তাহা সহজেই বলিয়া দিত।

দৃষ্টি লাভ করিলে প্রথমে তাহাকে একটা গোলা এবং চৌকা বাক্স দেখানো হইল। তাহাদের আকার কি তাহা সে স্পর্শ না করিয়া বলিতে পারিল না। তবু তৃতীয়বার যখন তাহাকে দেখানো হইল তখন সে স্পর্শ না করিয়াই বুঝিতে পারিল। একবার ভাল করিয়া দেখিয়া চোখ্ বন্ধ করিল এবং কিছুক্ষণ পর বলিল বাক্সটা চৌকা এবং গোলাটা গোল। চোখে দেখিয়া তাহার পর স্পর্শ করিয়া, দৃষ্টি এবং স্পর্শের বোধ একত্র করিয়া, তবেই জিনিষ পত্রের কোন্‌টার কি আকার তাহা সে বুঝিতে পারিল। পর দিন তাহাকে পরিমাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইল। এক ফুট কতটা লম্বা তাহা সে তাহার ছড়িকে দুই হাতে ভাগ করিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু যখন একটা বারো ইঞ্চি লম্বা এবং চার ইঞ্চি মোটা লাঠি দূরে ধরিয়া তাহার পরিমাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তখন সে বলিল তাহা চার ইঞ্চি লম্বা এবং তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা। লাঠিটা যখন আবার কাছে আনিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইল তখন সে ভুল সংশোধন করিয়া লইল। প্রথমে সে এইরূপে দূর হইতে মানুষ এবং জন্তুর আকার লইয়া মহা গোলে পড়িত কিন্তু অল্প দিনেই তাহার এ ভুল কাটিয়া গেল। তাহার পর সংখ্যা লইয়া গোল বাধিল। চার পাঁচ বার চেষ্টা করিয়া তবে তাহাকে এক দুই হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গণিতে শিখানো হইল। পাঁচের পর আর পারিল না। বর্ণবোধ শক্তি পরীক্ষা করিবার সময় ডাক্তারেরা যে সকল বিচিত্র রঙের রেসমের সুতার গুচ্ছ ব্যবহার করেন তাহা "কার্ম্মার জন্‌কে" দেখানো হইলে অনেক ভাবিয়া সে লাল, হল্‌দে, সবুজ এবং নীল রং কয়টা ঠিক্ করিয়া বলিয়া দিতে পারিল। রং দেখিয়াই, শিক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই, যখন সে কোন্‌টা কি রং তাহা বলিতে পারিল তখন নিশ্চয়ই যখন অন্ধ ছিল তখন বর্ণের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল। কেমন করিয়া অন্ধ অবস্থায় তাহার বর্ণজ্ঞান জন্মিল সে সম্বন্ধে ডাক্তার আয়ার্স্ নানা রকম কাল্পনিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু কিছু প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বক্তব্য এই যে আলোকের স্পন্দন তরঙ্গ চোখের ভিতর

দিয়া না গিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াও মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিতে পারে।

জন্তরা কেহ কেহ একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়কে অন্যগুলি অপেক্ষা বেশী কাজে লাগায় এবং কেহ কেহ এক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ সম্পন্ন করাইয়া লয়, যেমন শব্দ এবং আলোক অনেক জন্তু স্পর্শ করিয়া বোধ করে। খরগোসের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা গেছে তাহার শতভাগের দশভাগ অংশ কেবল ঘ্রাণবোধের কাজ করে; মানুষের যে পরিমাণে আছে ইহা তাহার প্রায় শতগুণ। শামুকের নরম শুঁড়ে এতগুলি চোখ আছে যে একটা গভীর গর্ত্তের ভিতরে না প্রবেশ করিয়াও তাহার ভিতর কি আছে তাহা সে দেখিতে পায়। এখানে স্পর্শের বদলে দৃষ্টি কাজ করিতেছে। কীটের শরীরে একপ্রকার দাগ আছে, তাহাদ্বারা সে আলোকের উত্তাপ অনুভব করিতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে একই প্রকার বোধের জন্য নানা জন্তুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কাজ করে। কিন্তু তবু কেমন করিয়া জন্ স্পর্শ করিয়া কোন্‌টা কোন্ বর্ণ তাহা বলিয়া দিত এই সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন। একটি ইন্দ্রিয়ের উপর কম্পন আসিয়া আঘাত করিয়া আর একটি ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে কি না! বর্ণের কম্পন স্পর্শের স্নায়ুর ভিতর দিয়া দৃষ্টির ক্ষেত্রে আসিতে পারে কি না? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, না, পারে না; তবে বর্ণের মধ্যে আলোকতরঙ্গ ব্যতীত স্পর্শবোধ্য আর কিছু পদার্থ যদি থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোনো বস্তুতে উত্তাপ, আলোক, বৈদ্যুত, চৌম্বক, এবং রন্টগেন্ রশ্মি প্রয়োগ করিলে তাহার ফলে ঐ বস্তুতে যে কম্পনতরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহাদের মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে। এই ছোট বড় স্পন্দন আসিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি কোন্‌টা কি। বেগুণী রঙের অপেক্ষা লাল রঙের উত্তাপ প্রায় দ্বিগুণ। মানুষেরা কি এই উত্তাপের তারতম্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে? না, কিন্তু একটা মোম বাতিতে যতটুকু উত্তাপ আছে ততটুকু উত্তাপের বস্তু দেড় মাইল দূরে থাকিলেও ল্যাংলীর বোলোমীটর যন্ত্রের ধাতব ইন্দ্রিয়ে তাহার স্পন্দন ধরা দেয়। জন্ যখন প্রথম আপেল দেখিয়াই বলিল তাহার রঙ সবুজে লালে মিশ্রিত তখন হয়ত সে আপেলটার সমস্তটা এক রঙের নয় দেখিয়া কতকটা আন্দাজ ঐ দুইটি রঙের নাম উল্লেখ করিয়াছিল। কিম্বা সে যখন অন্ধ ছিল তখন আমরা চোখে দেখিয়া যাহা বোধ করি তাহা সে স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিত; এই জন্যই সে এখন স্পর্শ করিবামাত্রই ঠিক্ বলিয়া দিল আপেলের রঙ কি। এখনো খবরটা মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিল ঠিক্, কিন্তু ভিন্ন দ্বার দিয়া।

ঘরের বাতাস যখন ঠাণ্ডা তখন ঘরের আস্‌বাবপত্র অপেক্ষাকৃত গরম এবং বাতাস যখন গরম তখন সেগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধ অবস্থায় জন্ যখন ঘরের আসবাব এড়াইয়া চলিত তখন সে নিশ্চয় তাহার অসামান্য স্পর্শবোধের দ্বারা এই তাপের তারতম্য অনুভব করিয়া বাধা বাঁচাইয়া চলিতে পারিত।

অন্ধ অবস্থায় জন্-এর বাড়ি চিনিয়া যাইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ঘন বন, অন্ধকার রাত্রি, পেঁচার ডাক এবং বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই; বাড়ি এত দূরে, যে কোনোরকম পরিচিত গন্ধের কণামাত্রও নাকে প্রবেশ করিতে পারে না; রাস্তাও আকাবাঁকা। এই অবস্থায় যখন তাহার ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি নির্ব্বাসিত কয়েদীর মত দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন কোন্ অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া তাহার সহায়তা করে? কেমন করিয়া সে এরূপ অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়া আসে? কেমন করিয়া যে তাহা "কার্ম্মার জনও" বলিতে পারিত না। যখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল তখন তাহার এই সকল তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তি চলিয়া গেল বটে কিন্তু সে ঘোড়ার ব্যবসায় যেমন চালাইতেছিল তেমনি চালাইতে লাগিল।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমবায়-কৃষিসমিতি।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা যে ক্রমশঃই হীন হইয়া পড়িতেছে এই বাণিজ্যমদমত্ত ঔপনিবেশিক জাতি এতকাল পরে তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাণিজ্য ও সহরের নানা প্রকার উত্তেজনা গ্রাম হইতে শ্রমজীবিদিগকে সহরে টানিয়া আনে এবং ইহার ফলে একদিকে যেমন কৃষির উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায় অপর দিকে শ্রমজীবিরও জীবনযাত্রা সহরের চাঞ্চল্যে ও সেখানকার কর্ম্মক্ষেত্রের তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্পেষণে দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে। যে সকল শ্রমজীবিগণকে কৃষিকর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদের ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার; এই অবস্থা হইতে কোনো প্রকারে তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প। শ্রমজীবিকে কৃষক হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু কৃষককে সমস্ত পরিবারসহ শ্রমজীবির কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে এমন ঘটনা

প্রতিদিনই ঘটিতেছে। ছোট ছোট জোতের জমি ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার ফলে কৃষকের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। এই জাতীয় সমস্যার মীমাংসার একটা পথ আবিষ্কার করিবার জন্য "Small holdings and Allotments Act" আইন পাশ হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সফলতা লাভ করিতে পারিল না।

যে জাতির ভিতরে মঙ্গলানুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা বাণী জাগিয়া উঠে, সে জাতি সমস্ত বাধাকে সমস্ত বিফলতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোনো না কোনো উপায়ে কল্যাণের পথ প্রস্তুত করিয়া লয়ই। যখন রাজবিধি সফল হইল না, তখন চিপয়ফীল্ড্ নামক একটী গ্রামের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সম্মিলিত চেষ্টায় এই সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে 'সমবায় কৃষি সমিতি' স্থাপন করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সমিতিটী 'কৃষি-ব্যবস্থা সমিতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইল। সমিতির নিয়ম হইল এই যে জোতদারগণকে তিন বৎসরের খাজনার অনুপাতে অংশ কিনিতে হইবে অর্থাৎ একটী অংশ লইলে অংশীদার বাৎসরিক ছয় শিলিং আট পেন্স হারের খাজনানুযায়ী জমি দখল করিতে পারিবে। যদি বাৎসরিক খাজনা এক পাউণ্ড হয় তবে তাহাকে তিনটী অংশ ক্রয় করিতে হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী, কার্য্যপ্রণালী, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া শ্রমজীবিদিগকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকজন আহ্বান করিয়া এক সভা আহূত হইল। সমবায়কৃষিসমিতির ব্যবস্থা শুনিয়া প্রথমতঃ গ্রামবাসীরা পিছুপাও হইয়া পড়িল কেননা তাহারা যে কোনোদিন জমি পাইবে তাহার কোনো সম্ভাবনাও তাহাদের কাছে প্রত্যয়যোগ্য মনে হইল না। জমি হইতে কর্ম্মিষ্ঠ কৃষক যে লাভ করিবে, অসমর্থ চাষীর সঙ্গে তাহা তাহাকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, "অংশ" কথাটির এই অর্থ আশঙ্কা করিয়া তাহারা যেন আরো একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিছু কাল পরে ১৫ জন শ্রমজীবি অংশ গ্রহণ করিল এবং ১৯১০ সালের প্রথমে সমিতির কর্তৃপক্ষেরা ৪৫ বিঘা জমি সংগ্রহ করিতে পারিলেন। অনতিবিলম্বে অংশীদারের সংখ্যা ৩৬ জন হইল। তাহারা একত্রিত হইয়া জমি ভাগ করিয়া লইল এবং তৎপরিমাণে খাজনা ধার্য্য করা হইল।

সমিতির চেষ্টার ফলে ৪৫ বিঘা জমি আজ এক বৎসরের মধ্যেই নূতন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শুধু কৃষির উন্নতি নয় যাহাদিগকে জমিটুকু আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিতেছে তাহাদেরও জীবন শিক্ষা স্বাস্থ্যে সফলতায় গড়িয়া উঠিতেছে।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমবায়কৃষিসমিতি কি স্থাপন করা যাইতে পারে না?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যর্থতা।

শুধু এই সব, এই সব?
আপনার কানে শুনিব কি বসে
আপনারি কলরব?
শুধু ভুলে থাকি আপনার সুখে,
আপন বেদনা বহি সদা বুকে;
শূন্য বাক্য কহি' নিজ মুখে
পূর্ণতা অনুভব।
এই সব, এই সব?

শুধু এই খেলা খেলে সবে?
আপনার পিছে ছুটি' কিগো কভু
আপনারে কেউ পাবে?
সকলের মাঝে প্রবেশের দ্বার
বন্ধ করিয়া ভাবে বার বার
এই ত পূর্ণ হয়েছে আগার
সবি আছে, কিবা চাবে!
এই খেলা খেলে সবে?

শুধু কেবলি এ জটিলতা,
পথে পথে ঘোর বাধা আছে পায়
বলে মোরে যাবে কোথা?'
যে মালা কণ্ঠে পরাইতে চায়
চোরা কাঁটা তার বেঁধে মোর গায়।
কারে চাহি মন দু'হাত বাড়ায়,
কি লাগি চঞ্চলতা!
কেবলি এ জটিলতা।

শুধু এই সব, এই সব?
সকল ডুবায়ে শুনিব বিশ্বে
আপন কণ্ঠরব?
আপনার সুখ, আপনার দুখ
সব হতে মোরে করিবে বিমুখ?

হবে না চিত্তে কভু জাগরুক
বিপুল সে অনুভব?
এই সব, এই সব?

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নানা কথা।

জাতির স্বাতন্ত্র্য। বিদেশীর আমদানীকে দেশের লোকে একটা উৎপাত মনে করে। এই জন্য আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে পরদেশীকে দূরে রাখিবার জন্য একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই উপলক্ষে ফ্রান্স-দেশের মনীষী জিয়ঁ ফিনো কণ্টেম্পোরারি রিভিয়ুপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন নবাগত বিজাতীয়ের সহিত দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাবের মিল হইবে কেন এই একটা ভাবনা, কিন্তু যাঁহারা কোন মহাজাতির মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন মানব মন আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকের সম্মিলিত সমাজের মনের কাছে পরাভব মানে। একই রকম সুবিধা অসুবিধা ও একই রকম মানস-প্রকৃতির মধ্যে গিয়া পড়িয়া দেখিতে দেখিতে নবাগতেরা পুরাতন দেশবাসীদের মত হইয়া যায়। আমেরিকায় যে সকল ইহুদি জার্ম্মান প্রভৃতি বিদেশী যায় তাহারা এক পুরুষের মধ্যেই সম্পূর্ণ আমেরিকান হইয়া পড়ে।

আচ্ছা বেশ, ব্যক্তিবিশেষের মানসিক প্রকৃতি জাতিবিশেষের মানসিক প্রকৃতির কাছে আপন বিশেষত্ব যেন বিসর্জ্জন করিল কিন্তু শারীরিক প্রভেদ ত এত সহজে দূর হয় না। ইহার উত্তরে লেখক বলেন, বিচিত্র জলবায়ু ও বিচিত্র পরিবেষ্টনের মধ্যে যাহারা গিয়া পড়িয়াছে এমন সমস্ত লোকের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে আমি আমার একটি গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। তাহাতে দেখাইয়াছিলাম যে, দেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত শারীরিক বিশেষত্বও লোপ পায়। কিন্তু কয়েক পুরুষ না গেলেও যে মস্তকের গঠনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তখন এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই। কারণ, তখন সাধারণত এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মাথার আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে ঘটে অথবা একেবারে ঘটেই না। অতএব মাথার আকৃতির বিশেষত্বই এক জাতি হইতে অন্য জাতির প্রধান স্থায়ী ভেদচিহ্ন, বৈজ্ঞানিক মহলে এই সংস্কারই দৃঢ় ছিল।

মাথার আকৃতি ও আয়তনের দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ করা যাইতে পারে তখন এই বিশ্বাসটিও প্রবল ছিল। জর্ম্মানদের মাথা যত লম্বা তত চওড়া নহে এই কারণে তখনকার এক দল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন লম্বা মাথাই আদর্শ মাথা—এবং জর্ম্মান জাতিই বুদ্ধির উৎকর্ষে মানুষের শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু যখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক দেশের অসভ্য জাতিরও মাথার গঠন জার্ম্মানদের ন্যায় লম্বা এবং ইহাও লক্ষ্য করা হইল যে যতই দিন যাইতেছে ততই য়ুরোপে লম্বা মাথা বিরল হইয়া গোল মাথারই প্রাদুর্ভাব হইতেছে তখন এইমত পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত আমেরিকান মানবতত্ত্ববিদ্ মাথার আকৃতি সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে আমেরিকায় যে বিদেশীরা যায় তাহাদের প্রায়ই এক পুরুষের মধ্যে মাথার পরিবর্ত্তন ঘটে; তা যদি কোনো ক্ষেত্রে নাও হয় তবু দুই পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবেই। বিদেশ হইতে নব আগন্তুকদের শারীরিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য আমেরিকায় একটি কমিশন স্থাপন করা হইয়াছে। নানা জাতির বহুতর মানুষকে লইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পরে সেই কমিশন হইতে যে সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে এমন সকল তথ্য পাওয়া যায় যাহা আলোচনা করিলে অনেক ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া যে নানা আকারের মাথা অল্প কালের মধ্যেই আমেরিকান মাথার ন্যায় হইয়া যাইতেছে তাহা পড়িলে বড়ই আশ্চর্য্য লাগে। ভিন্ন জাতির সহিত পরস্পর বিবাহাদি করিয়াই যে বিদেশীদের এই সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে; যেখানে বিবাহ হয় নাই সেখানে শুদ্ধমাত্র স্থানীয় প্রভাবেও এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছে। তবেই প্রমাণ হইতেছে জাতির স্বাতন্ত্র্য লইয়া আমাদের যে জাত্যভিমান আছে তাহা অমূলক। দেশ আছে বটে কিন্তু জাতি নাই। এক এক দেশ এক এক রকম মানুষ গড়িয়া তোলে। জাতির কোনই স্বাধীন অস্তিত্ব নাই।

রণক্ষেত্রের কুকুর। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পাই যে এমন এক দিন ছিল যখন শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য হিংস্র কুকুরের দলকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করা হইত। ফ্রান্সের পঞ্চম চার্লসের এইরূপ চার হাজার সাহসী যোদ্ধা কুকুর ছিল। জার্ম্মানির অসভ্য জাতি এই সকল হিংস্র জন্তুর দ্বারা রোমানদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। প্লিনি বলেন খৃষ্ট জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও কুকুর লইয়া যুদ্ধ করা হইত।

এখন কুকুরদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজের জন্য তৈরী করা হইতেছে। তাহারা এখন যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালের কাজে শিক্ষালাভ করিতেছে। রণভূমির হাঁসপাতাল বিভাগের চিহ্ন রক্তবর্ণ ক্রস্। এই কুকুরগুলিকে রক্ত-ক্রস্ কুকুর বলা হয়। ডাক্তার :ডেরিয়াঁ ফরাসী সৈন্য বিভাগের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি বলেন :—

এই রক্তক্রস কুকুররা লালক্রস-চিহ্নধারী হাঁস-পাতালের ডাক্তার ভিন্ন আর কাহাকেও মানে না। এমন কি যদি হাঁসপাতালের পরিচ্ছদ-পরা কোন কর্ম্ম-চারীরও আস্তিনের উপর এই চিহ্ন না থাকে তবে কিছুতেই সে তাহার কথা শোনে না। কোন অপ-রিচিত ব্যক্তিও যদি ডাক্তারের পরিচ্ছদ পরিয়া লাল ক্রশের ফিতাটি হাতে বাঁধিয়া আসে তবে সেই কুকুররা তৎক্ষণাৎ তাহার বাধ্য হইবে।

ইহাদের দুই রকম প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। একদলকে এমন করিয়া শেখানো হয় যাহাতে আহত সৈন্য দেখিলে কোন মতে না ডাকে, পাছে চীৎকারে আহত ব্যক্তি ভয় পায় বা সেই দিকে শত্রুর দৃষ্টি পড়ে। এই দলের কুকুর চেষ্টা করে কোন মতে যাহাতে সৈনিকের টুপিটা তাহার মাথা হইতে টানিয়া লইতে পারে। সেই টুপি মুখে লইয়া সে শিবিরে দৌড়াইয়া আসে। তখন হাঁসপাতালের লোকেরা বুঝিতে পারে যে সে এক জন বিপন্ন সৈনিককে খুঁজিয়া পাইয়াছে। আর এক দল কুকুরকে, আহত সৈন্য দেখিলে এক প্রকার বিশেষ রূপ শব্দ করিয়া সঙ্কেত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার কালে এক জন কেহ আহত সৈনিক রূপে তাঁবু হইতে দূরে কোন এক জায়-গায় লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য একটি কুকুরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে কান খাড়া করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া ঘ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করে তারপর হঠাৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমটা একবার এধারে এক-বার ওধারে যায়, তাহার নাসারন্ধ্র কাঁপিতে :থাকে ও চক্ষুতারা বিস্ফারিত হয়। মুহূর্ত্তের জন্য এইরূপ ইতস্তত করিয়া সে ছুট্ দেয় এবং কিছু পরেই দেখা যায় লাল টুপি মুখে লইয়া সে আসিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারকে বাছিয়া লইয়া তাঁহার পায়ের কাছে সে টুপি রাখিয়া দেয়। ডাক্তার একটি দড়ি বা বেত ধরিয়া থাকেন ও সেইটির অন্য প্রান্ত মুখে লইয়া কুকুর তাঁহাকে আহত ব্যক্তির নিকট লইয়া যায়।

এই কুকুররা মৃত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ করে না। জীবিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করাই ইহাদের কাজ। ইহাদের পিঠে অনেক সময় পানীয়ের পাত্র চামড়া দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে সে ঐ পানীয় লইবার জন্য কুকুরকে ভুলাইবার যতই চেষ্টা করুক কুকুর কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চায় না। যে ব্যক্তি চলৎশক্তিরহিত ভাবে পড়িয়া না থাকে রক্তক্রস্ কুকুররা তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করে না।

পাঞ্জাবের বিবাহ প্রথা। পাঞ্জাবের অধি-কাংশ ব্রাহ্মণ অধিবাসীই সারস্বত শ্রেণীভুক্ত। এই সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নানা শাখা আছে। সেই সকল ভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রচলিত নাই। বাহ্রি নামক ব্রাহ্মণদিগের কেবল ছয়টি মাত্র পরিবারের সহিত চল আছে। বুঞ্জাহি নামক ব্রাহ্মণ-গণের কেবল বাহান্নটি পরিবারের সহিত ক্রিয়াকর্ম্মের যোগ। আঠবান নামক সারস্বত শাখার ব্রাহ্মণদিগের আটটি উপশাখার নাম উদ্ধৃত হইল :—যোশি, কুরল, মদল, পাটক, ভারদ্বাজি, সোরি, তেওয়ারি। ইহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে কিন্তু এই আট প্রকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের চল নাই। আটটি উপশাখা আছে বলিয়া এই ব্রাহ্মণ-দিগকে আঠবান বলা হইয়াছে। আঠবানরা এত অল্প সংখ্যক যে ইহাদের স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে।

পাঞ্জাবে এইরূপে বিবাহ হয় :—

কন্যার পিতা নাপিতের হাত দিয়া সাতটি খেজুর এবং একটি টাকা পাত্রের বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। নাপিতটি বরের বাড়ী পৌঁছিলে পর বরের বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া দ্বারের দুই পাশে তৈল ছিটাইয়া দিয়া নাপি-তকে ভিতরে লইয়া আসে; কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইয়া গেলে গ্রামের পঞ্চায়েৎ ও অন্যান্য লোকেরা একত্র হইয়া বাড়ীর পুরোহিতকে দিয়া ভূমিতলে চতুষ্কোণ আকারে ময়দা ছড়াইয়া তাহার মধ্যে যত গ্রহের নাম লেখে। পুরোহিত যথারীতি বরকে দিয়া গ্রহগুলির পূজা করাইলে পর নাপিত বরের কোলে সেই সাতটি খেজুর ও টাকা রাখে ও বরের কপালে টীকা পরাইয়া দেয়। তখন বরের পিতা সাধ্য অনুসারে নাপিতকে ও পুরোহিতকে টাকাকড়ি দেন ও গ্রামের লোককে মিষ্টান্ন খাওয়ান। পাঞ্জাবীরা এই অনুষ্ঠানকে সগন বলে। বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিলে কন্যা-পক্ষের নাপিতকে দিয়া বরপক্ষের নিকট একটি পত্র পাঠান হয়। সেই পত্রটির নাম সাহ। পঞ্চায়েৎ ও

গ্রামের লোকে একত্র হইয়া এই পত্রটি বরের কোলে অর্পণ করে। এই পত্রে বরের সহিত কত বরযাত্র ও গাড়ী ঘোড়া যাইবে ও কবে বিবাহ হইবে তাহা স্থির করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের সাত দিন থাকিতে বরের ও কনের পিতামাতাগণ মাই নামক এক প্রকার বাটনা বর কন্যার গায়ে মাখাইয়া দেয়। এই বাটনাটি বেসন, তৈল ও মাথাঘষার সংমিশ্রণ। এই নিয়মটি আমাদের গায়েহলুদের মত। বর যখন কন্যার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হয় তখন কন্যাকর্ত্তারা তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইয়া মাথায় টোপর ও কপালে সোনালী জরির ঝালর পরাইয়া দেয়। তাহার পর পণ্ডৎগণ (পণ্ডিতরা) বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া দিলে হোমাগ্নি জ্বালাইয়া আহুতি হয়, ও গ্রন্থিবদ্ধ বর কনেকে চারিবার সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পর দিন বরযাত্রীরা কন্যাকর্ত্তার আতিথ্য গ্রহণ করেন, খুব ভোজ ও গান বাজনা হয়। ইহাকে মিঠাভাত বলে এবং তাহার পরের দিনের উৎসবকে খট্টাভাত বলে। অতঃপর কন্যাকর্ত্তারা সাধ্যানুসারে বরযাত্রদিগকে বস্ত্রালঙ্কার ও টাকা কড়ি দিয়া চতুর্থ দিনে বিদায় করে। বিবাহের দু তিন বৎসর পরে বধূকে আনিবার জন্য বর শ্বশুরালয়ে যায়। ইহার নাম মুকলাওয়া, আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে দ্বিরাগমন। মুকলাওয়ার সময় আবার পুরোহিতকে ডাকাইয়া ময়দার চক্ তৈরি করান হয় ও কন্যাবিদায়ের সময় কন্যাকে যথাসাধ্য অলঙ্কারাদি দেওয়া হয়। বিবাহের সময় বরযাত্রদিগকে ও মুকলাওয়ার সময় কন্যাকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয় তাহার নাম থৎ। কন্যা-পক্ষ হইতে পাত্রের বাড়ী বিবাহপ্রস্তাব পাঠাইবার সময় চারিটি প্রশ্ন করা হয়—"পাত্রটি কোন্ গোত্রের? পাত্রের পিতা মাতার আত্মীয়েরা কোন্ গোত্রের? পাত্রের মাতা কোন গোত্রের? এবং তাহার মাতামহীর কোন্ গোত্র?" এই চারিটি গোত্রের কোনটি যদি কন্যার গোত্রের সহিত এক হয় তবে বিবাহ হয় না।

শ্রীঅতসী দেবী।

চরিতার্থ।

এতদিন, প্রিয়তম, হৃদয় আমার
চঞ্চল মধুপসম শুধু বারবার
এসেছে গিয়েছে ফিরে, মরেছে ঘুরিয়া।
সহসা পেয়েছে খুঁজে ব্যাকুল সে হিয়া
একটি গোপন ঠাঁই মর্ম্মের নিভৃতে।
ঘুচিল ব্যর্থতা তার; আজি এক চিতে
পুঞ্জীভূত মকরন্দে আনন্দে নীরবে
রচি মধুচক্রখানি চরিতার্থ হবে।
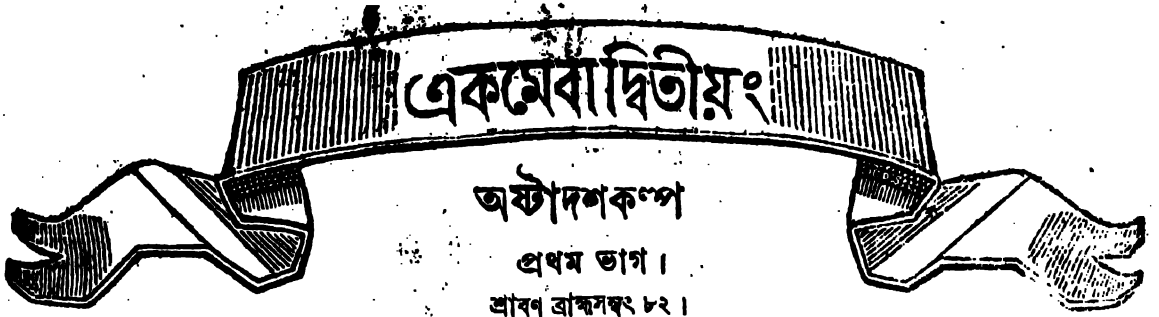
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বেদান্তবাদ।

দ্বিতীয় প্রপাঠক।

পরিচয়।

প্রথম প্রপাঠকে প্রাচীন তিন খানি ব্রহ্মসূত্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের কথা তুলিয়াছিলাম। আজ তাহা হইতেই আরম্ভ করা যাউক। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেরূপ ভাষ্য এ পর্য্যন্ত আর বিরচিত হয় নাই। তাঁহার ভাষ্যের প্রসন্ন-গম্ভীর ভাব অতিরমণীয়। তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনের কৌশল ও রচনারীতি অতিপ্রশংসনীয়। এরূপ ভাব অন্য কোনো ভাষ্যেই দেখা যায় না। শাঙ্কর ভাষ্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল, রামানুজের ভাষ্য সেরূপ নহে। রচনারীতির সম্বন্ধে সমস্ত ভাষ্যের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যের স্থান যে প্রথম, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে পতঞ্জলির ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের রচনা শাঙ্কর ভাষ্যের রচনা অপেক্ষাও ভাল বলিয়া বোধ হয়।

শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-সমূহে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আর যত ভাষ্যই হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সর্ব্ববিষয়ে শাঙ্কর ভাষ্যের প্রভাবেই পরিপুষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদিও ঐ সকল ভাষ্য শঙ্করের মতকে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া শঙ্করের ভাষ্যকেও বেদান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়, এবং উপনিষদের তুল্যই তাহা সম্মানিত হইয়া থাকে। শিষ্টাচারানুযায়ী বেদান্তাচার্য্যগণ শিষ্যবৃন্দকে যেরূপ পবিত্র ভাবে উপনিষৎ অধ্যাপন করিয়া থাকেন, শাঙ্কর ভাষ্যকেও সেইরূপে অধ্যাপন করেন। বেদান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় অন্যান্য গ্রন্থকেও বেদান্ত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকে শা রী র ক মী মাং সা বলিয়াছেন। রামানুজের ভাষ্য শ্রী ভা ষ্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেও তাহা শা রী র ক মী মাং সা নামে কথিত হইয়া থাকে। শা রী র ক নামটি শঙ্করাচার্য্যের নিজের উদ্ভাবিত নহে। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন বৃত্তিকার উ প ব র্ষ কে ঐ অর্থেই এই শা রী র ক শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই।

বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি শাঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যাকারগণ তাহার অর্থ এইরূপ করেন:—জীব শরীরে বাস করে বলিয়া তাহার নাম শা রী র ক, তাহার মীমাংসা অর্থাৎ পরমাত্ম-রূপতারূপ বিচার বলিয়া সেই ভাষ্যের নাম শা রী র ক মী মাং সা। কিন্তু রামানুজমতাবলম্বিগণ ইহার অন্য প্রকার অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন—শরীরসম্বন্ধী শা রী র, অর্থাৎ জগদ্রূপ শরীরবিশিষ্ট পরমাত্মা ব্রহ্ম, সেই শা রী র পরমাত্মা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহার নাম শা রী র ক।

শঙ্করাচার্য্যের এই শারীরকমীমাংসাভাষ্যের অনেক-গুলি টীকা আছে। আবার সেই সব টীকারও টীকা-অনু টীকা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদের একটির ধারা এখানে প্রদর্শিত হইতেছে:—প্রথমত ব্রহ্মসূত্র, তাহার পর শাঙ্কর-ভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের টীকা বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী, ভামতীর টীকা বেদান্তকল্পতরু, বেদান্তকল্পতরুর টীকা অপ্পয়-দীক্ষিতকৃত বেদান্তকল্পতরুপরিমল, এবং শুনিয়াছি, ইহার টীকার নাম আভোগ, ও আভোগেরও টীকার নাম ভ্রমর।

আভোগ ও ভ্রমর দেখি নাই, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই আজকাল সুলভ।

শঙ্করাচার্য্য স্বভাষ্যে অ দ্বৈ ত বা দ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য তিনি কেবল ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, কেননা, কেবল ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা করিলে ঐ মত প্রতিষ্ঠিতই হইতে পারে না; ব্রহ্মসূত্রের মূলস্বরূপ উপনিষদ্‌গুলি এবং সর্ব্বোপনিষদের সারভূত ভগবদ্গীতাকেও তন্নিমিত্ত ঐরূপে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এই জন্য তিনি প্রধান প্রধান দশ খানি উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকেও অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের পরে বেদান্তমূলক যে-কোন প্রধান সম্প্রদায় অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়কেই উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিন গ্রন্থকে স্ব স্ব মতে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

এই তিন গ্রন্থকে প্র স্থা ন ত্র য় বলা হয়, এবং পৃথক্ পৃথক্-ভাবে যথাক্রমে শ্রু তি প্র স্থা ন, স্মৃ তি প্র স্থা ন, ও সূ ত্র প্র স্থা ন উক্ত হইয়া থাকে। উপনিষৎসমূহ শ্রুতি বলিয়া তাহার নাম শ্রু তি প্র স্থা ন। ভগবদ্গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, মহাভারতকে স্মৃতি বলিয়া গণ্য করা হয়, শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় ভাষ্যের বহু স্থলে মহাভারতের বাক্য স্মৃতি নামেই উদ্ধৃত করিয়াছেন; অন্যান্য আচার্য্যগণও এইরূপ করিয়াছেন। মহাভারত স্মৃতি বলিয়া তদন্তর্গত ভগবদ্গীতাও স্মৃতি, এবং সেই জন্যই তাহার নাম স্মৃ তি প্র স্থা ন। ব্রহ্মসূত্র সূত্রাত্মক বলিয়া তাহার নাম সূ ত্র প্র স্থা ন। প্রস্থান শব্দের অর্থ প্রয়াণ অর্থাৎ গতি; বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বলিলে এই বুঝিতে হয় যে, বেদান্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র এই তিন গতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনে বেদান্ততত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য অ দ্বৈ ত বা দ স্থাপন করিয়াছেন উক্ত হইয়াছে। এখন এই অ দ্বৈ ত এবং তাহার মূল দ্বৈ ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ কি, একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা আবশ্যক। পণ্ডিতগণ ইহার দুইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ বলেন দ্বিতা (অর্থাৎ দ্বিত্ব) এবং দ্বৈত শব্দ অর্থত একই; দ্বৈ ত শব্দের অর্থ ভেদ, অতএব অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ অভেদ। এই ব্যাখ্যাই সাধারণত প্রসিদ্ধ। অন্য কেহ কেহ বলেন—দ্বী ত শব্দের অর্থ দ্বিধাজ্ঞান, দ্বী ত এবং দ্বৈ ত শব্দ অর্থত একই, অতএব দ্বৈত শব্দেরও অর্থ দ্বিধা জ্ঞান; এবং তাহা হইলেই অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ একবিধ জ্ঞান, অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান। বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই উভয় নির্ব্বচনই ফলত একই কথা প্রকাশ করিতেছে; উভয় নির্ব্বচনেই অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ অভেদ পাওয়া যাইতেছে।

তাহা হইলেই শঙ্করের অ দ্বৈ ত বা দে র অর্থ অভেদবাদ। শঙ্কর বলেন যে, জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ। সমস্ত বেদান্তে তিনি ইহাই স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন এই দৃশ্যমান জগতের পরমার্থত কোন সত্তা নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রম, বা শুক্তিতে রজতভ্রম হইলে যেমন সেই-সেই স্থলে পরমার্থত সর্প বা রজত না থাকিলেও তাহাদের প্রতীতি হয়, এবং সত্য সর্প ও সত্য রজত দর্শন করিলে যেমন ভয় বা প্রীতির উদ্রেক হয়, ভ্রম স্থলেও সেইরূপই থাকে; এবং যখন সেই রজ্জু বা শুক্তিকে চিনিতে পারা যায়, তখন যেমন সর্প বা রজত আর প্রতিভাসিত হয় না, সেখানে কেবল রজ্জু বা শুক্তিই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্মেই অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই আর তাহা প্রতীয়মান হইবে না। এখন যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সমস্তই ভ্রম। এই ভ্রমেরই নাম মায়া, বা অবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলেই এই অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য এই সমস্ত জগৎ নিবৃত্ত হইবে। স্বপ্নদর্শন-স্থলে যেমন এক স্বপ্নদ্রষ্টাই সত্য, আর লোক-জন ইত্যাদি যাহা কিছু দর্শন করা যায়, সমস্তই মিথ্যা, ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। স্বপ্নের পর জাগ্রদ্ অবস্থা আসিলে যেমন স্বপ্নকার্য্য আর কিছুই থাকে না, সমস্ত বিলীন হইয়া যায়, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলেও সেই রূপ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন সত্তা থাকিবে না, তখন ঐ এক দ্রষ্টা আত্মা বা জীবই সত্য থাকিবে, এবং এই জীব ও ব্রহ্ম একই।

শঙ্করাচার্য্যের মতকে অনেক সময় বি ব র্ত্ত বা দ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যেখানে কার্য্য ও কারণ একরূপ, অর্থাৎ কারণ নিজের তত্ত্ব বা স্বরূপ বা লক্ষণ পরিত্যাগ না করিয়াই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে ঐ কার্য্যকে পরিণাম, বা বিকার বলা হয়; যথা, কুণ্ডল সুবর্ণের পরিণাম, বা বিকার। আর যেখানে কারণ একরূপ, এবং কার্য্যও আর একরূপ, অর্থাৎ কারণের তত্ত্ব বা স্বরূপ কার্য্যে অনুগত হয় না, অথচ তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে ঐ কার্য্যের নাম বিবর্ত্ত; যথা, শুক্তিরজত-স্থলে রজত শুক্তির বিবর্ত্ত, রজ্জুসর্প-স্থলে সর্প রজ্জুর বিবর্ত্ত। শঙ্কর বলেন যে, এই দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্মের সেইরূপ বিবর্ত্ত। এবং সেই জন্যই তাঁহার মতকে বি ব র্ত্ত বা দ বলা হয়।

শুক্তিরজত-স্থলে যে রজত দেখা যায়, তাহাকে সৎ পদার্থ বলা যায় না, কেননা, সৎ পদার্থের কখনো ধ্বংস হয় না; কিন্তু শুক্তি-রজত-স্থলে ঐ রজতের ধ্বংস আছে, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিতে পারিলেই আর সেখানে রজত দেখা যায় না। অতএব ঐ রজত সৎ নহে।

আবার তাহা অসৎও নহে; কেননা, অসৎ হইলে তাহার কোনোরূপ প্রতীতিই হইতে পারে না। অসৎ অলীক বস্তুর প্রতীতি কখনো সম্ভাবিত নহে; বন্ধ্যা-পুত্র, শশশৃঙ্গ কূর্ম্মলোম বা আকাশকুসুমবৎ অলীক, এবং সেই জন্যই তাহাদের প্রতীতি নাই। কিন্তু শুক্তি-রজত সেরূপ নহে, শুক্তিরজতের প্রতীতি আছে, তাহাকে আমরা দেখিতে পাই। সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাকে সদসৎও বলিতে পারা যায় না। অতএব বস্তুত শুক্তিরজত কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তাহার নির্ব্বচন করিতে পারা যায় না, অতএব তাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলাই উচিত। শঙ্করের মতে যাহার প্রভাবে এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে, সেই সকল অনর্থ-হেতু অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ উভয়েই পূর্ব্ববর্ণিত শুক্তি-রজতের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়, এবং সেই জন্যই তাঁহার মতের আর একটি নাম অ নি র্ব্ব চ নী য় বাদ বা অ নি র্ব্ব চ নী য় খ্যা তি।

শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে অথবা অ ষ্টম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট খাঁটি জানা যায় নাই; কেহ আবার বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে তাঁহার অভ্যুদয় বলিতে চান। যাহাই হউক, তাঁহার পরে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া বেদান্ত আলোচনা নব ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের নব-নব ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল। বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়া শঙ্করাচার্য্য যেমন এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণও সেইরূপ স্ব-স্ব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এবং এখনো তাহা চলিয়া আসিতেছে। কোনো মত উদ্ভাবন করিয়া সাধারণ জনসমাজকে তাহার অনুসরণ করাইতে হইলে কতদূর যোগ্যতার আবশ্যক, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়। তাহার উপর আবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে ঐ কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর তাহা বলাই বাহুল্য। শঙ্করের পরবর্ত্তী উল্লিখিত ব্যাখ্যাকারগণও সেইরূপ যোগ্যতা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই শঙ্করের ন্যায় তাঁহারাও আ চা র্য্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম, যথা, রামানুজ, আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বানন্দ বা নিম্বার্ক। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। মূলত ইঁহাদের দ্বারাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া বি শি ষ্টা দ্বৈ ত বা দ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইঁহার ভাষ্যও শা রী র ক মী মাং সা ভা ষ্য নামে কথিত হয়; তদ্ভিন্ন তাহার আর একটি নাম শ্রী ভা ষ্য। তাঁহার উদ্ভাবিত মত শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা পরি-গৃহীত বলিয়া ভাষ্যের নাম শ্রী ভা ষ্য হইয়াছে, এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রী স ম্প্র দা য়। ইনি ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ বোধায়ন-কৃত যে বিস্তীর্ণ বৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তন্মতানুসারেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের অক্ষরসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* রামানুজ স্বভাষ্যে শঙ্করের মতকে যতদূর পারিয়াছেন খণ্ডন করিতে ক্রটি করেন নাই; এবং তাঁহার যুক্তিবলও সাধারণ নহে।

তাঁহার বি শি ষ্টা দ্বৈ ত বা দ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপঃ—বি শি ষ্টে র অ দ্বৈ ত বি শি ষ্টা দ্বৈ ত; অথবা বি শি ষ্ট অ দ্বৈ ত বি শি ষ্টা দ্বৈ ত। চিৎ অর্থাৎ চেতন, অচিৎ অর্থাৎ জড়, এবং ব্রহ্ম, এই তিনটি পদার্থ মূলত স্বীকার করিয়া ইঁহারা বলেন যে, ঐ চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম শরীরিস্বরূপ। এই চিদচিন্ময় জগৎপ্রপঞ্চরূপ শরীরের ব্রহ্ম আত্মা, ব্রহ্ম ঐ চিৎ ও অচিৎ এই উভয়-বি শি ষ্ট, এবং সেই চিদচিদ্-বি শি ষ্ট ব্রহ্মের অ দ্বৈ ত অর্থাৎ এ ক ত্ব এই মতে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বি শি ষ্টা দ্বৈ ত বা দ। অথবা তাদৃশ চিদচিদ্ বি শি ষ্ট ব্রহ্ম অ দ্বৈ ত অর্থাৎ এক বলিয়াও এই মতের ঐ নাম হইতে পারে। শরীর ও শরীরীর (জীবাত্মার) ভেদ থাকিলেও যেমন সেই শরীরবিশিষ্ট শরীরীর "এই ব্যক্তি এক" এইরূপে ঐক্য ব্যবহার হইয়া থাকে; সেইরূপ চিৎ ও অচিতের সহিত ব্রহ্মের বস্তুত ভেদ থাকি-লেও, সেই চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক। শঙ্কর-মতে যেমন এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকেই মিথ্যা বলা হয়, রামানুজ মতে সেরূপ নহে; ইহাতে সমস্তকেই সত্য বলিয়া স্বীকার হয়।

রামানুজের ন্যায় আরো এক জন বি শি ষ্টা দ্বৈ ত বা দী আচার্য্য আছেন। ইঁহার নাম শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য। ইনিও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য ভাষ্যকারের নামে শ্রী ক ণ্ঠ ভা ষ্য নামে প্রসিদ্ধ। ইহাকে শৈ ব ভা ষ্য ও বলা হয়, কেননা, এই ভাষ্যে ব্রহ্ম শি ব নামেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। এই ভাষ্যের রচনা বেশ প্রাঞ্জল, যুক্তিও মনোরম। এবং ইহার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো ভাষ্যেরই কোনো কথা উদ্ধৃত হয় নাই, অথবা খণ্ডিত বা সমর্থিত হয় নাই। তবে ভাষ্যকার গ্রন্থপ্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, বিদ্বদ্‌গণের ব্রহ্মসিদ্ধির নেত্রস্বরূপ ব্রহ্ম-সূত্রকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি তাহা নির্ম্মল করিতেছেন। শৈবাগমের এই ভাষ্যই পরম প্রামাণিক ও আশ্রয়স্থল। শ্রীকণ্ঠও রামানুজের ন্যায় চিদচিতের সহিত ব্রহ্মের শরীরশরীরিভাব সম্বন্ধ গ্রহণ

করিয়াছেন। মূল প্রক্রিয়ার সহিত ইঁহাদের উভয়ের পার্থক্য নাই; শ্রীকণ্ঠও শিবরূপ ব্রহ্মকে চিদচিদ্বিশিষ্ট ও অদ্বৈত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য দ্বৈ ত বা দ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহার মতকে ইঁহার নামানুসারে কখনো কখনো আ ন ন্দ তী র্থী য়, বা মা ধ্ব মত বলা হয়। মূল মাধ্বভাষ্য সংক্ষিপ্ত। যুক্তির দৃঢ়তা বা রচনাবন্ধনে ইহা শাঙ্কর বা রামানুজভাষ্যের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়া ইনি যে দর্শন প্রচলিত করিয়াছেন তাহা পূ র্ণ প্র জ্ঞ দ র্শ ন নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অ ভে দ স্বীকার করেন বলিয়া তাহার মতকে যেমন অ দ্বৈ ত বা দ বলা হয়, মধ্বাচার্য্যও সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার বলেন বলিয়া তাঁহার মতকে দ্বৈ ত বা দ বলা হয়। কথিত আছে মধ্বাচার্য্যের মত চতুর্ম্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মার সম্মত; এই জন্য তাঁহার সম্প্রদায়কে চা তু র্ম্ম্থ স-ম্প্র দা য় বলা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতএব মাধ্বসম্প্রদায়ের ন্যায় তিনিও দ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্য-কেই অবলম্বন করিয়া চলিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। শ্রীমদ্ভাগ-বতের তুলনায় তাঁহার নিকটে মাধ্বভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের অর্থসম্বন্ধে যেখানে যেখানে অসামঞ্জস্য বোধ হইত, সেই সকল স্থানকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিতেন; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পৃথক্ কোন ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সেই মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া পরমপণ্ডিত পরমবৈষ্ণব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গো বি ন্দ ভা ষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যা রচনা করেন। মূলত তিনি মধ্বাচার্য্যকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, এবং তাঁহার মতই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই গোবিন্দভাষ্যই উপজীব্য। মাধ্বভাষ্য অপেক্ষা গোবিন্দভাষ্য যুক্তি, তর্ক, রচনা সব বিষয়েই উৎকৃষ্ট বোধ হয়।

নিয়মানন্দ বা নিম্বার্কাচার্য্য দ্বৈ তা দ্বৈ ত, বা অপর কথায় ভে দা ভে দ বা দ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের অভি-নব ব্যাখ্যা রচনা করেন। অভিজ্ঞগণ বলেন যে, নিম্বার্ক ঔডুলোমি-কৃত প্রাচীন ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই নিজ ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যার নাম বে দা ন্ত পা রি জা ত সৌ র ভ। ইহা অতি-সংক্ষিপ্ত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অন্যান্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কথা ঐ দর্শন আলোচনা করিবার সময় বলিব। রামানুজের ন্যায় এই মতেও চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। ইহাঁরা বলেন যে, এই চিদচিন্ময় জগৎপ্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্ম ভি ন্ন এবং অ ভি ন্ন উভয়ই, অপর কথায় জীবজড়ময় জগতের ব্রহ্মে ভে দ ও অ ভে দ উভয়ই রহিয়াছে; এবং এই ভে দ ও অ ভে দ স্বাভাবিক। জড় ও জীব উভয়েই ব্রহ্মের শক্তি। প্রলয়কালে এই জড়জীবময় জগৎ অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে ব্রহ্মেই থাকে, ব্রহ্ম নিজের সেই শক্তিকে তখন সঙ্কুচিত করিয়া লন, এবং সৃষ্টির সময় আবার তাহার প্রসারণ করেন। সর্প ও তাহার কুণ্ডল এই উভয়ের অথবা সূর্য্য ও তাহার প্রকাশের পরস্পর যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক, ব্রহ্ম ও জগতে সেইরূপ। এই জন্যই নিম্বার্কের মতকে স্বা ভা বি ক দ্বৈ তা দ্বৈ ত, বা ভে দা ভে দ বা দ বলা হইয়া থাকে। নিম্বার্ক এই অভিনব মত প্রকাশ করিয়া যে সম্প্রদায় প্রচলিত করেন, তাহা চ তুঃ স ন স ম্প্র দা য় বলিয়া খ্যাত।

নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্করাচার্য্যও দ্বৈ তা দ্বৈ ত বা দী। কিন্তু উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিম্বার্ক উক্ত ভেদাভেদকে স্বা ভা বি ক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাহা ঔ পা ধি ক (attributivo) বলিয়া প্রতিপাদন করেন। ইনিও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা গ্রন্থকারের নামে ভা স্ক র ভা ষ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং যুক্তিতর্কাদির দ্বারা বেশ পরি-পুষ্ট। ভাস্কর-ভাষ্য এখনো সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই, আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পাই-য়াছি। এবং ইহার দ্বারাই তাঁহার মত সংগ্রহ করিতে পারা যায়, কেননা, প্রথম চারিটি সূত্রের মধ্যেই ভাষ্য-কারগণ স্ব-স্ব মতামত প্রধানত প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আচার্য্য বি ষ্ণু স্বা মী শু দ্ধা দ্বৈ ত বা দ প্রচার করেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত স্বীকার করেন, কিন্তু দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চের সমাধানের জন্য তাঁহাকে সেই অদ্বৈতে মায়ার সম্বন্ধ বলিতে হয়। কিন্তু বিষ্ণুস্বামী তাহা বলেন না, তিনি শু দ্ধ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধরহিত অদ্বৈত স্বীকার করেন, এই জন্য তাঁহার মতের নাম শু দ্ধা দ্বৈ ত বা দ। ইনি বলেন, যাহা কিছু জড়-চেতন দেখা যাইতেছে, তাহা এক অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। অদ্বৈত ব্রহ্ম সদ্-রূপে, চিদ্-রূপে ও আনন্দ রূপে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। তবে সর্ব্বত্র সমস্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন না, স্থান বিশেষে তাঁহার কোন কোন অংশ তিরোভূত এবং কোন কোন অংশ আবির্ভূত থাকে। সামান্য জড় তৃণেও তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন, তবে সেখানে তাঁহার কেবল সদ্-রূপ মাত্রআবির্ভূত বা প্রকাশিত আছে, আর

চিদ্‌ ও আনন্দ-রূপ তিরোভূত রহিয়াছে। চেতনে তাঁহার সদ্‌-রূপ ও চিদ্‌রূপ উভয়ই প্রকাশিত রহিয়াছে, আনন্দরূপ তিরোভূত আছে। অন্যত্রও এই আবির্ভাব ও তিরোভাবে সমস্ত বুঝিতে হইবে। এইরূপে এক শুদ্ধ অদ্বৈত স্বীকার করায়, এই মতের নাম শুদ্ধাদ্বৈত। অথবা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধরহিত যে জগদ্‌রূপ কার্য্য ও তাহার কারণ পরমাত্মা ব্রহ্ম, এই উভয়ের অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ স্বীকৃত হয় বলিয়াও ঐ মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা চলে।

বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার মত রুদ্রের সম্মত বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ের নাম তদনুসারে রুদ্রসম্প্রদায় নামে খ্যাত, ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের কোনো ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। কথিত আছে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর কিছু দিন পরেই তাঁহার সম্প্রদায় একরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তাহার পরেই বল্লভাচার্য্য তাহাকে পুনর্ব্বার জাগাইয়া তোলেন। বল্লভাচার্য্যই তখন সেই সম্প্রদায়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন, এবং তাঁহার মতেই সম্প্রদায়ের নাম বল্লভসম্প্রদায় হইল। এই সম্প্রদায়কে পুষ্টিমার্গীয় নামেও অভিহিত করা হয়। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-আলোচনার সময় বলিলে ভাল হইবে বলিয়া এখানে আর বলিতেছি না। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পরিগৃহীত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নাম অণুভাষ্য। ইহা বল্লভাচার্য্য রচনা করিয়াছেন। ইহার ভাষ্যখানি আকারে ছোট নহে, অতএব তজ্জন্য তাহার নাম অণু হয় নাই। শঙ্করপ্রভৃতি যেমন জীববাচী শারীরক শব্দে স্বস্ব ভাষ্যের নাম করিয়াছেন, আমার বোধ হয়,অন্যান্য বৈষ্ণব দর্শনের ন্যায় শুদ্ধাদ্বৈতদর্শনেও জীবের পরিমাণ অণুমাত্র স্বীকৃত হওয়ায় অণুশব্দে এখানে জীবকেই লক্ষিত করা হইয়াছে, এবং এইরূপে জীববাচী অণুশব্দেই ভাষ্যের নামকরণ হইয়াছে। রামানুজের ন্যায় বল্লভও শঙ্করের মতকে অবসর পাইয়াই খণ্ডন করিতে নিবৃত্ত হন নাই। ইনি স্বকীয় ভাষ্যে স্থানে স্থানে শঙ্করকে সর্ব্ববিপ্লববাদী প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি মাধ্যমিক নামে শূন্যবাদী বৌদ্ধের অপর অবতার, এবং এই জন্যই সজ্জনগণের উপেক্ষণীয়।

সাঙ্খ্যদর্শনের সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর নাম দার্শনিকগণের নিকট সুপরিচিত। ইনিও বেদান্তদর্শনের একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যের নাম বিজ্ঞানামৃতভাষ্য। সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যের ন্যায় বিজ্ঞানামৃতভাষ্যেও বিজ্ঞানভিক্ষু অন্যান্য দর্শনের মতকে যতদূর পারিয়াছেন, সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাঙ্খ্যপ্রবচনের ন্যায় বিজ্ঞানামৃতেও তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতকে ভূয়োভূয়ঃ খণ্ডিত করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুকে একরূপ ভেদাভেদবাদী বলিতে পারা যায়, কিন্তু ইঁহার ভেদাভেদ নিম্বার্কের বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় নহে। ইনি বলেন জীব হইতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, শঙ্করাচার্য্যের মত ঐ দুই পদার্থের অত্যন্ত অভেদ বা ঐক্য নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ আছে; কিন্তু এই অভেদ অর্থে ইহা নহে যে, তাহাদের পরস্পরের স্বরূপত কোনো ভেদ নাই; ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির আদি ও অন্তে এই জীব ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত হইয়া থাকে, লবণ ও জল যেমন পরস্পর অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম ও জীবও সেইরূপ অবিভক্ত থাকে। কেবল জীবই যে এইরূপ ভাবে থাকে তাহা নহে, অন্যান্য সমগ্র জড় পদার্থই এইরূপ অবিভক্ত থাকে, এবং সেই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "এই সমস্তই আত্মা।" এতাদৃশ স্থানে জড় পদার্থের সহিত ব্রহ্মের এই অভেদকে যেমন অবিভাগরূপে অভেদ বলিয়া স্বীকার না করিলে চলে না, কারণ, তাহা না হইলে জড়ের সহিত অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মও জড় হইয়া পড়েন, সেইরূপ জীবের সহিতও ব্রহ্মের অবিভাগরূপই অভেদ গ্রহণ করিতে হয়। বেদান্তশাস্ত্রের মহাবাক্যসমূহ ব্রহ্মাত্মতা প্রতিপাদন করে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন, তবে তাহার তাৎপর্য্য ভিন্ন ভিন্ন। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মই জীবের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপ; কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্ম জীবের আত্মা হইলেও জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেন না; শরীরের যেমন এক পৃথক্ আত্মা চেতন রহিয়াছে, জীবেরও সেইরূপ ব্রহ্মই আত্মা। ঈশ্বর বা ব্রহ্মই মুখ্য আত্মা, জীব গৌণ আত্মা। যখন বিজ্ঞানভিক্ষুর এই বিজ্ঞানামৃতভাষ্যকে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা হইবে, তখনই এই সমস্ত বিষয় পরিষ্কার রূপে বলিব বলিয়া এখন এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতেছি না।

বেদান্তদর্শনের আর একখানি ভাষ্যের নাম নিরঞ্জনভাষ্য। এই ভাষ্যকারের নাম বিশ্বদেবাচার্য্য। ভাষ্যখানি পুণা-আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত হইলেও এখনো আমাদের হস্তগত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন কথাই আজ আমি বলিতে পারিলাম না; আশা করি অনতিবিলম্বেই বলিতে পারিব।

ইহা ছাড়া পূর্ব্বোক্ত বহু মতেই বেদান্তদর্শনের আরো একাধিক ব্যাখ্যা-গ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বৃত্তির মধ্যে, এবং কতকগুলিকে ভাষ্য বলিয়াই গণ্য করা হয়। এই সমস্ত বিবরণ এখানে না বলিয়া বিশেষ বিশেষ শাখা বা সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনার সময়েই বলিব।

বেদান্তদর্শনের যে সকল শাখার কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদের মধ্যে বঙ্গদেশে যেগুলিকে এখনো সেরূপ আলোচিত হইতে দেখা যায় না, আমি সেই গুলি লইয়াই প্রথমে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিব; এবং প্রত্যেক দর্শনের কথাই সাধারণত দুই-দুইটি প্রপাঠকে যথাশক্তি সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা তদনুসারে পরবর্তী প্রপাঠকে নিম্বার্কদর্শন আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ তবে আপনাদের নিকটে বেদান্তের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করি।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

বর্ষা আবাহন।

বনে বনান্তে দিকে দিগন্তে
এসহে নিবিড় এসহে;
হৃদয় ভরানো জীবন জুড়ানো
এস সুগভীর এসহে।
এস পবিত্র, এস নিরমল,
এস তাপহর, এস সুশীতল,
অশনিমন্দ্রে এস মহাবল,
ঘোর গম্ভীর এসহে।
তৃষিত শুষ্ক তপ্ত ধূলায়
পরাণ বরষি এসহে।
বিদ্যুৎ জ্বালা চকিতে জ্বালায়ে
ভীষণ হরষে এসহে।
এস ঝর ঝর সজলছন্দে,
এস ধরণীর আর্দ্র গন্ধে
এস নব-ঘন ঘন আনন্দে
পুলক-অধীর এসহে॥

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা।*

কর্ম্ম করতে করতে কর্ম্মসূত্রে এক এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে,—তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে খুলতে সেরে নিতে চারদিকে কত রকমের টানা-টানি করতে হয়—তাতে মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল—তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বলেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে, এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কি করলে জটা ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, কিরকম করলে তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর পশ্চিমে ঘন ঘোর মেঘ করে এসে সূর্য্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মত ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্ত ভাবে ছুটে আসচে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল; তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল—পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্ম্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘন ধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারিদিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে সে জন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম, মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল—দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারিদিকে ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, কণা কণা নয়—চিন্তা করে নয় চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্য্যাপ্ত বর্ষণ এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা আমার মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই; আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা একমুহূর্ত্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ করে; একটুর সঙ্গে আরেক টুকু জুড়ে গেঁথে কোনোকালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু জমানো নয়; সে কলতলা থেকে ঘটিতে করে

* ৬ই বৈশাখে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

বনে লক্ষ কোটি ফুলের নিগূঢ় মর্ম্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করচে—যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে' অকস্মাৎ সে কি আশ্চর্য্যরূপে দেখা দেয়! বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্ত্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে একমুহূর্ত্তে শ্যামল করে তোলে—তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখ্‌তেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কি বাধাহীন, কি প্রচুর, কি মধুর, কি গম্ভীর সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করচে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই—কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বলচে না; কেবল ইচ্ছা করচে বিশ্বজগতের মধ্যে যে একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে; কোনো দুঃখবিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারচে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই—তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে, সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাক্‌বে—যে দীনতা কোনো দিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। আমাদের তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাক্‌বে তোমার প্রসাদধারা—গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠ্‌চে। বারিধারা ঝরচে ঝরচে—সমস্ত ধুয়ে যাচ্চে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্চে, সমস্ত নবীন হয়ে উঠ্‌চে, শ্যামল হয়ে উঠ্‌চে। বাইরে কেউ দেখ্‌তে পাচ্চে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার—তারি মধ্যে নেমে আসচে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি; ভরে ভরে নিয়ে আসচে তাঁরি সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই—এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে মেঘে, আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে; তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কি গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব, সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে;—প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎসুক হয়ে উঠেছে—তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারিদিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুসির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুসি হও! এই সহসা অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুসি, এই এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুসি —সেই খুসির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মনপ্রাণশরীর আজ খুসি হয়ে উঠুক্! আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্ম্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক্—পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এস, এস, তুমি এস,— আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এস! হে গোপন, তুমি এস! প্রান্তরের এই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এস! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এস, আজ তুমি বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও—তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন; তাহা এই যে, শরীর কৌমার হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে, বার্দ্ধক্য হইতে মৃত্যুতে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে—ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী যিনি আত্মা তিনি প্রকৃতির কোনো পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হ'ন না। কিন্তু আত্মা স্থির আছেন জানিয়া তুমি নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হইতে না দিয়া তোমাকে করিতে হইবে কর্ম্মের পর্ব্বত আরোহণ;— তাহার শিখরে যখন উত্থান করিবে তখন তোমার অন্তর্নিগূঢ় জ্ঞান এবং আনন্দ পরিস্ফুটরূপে দীপ্তি পাইবে। তুমি চক্ষুষ্মান্ই হও, আর অন্ধই হও, তোমাকে গন্তব্য পথ অতিবাহন করিতেই হইবে। তুমি যদি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও পথ দেখিয়া না চলিয়া ক্রমাগতই খানায় ডোবায় পা-পিছ্‌লিয়া পড়িয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে তোমার চক্ষু থাকা না-থাকা সমান। তুমি যদি ইংরাজি-ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও একটা ইংরাজি কহিতে

দশটা। ব্যাকরণ স্থূল ক্ষুদ্র তবে সেরূপ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা মূর্খত্ব ভাল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কর্ম্মের পার্ব্বত্য-পথের যাত্রীদিগের পক্ষে যাহা একান্ত পক্ষে অবলম্বনীয় এইরূপ একটি আশ্রয়-দণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে আশ্রয়-দণ্ড হ'চ্চে অবিচলিত-ভাবে আত্মাতে স্থিতি—যাহার আর এক নাম যোগ। পাতঞ্জল-দর্শনে যোগশব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইরূপ :—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং।"

যোগ কি? না চিত্তবৃত্তির নিরোধ। তাহাতে ফল হয় কি? না, স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ আত্মা ঠিক্ আপনি যাহা তাহাতেই ভর করিয়া দাঁড়ানো। ভাব এই যে, অসংযত মন ক্রমাগতই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, একদণ্ডও স্থির থাকে না; জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে স্থির করা চাই। কচ্ছপ যেমন আপনার বহির্মুখী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে টানিয়া লয়, সেইরূপ বহির্মুখী মনোবৃত্তিসকলকে ভিতরে টানিয়া লইয়া আত্মাতে সমাহিত করা চাই। এই জায়গাটিতে গোড়াতেই এই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই উত্থিত হয় যে, জ্ঞান নানাপ্রকার—যেমন সঙ্গীত-বিজ্ঞান জ্যোতিষ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ইত্যাদি। মানিলাম যে, সঙ্গীত-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে গীতের স্বরলহরীর প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; জ্যোতিষ-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদির গতিবিধির প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; রসায়ন-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে দ্রব্যাদির সংযোগ-বিয়োগ-মূলক রূপান্তর সংঘটনের প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; এইরূপে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের চরিতার্থতা সাধন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ বিষয়-ক্ষেত্রে মন স্থির করা আবশ্যক তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি বিষয়-বিশেষে মন স্থির করিতে বলিতেছ না—তুমি বলিতেছ আত্মাতে মনস্থির করিতে; ইহার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর:—মনে কর তুমি তানসেনের নিকটে বেহাগ-রাগিণীর একটি গান শিক্ষা করিতেছ, আর মনে কর যে, সেই গানটির সমের জায়গার সুরটি নিরন্তর তোমার মনঃকর্ণে বাজিতেছে—উহার আর কোনো সুরের প্রতি তোমার তেমন মন বসিতেছে না; এরূপ হইলে, বেহাগ-রাগিণী গাহিতে শেখা যে, তোমার ভাগ্যে কোনো কালে ঘটিয়া উঠিবে তাহার কোনো সুরাহা দেখিতেছি না। তুমি যদি বেহাগ-রাগিণীর গান গাহিবার সামর্থ্য উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা কর, তবে বেহাগ-রাগিণীর গীতের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বেহাগ-রাগিণীর মুখ্যভাবটি চুনিয়া লইয়া তাহারই প্রতি মনঃসমাধা করা তোমার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। সা গা মা পা নি এই পাঁচটি সুর যেমন বেহাগ-রাগিণীর অন্তর্ভূত, তেমনি সমস্ত বিজ্ঞান মোট জ্ঞানের অন্তর্ভূত। একদিকে যেমন দীপালোকিত ঘরের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দ্রব্যাদি দীপনির্গত ভিন্ন-ভিন্ন রশ্মিচ্ছটার আলোকে প্রকাশিত হয়, এবং আর-একদিকে যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট দীপ-রশ্মি আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত; সেইরূপ একদিকে জ্যোতিষাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখা-তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের অর্থাৎ ফ্যাক্ড়া-জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হয়, আর একদিকে আত্মার সঙ্গাশ্রিত মোট জ্ঞান আপনাতে আপনি প্রকাশিত। আত্মার সঙ্গাশ্রিত সেই যে জ্ঞান যাহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত তাহারই নাম আত্মজ্ঞান—আত্মজ্ঞানই মোট জ্ঞান। দীপের সমস্ত ফ্যাকড়া রশ্মিজাল যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট রশ্মির অন্তর্ভূত, তেমনি সমস্ত ফ্যাকড়াজ্ঞান বা বিজ্ঞান আত্মাশ্রিত মোট জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত। উপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে,—

"অপরা ঋক্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।

অর্থাৎ অপরাপর বিদ্যা অপরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা। যেমন বেহাগের গীত গাহিবার সময় সেই রাগিণীর মুখ্য ভাবটির মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইয়া আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি অনুসারে স্বর-সপ্তকে বিচরণ করিতে হয়; তেমনি জ্ঞানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে আত্মার মুখ্যতম জ্ঞান এবং আনন্দে দৃঢ়রূপে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করা বিধেয়। কেননা, তাহা হইলেই কর্ম্মধন্দার প্রতিযোগে আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বাধীন স্ফূর্ত্তি এবং সদানন্দ অনুপম সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্যের উপদেশ দিয়া তাহার পরে যোগের উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন; "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক বই দুই নহে কুরুনন্দন, পরন্তু অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা এবং অনন্ত।" এই কথাটির একটি উপমা দিতেছি তাহার আলোকে উহার তাৎপর্য্য শ্রোতৃগণের চক্ষে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইবে।

মনে কর যে, দেশের রাজা দূত-মুখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, ঠিক্ বেলা

দশটার সময় তুমি রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে চাও, এক মুহূর্তও যেন বিলম্ব না হয়; আর, মনে কর, রাজসভায় যাইবার জন্য তুমি সাজিয়া বাহির হইয়াছ, ইতিমধ্যে তোমার দুই বয়স্য রাজদর্শনের অভিলাষী হইয়া তোমার সঙ্গে যুটিলেন। মনে কর, রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত ডানদিক্ দিয়া তিনটি শানবাঁধা বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে, আর, বামদিক্ দিয়া ঐরূপ আর-তিনটি বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে। তোমার সঙ্গী-দুজনা'র মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতে আরম্ভ হইল। রাম বাবু বলিলেন, বাম দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; শ্যাম বাবু বলিলেন, দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; এ তর্কের আর কিছুতেই মীমাংসা হইতেছেনা; এদিকে সময় যাইতেছে; তোমাকে ঠিক দশটার সময়ে রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে হইবে;—তুমি বলিলে, "তোমরা বলিতেছ নানা কথা—ঘড়ি কি বলে দেখি"; ঘড়ি বলিল, "৯টা বাজিয়া পঞ্চাশ মিনিট্"। তুমি বলিলে "সর্ব্বনাশ!" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তুমি সম্মুখের সীধা রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া রাজপরিষদে উপস্থিত হইলে; যেই তুমি রাজার সম্মুখে জোড়করে দণ্ডায়মান হইয়াছ, আর অমনি ঢঙ্ ঢঙ্ শব্দে দশটার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণদ্বারে যাইবার বাঁকা-পথ ডাইনে বামে তিন তিনটি, কিন্তু সোজাপথ সম্মুখে একটি মাত্র—যদিচ সে পথ কাটিয়া প্রস্তত করা নাই। কর্ত্তব্যকার্য্যের অলঙ্ঘনীয় অনুরোধে তুমি সেই অপরিচিহ্নিত সোজা পথটি অবলম্বন করিয়া রাজাজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হইলে; আর, তোমার সঙ্গীদুজনার তর্কবিতর্কের কিছুতেই মীমাংসা না হওয়াতে, তাহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না। রাজবাটীতে যাইবার সোজা পথ যেমন এক বই দুই নহে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যকরী বুদ্ধি তেমনি এক বই দুই নহে; পক্ষান্তরে, রাজবাটীতে যাইবার বাঁকা পথ যেমন অসংখ্য, অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি (অর্থাৎ অ-কেজো লোকের বুদ্ধি) তেমনি অসংখ্য এবং তাহার ডালপালা অনেক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ফলকামী স্বর্গলোভী মূর্খ পণ্ডিতেরা বেদের দোহাই দিয়া এই যে সকল কথা বলেন যে, নানাবিধ বহুমূল্য উপকরণের আয়োজন করিয়া খুব ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে পরজন্মে তোমার ভোগৈশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা থাকিবে না—এইসকল পুষ্পিত বাক্যাবলীর ছটাতে যাঁহাদের মন অপহৃত হয়, সমাধি-প্রবণ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহাদের নিকটে সমাদর প্রাপ্ত হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের বড় মিয়া ছোট মিয়া প্রভৃতি ওস্তাদ গায়কেরা রাগরাগিণী ভাঁজিবার সময় মুদ্রাদোষ-সংস্কারে প্রভূত পরিমাণে গিট্‌কিরি জারি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহবা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, ঐ সকল ওস্তাদিঢঙের গিট্‌কিরি-বাজিতে রাগিণীর মুখ্য ভাব-মাধুর্য্য সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া মারা পড়ে, তা বই, তাহা বিধিমতে ফুটিতে পায় না। আমাদের দেশের তেমনি অনেকানেক মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বাজে ক্রিয়া-কলাপে এরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে, তাহার মুখ্য অঙ্গের ভাব-সৌন্দর্য্য কৃত্রিম অলঙ্কারের বোঝায় চাপা পড়িয়া তাহার প্রাণবধ হইয়া যায়—তাহা মুহূর্ত্তেকের জন্যও মাথা তুলিতে অবকাশ পায় না। রাগরাগিণীর মুখ্য ভাবটির প্রতি যাঁহারা মনকে সমাহিত করিয়া গান করেন, তাঁহাদের গানের মধ্য দিয়া রাগরাগিণীর সেই মুখ্য ভাবটির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হয়; পক্ষান্তরে, যাঁহারা গিট্‌কিরি-বাজি প্রভৃতি বাজে অলঙ্কারের প্রতি মনকে সমাহিত করিয়া গান করেন, তাঁহাদের গানের মধ্য দিয়া রাগরাগিণীর ভাব-সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিজের নিজের ওস্তাদি মস্তক উত্তোলন করিয়া এবং বক্ষ স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। বাজে বিষয়েতে মনকে ঘুরাইয়া বেড়ানো একপ্রকার গিট্‌কিরি-বাজি; আর, আত্মার সহজ জ্ঞান এবং সহজ আনন্দে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তভাবে বিষয়ক্ষেত্রে মনকে বিচরণ করানো একপ্রকার রাগরাগিণীর মুখ্যভাবটির প্রতি মনকে তদ্গতভাবে সমাহিত করিয়া তাহার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য, ফুটাইয়া তোলা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচালনা কার্য্যে পরিপক্কতা লাভ করিতে হইলে বুদ্ধির মূলস্থিত সহজ জ্ঞান এবং আনন্দে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কিরূপে অনাসক্তভাবে মনকে বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করাইতে হয়—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "বেদশাস্ত্র ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক—তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হও, যোগ-ক্ষেমের ভাবনা হইতে বিরত হও—অর্থাৎ কি খা'ব কি পরিব এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিও না—আত্মবান্ হও অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে আত্মা জাগিতেছে কার্য্যে তাহার পরিচয় দাও।" এ জায়গাটির ভাবার্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ত্রিগুণ পদার্থটা কি, সগুণই বা কাহাকে বলে এ সমস্ত বিষয়

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা চাই। আগামী বারে ঐ দুরূহ বিষয়টিতে হাত দেওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শীলশিক্ষা।

আমাদের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে শীলশিক্ষার স্থান না থাকাতে যে কিরূপ কুফল ঘটিতেছে আজকাল তাহার আলোচনা প্রায়ই দেখা যায়। আমেরিকার কোন শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ লিখিতেছেন যে আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি এখন মানুষের চরিত্রের উপর দাবি যত বেশী এমন আর কোন কালে ছিল না।

আমরা যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আড়ম্বরহীন বিলাস-বিকার-শূন্য সরল জীবনের কথা বলি তখন ভুলিয়া যাই যে তাঁহাদের অনেকটা দায়ে ঠেকিয়া মিতাচারী হইতে হইয়াছিল—তাঁহাদের কালে বিলাস-পিপাসা উত্তেজন করিবার এত সামগ্রী এবং তাহা মিটাইবার এত উপকরণ ছিল কোথায়? তাঁহারা যে পরিশ্রমী ছিলেন তাহার কারণ কোনমতে কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই পরিশ্রম করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমাদের ন্যায় তাঁহাদের এত ভোগলালসা ছিল না তাহার কারণ এই সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আয়োজন তাঁহাদের সম্মুখে এত প্রচুর ছিল না। আধুনিক যুগের এই সহস্র প্রলোভন ও সামাজিক জটিলতার মধ্যে শীলবান্ হওয়া আমাদের পক্ষে আমাদের পিতৃপুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের অনেক বোঝা অনেক সমস্যা বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া স্বতই আমাদের যতটুকু চরিত্র গড়িয়া উঠে যথার্থ চরিত্র বলিতে কেবল সেইটুকু বোঝায় না। এই আবর্ত্তের মধ্যে যে শ্রেয়ঃপথ বাছিয়া লইতে পারে ও সেই পথে চলিবার মত যাহার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে সেই যথার্থ শীলবান পুরুষ।

বস্তুত আমরা বর্ব্বরতারই দ্বিতীয় স্তরে আছি। একদিকে যেমন অসভ্যেরা প্রাকৃতিক জড়বস্তুপুঞ্জের বন্ধনে আবদ্ধ, অপর দিকে তেমনি আমরা স্বরচিত বস্তুরাশির মধ্যে বন্দী হইয়া আছি। আমাদের যেগুলি বৈধ প্রয়োজন যে গুলি প্রকৃত অভাব তাহাই মিটাইবার জন্য আমাদের চিন্তা ও চেষ্টা ব্যাপৃত নহে পরন্তু লোকাচার ও ফ্যাসান যে প্রকার পানাহার বসন ভূষণ ও ঘর দরজার অনুশাসন প্রচার করে আমরা তাহাই জোগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছি। অথচ এই সঙ্কটের মধ্যে যখন শীলনিষ্ঠতা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক তখনি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে শীল-চর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হইতেছে। বলিতে গেলে চরিত্র-গঠনই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। শীলশিক্ষার প্রতি এই অবহেলার কারণ আলোচনা করিয়া লেখক বলিয়াছেন:—

এক কালে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে শীলশিক্ষার যে স্থান ছিল এখন প্রধানতঃ জ্ঞানচর্চ্চাই তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই যে ধর্ম্ম-নৈতিক শিক্ষা বর্জ্জন করা হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু বহু আয়োজনের ঠেলাঠেলির মধ্যে তাহা লোপ পাইয়াছে। আধুনিক পাঠ্য পুস্তকগুলি দর্শন-বিজ্ঞানের প্রাচুর্য্যে এত জ্ঞানপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে যে স্কুলের সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি তাহাতেই ব্যয় হয়। বর্ত্তমান যুগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনেক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ মাত্র সংখ্যা হিসাবে যদি জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় তবে এরিষ্টট্‌ল্ প্রভৃতি প্রাচীন মনষীগণের অপেক্ষা আজ আমাদের জ্ঞানের বোঝা কত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে! এরিষ্টট্‌ল্ সম্ভবত সেকালের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যারই অধিকারী ছিলেন কিন্তু এখনকার দিনে কোন লোকের পক্ষে বর্ত্তমান যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় অধিকার লাভ কত অসম্ভব! তাঁহাদের সময় ইতিহাস কত সংক্ষিপ্ত ও সরল ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বৃত্তান্ত আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জানি। তা ছাড়া তখন পৃথিবীর ইতিহাসের এত কলেবর বৃদ্ধি হয় নাই; আমাদের ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই তখন ভবিষ্যৎ গর্ভে অদৃশ্য হইয়া ছিল। তখনকার সাহিত্য যথেষ্ট ক্ষীণকলেবর ছিল বটে কিন্তু তাহা ভাবের সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল—তাহার মধ্যে অন্নের ভিতর খাঁটি জিনিষটি পাওয়া যাইত।

বর্ত্তমান সমাজে বিদ্যালয়গুলি বুদ্ধিবিকাশ-চর্চ্চারই বিশেষ উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষভাবে বুদ্ধিবিকাশের চর্চ্চাই আধুনিক বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়াতে তাহাকে ধর্ম্মনীতির অনুশীলনও প্রধানতঃ চিন্তা এবং জ্ঞানের পথ দিয়াই করিতে হয়। বর্ত্তমান কালের বুদ্ধিমূলক বিচিত্র বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার বিপুল প্রয়াসে এখনকার বিদ্যালয় ক্রমশই নিজের অজ্ঞাতসারে আর সমস্ত লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতেছে।

ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় চরিত্র শীলবান্ ও সার্থক হইতে পারে ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্বন্ধে এখন একটি সর্ব্বব্যাপী সচেতনতা দেখা যাইতেছে।

শ্রীঅতসী দেবী।

সাধুবাক্য।

রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন প্রদীপটি জ্বালিয়া, কোন সূচিকার্য্য লইয়া একাকী আমার ঘরে বসিয়া থাকি, আপন নিশ্বাসপতনের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাই না, তখন আমার মন শান্তিসুখে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন যেমন আমার ঈশ্বরকে আমি একান্ত নিকটে অনুভব করিতে সক্ষম হই এমন আর কোন সময় পারি না। আমি ঠিক্ যেমনটি, আপনাকে ঠিক্ তেমনিটি বোধ করিতেই ভালবাসি—ক্ষুদ্র একটি প্রাণ, পরমেশ্বর তাহার নিকট প্রিয়তম—তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞানেই তাহার সুখ। এক একবার কাজ রাখিয়া বাতায়নের কাছে উঠিয়া যাই, চারিদিকে চাহিয়া দেখি—দেখিতে পাই নিশীথ আকাশে চন্দ্রতারকা সেই সর্ব্বশক্তিমানের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ চিরদীপ্যমান; অখিল বিশ্বের অনন্ত মহিমার কথা একবার ভাবি, আবার আসিয়া আপন কাজ তুলিয়া লই, সমস্ত হৃদয় মন প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া যায়, আমি অনুভব করি আমার মত সুখী আর কেহ নাই।

A Poor Methodist Woman.

স্বর্গীয় শক্তির নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিলে ক্রমে আমাদের চারিদিকে যে দিব্য আনন্দ-মন্দির রচিত হয়, মনের মধ্যে যে শান্তি এবং সৌন্দর্য্য প্রসারলাভ করে, পার্থিব কোনও ক্ষমতা, কোনও সুখ, কোনও অধিকার তাহা আমাদিগকে দান করিতে পারে না।

J. P. Greaves.

ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে যখন আমরা সম্পূর্ণ আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হই তখন আশাতিরিক্ত ভাবে আমাদের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, প্রফুল্লতা সহজ হয়, মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হৃদয়ে অক্ষয় তেজ সঞ্চিত হয়—সুখ হারাই না, তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, আত্মা তখন পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।

Henry More.

হে প্রভু, হে আমাদের জীবনমরণের চিরন্তন সহায়, যেখানে যেমন ভাবে তুমি আমাকে লইতে চাও, বল বিধান কর আমি যেন সেইখানে তেমনি ভাবে তোমার অনুসরণ করিতে পারি। হে অখিলশরণ, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তুমি আমাদের যে কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান করিতেছ, বিরক্তি দুঃখে যে ধৈর্য্য, কার্য্য এবং বাক্যে যে অখণ্ড নিরাময় সততা, যে নম্রতা ও দয়া আমাদের নিকট প্রত্যাশা কর, আমরা যেন ভক্তিনত-মস্তকে তাহা প্রতিপালন করিতে পারি। যদি মহত্তর আর কোন কর্ত্তব্যভার শিরোধার্য্য করিব এই তোমার অভিপ্রায় হয়, যদি তোমার নিয়মিত ধর্ম্মের জন্য, যদি তোমার মানবসন্তানদিগের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ এই তোমার বিধান হয় তবে হে ইচ্ছাময় তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

C. G. Rossetti.

তর্ক নয়, আলোচনা নয়, কার্য্যের দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্যের যথার্থ পরিচয় লাভ করি। যতক্ষণ তর্ক করিতে থাকি ততক্ষণ সমস্যার কোনই মীমাংসা হয় না কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি অমনি চারিদিক হইতে কোন্ মায়াবলে রুদ্ধ যবনিকাগুলি অপসারিত হইয়া যায়, সম্মুখে আমাদের কর্ত্তব্যের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, তাহার সম্যক জ্ঞানলাভ করি। অননুভূতপূর্ব্ব-শক্তিতে হৃদয় ভরিয়া ওঠে, বাধাবিঘ্ন দূর হইয়া যায়, পূর্ব্বে যাহা অলঙ্ঘ্য, ভীতিউৎপাদক ছিল তখন তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়াই মনে হয়। অসীম শক্তিশালী বিশ্বনিয়ামক প্রভু অচিন্ত্য উপায়ে তখন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া সেখানে অভিনব শক্তিবিধান করেন, তাঁহার সহিত সম্বন্ধসংযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া আমরা যেন নবজীবনে জন্মলাভ করি।

E. B. Pusey.

হে সত্য, তুমিই অনন্তকালের সম্বল, তুমি চিরন্তন, হে প্রেম, তুমিই অনন্ত সত্যের স্বরূপ, হে অনন্ত, তুমিই চির-মধুময় প্রেম, তুমিই আমার জীবনদেবতা, তুমিই আমার পরম ঈশ্বর—অহরহ নিত্য নিয়ত আমি তোমারি নিমিত্ত বিরহ-কাতর। যেদিন তোমার আমার প্রথম মিলন, যে দিন তুমি আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া উন্নত করিয়াছিলে, সেদিন আমার নেত্রে স্বর্গ-পথের যে জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দৃশ্য প্রসারিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমি তোমার সহবাসের কত অযোগ্য। আলোক-প্লাবনে আমার অন্তরের চক্ষু এবং আমার বাহিরের এই ক্ষীণ দৃষ্টিকে পরি-প্লাবিত করিয়া তুমি আমাকে দুর্ব্বলতা-দোষ-মুক্ত করিয়া-ছিলে, বারম্বার আমার কম্পিত হৃদয় প্রেমের অপার বিস্ময় এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম হে বিশ্বসম্রাট, হে নিখিল-নায়ক, তোমায় আমায় কি দূরতা, কত প্রভেদ।

St Augustine.

ভবিষ্যতের জন্য অযথা ব্যাকুল হইয়া কাহাকেও কখনো কি বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতের সমস্যা সম্যকরূপে পালন এবং পূরণ করিতে দেখিয়াছ? যদি আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ অভাবের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিরস্ত হই, যদি জীবনের দিনগুলিকে

ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিনে দিনে তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে পূর্ণ করিয়া লই, যাহা করণীয় তাহা যদি ভবিষ্যতের জন্য না ফেলিয়া রাখিয়া প্রতিদিন সম্পন্ন করি, ভবিষ্যৎ দুঃখভয়ে বর্ত্তমানকে অবহেলা না করি তবেই জীবনে আশাতিরিক্ত এবং অভিনব সুখের অধিকারী হইতে সক্ষম হইব।

F. D. Maurice.

ঘটনাসঙ্কুল এই জীবনে পরিবর্ত্তন-ভয়ে ভীত হইও না—বরং আশা এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত কর। যে পরমেশ্বর তোমার জীবন-বিধাতা, যিনি তোমার সৃজনকর্ত্তা পরমপিতা তাঁহার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন কর। দুঃখবিপত্তিতে, দুর্দ্দিন অন্ধকারে তুমিত অসহায় নও সেই কলঙ্ক-ভঞ্জন, বিপদ-বারণ দয়াময় প্রভু সতত তোমার সহায়। এতদিন তিনিই তোমার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, পুনরায় তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন, তাঁহার হাতখানি দৃঢ় করিয়া ধারণ কর, যদি হে দুর্ব্বল, আর চলিতে অক্ষম হইয়া থাক তবে আবেদন জানাও, সেই অখণ্ড প্রতাপবান, অনন্ত করুণাময় তোমায় বহন করিয়া লইয়া যাইবেন। কাল কি হইবে বলিয়া ভাবনায় ব্যাকুল হইও না, সেই এক, অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনীয়, যিনি আজ তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কাল কেন চিরদিনই তোমায় রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া ধারণ কর। হয় তিনি তোমায় দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন নয় ত তিনিই তোমাকে দুঃখ-বহনের শক্তি দান করিবেন। তবে আর কেন, শান্তি, পরমা শান্তিতে হৃদয় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক—দুঃখ-কাতরতা, ভবিষ্যৎ ভীতি, অশান্ত ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাক।

Francis De Sales.

হে নবীন পান্থ, স্বর্গীয় পথে অগ্রসর হইতেছ কিনা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ—কোন্ উপায়ে জানিতে পারিবে? আপন আবাস-গৃহখানি ভাল করিয়া একবার পর্য্যবেক্ষণ কর—আত্মার মন্দিরতোরণ ত্যাগ করিয়া কখনো দূরে যাইওনা। আপন হৃদয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া বসতি কর, বাহিরে অশান্ত ব্যাকুল চেষ্টায় ব্যর্থ অন্বেষণে উন্মাদের মত দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইও না। যদি এই অন্তর্নিবেশ অভ্যাস হইয়া যায়, তবে তখন আপন করণীয় সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবে; অন্তর্য্যামী অন্তরে যে আদেশ প্রচার করিবেন, বাহিরে তাহা পালনের উপায় দেখাইয়া দিবেন; তবে হে ভ্রান্ত, একান্ত বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে সেই দুর্লভ চরণে আত্মসমর্পণ কর—ধ্যানে কিম্বা কর্ম্মে, বিষয়-সম্ভোগে কিম্বা পরার্থপরতায়, সুখে কিম্বা দুঃখে যেখানে যেমনভাবে তিনি লইয়া যাইবেন সেই খানেই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চল। যদি সেই ইচ্ছাময় তোমাকে নিতান্ত তাঁহার একান্ত নিকট সান্নিধ্য অনুভব করিতে না দেন তবুও ভক্তিভরে তাঁহারি উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ কর, তাঁহার নিমিত্ত, সেই চিরদুর্লভ এবং নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের নিমিত্ত বাহিরে এবং সুদূরে কর্ত্তব্যের পথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে থাক।

J. Tauler.

ধৈর্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইলে পরমেশ্বরের পবিত্র নৈকট্যের অনুভূতিতে নিয়ত দৃঢ় হইতে হইবে—কে জানে কখন প্রলোভন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়, কখন ধৈর্য্য, বীর্য্য এবং নম্রতার পরিচয় দান করিতে হয়। আত্মসংবরণ, ক্রোধ-বিরক্তির সংযমের দ্বারাই আমরা আত্মত্যাগী এবং নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা করি। এ সংসারে কাহারও নিতান্ত স্বার্থপর হওয়া সম্ভব নহে—মানুষের যাহা কিছু একান্ত নিজস্ব, যেমন সময়, গৃহ এবং বিশ্রাম, সেখানেও সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা চলে না, সেখানেও কত আক্রমণ, কত দৌরাত্ম্য, কত ব্যতিক্রম—গৃহী ব্যক্তিকে পদে পদে আত্মসংবরণ, আত্মসংযমন এবং আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়।

F. W. Faber.

এ সংসারে শান্তি এবং সুখে বাস করিতে হইলে নিত্য নিয়ত নিয়মিতভাবে আমাদের আপন ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছার নিকট পরিহার করিতে হয়—বাহিরের ভাবে কোনও আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া নীরবে নম্রতার সহিত কতবার কত পীড়াদায়ক শব্দ এবং দৃশ্য সহ্য করিতে হয়। কতবার যখন অন্য কিছু করিলে আনন্দলাভ করিতে পারিতাম, তখন তাহার বিপরীত করিতে হয়—শ্রান্ত হইলে তবুও বিরাম নাই, তবুও অধ্যবসায়ের সহিত আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, কতবার যখন একেলা থাকিতে পারিলে অধিকতর আরাম ও আমোদ উপভোগ করিতে পারিতাম তখন হয়ত কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে সামাজিকতা রক্ষা করিতে হয়; ইহা ভিন্ন জীবনে দৈনিক কত অসুখকর ঘটনা ঘটিতে থাকে, বহুকালস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, মূল্যবান পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, যত্নরক্ষিত সামগ্রী হারাইয়া যায়, বন্ধু বিমুখ হয়, নির্ম্মমতা, অকৃতজ্ঞতা, আত্মম্ভরিতা প্রতিকূলতা জীবনে প্রতিদিন কতবিধ দুঃখ বেদনার সৃষ্টি করে।

J. Keble.

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বাবীধর্ম্ম।

(E. G. Browne সাহেবের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত)

যিনি "বাবী"-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক এবং বাব্ নামে সকলের কাছে পরিচিত তাঁহার প্রকৃত নাম মির্জ্জাআলি মহম্মদ। তিনি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসে দক্ষিণপারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না তথাপি তিনি স্বয়ং মহম্মদের বংশধর সৈয়দ ছিলেন বলিয়া চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে পারস্যদেশবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

মির্জাআলি মহম্মদকে শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় বিদ্যালয়ে তিনি অধিক দিন ছিলেন না। তাঁহার বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার প্রধান কারণ তথাকার শিক্ষকদিগের অমানুষিক অত্যাচার। কালে যখন তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন তখন আপনার শিশুজীবনের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে শিশুদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অবশ্যপালনীয় কতকগুলি বিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং শিশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের সম্বন্ধে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন "সেই পরমাত্মা—যাঁহার কৃপাসিন্ধু হইতে বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়া জীবমাত্র জীবিত রহিয়াছে, তাঁহার দুঃখ নিবারণের জন্যই এইরূপ বিধি প্রস্তুত করা হইল; কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁহাকে জানে না, যিনি তাঁহার এবং সকলের গুরু!"

বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর মির্জা মহম্মদ কিছুদিন পর্য্যন্ত পিতার বাণিজ্যে তাঁহার সহায়তা করিলেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল তখন তিনি বালকমাত্র, এইজন্য তাঁহাকে তাঁহার মাতুল হাজি সৈয়দ আলি'র বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সিরাজসহর ত্যাগ করিয়া পারস্যোপসাগরতীরে বুসিয়র সহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই বাল্য বয়সেই তাঁহার বৃদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল এবং তখন হইতেই যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত সেই তাঁহার সুপবিত্র জীবন, স্বার্থহীন বৈরাগ্যের ভাব এবং সরল মধুর আচরণে মুগ্ধ হইত। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া শিশু অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল।

কারবেলা সহর পারসিক সিয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। কারণ তৃতীয় ইমাম (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) হুসেন সেখানে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। শেখ্ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শেখ আহম্মদের এক শিষ্য হাজি সৈয়দ কাজিম সেখানে বাস করিতেন এবং ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। শেখদিগের ইমামের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই শেখ সম্প্রদায় দ্বাদশ ইমাম বা ইমাম মাহদির অভ্যুদয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে আশা করিয়া বসিয়া আছে।

একদিন একজন নূতন ব্যক্তি আসিয়া সৈয়দ কাজিমের ভক্ত শিষ্য-সংখ্যার দল বৃদ্ধি করিল। এই আগন্তুক আর কেহ নহে, সেই মির্জ্জাআলি মহম্মদ। ইনি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া বুসিয়র ত্যাগ করিয়া কারবেলা সহরে আসিয়া পঁহুছিলেন এবং সৈয়দ কাজিমের নিকট আসিয়া দ্বারের কাছে সকলের নীচের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া রহিলেন। কয়েক মাস এইরূপ নিয়মিত যাতায়াত করাতে সৈয়দ কাজিমের শিষ্যেরা সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইল এবং গুরুও এই তরুণ যুবকের একাগ্রতা এবং বিনীত আচরণে মুগ্ধ হইলেন। একদিন মির্জাআলি মহম্মদ যেমন হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন তেমনি অন্তর্হিত হইয়া জন্মস্থান সিরাজে চলিয়া গেলেন। ইহার অল্প দিন পরে উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহার ব্যবস্থা করার পূর্ব্বেই সৈয়দ কাজিমের মৃত্যু হইল। আসন্ন মৃত্যুকালে রোদনরত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি বলিলেন "যাহা সত্য তাহা জগতে প্রকাশিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইবে ইহা জানিয়াও তোমরা চাহ না যে আমার মৃত্যু হোক?" কেমন করিয়া এই সত্যের প্রকাশ হইবে তাহা তিনি আভাসে বলিলেন মাত্র, এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর সকল শিষ্য মিলিয়া অনশনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর তাহারা ঈপ্সিত বস্তুর অন্বেষণে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এই শিষ্যদিগের মধ্যে মুল্লা হুসেন নামে একজন খোরাসানবাসী ছিলেন। ইঁহার সহিত গুরুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য সকলেই মনে করিত হয়ত ইনিই গুরুর উত্তরাধিকারী হইবেন। শেখরা যখন আপন আপন পথে বাহির হইয়া পড়িল তখন মুল্লা হুসেন সিরাজ সহরে গেলেন, সেখানে গিয়া গুরু ভাই আলি মহম্মদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। এই প্রিয়দর্শন যুবকের গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার সহিত পূর্ব্বপরিচয় পুনঃস্থাপনের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মির্জ্জা আলি মহম্মদ স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসাদির পর সৈয়দ কাজিম এবং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্বন্ধে উভয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল।

মির্জ্জা আলি মহম্মদ বলিয়া উঠিলেন যে তিনিই সেই গুরুর উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ গুরু এবং পথ-প্রদর্শক; গুরু যে সত্য প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই দ্বারা সাধিত হইবে এবং যে ইমামের সহিত সহস্র বৎসর যাবৎ শেখদিগের বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের পথে তিনিই 'বাব' বা তোরণস্বরূপ। এই কথা শুনিয়া মুল্লা হুসেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং প্রথমে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু মির্জ্জা আলি মহম্মদের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর তাঁহার মনে আর সন্দেহ রহিল না।

দেখিতে দেখিতে এই বাবের অভ্যুদয়বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিল। পরলোকগত সৈয়দ কাজিমের অনেক শিষ্য মুল্লা হুসেনের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অনতিবিলম্বে সিরাজ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী ভক্তদিগের উৎসাহ উদ্যমের অন্ত রহিল না। বাবের রচিত জিয়ারৎনামা (ঈশ্বর সাক্ষ্য) ইত্যাদি কতকগুলি পুস্তক তাহারা অত্যন্ত আগ্রহ এবং আনন্দের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই গুরু যখন মোল্লা বা মুসলমান ধর্ম্মযাজকদিগের বিষয়াসক্তির কথা, দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার অবিচারের কথা বলিতেন তখন শিষ্যেরা একাগ্র চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত এবং তিনি যখন দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেন যে তিনি যে সত্য প্রচার করিতে আসিয়াছেন তাহার জয় হইবেই এবং তাহার ফলে দেশে ন্যায়ের এবং সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবেই তখন যে অত্যন্ত অবিশ্বাসী সেও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিত না।

অল্প সময়ের মধ্যে বাবের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বাবীদিগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—রাজপুরুষ এবং ধর্ম্মযাজকদিগেরও দৃষ্টি পড়িল কিন্তু সে দৃষ্টি সন্দেহ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি। এমন সময়ে বাব একদিন গোপনে একজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া সিরাজ ছাড়িয়া মক্কা তীর্থে চলিয়া গেলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বাব মক্কা হইতে বুসিয়ারে ফিরিয়া আসিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদিকে বাবের নিজের অন্তরের ভাব ও মত-বিশ্বাসগুলি তাঁহার নিকট সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, অন্যদিকে শাসনকর্ত্তারা এবং মুসলমান ধর্ম্মযাজকেরা এই নূতন ধর্ম্মমতটিকে অনিষ্টকারী বিবেচনা করিয়া উহার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বাব সিরাজে যাইবার পূর্ব্বে যে সকল শিষ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল শাসনকর্ত্তা হুসেন খাঁ তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া রীতিমত প্রহার করিলেন এবং প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন; দুইজন শিষ্যকে খোঁড়া করিয়া দিয়া তাহাদের বাড়ীর বাহির হইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অশ্বারোহী সৈন্যদল গিয়া বাবকে বন্দী করিয়া সিরাজে লইয়া আসিল; কয়েকজন মুসলমান ধর্ম্মযাজক শাসনকর্ত্তার সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী সাব্যস্ত করিল এবং প্রহার করিয়া দারোগা আবদুল হামিদ খাঁ'র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

এই সকল উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই ধর্ম্ম শীঘ্রই সমগ্র পারস্য দেশে বিস্তার লাভ করিল, এবং যে সকল শিষ্য সিরাজে ছিল তাহারা নানা উপায়ে কারাবাসেও গুরুর দর্শন লাভ করিল। প্রধান দারোগাও এই বন্দীর শান্তমধুর স্বভাবে মুগ্ধ হইল এবং তাঁহারই পুণ্যবলে তাহার পুত্র কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এই বিশ্বাসে সে অবশেষে বন্দী মহাত্মার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিল। ইহার ফলে এই হইল যে যখন ইস্‌পাহানের শাসনকর্ত্তা মুনচিহর্ খাঁ এই মহাত্মার কীর্ত্তির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কোন উপায়ে কারামুক্ত করিবার জন্য সিরাজে লোক প্রেরণ করিলেন তখন প্রধান দারোগা গোপনে উৎসাহ দিয়া বাবের মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিল এবং তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে ইস্‌পাহানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

প্রায় এক বৎসর কাল বাব্ ইস্‌পাহানে নিশ্চিন্তচিত্তে শান্তিতে যাপন করিলেন। স্থানীয় একজন ক্ষমতাশালী ধনী স্বেচ্ছায় তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে, বিশেষত, ধর্ম্মযাজকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার এই রক্ষাকর্ত্তার মৃত্যু হইল এবং উঁহার উত্তরাধিকারী গুর্গিন খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া সৈন্যগণের হেপাজতে পারস্যের সম্রাট মহম্মদ সাহ এবং তাঁহার কুচক্রী মন্ত্রীর নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করিল। সম্রাট বাবকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পাছে এই তেজঃপুঞ্জ যুবার অমিয়ময় বাক্যে তাঁহার মন ফিরিয়া যায় এই ভয়ে মন্ত্রী তাঁহাকে সম্রাটের সম্মুখে আনিতে দিলেন না।

বাবকে দূরস্থিত মাকু কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য পাঠানো হইল; সেখানকার শাসনকর্ত্তা

আলি খাঁ এই মন্ত্রীর বড় অনুগত ছিল। বাবকে সেখানে লইয়া যাইবার সময় সাধারণে তাঁহার প্রতি এত সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্ত দলে দলে এতলোক আসিতে আরম্ভ করিল যে তাঁহাকে সোজা পথ ছাড়িয়া অন্ত পথ দিয়া লইয়া যাইতে হইল। যে সকল সৈন্তের সঙ্গে তাঁহাকে পাঠানো হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

মাকু কেল্লায় বন্দী হইবার কিছু পরে বাবকে পুনরায় অত্রিজ সহরে লইয়া গিয়া তখনকার যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল এবং সেইস্থানে কতকগুলি প্রধান ধর্ম্মযাজক তাঁহার মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রশ্নগুলি কিরূপ ভাবে করা হইয়াছিল তাহা একমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি। এই একান্ত পক্ষপাতী বৃত্তান্ত পড়িলেও আমরা জানিতে পারি যে, যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহা হইতে প্রশ্নকর্ত্তার অনুসন্ধিৎসার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল দেখা যায় বাবকে অপদস্থ করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা। তাহারা বাবকে বলিল 'তুমি যখন বাব অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ তখন যে প্রশ্ন করি না কেন তাহার উত্তর দেওয়া তোমার পক্ষে কখনই অসম্ভব হইবে না" এই বলিয়া তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাদের ঔদ্ধত্য এবং ধৃষ্টতা দেখিয়া তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে নির্য্যাতনকারীরা যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল তখন তাঁহাকে প্রহার করিয়া মাকু কেল্লায় লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সাধারণ লোকেরা বাবকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিত তাহা ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে কেহ তাঁহাকে প্রহার করিতে স্বীকৃত হইল না, অবশেষে ধর্ম্মযাজকেরা আপনারাই এই প্রহার-কার্য্য সমাধা করিল।

এই সকল অন্যায় অত্যাচারে ভগ্নোদ্যম হওয়া দূরে থাকুক বাব অক্ষুণ্ণ উৎসাহে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ক্রিয়া-পদ্ধতি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইয়েজদ্ সহরের সৈয়দ হুসেন এবং সৈয়দ হাসান এই দুই ভাই তাঁহার সহিত বন্দী হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে সৈয়দ হুসেন গুরুর লেখা নকল করিয়া দিত এবং গুছাইয়া রাখিত। মন্ত্রীর কঠিন আদেশ সত্ত্বেও এই সকল রচনা বাহির হইয়া পড়িয়া ভক্তদিগের হস্তগত হইল। বাবের ধর্ম্মমতেরও ক্রমশ উন্নতি হইতে লাগিল। বাব বলিলেন তিনি কেবলমাত্র ইমাম মাহদি'র নিকট লইয়া যাইবার দ্বারস্বরূপ নহেন, তিনিই স্বয়ং ইমাম মাহদি, তাঁহারই অন্তরে পরম সত্যের প্রকাশ হইয়াছে এবং এতদিন তিনি যে সকল কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিছু প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা সকলের নিকট সমগ্ররূপে সরলভাবে প্রকাশ করিবেন, কিছু ঢাকা রাখিবেন না। তাঁহাতেই যে শেষ হইবে—তাঁহার দ্বারাই সত্যের চরম প্রকাশ হইবে এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই। তিনি বলিলেন যে তাঁহার পরে আরও একজন মহত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে এবং তিনিই এই নবধর্ম্মসম্প্রদায়ের আরও উন্নতি সাধন করিবেন। এই সময়ে বাবের রচনার মধ্যে দেখা যায় তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুকে কিরূপ সমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেই তিনি বারম্বার আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিনি শিষ্যদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছেন তোমরা কখনও এই মুসলমানদিগের ন্যায় ব্যবহার করিও না; মনে রাখিও সত্য অনন্ত, সত্যকে লাভ করিয়া শেষ করা যায় না। আজ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু সত্য লাভ করা হইয়াছে ততটুকুই প্রকাশ করিতে আমরা সক্ষম, ভবিষ্যতে ইহার কত উন্নতি হইবে তাহা কে জানে?

এইরূপে এই মাকু কেল্লায় ছয় মাস কাটিয়া গেল; শাসনকর্ত্তা যখন দেখিলেন যে সেখানেও শিষ্যেরা প্রবেশলাভ করিতেছে তখন তাঁহার আদেশে বাবকে দুরধিগম্য চিহরিক কেল্লায় লইয়া যাওয়া হইল। এইখান হইতেও, বাদামের খোসার ভিতর পুরিয়া, দুধের ভিতর ডুবাইয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে তাঁহার চিঠি শিষ্যদের হস্তগত হইতে লাগিল।

(ক্রমশ:)

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার যে প্রদেশে আমরা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছিলাম গ্রীষ্মকালে সেখানে শস্যক্ষেত্রে একবার একটা গুরুতর ছাতাপড়ার ব্যাধি (fungous disease) অত্যন্ত প্রবল হইয়া কৃষকদের কোনো কোনো ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিল। এই ব্যাধির প্রতিকারের জন্য সমস্ত প্রদেশটার প্রধান কৃষকেরা কৃষি-ব্যবস্থা-সমিতির সাহায্যে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া, ব্যাধির লক্ষণাদি তদন্ত করিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। আমি আমার এক জাপানী সহপাঠীর সঙ্গে গ্রামের একটা সভায়

গিয়াছিলাম। সেখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত কৃষকদের বক্তৃতা প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া শুনিলাম। অবশ্য কোনো কোনো বক্তা যদি তাঁহাদের ভাষার ছন্দে, সুরে, নৈপুণ্যে মনের সাধে হাসিয়া লইবার সুযোগ আমাদের না দিতেন তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্য রাখিয়া বক্তৃতা শোনা সম্ভবপর হইত না।

একটা প্রকাণ্ড ক্যাম্বিসের উপর নিম্নলিখিত বাক্যটী বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া,একজন লোক সভাগৃহের প্রবেশ-দ্বারের কাছে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া ছিল। "If we donot hang together now, we shall have to hang ourselves separately." বাংলায় এই বাক্যটাকে এই ভাবে তর্জ্জমা করা যাইতে পারে:—যে বাঁধনে সকলে একত্রে মেলে এখন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে যে বাঁধনে গলায় দড়ি দিয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ঝুলিয়া মরে তাহাই আমাদের ভাগ্যে জুটিবে। আমার সঙ্গী জাপানী বন্ধুটী কথাটী পড়িয়াই বলিয়া উঠিলেন "রুসিয়া যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিল তখন আমরা এই বাক্যের মধ্যে যে একটী সার্থক শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিলাম বলিয়াই আমরা দেশের মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলাম।" তার পর, জাপানী বন্ধুটি তাঁহার দেশের নানাপ্রকার উৎসাহ উদ্যম উদ্যোগের খবর আমাকে বলিতে লাগিলেন। সেদিন হইতেই জাপানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে, এবং সেই অবধি জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাস আমার কাছে অত্যন্ত সুখ-পাঠ্য।

পৃথিবীতে আজ যে কঠোর সংগ্রামের ঝড় বহিয়া যাইতেছে, কোনো জাতিকে তাহার মধ্যে আপনার বিশেষত্ব, মান, গৌরবকে অটুট রাখিতে হইলে মিলিবার শক্তিকে সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিতেই হইবে। শক্তির এই উৎসকে খুঁজিয়া বাহির না করিয়া আর যাহাই করিবার উদ্যোগ হউক না কেন, সমস্তই নিস্ফল হইবে। কয়েক শতাব্দী হইতে এসিয়ার মধ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, যাহা তাহার মর্ম্মস্থানকে আক্রমণ করিয়াছে, যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণে এসিয়াবাসীগণ তাহাদের সমস্তই বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে, সে কঠিন সমস্যার মীমাংসার পথ এসিয়া কখনই আবিষ্কার করিতে পারিবে না যতদিন না এসিয়া সমবায় চেষ্টা দ্বারা নিজেদের উচ্চতর স্বার্থকে বজায় রাখিতে না শিখিবে। জাপানীরা উহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই জাপানের চিত্ত দেশের সমগ্র কর্ম্মক্ষেত্রেই সচেষ্টভাবে জাগ্রত হইয়াছে।

জাপানের শক্তি দুইটি ধারায় আপনাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। একটী, উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টাকে ব্যবস্থাবদ্ধ করিবার শক্তি; আর একটি, নিজের বিশেষ জাতীয় প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে শিক্ষা-গ্রহণ। জাপানীরা দেশের কৃষিউন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের কৃষকেরা গড়ে যত জমি চাষ করিতে পায়, ভাগ্য-দেবতা জাপানী কৃষকের অংশে ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু মঞ্জুর করেন না। অথচ এই একই পরিমাণ জমি লইয়া তাহারা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও যাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছে আমাদের দেশের কৃষকেরা তাহা পারিতেছে না। আমাদের তুলনায় ইহাদের চাষের উপযোগী জমিরও পরিমাণ কম। ১৯০৪ সালের গণনানুসারে সমস্ত দেশের জমির মধ্যে (ফরমোসা বাদ দিয়া) শতকরা ১৫ ভাগ জমি চাষোপযোগী। শতকরা ৫৫ জন প্রত্যেকে ৬ বিঘার কিছু কম, ৩০ জন প্রায় ১০ বিঘা, বাকী ১৫ জন তদধিক পরিমাণ জমি চাষ করিতে পায়। এই জমিও সবক্ষেত্রে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। অল্প পরিমাণ জমিও বহু খণ্ডে বিভক্ত; সেই জন্যেই কৃষি-উন্নতিকল্পে যত যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, জাপানীরা তাহা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া আমেরিকার কৃষকদের ন্যায় শ্রমের লাঘব করিবার সুযোগ পায় না। যন্ত্রাদি পুরাতন ধরনের হইলেও ইহারা অল্প জমিতে যথেষ্ট সার প্রয়োগ করে এবং ইহারই ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ ইহারা ধান যব, গম, আলু, চা, তামাক, তুলা, নীবার ইত্যাদি শস্যের চাষ করে। সম্প্রতি জাপানীরা পশু-জননের প্রতিও দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে কৃষকেরা তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যেমন কেবলমাত্র উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করে, এবং তাহা না পাইলে অনাহারে মরিতে থাকে, কর্ম্মিষ্ঠ জাপানীকে তেমন শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হয় না। কেননা তাহারা কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা অর্থকরী ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। আমার জাপানী বন্ধুটির কাছে শুনিয়াছি যে তাহাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক রেশম পোকা পুষিয়া যথেষ্ট রেশম সূতা উৎপন্ন করে। আমেরিকাতেও দেখিয়াছি যেসকল কৃষকের জমিজমা অল্প তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র ফসলের উপর নির্ভর না করিয়া ঘরে বসিয়া নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করে। এই শ্রেণীর কৃষকদের ঘর হইতেই সহস্র সহস্র ভাণ্ড মধু উৎপন্ন হয়। আমাদের এই বাংলা দেশের কৃষকদের মধ্যে কোনো প্রকার ছোট খাট ব্যবসার পথ খুলিয়া দিতে পারিলে অল্পদিনের মধ্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে নূতন জীবনের সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু এদিকে আমা-

দের দৃষ্টি নাই। যাহাদের হাতে বাংলাদেশের বহু সংখ্যক প্রজার সুখদুঃখের ভার অর্পিত হইয়াছে সেই জমিদারবর্গ যদি কেবলই নিজেদের ভোগবিলাসের দিকে না তাকাইয়া বাংলার গ্রামে গ্রামে ক্রমশঃ ছোট ছোট ব্যবসা খুলিবার জন্য প্রজাদিগকে উৎসাহিত করেন তবেই তাঁহাদের জমিদারী শোভা পায়, এবং প্রজাদের কাছে তাঁহাদের ঋণ কতকটা শোধ হইতে পারে।

আমি যে বিশেষভাবে জমিদারদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি তাহার একটি কারণ আছে। আমাদের দেশে কৃষকদের উন্নতি-সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কিছু মনোযোগ করিয়াছেন কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যে উপায়ে ও যাঁহাদের দ্বারা এদেশে গবর্ণমেণ্টকে কাজ করিতে হয় তাহাতে জনসাধারণের সহিত যথার্থভাবে তাঁহাদের যোগ ঘটিতেই পারে না। এই কারণে এদেশে সরকারী কৃষিবিভাগের সমস্ত কাজকর্ম্ম ও অভিজ্ঞতা আমাদের জনসাধারণের আয়ত্তের অতীত। এমন কি, তাহার কার্য্যবিবরণী দেশীয় ভাষাতে প্রকাশ ও বিতরণ করিবার কোনো চেষ্টামাত্রও নাই। এই সকল বিভাগের যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহারা কৃষকদিগকে কৃষি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান দিবার বা আনুকূল্য করিবার জন্য তাহাদের সহিত বিশেষভাবে যোগ রাখিয়াছেন বা যোগ রাখিতে পারেন এমন কোনো লক্ষণই ত আমরা দেখিতে পাই না। জাপানে দেশের শ্রমজীবিদের ও কৃষকদের সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে উন্নতি হয়, যাহাতে বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রচুর আয়োজন করিতেছেন, নানাভাবে দেশের সম্মুখে কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেছেন। আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জর্ম্মণিতে, জাপানে গবর্ণমেণ্ট যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের দেশে জমিদারগণকে সেই সমস্ত দায়িত্ব যতদূর সম্ভব বহন করিতে হইবে। কৃষি-উন্নতিকল্পে জাপান গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে সকল কাজ অনুরোধের দ্বারা কিংবা আর কোনো উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে না, সে সম্বন্ধে আইনের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যথা, জলসেচনের ব্যবস্থা করা, অরণ্যগুলির যত্ন লওয়া, নদীতে বাঁধ দিয়া, খাল কাটিয়া নানা উপায়ে কৃষি-উন্নতির ব্যবস্থা করা, কৃষকদের জন্য সম্প্রদায় গঠন করা (Farmers guid) ইত্যাদি কর্ম্ম আইনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশের জমিদারেরাও বিশেষভাবে চেষ্টা করিলে প্রজাদিগকে এই প্রকার উন্নতির পন্থা আশ্রয় করিতে অনেকটা পরিমাণে বাধ্য করিতে পারেন।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যাহাই করা হউক না কেন, যদি সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার না করা হয় তবে কোন কর্ম্মেরই শিকড় দেশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না এবং ফলও স্থায়ী হয় না। এইজন্য জাপান-গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের সাধারণভাবে কৃষি ও তদানুষঙ্গিক-বিষয়-সকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছয়টী কৃষি-স্কুলের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কৃষিসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে কৃষিজীবিদিগকে আহ্বান করা হয়। মাঝে মাঝে কতকগুলি গ্রামের কৃষকেরা এই ভাবে একস্থানে মিলিত হওয়াতে একদিকে যেমন পরস্পরের মধ্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ অলক্ষ্যে ফুটিয়া ওঠে, অপরদিকে ইহাদের চিত্তেরও পরিণতি হইতে থাকে। এই সকল পরীক্ষাক্ষেত্র ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট হইতে গরু ভেড়া মুরগীর উন্নতিকল্পে পরীক্ষাগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে এই সকল পরীক্ষাগারের, পরীক্ষাক্ষেত্রের কাজ অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে। যাহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সুদক্ষ চালকের হাতে অর্পিত হইতে পারে এইজন্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া যোগ্য করিয়া আনেন।

কৃষি-উন্নতির চেষ্টা করিতে গিয়া জাপান দেখিলেন যে, এমন অনেক কৃষিজীবী আছে যাহারা অর্থাভাবে তাহাদের স্বল্প জমিটুকুর চাষ করিতে পারে না, পরীক্ষাগার বা পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে যে সকল অভিনব পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহার খরচ জোগাইতে পারে না অতএব যাহাতে ইহার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে জাপান-গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে তাহাই ভাবিলেন।

অর্থদৈন্য হইতে বাঁচাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কৃষিজীবিদের সাহায্য ও সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। জমি জমা বন্ধক রাখিয়া কৃষককে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কগুলি রাজস্ব-সচিবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। টাকা কর্জ্জ লইবার পূর্ব্বে কি ভাবে টাকা ব্যয় হইবে সে কথা কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হয় - কেবল মাত্র কৃষি-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মের জন্যই কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের নিয়ম। এই জন্যই পতিত জমির উদ্ধার-কার্য্য, জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি, জলসেচনের ব্যবস্থা, রাস্তা তৈরী, শস্যের বীজ সংগ্রহ, উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ক্রয়, গ্রামের বাড়ীঘরের উন্নতি-সাধন প্রভাবে জাপানী কৃষিজীবী ও শ্রমজীবিরা ক্রমশঃই সতেজ হইয়া উঠিতেছে। এ কেবল এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। কৃষিজীবিদের সম্প্রদায়গুলি (Farmers' guilds) ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা-প্রকার উন্নতির চেষ্টা করেন। এইরূপে জাপান অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশের কাছ হইতে

শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশের আবশ্যকতা অনুসারে নানা প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। জাপানের কৃষি-উন্নতি এই বাক্যটিকেই প্রচার করিতেছে যে; সমস্ত কল্যাণের গোড়ার কথা সমবেত চেষ্টা। বাংলা দেশের সমস্যার মীমাংসাও এইখানে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শরীরের শত্রু ও মিত্র।*

পুরাকালের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় 'পনটসের' রাজা মিথ্রিডেটিস্ পাঠানুরক্ত এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উৎসাহশীল ছিলেন। তিনি সকল প্রকার বিস নিজের শরীরে অতি অল্প মাত্রায় ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া অবশেষে এমন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে কোন বিষেই আর তাঁহার কোন অপকার করিতে পারিত না। রোমানেরা যখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল তখন তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার শরীরে কোনো বিষেরই ক্রিয়া হয় না। এই জন্যে বিষের অপকারিতা নিবারণের জন্য অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া শরীরে বিষ সহাইয়া লওয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিথ্রিডেটিজম্ বলে।

প্রয়োজনবশত মানুষকে নানা প্রতিকূল অবস্থা স্বীকার করিতে হয়, যথা অতিরিক্ত শীত, গরম বা বর্ষা সহ্য করা, অতিরিক্ত লবণাক্ত বা একেবারে লবণবর্জ্জিত খাদ্য খাওয়া, কিছুকাল অনশনে যাপন করা ইত্যাদি। এইরূপে যেমন তাহা ক্রমে মানুষের অভ্যস্ত হইয়া যায়, তেমনি তামাক, সুরাসার, এমন কি, আর্সেনিক্ প্রভৃতি ধাতব বিষও অল্পে অল্পে শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হইলে তাহাতে মানুষের আর কোনও অপকার করিতে পারে না এই বিশ্বাস পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কেমন করিয়া যে ইহা সম্ভব হয় তখন তাহার কোন অনুসন্ধান করা হয় নাই। এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আমাদের শারীর প্রকৃতি বিষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করে না। মানুষ এবং অন্য উন্নত জন্তুর রক্তের মধ্যে এবং রক্তের চারিদিকে ছোট ছোট জীবকোষ আছে; ইহাদের ক্ষমতা বড় অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। ইহারাই প্রত্যেকে বিষাক্ত জীবাণু এবং সকল প্রকার বিষের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করে। উন্নত জীবের রক্ত যে কি একটা অদ্ভুত পদার্থ তাহা আমরা খুব কম লোকেই জানি।

আমাদের শিরায় বহমান রক্তপ্রবাহ কেবল যে পরিপাক করা খাদ্যকে নাড়ির আবরণের ভিতর দিয়া শোষণ করিয়া লয় তাহা নহে, যেখানে যেখানে তাহাদের প্রয়োজন সেখানে তাহাদিগকে বহন করিয়া ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দেয়। শরীরের প্রত্যেক অংশে যে সকল পদার্থ ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে এই রক্তস্রোত তাহাদিগকে সরাইয়া দেয় এবং ফুস্‌ফুসের বায়ুর থলিগুলির গা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইবার সময় কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাস্‌কে দূর করিয়া দিতে থাকে। শরীরের অন্যান্য বর্জ্জনীয় পদার্থ মূত্রাশয় হইতে বাহির হইয়া যায়। রক্তের এই প্রবল প্রবাহ শরীরের প্রত্যেক অংশকে পরস্পরের সহিত যোগযুক্ত করিয়া রাখে। পঁচিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই এই দ্রুতগামী রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসে। এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে এই রক্তপ্রবাহের মধ্যে যদি কোনরূপ বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে তবে সে কি ভয়ানক ব্যাপার হয়।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন প্রণালীর নানা পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে এই রক্ত এবং তাহার আশ্রিত সজীব কোষগুলি জীবরক্ষার উপযোগী অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। জীবরক্তের সকল কণাই লাল রঙের নহে। তাহার মধ্যে যে শ্বেত কণিকা আছে তাহারাই আমাদের দেহরক্ষকের দল। এক চামচ রক্তে ইহার সংখ্যা আটশত কোটি। এই যে সকল জীবকোষ শরীরের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার কাজে নিযুক্ত আছে ইহাদিগকে রুষীয় বৈজ্ঞানিক মেচ্‌নিকফ্ প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সামান্য প্রাণীদের দেহেও ইহারা বাস করে। অতি ক্ষুদ্র জলের কীটের দেহেও অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই জীবকোষগুলি বাহির হইতে প্রবিষ্ট অন্য জীবাণুকে ভক্ষণ করিতেছে।

উন্নততর জন্তুদের শরীরতন্ত্রে একপ্রকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে তাহার ফলে ক্ষত ও অনেক প্রকার ব্যাধিতে তাহাদের ব্যাধিগ্রস্ত অংশে প্রদাহ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তখন রক্তনালীর পৈশিক আবরণের উপর স্নায়ুর বিশেষ প্রভাববশতঃ সেখানে রক্তপ্রবাহ বাধা পাইয়া জমিয়া উঠিতে থাকে। তখন ঐ খাদক জীবাণুগুলি সেই রোগদুষিত স্থানে প্রবেশ করে এবং ব্যাধিজীবাণু এবং অন্যান্য অনিষ্টকর পদার্থগুলিকে খাইয়া নষ্ট করিতে থাকে।

যে সকল জীবকোষ এবং শারীর কোষের উপর দিয়া রক্ত বহিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ রাসায়নিক গুণ জন্মিয়াছে। এই রাসায়নিক শক্তি

---

* অধ্যাপক রে-ল্যাঙ্কেষ্টারের রচনা হইতে।

নানা প্রকারের। প্রথমত এই খাদক জীবাণুগুলি ব্যাধিজীবাণুর বিষকেই সেই বিষের প্রতিকারকরূপে পরিণত করিয়া দিতে পারে। এইরূপে বিষপদার্থই (toxin) বিষহারী পদার্থ (anti-toxin) হইয়া দাঁড়ায়। রক্তের শ্বেতজীবাণুগুলি এই বিষ পদার্থের পরমাণু-সমষ্টিকে এমন কি এক প্রকারে নাড়া দিয়া দেয় যাহাতে তাহাদের অণুসমাবেশের রূপান্তর ঘটে—এবং এই রূপান্তরিত পদার্থ তাহাদের আদিকারণ বিষ পদার্থের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হইয়া তাহার অপকারিতা নষ্ট করিয়া দিতে থাকে।

এই জীবাণুঘটিত রক্তের মধ্যে আর এক প্রকারের বিষ-প্রতিরোধক রাসায়নিক গুণ জন্মায়; ঐ রক্ত নিজেই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়া ব্যাধি-জীবাণুর ক্ষতি করিতে থাকে। উহা অ্যালেক্সিন্ নামক ব্যাধি-জীবাণুনাশক বিষ উৎপন্ন করে। এই বিষ সহজ অবস্থাতেও মানুষের শরীরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু টাইফয়িড্ প্রভৃতি রোগের ব্যাধি-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। পুনশ্চ রক্তের মধ্যে আর এক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহা ব্যাধিজীবাণুগুলিকে একেবারে হত্যা করিতে পারে না কিন্তু তাহাদিগকে অসাড় করিয়া দেয়। তখন তাহারা পরস্পর জমাট হইয়া নিশ্চেষ্ট পিণ্ড আকারে চাপ বাঁধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি-জীবাণুকে জমাট করিয়া তুলিবার বিষ ভিন্ন প্রকারের এই জন্য কাহারও টাইফয়িড্ হইয়াছে কি না সন্দেহ জন্মিলে তাহার শরীর হইতে এক ফোঁটা রক্ত লইয়া তাহাতে টাইফয়িড্ জীবাণু ছাড়িয়া দিলে যদি দেখা যায় তাহারা জমাট বাঁধিতেছে তবে বোঝা যাইবে যে রোগীর রক্তে উক্ত প্রকারের বিষ জন্মিয়াছে, অতএব তাহার টাইফয়িড হইয়াছে।

দেহরক্ষক জীবাণুগুলি যদিচ ব্যাধিজীবাণুকে ভক্ষণ করে তথাপি সকল সময়ে তাহারা যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে খায় না। যদি ব্যাধিজীবাণুকে কোনো উপায়ে খাদক জীবাণুদের বিশেষভাবে মুখরোচক করিয়া তোলা যায় তবে তাহারা উৎসাহের সহিত ভক্ষণ কার্য্যে লাগিতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে ব্যাধিবীজ শরীরে প্রবেশ করিলে রক্তের এমন একটি রাসায়নিক গুণ জন্মে যাহাতে সে এক প্রকার স্বাদুরসের দ্বারা ব্যাধিবীজকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। এই রসকে অপ্‌সোনিন্ বলে। এই রসের আকর্ষণে খাদক জীবাণুরা পরম আগ্রহে শত্রুভক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহাতে আমাদের রক্তের শ্বেতকণিকাগুলির লুব্ধতা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের আহারে অরুচি না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের শরীররক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভেক প্রভৃতি জন্তর শরীরের কস্ (serum) লইয়া তাহার মধ্যে ওলাউঠার বীজাণুকে যদি পালন করিয়া তোলা যায় তবে তাহা সাংঘাতিক বিষ উৎপাদন করে। অথচ এই জীবাণুকেই যদি সেই জন্তর সজীবদেহের রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে লেশমাত্র পীড়া হয় না কেন? কারণ এই ব্যাধিজীবাণুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিষ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই শরীরের রক্তের সতর্ক প্রহরীগুলি আসিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে।

খাদক জীবাণুগুলিকে লুব্ধ করিবার জন্য ঐ স্বাদুরস উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা রক্তের মধ্যেই আছে বটে কিন্তু ব্যাধিশত্রু রক্তের মধ্যে প্রবেশ না করিলে রক্ত ঐ রস উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ব্যাধিজীবাণুকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়া যদি তাহাকে মানুষের শরীরের রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে সেই মৃত জীবাণুর সংস্রবেও রক্তের মধ্যে সেই স্বাদুরস উৎপন্ন হয়। রক্তের মধ্যে মৃত জীবাণু প্রবেশ করাইলে সুবিধা এই যে স্বাদুরস অপ্‌সোনিন্ ত উৎপন্ন হয়ই অথচ জীবাণু মৃত বলিয়া শরীরেও কোনো অপকার করিতে পারে না। ইহার পর যদি ঐ রোগের জীবিত জীবাণু দেহে প্রবেশ লাভ করে তবে খাদক জীবাণু আসিয়া বিনা বিলম্বে পরম উৎসাহে আহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ এবং উন্নত জীবের শরীরের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এইরূপ এক অদ্ভুত সংগ্রাম অনবরত চলিতেছে।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাদূ।

সাসৈঁ সাঁস সঁভারতা
এক দিন মিলহই আই
সুমিরণ পৈঁডা সহজকা
সতগুরু দিয়া দেখাই

শ্বাসে শ্বাসে সামলাইতে সামলাইতে একদিন মিলিবেনই আসিয়া। সহজের স্মরণের পথ সদ্‌গুরু দিয়াছেন দেখাইয়া।

এক মহূরত মন রহই
নাউ নিরঞ্জন পাস।
দাদূ তবহী দেখতা
সকল করমকী নাস॥

এক মুহূর্ত্ত মন যদি থাকে নাম * নিরঞ্জনের পাশ, তবেই দাদূ দেখে সকল কর্ম্মের নাশ।

দাদূ রাম অগাধ হৈ
পরিমিতি নাহীঁ পার।
অবরন বরন ন জানিয়ে
দাদূ নাউ অধার॥

দাদূ রাম অগাধ হৈ
বেহদ লখা ন জাই।
আদি অংত ন জানিয়ে
নাউ নিরন্তর গাই॥

দাদূ রাম অগাধ হৈ
অকল অগোচর এক॥
এক্টৈ অল্লহ রাম হৈ
সমরথ সাঙ্গঁ সোই॥

হে দাদূ, অগাধ এই রাম, না আছে (তাঁর) পরিমিতি নাহি আছে পার। অবর্ণ বর্ণ (প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা) তাঁহাকে জানিও না, হে দাদূ, নামই আধার।

হে দাদূ, অগাধ এই রাম, অসীম তিনি লক্ষ নাহি হয় আদি অন্ত যায় না পাওয়া যদি গাও নিরন্তর নাম।

হে দাদূ, অগাধ এই রাম, অগম্য তিনি, অগোচর তিনি, তিনি এক। আল্লা ও রাম তিনি একই, তিনিই সমর্থস্বামী।

সরগুন নিরগুন হৈ রহে
জৈসা তৈসা লীন্হ

সগুণ নির্গুণ দুইই বিদ্যমান, যেমন ঠিক তেমনই করিলাম গ্রহণ।

দাদূ সিরজন হায়জে
কেতে নাম অনন্ত

হে দাদূ, সৃজন যিনি করিতেছেন কত তাঁহার নাম! (তিনি যে) অনন্ত।

ঐসা কৌন অভাগিয়া
কছু দিঢ়াবই ঔর।
নাউ বিনা পগ ধরন কো
কহহুঁ কহাঁ হৈঁ ঠৌর॥

এমন আছে কোন অভাগ্য যে দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিয়াছে অন্য কিছু। নাম বিনা চরণ রাখিবার বল কোথায় আছে ঠাঁই। †

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

* "নাম"—সজীব সচেতন পুরুষাত্মক সত্তাকে হিন্দুস্থানী সাধকরা "নাম" বলেন। আমাদের ডাকটি সেখানে পৌঁছিলে সমস্ত বিশ্ব সাড়া দেয়। অন্যথা সমস্ত বিশ্ব বধির।

† আমরা যেখানেই পা রাখি সেখানেই ব্রহ্ম। সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম সাড়া দিতেছেন। সকল ভুবনে যে ব্রহ্ম আছেন তিনিও অসাড় ব্রহ্ম নহেন—তিনি "নাম ব্রহ্ম"। অর্থাৎ সচেতন পুরুষ ব্রহ্ম। সেই নামকে অতিক্রম করিয়া পা রাখিবার কোথাও ঠাঁই নাই। এমন ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া যে আশ্রয় লইতে চাহে অন্যত্র, সে হতভাগ্য।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

কোথায় বজ্রপাতের সম্ভাবনা।

কোন্ কোন্ স্থানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা অধিক ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রসিয়ার এক প্রদেশে ১৮৭৪ সাল হইতে বজ্রপাতের হিসাব রাখা হইয়াছিল। এই সংগৃহীত তথ্য হইতে ইহা দেখা যায় যে জলাভূমিতেই বজ্রপাতের অধিকতর সম্ভাবনা। অরণ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতের সংখ্যা কমিয়া যাইতে এবং অরণ্য-ধ্বংশের সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। সহরের সঙ্গে তুলনায় গ্রামে বজ্রপাতের প্রকোপ প্রায় দ্বিগুণ। যে সকল গৃহ ইহার আঘাতে জীর্ণ হইয়াছে তাহার গণনা করিয়া দেখা যায় যে কাঠে কিংবা খড়ে আচ্ছাদিত গৃহগুলির সংখ্যাই বেশী।

অনেকের এই ধারণা যে গাছপালা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করে কিন্তু দেখা গিয়াছে তাহা সত্য নহে; পনর বৎসরকাল মধ্যে হত প্রাণীর সংখ্যা ত্রিশ জন ব্যক্তি ও তিন শত তিরানব্বইটি জন্তু। ঘরের ভিতরে মোট ২৯০ জন বজ্রাহত ব্যক্তির মধ্যে কেবলমাত্র ১৯ জন, এবং ঘরের বাহিরে ২২ জনের মধ্যে ১১ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। বাহিরে আহতের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ যে ঝড়ের সূচনা হইলেই স্বভাবতঃ লোকেরা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সাংঘাতিক রূপে আহতের সংখ্যা শতকরা হিসাবে গণনা করিলে দেখা যায় যে বাহিরে আঘাত-প্রাপ্তের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। উহার কারণ এই যে যখন বজ্র কোনো একটা গৃহের উপর পড়ে তখন তড়িতের অনেকটা শক্তি ইহার উপর ব্যয় হয় অথবা গৃহেস্থিত নানাপ্রকার তড়িৎ-সঞ্চারক দ্বারা —(যথা ড্রেন্, পাইপ্ ইত্যাদি) দিয়া তড়িতের শক্তি ভূমিতে বিলীন হইয়া যায়। আবার খোলা মাঠে গাছের নীচে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি, কেননা বর্ষাসিক্ত

পাতাগুলি হইতে ভূমিতে তড়িৎ সঞ্চারিত হইবার পক্ষে গাছের শুষ্ক কাণ্ড অপেক্ষা মানুষের দেহযষ্টি সহজ পথ।

রক্ত সঞ্চারণ।

নিরাময় দেহ হইতে আসন্নমৃত্যু রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চারিত করিয়া জীবন বাঁচাইবার প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়া থাকেন এবং সাধারণ লোকের ধারণা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহা বহুদিন হইতে প্রচলিত, কিন্তু সবেমাত্র সেদিন এই চেষ্টা সফল হইয়াছে। রক্তে ফাইব্রিন নামক ডিম্বের শ্বেতাংশজাতীয় এক প্রকার পদার্থ আছে; ইহাই বাতাসের কিংবা যে সকল শারীর তন্তুর ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় তাহা ব্যতীত আর কিছুর স্পর্শে জমাট বাঁধিয়া যায়। ফাইব্রিন্-হীন রক্ত ব্যবহার করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; উষ্ণ লবণাক্ত জল ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থের ব্যবহারও সন্তোষজনক হয় নাই। সম্প্রতি হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে এক ব্যক্তির শিরা হইতে অপর একজনের শিরায় সদ্য উষ্ণ রক্ত সঞ্চারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বেল্‌জিয়মের এক বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত একজন লেখকের মন্তব্য এই স্থলে অনুবাদ করিতেছি।

"যখন আমি বালক, কোনো এক বিদেশীয় চিত্রশালার দেউড়িতে একটি ছবি অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম; একজন ডাক্তার বলিষ্ঠকায় এক যুবকের দেহ হইতে এক আসন্নমৃত্যু স্ত্রীলোকের দেহে রক্ত সঞ্চারণ করিতেছেন, এবং ইহাতে স্ত্রীলোকটী ক্রমশঃই যেন নূতন জীবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে পড়িল প্রাচীন রাসায়নিকেরা এক ধাতুকে আর এক ধাতুতে পরিণত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন সেও কতকটা এই জাতীয়। আজ বহু যুগের সেই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিতে চলিয়াছে; আজ আমরা রেডিয়ো তেজোময় (Radio-active) পদার্থের আলোচনা করিয়া একদিকে যেমন ধাতুর অপূর্ব্ব রূপান্তরের বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেছি, সেই প্রকার নানাবিধ অদ্ভুত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে দেহান্তর হইতে রক্ত সঞ্চারণ করিয়া মরণাপন্ন রোগীকে সতেজ করিয়া তোলা সম্ভব। কিছুকাল অবধি চিকিৎসাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ যে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন তাহারি সূত্র ধরিয়া আজ তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। অল্প কিছুদিন হইল নিউইয়র্কের এক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক একটা প্রাণীর মূত্রাশয় বাহির করিয়া ফেলিয়া আর একটি মূত্রাশয় বসাইয়া দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন; আর একজন ডাক্তার একটি কুকুরের মাথা আর একটি কুকুরের উপর বসাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

একবার ফাইব্রিন্ বাহির করিয়া দিয়া ভেড়ার রক্ত এক রোগীর শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু এক জাতীয় প্রাণীর রক্ত অপরের পক্ষে বিষবৎ; কাজেই এই পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। তারপর একই জাতীয় প্রাণীর ফাইব্রিন্-বর্জ্জিত রক্ত লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে। কেননা রক্ত হইতে ফাইব্রিন্ বাহির করিয়া লইলেই কোষাত্মক পদার্থগুলি নষ্ট হয়। অবশেষে এই কয়েক বৎসর হইল একজনের শিরার জোড়মুখে অপর একজনের ধমনী কোনো প্রকারে সংযুক্ত করিয়া রক্ত সঞ্চারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংযোজনের জন্য কোনো জন্তুর শিরা কিংবা কেবল মাত্র একটি কাঁচের নল ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। ইতিমধ্যে জর্ম্মানির একটি নগরে প্রায় দশটি রোগীর এই ভাবে চিকিৎসা হইয়াছে। উত্তরোত্তর এই প্রণালী চিকিৎসাশাস্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়া বিংশতি শতাব্দীর জয়স্তম্ভের উপর নূতন একটি চূড়া রচনা করিবে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ আশা করিতেছেন।

নক্ষত্রের সংঘাত।

কি ভাবে দুইটি জ্যোতিষ্কের পরস্পর সংঘাতে একটি কৈন্দ্রিক সূর্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে আমেরিকার এক জ্যোতির্ব্বিৎ অধ্যাপক তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়, সে আপনার শক্তিগুলিকে বিকিরণ করিয়া দিয়া একেবারে নিঃশেষ করিতে চাহিতেছে; এই প্রকার সংঘাতের বিপ্লব ঘটাইয়া প্রকৃতি এই ব্যয়ের চেষ্টাকে নিরস্ত করিতেছেন। নভোমণ্ডলের যে সকল স্থানে কদাপি তারা দৃষ্ট হয় নাই অকস্মাৎ সেইখানে একটি তারাকে জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যায়; জ্যোতির্ব্বিদেরা মনে করেন ইহা জ্যোতিষ্কের সংঘাতজনিত। এই প্রকার অত্যুজ্জ্বল তারা অনেকবার দেখা গিয়াছে। কোনো কোনোটা এত উজ্জ্বল যে দিনের আলোতেও তাহা দৃষ্ট হয়। ১৯০১ সালে যেটী দেখা গিয়াছিল তিন দিনের মধ্যে তাহা ২৫০০০ গুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কয়েক ঘণ্টাকাল সিরিয়াস্ নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই সংঘর্ষণে এমন উত্তাপের সৃষ্ট হইয়াছিল যে বাষ্পরাশি এক মুহূর্ত্তে ২০০০ মাইল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই নবজাত নক্ষত্রের দূরত্ব এত যে আলোকরশ্মি এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল ছুটিয়াও তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের কাছে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে এই সংঘাত যথার্থ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

উদ্ভিদের সংজ্ঞানাশ।

সম্প্রতি নিশ্চেতনক পদার্থ ব্যবহার করিয়া অল্পকালের মধ্যে গাছে ফুল ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। কথাটা শুনিয়াই হয় ত কাহারো মনে হইতে পারে যে চেতনাহারী পদার্থ ব্যবহারে গাছের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং মুকুলিত হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক ঘটিতেই পারে। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। গাছকে মুকুলিত হইবার পূর্ব্বে শক্তির সঞ্চয় করিবার জন্য কিছু কাল বিশ্রাম সম্ভোগ করিতে হয়। কোনো নিশ্চেতনক পদার্থ প্রয়োগে এই বিশ্রাম কালটী সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় তরুপালন-শালায় কৃত্রিম কোনো উপায়ে উত্তাপ জন্মাইয়া অসময়ে ফুল ফোটান হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিদের প্রাণশক্তিকে কেবলি তাড়না করিলে চলে না। যখন সে আপন সাধ্যের

চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে তখন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া চাই। এই জন্যেই উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বৃক্ষাদির ক্রমিক বৃদ্ধিকে রোধ করিবার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ডেন্‌মার্কের একদল পণ্ডিত দীর্ঘকাল উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সমগ্র জীবনে তিন অবস্থায় মাত্র উদ্ভিদের নিদ্রা ঘটিয়া থাকে। (১) পাতা ঝরিবার পর (২) শ্রান্ত হওয়ার পর (৩) এবং বসন্তে গাছের নিদ্রা ভাঙিবার সময় যদি আবহাওয়ার কোনো বিশেষ কারণে তাহার বৃদ্ধি হইবার বাধা ঘটে তবে সেই অবস্থায়।

গাছকে প্রথম দুই নিদ্রিত অবস্থার ভিতর দিয়া কোনো উপায়ে সচেষ্ট অবস্থায় আনিয়া পৌঁছান সম্ভব এই মনে করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কিছুকাল ধরিয়া যে পরীক্ষা করিতেছিলেন তাহা সফল হইয়াছে। কোনো প্রকার নিশ্চেতনক ব্যবহার করিয়া গাছের নিদ্রার মাত্রা পূর্ণ করিয়া দিয়া গাছকে বৃদ্ধির সময়ে সজাগ করিতে পারিয়াছেন। ঈথর এবং ক্লোরফরম্‌ প্রয়োগে নিদ্রিতের সমস্ত লক্ষণই উদ্ভিদে দৃষ্ট হয়; ইহা প্রয়োগে বৃক্ষের বিশ্রাম কাল সংক্ষেপ করিয়া শীঘ্র মুকুলিত করিবার চেষ্টা যথার্থই সফল হইয়াছে।

গ্রীষ্মের শেষভাগে যখন পাতাগুলি সব ঝরিয়া যায় নাই তখন লাইলাক্‌ নামক পুষ্পের একটী গুল্মকে মাটি হইতে তুলিয়া ঈথর প্রয়োগে কয়েক ঘণ্টা রাখিলে গাছের এমন পরিবর্তন উপস্থিত হয় যাহা স্বভাবত ঘটিতে মাসাধিক লাগে। আগষ্টের শেষভাগে লাইলাক্‌ গাছে ঈথর প্রয়োগ করিলে একবার জুন মাসে আর একবার নভেম্বরে অনায়াসে ফুল ফোটান যাইতে পারে।

যে গাছে ঈথর প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার পাতা ও শিকড়কে সম্পূর্ণ ভাবে শুকাইয়া রুদ্ধবায়ু কোনো আধারের মধ্যে রাখিতে হয়। তাহার দরজা বন্ধ রাখিয়া ছাদে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ভিতরের পাত্রে ঈথর ঢালিয়া দেওয়া হয়; এবং ঈথরের বাষ্প বায়ু হইতে ভারি বলিয়া গাছের উপর আসিয়া পড়ে। কেহ কেহ ঈথরের পরিবর্তে আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যবহার করিতে বলেন। বৈদ্যুতিক আলোর উত্তেজনায় ফুলের চাষ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাহায্য করিলেও ইহার রাসায়নিক অতি-ভায়লেট্‌ রশ্মিগুলি গাছপালার পক্ষে হানিকর। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৈজ্ঞানিক আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ইহার সঙ্গে সূর্য্যের আলোর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যবহার করিয়া যথাসময়ের ১৬ দিন পূর্ব্বে ষ্ট্রবেরি, তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে জেরেনিয়ম্‌ মুকুলিত করা হইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কল্পনা ও কল্পনাতীত।

কল্পনা মায়ার রাজ্য স্বপনের প্রায়
ওঠে পড়ে ভাঙ্গে গড়ে ছায়াতে মিলায়;
তাহার আনন্দ কভু নাহি রহে স্থির,
অনিত্য জানিয়া তারে তেয়াগেন ধীর।
যদিও জীবন-চক্র কল্পনা-গঠিত,
আপনার কল্পনায় আপনি জড়িত,
তথাপি রহে না তার কল্পনার ভান
হেরিলে সত্যের জ্যোতি হয়ে আত্মবান।
যদিও কল্পনা-সূত্রে গ্রথিত সংসার,
কল্পনা সংযোগে তার রচনা-বিস্তার,
তথাপি করিয়া এই কল্পনার শেষ
বিরাজে সত্যের রূপ জিনি কাল দেশ।
ঘুচি গিয়া কল্পনার বিচিত্র বন্ধন
কল্পনা-অতীতে হেরি মুক্ত হয় মন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

অষ্টাদশকল্প

প্রথম ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৭ সংখ্যা — ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্তবাদ।

তৃতীয় প্রপাঠক

দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ

১

শ্রীনিম্বার্কদর্শন

(ক)

আমি আমার পূর্ব্ব প্রপাঠকে বেদান্তের মূল পাঁচটি শাখা বা সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি; যথা, (১) শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ; (২) রামানুজাচার্য্য ও শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (৩) বিষ্ণুস্বামীর মতানুযায়ী বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, (৪) মধ্বাচার্য্যের ও বলদেব বিদ্যাভূষণের দ্বৈতবাদ, এবং (৫) নিম্বার্কাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ইহা ভিন্ন বিজ্ঞান ভিক্ষুর বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ও বিশ্বদেবাচার্য্যের নিরঞ্জন ভাষ্যের কথাও বলিয়াছি। আজ আমরা দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ-বাদ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিব। নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য্য উভয়েই দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী, কিন্তু পরস্পরের মতভেদ আছে, ইঁহারা উভয়েই বিভিন্ন বিভিন্ন প্রণালীতে স্বকীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশ উভয় প্রণালীই আলোচনা করিয়া দেখিব; অদ্য নিম্বার্কেরই মত আলোচিত হইবে।

এই স্থানে এই দর্শনের পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদে চিৎ অর্থাৎ চেতন, অচিৎ অচেতন জড় ও ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই তিনটি পদার্থ প্রধানতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোনো কোনো স্থানে ঐ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের পরস্পর স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে; আবার কোনো স্থলে দেখা যাইবে যে, চিৎ ও অচিতের ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ ঐক্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করায় ঐ উভয় জাতীয় বাক্যের মধ্যে কোনোরূপ বাধ্যবাধকভাব সম্বন্ধ আছে মনে করা যাইতে পারে; কেহ মনে করিতে পারেন যে, এক জাতীয় বাক্যই প্রমাণ, অপর জাতীয় বাক্য প্রমাণ নহে, এক জাতীয় বাক্য অপর জাতীয় বাক্যের অর্থকে বাধিত করিবে; অথবা ইহাও কেহ মনে করিতে পারেন যে, এক জাতীয় বাক্য মুখ্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে, অপর জাতীয় বাক্য গৌণ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেননা, উভয় জাতীয় বাক্যেরই বল সমান; উহাদের মধ্যে যদি কোন প্রবল-দুর্ব্বল ভাব থাকিত তবে তাদৃশ কল্পনা চলিত, কিন্তু বস্তুত তাহা বলিতে পারা যায় না; কে বলিতে পারিবে যে, এই সকল বাক্য প্রবল, এবং ঐ সকল দুর্ব্বল? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ উভয়বিধ বাক্যই স্ব স্ব প্রতিপাদ্য অর্থে প্রমাণ। এবং তাহা হইলেই বলিতে হয় যে, চিৎ ও অচিতের সহিত ব্রহ্মের স্বা ভা বি ক ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। এই জন্যই এই মতের নাম ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত। ইঁহারা বলেন উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈতাদ্বৈত-মতই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং এই-রূপেই ইঁহারা তৎসমুদয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভেদ প্রতিপাদক ও অভেদ প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতিস্মৃতিবচন ইঁহারা সাধারণত উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাদের কয়েকটি এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। ইঁহারা যে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ব বা পদার্থ স্বীকার করেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণত এই বচনদ্বয় উল্লেখ করিয়া থাকেন :—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥" * শ্বেতা· ১· ১২।"
"প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতিগুর্ণেশঃ।" † শ্বেতা· ৬·১৬।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি ঐ তিন তত্বের পরস্পর বৈলক্ষণ্য বা ভেদ প্রকাশ করিতেছে :—

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগামজোঽন্যঃ॥" ‡ শ্বেতা· ৪·৫।
"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥" § মুণ্ড· ৩· ১· ১।
"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" ¶ শ্বেত· ১·৯।

ইত্যাদি। ॥ স্মৃতি বচনও এইরূপ অনেক আছে, যথা—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ** গীতা·১৫· ১৬-১৭ ইত্যাদি। ††

আবার এই সকল বাক্যে অভেদ প্রকাশিত হইতেছে—"সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," "তত্বমসি," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "তদাত্মানমেবাবেদ্ অহং ব্রহ্মাস্মি," "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি।"

এখন এই চিৎ ও অচিৎ হইতে ব্রহ্ম কিরূপে ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারেন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের এ সম্বন্ধে যুক্তি কি, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইঁহারা বলেন—আমরা জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপত ঐক্য স্বীকার করি না; কেন না, জীবের স্বরূপ অন্য, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ অন্য। চেতন ও অচেতনের স্বরূপ অন্য, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ অন্য। চেতনের (অর্থাৎ জীবের) স্বরূপ অণু, অচেতনের স্বরূপ স্থূল, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ স্থূলও নহে, অণুও নহে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি অস্থূল অনণু।

আবার শ্রুতিতে বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মা, সকলের নিয়ন্তা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার সত্তা স্বতন্ত্র—স্বাধীন, পরতন্ত্র নহে, এবং তিনি সকলের আধার। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, এই চেতনাচেতনময় জগৎ ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্মই ইহার আত্মা, ব্রহ্মেরই দ্বারা ইহা নিয়মিত হয়, ব্রহ্মেরই দ্বারা ইহা ব্যাপ্ত, এবং ইহার সত্তা ব্রহ্মেরই অধীন, এবং ইহা ব্রহ্মেই আধেয় ভাবে রহিয়াছে।

অতএব যদিও ব্রহ্ম চিৎ-অচিৎ হইতে স্বরূপত ভিন্ন, তথাপি এই সকল কারণে তাঁহাকে চিৎ-অচিৎ হইতে অভিন্নও বলা যাইতে পারে। একটু স্পষ্ট করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম সকলের আত্মা, এবং চিদচিন্ময় এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক। ঘট যেমন মৃত্তিকাত্মক বলিয়া ঘটকে মৃত্তিকা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাও ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ব্রহ্ম জগতের নিয়ন্তা, এবং জগৎ নিয়ম্য। দেখা যায়, যে যাহার নিয়ম্য তাহা তাহার নামে অভিহিত হয়; জীবের শরীর জীবের নিয়ম্য বলিয়া জীব ও শরীরের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্ম নিয়ন্তা এবং জগৎ নিয়ম্য বলিয়া ব্রহ্ম ও জগতের অভেদ নির্দ্দেশ হইতে পারে। ব্রহ্ম ব্যাপক এবং জগৎ ব্যাপ্য। যেমন অগ্নি ব্যাপক এবং ধূম ব্যাপ্য বলিয়া অগ্নি ও ধূমের অভেদ ব্যবহার হয়, (ধূমবিশিষ্ট অগ্নিকেও কেবল 'অগ্নি' বলা হয়), ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই জগতের সত্তা ব্রহ্মের অধীন, ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যে যাহার অধীনে থাকে, তাহাকে তাহার নামে অভিহিত করা যায়। উপনিষদেই পাওয়া যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণের অধীন বলিয়া ঐ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাণ নামেই নির্দ্দিষ্ট করা হই-

---

* ভোক্তা জীব, ভোগ্য জড় জগৎ, ও ইহাদের প্রেরিতা প্রেরক ঈশ্বরকে মনে করিয়া এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে।

† প্রধান অব্যক্ত, প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, তাহাদের পতি; ও গুণেশ গুণ সমূহের ঈশ।

‡ একটি অজ (জীব) প্রীত হইয়া তাহাকে সেবা করে, এবং অপর অজটি (পরমাত্মা) ভুক্তভোগা (প্রকৃতিকে) ত্যাগ করে।

§ সর্ব্বদা একসঙ্গযুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবপ্রাপ্ত দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একটি স্বাদুফল ভক্ষণ করে অপরটি ভোজন না করিয়া দর্শন করে।

¶ দুইটি অজের মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ; একটি ঈশ, অপরটি অনীশ।

॥ কঠ· ৫. ১৩, শ্বেতা· ৬. ১৩; শ্বেতা. ৬. ১৬; শ্বেতা. ১. ৬; চূণ. ৬।

** লোকে অর্থাৎ সংসারে এই দুইটি পুরুষ অর্থাৎ রাশি আছে, একটি ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী, আর একটি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী; ক্ষর বলিতে এই সমস্ত ভূত এবং কূটস্থ অর্থাৎ নিত্যকে অক্ষর বলা হয়। ইহা ছাড়া অপর এক উত্তম পুরুষ আছেন, ইহাকে পরমাত্মা বলা হয়, ইনি অব্যয়-অক্ষর ঈশ্বর, ইনি লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া ইহাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

†† "তত্র যঃ পরমাত্মা তু স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ কর্ম্মবন্ধৈঃ স যুজ্যতে॥"

য়াছে। * আবার ব্রহ্ম জগতের আধার, এবং জগৎ আধেয়। এই আধারাধেয় ভাব সম্বন্ধেও কোনো কোনো স্থলে অভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে ; যেমন কোন ভৌতিক পদার্থ নিজের অধিকরণস্বরূপ মূল ভূতের সহিত অভেদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, চেতনাচেতনময় জগৎ ও ব্রহ্মের এই অভেদ পূর্ব্বোক্তরূপে মুখ্য বলিতে পারা যায় না, ইহা গৌণ অভেদ হইতে পারে। নিয়ম্য নিয়া-মক ভাব প্রভৃতি কয়েকটি হেতুতে এইরূপ গৌণ অভেদ সম্ভাবিত হইলেও সর্ব্বত্র এইরূপ হইতে পারে না। জীব শরীরের নিয়ামক ও শরীর তাহার নিয়ম্য ; এক্ষণে জীব ও শরীরের যে অভেদ ব্যবহার তাহা কখনই মুখ্য নহে, ইহা গৌণ অভেদ মাত্র। অন্যত্র কয়েকটি হেতু সম্বন্ধেও এইরূপ বলিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম হেতু সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকাত্মক বলিয়া ঘটের যেমন মৃত্তিকার সহিত অভেদ স্বাভাবিক, জগৎও তেমনি ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাঁহার সহিত জগতের যে অভেদ, তাহা স্বাভাবিক, এবং মুখ্য। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, এবং সেই জন্যই জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হয়। ইহা পরে আরো বিবৃত হইবে। আরও ইহার উত্তরে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন :—দ্রব্য সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক, এবং ঘট, পৃথিবী প্রভৃতি বিশেষ অর্থাৎ ব্যাপ্য ; এস্থলে যেমন আমরা 'ঘট দ্রব্য' 'পৃথিবী দ্রব্য' ইত্যাদি ব্যবহারে ঘট ও দ্রব্যের মুখ্য অভেদই গ্রহণ করিয়া থাকি, কেননা, বিশেষ সামান্যের সহিত অভিন্ন, চেতনাচেতনময় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেইরূপ ; সর্ব্ব-জ্ঞত্বপ্রভৃতি-অনন্তগুণশালী ও অসীমশক্তিবৈভবযুক্ত ব্রহ্ম সামান্য বা ব্যাপক, এবং চেতনাচেতনময় জগৎ বিশেষ বা ব্যাপ্য ; ঐ ব্রহ্মই জগতের আত্মা-প্রকৃতি ও অন্তরাত্মা-অন্তর্যামী ; অতএব ব্রহ্মই যাহার প্রকৃতি ও অন্তরাত্মা, সেই চেতনাচেতনময় জগতের অন্তরাত্মা ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাহা সুস্পষ্ট। অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম, এই অভেদ ব্যবহার মুখ্যই বলিতে হইবে।

ইঁহারা চিদচিৎ ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য বা অভেদ প্রতিপা-দনের জন্য যে সকল হেতু প্রদর্শন করেন, তৎসমুদয়কে প্রধানত তিনটির মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায় ; যথা—(১) প্রথম, চিদচিৎ জগৎ ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্মাত্মকত্ব) ; (২) দ্বিতীয়, ইহার স্থিতি ও প্রবৃত্তি ব্রহ্মের অধীন (তদা-য়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্ব) ; এবং (৩) তৃতীয়, ইহা ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত (তদ্ব্যাপ্যত্ব)। *

এই ত্রিবিধ হেতু স্বকপোলকল্পিত নহে, শ্রুতি ও স্মৃতিতেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্রেও তাহা উপনিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নোক্ত বাক্যগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহা জানা যাইবে। "এই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃত ;" † "ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ;" ‡ "সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ;" § "হে গুড়াকেশ, আমি সর্ব্বভূতের আশয়স্থিত আত্মা ;" ¶ "আত্মা বলিয়া (ইঁহাকে) স্বীকার করেন ও গ্রহণ করান ;" ‖ "হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজার মূল সৎ, ইহাদের আশ্রয় সৎ, এবং সতেই ইহারা প্রতিষ্ঠিত ;" ** "আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতে সমস্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ;" †† "সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ;" ‡‡ "তুমি একাই এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থান ব্যাপ্ত করিয়াছ ;" §§ "এই জগতে যাহা দেখা বা শুনা যায়, তৎসমুদায়ের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ ব্যাপ্ত করিয়া নারায়ণ রহিয়াছেন ;" ¶¶ ইত্যাদি।

তাঁহারা আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—সত্তা দ্বিবিধ; স্বতন্ত্রসত্তা ও পরতন্ত্রসত্তা। যেখানে স্থিতি ও প্রবৃত্তি স্ব অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত, সেখানে তাহারই নাম পরতন্ত্র সত্তা ; এবং যেখানে ঐ স্থিতি ও প্রবৃত্তি পরের আয়ত্ত, সেখানে তাহা পরতন্ত্র সত্তা। স্বতন্ত্র সত্তা কেবল বিশ্বাত্মা পরব্রহ্মেই আছে। "হে সোম্য, পূর্ব্বে ইহা একই অদ্বি-তীয় সৎই ছিল," ‖‖ ইত্যাদি শ্রুতি প্রভৃতিতে পরব্রহ্মই তাদৃশ স্বতন্ত্রসত্তার আশ্রয় বলিয়া জানা যায়। পরতন্ত্র-সত্তা ব্রহ্মের নিয়ম্য চেতনাচেতনময় সমস্ত পদার্থে রহি-য়াছে। "যাহা ছিল তাহা তাঁহার অধীন ছিল," *†

---

* ছান্দো. ৫. ১. ৬-১৫ ;—'(সেই বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে লোকেরা) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) বলে না, চক্ষু বলে না, শ্রোত্র বলে না, এবং মনও বলে না, তাহারা (তৎসমু-দয়কে) "প্রাণ" এই মাত্র বলিয়া থাকে ; কেন না এই সমস্তই প্রাণ।' তুল:—বৃহ. ৬. ১. ৭-১৪।

* বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২২-২৩ পৃ ; বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ৮৮ পৃ ; বেদান্তকৌস্তভ (শ্রীনিবাসভাষ্য) ১. ১. ১, ১৮পৃ ২. ৩, ৪২, ৬৯৫ পৃ ; বেদান্তকৌস্তভপ্রভা ২. ৩, ৪২।

† বৃহ. ৩-৭৩।

‡ মুণ্ডক, ২, ১, ৪।

§ শ্বেতা, ৬, ১।

¶ গীতা, ১০, ২০।

‖ বে, সূ, ৪, ১, ৩।

** ছান্দো, ৬, ৮, ৪।

†† গীতা, ১০, ৮।

‡‡ শ্বেতা, ৬, ১।

§§ গীতা, ১১, ২০।

¶¶ বিষ্ণু. পু. (?)।

‖‖ ছান্দো. ৬. ২. ১।

*† বেদান্ত রত্নমঞ্জুষা (৯০ পৃ.) ধৃত শ্রুতি।

ইত্যাদি শ্রুতি ও "আমা হইতেই সমস্ত প্রবৃত্ত হয়" * ইত্যাদি স্মৃতির দ্বারা ইহা জানা যায়।

এই পরতন্ত্রসত্তা আবার দ্বিবিধ; কূটস্থত্ব ও বিকার-শীলতা। যাহার জন্মাদি বিকার নাই এবং যাহা নিত্য, তাহাকে কূটস্থ বলা হয়, এবং তাহার ধর্ম্মের নামই কূটস্থত্ব। এই কূটস্থত্ব জীবে রহিয়াছে। জীবের জন্মাদি বিকার নাই, ইহা নিত্য, এবং ইহার স্থিতি ও প্রবৃত্তি উভয়ই পর-অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মের আয়ত্ত, নিজের আয়ত্ত নহে। এই জন্য কূটস্থত্ব রূপ পরতন্ত্রসত্তা জীববর্গে থাকে। এই জীবকে সময়ে সময়ে প্রত্যক্ অক্ষর, পুরুষ, ও ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিকারশীলতারূপ পরতন্ত্রসত্তার লক্ষণ এই যে, এই সত্তাও পর-অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মের আয়ত্ত, কিন্তু ইহা যাহাতে থাকিবে তাহা অবিকারী নহে, ইহার বিক্রিয়া আছে, কিন্তু ইহার আদি বা অন্ত নাই। এই সত্তা অচেতন বা জড়বর্গে রহিয়াছে। কার্য্যকারণ রূপে এই অচেতনবর্গকে প্রধান প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

এইরূপে অভেদবাচক, ভেদনিষেধক ও ভেদবাচক এই ত্রিবিধ শ্রুতিরই সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া থাকে, এই ত্রিবিধ শ্রুতিরই স্ব স্ব বিষয় প্রতিপাদনে প্রামাণ্য থাকে। যে সমস্ত শ্রুতি অভেদ-বা অদ্বৈত-বাচক, তাহারা ব্রহ্মের যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহাই প্রতিপাদন করে; যে সমস্ত শ্রুতি ভেদনিষেধক, তাহারা এই প্রতিপাদন করে যে, চেতনাচেতনময় বিশ্বের স্বতন্ত্রসত্তা নাই; আর যে সমস্ত শ্রুতি ভেদবাচক, তাহারা চেতনাচেতন-ময় বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তা প্রকাশ করে। অভেদবাচক শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মের স্বতন্ত্রসত্তা প্রতিপাদন করিয়া এই প্রকাশ করে যে, ব্রহ্ম নিজাশ্রিত স্বতন্ত্রসত্তায় (সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়া) সমস্ত বিশ্ব হইতে অ ভি ন্ন। ভেদ-বাচক শ্রুতিসমূহ বিশ্বের পরতন্ত্রসত্তা প্রকাশ করিয়া এই প্রতিপাদন করিতেছে যে ব্রহ্মনিয়ম্য চেতনাচেতনরূপ বিশ্বে যে পরতন্ত্রসত্তা আছে তাদৃশ বিশ্বের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে সেই পরতন্ত্রসত্তা নাই, প্রত্যুত তাঁহাতে বিশ্বের বৈল-ক্ষণ্যই (ভেদই) রহিয়াছে,—তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদিরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম রহিয়াছে, এই সকল ধর্ম্মকেই 'অস্থূল' প্রভৃতি পদে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব এতা-দৃশ বিশ্ব হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া ভেদাভেদবাদিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন—সর্প ও সর্পের কুণ্ডল (অর্থাৎ কুণ্ডলী) সকলেই দেখিয়াছেন। এখানে কুণ্ডল ও সর্পে পরস্পর ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। সর্প কুণ্ডলের উপাদানভূত কারণ, এবং কুণ্ডল তাহার কার্য্য। সর্প স্বাধীন, কুণ্ডল পরাধীন; সর্প ব্যাপক, কুণ্ডল ব্যাপ্য। এই জন্য সর্প ব্যাপক, কুণ্ডল ব্যাপ্য। এই জন্য সর্প ও কুণ্ডলকে পর-স্পর হইতে একবারে ভিন্ন বা একবারে অভিন্ন বলা যায় না, উহাদিগকে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলা সঙ্গত। এবং তাহাদের ঐ ভেদ ও অভেদ স্বাভা-বিক। ব্রহ্ম ও জড় জগৎ এইরূপ। এই কথাকেই আর এক জন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে:—সর্প সর্পই, এবং কুণ্ডল কুণ্ডলই, এইরূপে আমরা সর্প ও কুণ্ডল উভয়ের ভেদ স্পষ্টই দেখিতে পাই। আবার যখন দেখি কুণ্ডল সর্প হইতে পৃথক্ নহে, কুণ্ডল সর্পাত্মকই, তখন উভ-য়ের অভেদও স্পষ্ট দেখিয়া থাকি। সর্প যখন লম্বা হইয়া থাকে, তখন কুণ্ডল সূক্ষ্মাবস্থায় তাহাতেই থাকে, তাহার কেবল নাম ও রূপ ব্যক্ত থাকে না; এবং তাহা সেইরূপ থাকে বলিয়াই অপর সময়ে আবার তাহা আবির্ভূত হইতে পারে; তাহা না হইলে, ঐ কুণ্ডল সূক্ষ্মভাবে তাহাতে না থাকিলে আবার আবির্ভূত হইতে পারে না। অতএব স্থূলাবস্থায় কুণ্ডলের সর্প হইতে ভেদ, এবং সূক্ষ্মাবস্থায় অভেদ স্বাভাবিক। জগৎও এইরূপ স্থূলাবস্থায় ব্যক্তনামরূপ হইয়া থাকে। তখন ইহার কারণ ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্ন; এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহা হইতে অভিন্নও। বীজে অঙ্কুরের ন্যায় অব্যক্তাবস্থায় জগৎ সূক্ষ্মরূপে নিজের কারণ ব্রহ্মেই থাকে। অতএব ব্যক্ত অব্যক্ত উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। আবার সূর্য্যাদির সহিত তদীয় প্রকাশের যেরূপ স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয় থাকে জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক। এইরূপে ব্রহ্ম সমস্ত হইতে স্বভাবত ভি ন্ন ও অ ভি ন্ন হওয়ায় তাঁহাকে স র্ব্ব ভি ন্না ভি ন্ন বলা হয় এবং এই জন্যই বিশ্ব হইতে ব্রহ্মে স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকাতেই এই মতের, নাম ভে দা ভে দ বা দ হইয়াছে; ইহারই অপর পর্য্যায় দ্বৈ তা দ্বৈ ত বাদ।

ভাস্করাচার্য্যও ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া প্রতি-ষ্ঠাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভেদাভেদ নিম্বার্কের ন্যায় স্বা ভা বি ক নহে, তাহা ঔ পা ধি ক; ইহা ভাস্কর-দর্শন আলোচনার সময় সবিশেষ বিবৃত করা হইবে। শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ডে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—

"নিম্বার্কভাস্করাচার্য্যৌ ভেদাভেদ নিরূপকৌ॥
তত্রাদ্যানাং বাস্তবঃ স ভাস্করাণামুপাধিতঃ॥"

অতএব নিম্বার্কের দর্শন স্বা ভা বি ক ভে দা ভে দ, এবং ভাস্করাচার্য্যের দর্শন ঔ পা ধি ক ভেদাভেদ; এই

* গীতা, ১০-৮।

বলিয়া উহাদের পরস্পর পার্থক্য রক্ষা করিতে হইবে।

ব্রহ্ম যে এইরূপে সমস্ত হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই তদ্বিষয়ে ইঁহারা এই সকল ঘটক (অর্থাৎ তাদৃশ সিদ্ধান্ত-সম্পাদক) শ্রুতি ও স্মৃতির বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন:—"তিনি এক হইয়া বহু প্রকারে বিচরণ করিয়াছিলেন," * "তুমি এক (কিন্তু) বহুরূপে বহুর মধ্যে প্রবিষ্ট," † "এক দেব বহুভাবে সন্নিবিষ্ট," ‡• "একত্ব হইলে নানাত্ব, এবং নানাত্ব হইলে একত্ব, ব্রহ্মের সেই অচিন্ত্য রূপ কে জানিতে পারে?" § "একত্ব ভাবে পৃথক্ত্বভাবে, ও বহুভাবে আমাকে উপাসনা করে," ¶ "পৃথগ্‌ভূত ও একভূত তোমাকে নমস্কার," ‖ ইত্যাদি। **

অদ্বৈতবাদীরা এখানে একটা কথা তুলিতে পারেন:—ব্রহ্মে যদি চেতনাচেতনময় বিশ্বের স্বাভাবিক অর্থাৎ বাস্তব ভেদাভেদ থাকে, তবে সেই বিশ্বের একটা বাস্তব সত্তা আছে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু তাহা হইলে "এখানে কিছু নানা নাই" †† ইত্যাদি নানাত্ব-নিষেধক শ্রুতির গতি কি? ইঁহারা বলেন ঐ শ্রুতি দ্বারা বিশ্বের নানাত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না, বিশ্বের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই নানাত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মের নানাত্ব-দর্শন দূরে থাকুক, তাঁহাকে যে নানার ন্যায় ("নানেব") দর্শন করে, সেও মৃত্যুর পর আবার মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করে।

আরো একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নানাত্ব-নিষেধক শ্রুতি কাহার নিষেধ করিতেছে? তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় না। কোনোরূপে প্রাপ্ত বিষয়েরই নিষেধ হইয়া থাকে, অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিষেধ হইতে পারে না। অর্থাৎ কোনো প্রকারে যদি একটা কিছু থাকে, তবে 'তাহা নাই' বলিতে পারা যায়। কেহ যদি কিছু খাইতে যায়, খাওয়ার জন্য তাহার কোনোরূপে প্রবৃত্তি হইলে বা সম্ভাবনা থাকিলে 'খাইও না' বলিয়া নিষেধ করা যায়। অতএব এইরূপে বলিতে হয় যে, প্রাপ্ত বিষয়েরই নিষেধ হইয়া থাকে, এবং ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এখন নানাত্বনিষেধক শ্রুতি যদি ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর নিষেধ করে, তবে সেই বস্তু হয় প্রাপ্ত না হয় অপ্রাপ্ত হইবে। যদি তাহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর যদি কোনোরূপে উপস্থিতি থাকে, তবে তাহা হয় সত্য না হয় অসত্য। তাহাকে আমরা সত্য বলিতে পারি না; কেন না, সত্য হইলে তাহাকে আর নিষেধ করিতে পারা যায় না যে, 'তাহা নাই।' সত্যেরও যদি নিষেধ হয়, তবে সত্যরূপ ব্রহ্মেরও নিষেধ আসিয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইল নিষেধশ্রুতি যাহার নিষেধ করিতেছে, তাহা অসত্য। কিন্তু বস্তুত আমরা তাহাকে অসত্য বলিতে পারি না; কেন না, অসত্য হইলে তাহার প্রাপ্তি বা উপস্থিতিই হইতে পারে না, এবং প্রাপ্তি না থাকিলে তাহার নিষেধও হইতে পারে না।

ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, যেমন শুক্তিরজতস্থলে বস্তুত রজত না থাকিলেও অধ্যস্ত বা আরোপিত রজতকে 'ইহা রজত নয়' এই বলিয়া নিষেধ করা হয়, এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মভিন্ন বস্তু এই জগৎ বস্তুত না থাকিলেও অধ্যস্তরূপে মিথ্যাভূতরূপে থাকে, এবং এইরূপেই তাহার প্রাপ্তি থাকে ও তাহার নিষেধও হইতে পারে। * ইহা কেন বলা যায় না তাহা দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। শুক্তিতে যেমন রজতের অধ্যাস বা আরোপ হয়, ব্রহ্মেও সেইরূপ ব্রহ্মভিন্ন জগতের অধ্যাস ইহাই অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রায়; কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ অধ্যাসের পাঁচটি কারণ আছে; যথা, যাহাতে কোন বস্তুর অধ্যাস হইবে তাহা (১) সাবয়বও (২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে, (৩) এবং যে বস্তু তাহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হইবে তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকা চাই; আবার যে ব্যক্তি অধ্যাস করেন, তাঁহার (৪) সাক্ষাৎ বা পরম্পরা যে কোন সম্বন্ধেই হউক ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকা চাই, † (৫) এবং যে বস্তুকে তিনি অধ্যাস করিবেন, সেই বস্তুটি তাঁহার পূর্ব্বে অনুভূত হওয়া আবশ্যক,—তাঁহার সেই বস্তুর অনুভবজনিত একটি সংস্কার থাকা আবশ্যক। শুক্তিরজত স্থলে এ সমস্তই থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস বলিবার সময় আমরা সেই সমুদয় কারণ দেখিতে পাই না। জগৎ যদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রহ্মকে (১) সাবয়ব, ও (২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

---

* "একঃ সন্ বহুধা বিচচার।"

† "ত্বম্ একোঽসি বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ।"

‡ একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।

§ মনু।

¶ একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্" —গীতা, ৯. ১৫।

‖ "পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায়,"—বিষ্ণুপুরাণ ১. ১২. ৭০।

** বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২৬ পৃ।

†† বৃহ. ৪. ৪. ১৯; কঠ. ৪. ২১।

* বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২৬ পৃ।

† চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বভাবত অপটুতা সাক্ষাৎ দোষ; আলোকাদির অস্পষ্টতা, বা কোন রোগাদি প্রভাবে বস্তুকে যথাযথ গ্রহণের অশক্তি পরম্পরা দোষ বলিয়া এখানে ধরা হইয়াছে।

হইতে হইবে, এবং (৩) তাহাতে জগতের সাদৃশ্য থাকিবে; কিন্তু বস্তুত ব্রহ্ম ঈদৃশ নহে, কেন না, তাঁহারা নিজেই স্বীকার করেন যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব, অতীন্দ্রিয় ও নির্গুণ। * আবার (৪) দোষ, ও (৫) সংস্কারও কাহারো দেখা যায় না। অধ্যাস করিবে কে? জীব ভিন্ন আর কেহ নহে; কিন্তু জীবে ঐ উভয়ই নাই; কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন জীব ত তাঁহারা স্বীকারই করেন না। অপর কোন জীবই ত তখন নাই, কেবল অধ্যাসের অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্মমাত্র রহিয়াছে; জীবও ত ভ্রমের কার্য্য, অতএব ভ্রম হইবার পর জীব থাকিতে পারে। †

ভেদাভেদবাদিগণ এইরূপ বিপুল তর্কের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের প র প ক্ষ-গি রি ব জ্র নামক গ্রন্থখানিতে অতি গভীর তর্কযুক্তি দ্বারা অধ্যাসবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এখানে অনাবশ্যক মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে আর কিছু উদ্ধৃত হইল না। ‡

শ্রীমধ্বাচার্য্যমতাবলম্বী দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, চেতন ও অচেতন হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভেদবাচক শ্রুতিসমূহ ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, এবং তাহাই যথার্থ। অভেদবাচক শ্রুতিসমূহ চেতন ও অচেতনের সহিত ব্রহ্মের অভেদ প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা বাস্তব নহে; ঐ সকল শ্রুতিবাক্য বাস্তব অভেদ বুঝাইতেছে না। চন্দ্র ও মুখের পরস্পর সাদৃশ্য থাকায় যেমন মুখকেই চন্দ্র বলা হয়, তাহাদের অভেদ ব্যবহার হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও চেতনাচেতনময় প্রপঞ্চের কোন একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই 'ইহা সমস্তই ব্রহ্ম' ইত্যাদি অভেদ শ্রুতিসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন 'মুখই চন্দ্র' এই অভেদ ব্যবহার স্থলে মুখ ও চন্দ্র উভয়ের সৌন্দর্য্যরূপ সাদৃশ্য থাকে, ব্রহ্ম ও চেতনাচেতন জগতেরও সেইরূপ সত্তা-রূপ সাদৃশ্য আছে; অর্থাৎ যেমন মুখও সুন্দর চন্দ্রও সুন্দর, সেইরূপ ব্রহ্মও সৎ জগৎও সৎ। অতএব সত্তারূপ সাদৃশ্যেই ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ এবং তাহা হইলেই এই অভেদ গৌণ মাত্র, মুখ্য নহে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ইঁহাদের এই মতকে সাধারণত এই বলিয়া পরিত্যাগ করেন যে, সমস্ত শ্রুতিই সমান; ইহাদের প্রবল দুর্ব্বল ভাব নাই; এক জাতীয় শ্রুতি মুখ্য অর্থ এবং আর এক জাতীয় শ্রুতি গৌণ অর্থ প্রকাশ করিবে, তাহা বলিতেই পারা যায় না।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

* নির্গুণ বলিয়া সাদৃশ্যরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকিতে পারে না।

† বেদান্ততত্ত্ববোধ, ১৪পৃঃ।

‡ বেদান্তকৌস্তুভপ্রভাতেও (১. ১. ১; ৩০ পৃঃ) সবিশেষ অধ্যাসখণ্ডন আছে।

যিশু চরিত। *

বাউলসম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমরা সকলের ঘরে খাও না?" সে কহিল, "না।" কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।" আমি কহিলাম "তারা স্বীকার না করে নাই করিল; তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?" সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল "তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।"

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখাদ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো না কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছি—আপনাকেই ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসবের দিনে কথিত বক্তৃতার মর্ম্ম।

সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চ্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র, এদেশে ধর্ম্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দুসমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল—স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সঙ্কট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ্ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্ম্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য আচাররূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্য্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে একদিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর একদিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিপদ আমাদের পূর্ব্বতন বিপদের উণ্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না কিন্তু আমাদের অহঙ্কার বাড়িল। পূর্ব্বে এক দিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহঙ্কারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জ্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধূলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্ব্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জ্জীবতাই যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালও যেমন, মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি। জীবনের ধর্ম্মই নির্ব্বাচনের ধর্ম্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জ্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উণ্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাল, তাহার কিছুই বর্জ্জনীয় নহে ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

একদিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি কিন্তু পাদ্যঅর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না—কিন্তু তুমি সত্য নও যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মত এত বড় অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলতঃ চরিত্রের দুর্ব্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলি ছোট করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না;—নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্দ্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্ম্মবুদ্ধি

চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণ শক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই,—যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিলে সমস্ত কৃত্রিমতা, কুটিল তর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন—তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন—তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্ব্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জালবুনানীর মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কি দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্ত্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড় সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি;—স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্ব-চিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড় করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে, মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখ কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়োনা, আঘাত করিয়োনা, তুমি আমাদের কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়োনা, তুমি আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়োনা। সমস্ত জড় সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম কর, বল তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্ত্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড় যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহবা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহবা দাস্যবৃত্তি, কেহবা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন

করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়, একমুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যেদিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরব-চূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারিদিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র য়িহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোমসাম্রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের যেমন প্রবল মূর্ত্তি, য়িহুদি সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

য়িহুদিদের ধর্ম্ম স্বজাতির গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোবা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কঠিন ও সঙ্কীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু য়িহুদিদের সনাতনআচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্ম্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি য়িহুদি ঋষিগণ পরম দুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্রজ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে তাহাদের বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্ম্মের দ্বারাই য়িহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল তবু রাষ্ট্ররক্ষাব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতি লাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে য়িহুদিদের সমাজে ঋষিঅভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসঙ্কলিত তাল্‌মদ্ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্ম্ম-পালনের মূলে যে একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই বাণীকে সে হয়ত সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে য়িহুদিরা আপনাপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র য়িহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেককারী যোহন্ যখন য়িহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। য়িহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি ত রাজা, তাঁহাকে ত রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন করিবে কি করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, সয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত

য়িহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই সর্ব্বত্রব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্যউপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক্‌ দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন; "যাহারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।" "ধীরাঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং যাহাঃ সর্ব্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত—বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। যেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না; যেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র, আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্র ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্ত্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন, মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যেও নহে আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ—আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অঙ্গীকাররক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই সয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল, তুমি রাজা, তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহবশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর, আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে মানকে দেখে, তখনি আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড় দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড় করে না তেমনি বাহ্য আচারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না, কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই; যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোট হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তাহার শক্তিহ্রাস হয় এবং সে কেবলি ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলিনৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত

একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সঙ্কীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরসসম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া নৈবেদ্য দিয়া বস্ত্র দিয়া স্বর্ণ দিয়া ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়, ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক্ তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চ্চনাদ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দূর দেশ দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন —কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে; কারণ, এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড় করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনি মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুণে পোড়ে না, যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন সমস্ত মনুষ্যের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখ বহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম। দুর্ব্বলের নির্জ্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহঙ্কারের গৌরব নহে —কারণ অহঙ্কারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক—তাহার নিজের মধ্যে স্বত উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না—তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মত নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্ব্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে—শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্ব্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার গৃহে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সঙ্কোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপে নব ধর্ম্মান্দোলন।

ইউরোপের নব ধর্ম্মান্দোলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলেই রামমোহন রায়ের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কত আগে যে ইহার পূর্ব্বসূচনা করিয়া গিয়াছিলেন সে কথা ইউরোপ জানে না এবং আমাদের দেশের লোকে সম্ভবতঃ আরও কম জানে।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে তিনি তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের একটা আলোচনা মাত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের সার সার সত্যগুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের পরস্পরের ঐক্য তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়কে এমন করিয়া দেখিলে অত্যন্ত

ক্ষুদ্র করিয়া দেখা হইবে। অবশ্য জগতের কোন সভ্যতার এমন কোন দিক্ ছিল না যাহা রামমোহন রায়ের জানা ছিল না। ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, আইন, অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রবেশ ছিল। তথাপি তাঁহাকে একজন আশ্চর্য্য মনস্বী মাত্র মনে করা ভুল। তাঁহার এ পাণ্ডিত্য তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্গত ছিল। ইহা পাষাণস্তূপের মত তাঁহার জীবনের উপরে ভারের মত চাপিয়া ছিল না বরং হিমাচলের উত্তুঙ্গ তুষাররাশির ন্যায় নানা ভাবের নদীতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

রামমোহন রায় ভিন্ন আর একজন মানুষের নাম আমরা করিতে পারি না যাঁহার অধ্যাত্ম সাধনা এমন বিশ্বানুপ্রবিষ্ট এবং সকল দিক দিয়া এমন পরিপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনা চিরদিনই অন্তর্মুখীন ও ভাবপ্রধান। এদেশে কি জ্ঞানপন্থী কি ভক্তিপন্থী সকলেই আপনার ব্যক্তিগত ভাবের ভিতরেই সেই পরমপুরুষকে দর্শন করিতে চায়—বিশ্ব জগৎ কোথায় থাকে পড়িয়া! সেই জন্য যখন শুনি যে আমাদের ধর্ম্মের ঔদার্য্য যেমন এমন আর কোন ধর্ম্মের নয়, আমরা সকল মতেরই বিচিত্র সার্থকতা দেখিতে পাই তখন আমার মনে অনেক সময় সন্দেহ হয় সে ঔদার্য্য ঔদাসীন্যের সমজাতীয় কি না। "যে যে পথ দিয়া যাক্ সে সত্যে পৌঁছিবে" এ কথার ভিতরে একটা ঢিলা ভাব আছে, সচেষ্ট পরীক্ষার যে একটা নিশ্চয়তা তাহা ইহার মধ্যে নাই।

রামমোহন রায় বিশ্বমানবের অখণ্ড স্বরূপের মধ্যে বিশ্বমানবের বিধাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের ভাবলোকের মধ্যে নহে, ধ্যানের মধ্যে নহে, তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যেও নহে, সমস্ত মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী সকল চেষ্টা ও সকল চিন্তার মধ্যে তিনি স্তব্ধ-নিবিষ্ট সেই এককে ভাবিতে চাহিয়াছিলেন

"জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে!"

সেই জন্যই কি তিনি কথা কহিতে কহিতে এক একবার গায়ত্রী মন্ত্রধ্যানের দ্বারা সমস্ত বিশ্বচরাচরের মধ্যে আপনার আত্মার বাধাহীন প্রসরতাকে অনুভব করিয়া লইতেন না?

রামমোহন রায়ের পর হইতে আমাদের দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সকল সাধনা কেবলি বিশ্বানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যাহা বিশ্বের মধ্যে স্থান পাইবার নয়, যাহা কেবল বিশেষভাবে আমাদের সংস্কারের জিনিস, তাহার অন্য যাহাই সার্থকতা থাক্ আমরা তাহাকে গ্রহণ করিতে ভরসা পাইতেছি না। আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছি যে আমাদের সমাজের কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়া আর সত্যের পরিমাপ চলিবে না, এখন বিশ্বমানব আমাদের মানদণ্ড হইবে—সে যাহাকে বলিবে থাকিবার, তাহাই থাকিবে; সে যাহাকে বলিবে বিনাশ পাইবার, তাহাকে আমাদের মুগ্ধ আসক্তি বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবে।

সময় আসিয়াছে যখন আমাদের উচিত যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের বিশ্বরূপ-দেবতা সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে কেমন করিয়া কাজ করিতেছেন তাহা আমরা সজ্ঞানভাবে অনুসন্ধান করি ও উপলব্ধি করি। কিন্তু রামমোহন রায়ই না বলিয়া গেছেন যে আমাদের নিজেদের পরিচয় নিজেদের মধ্যে নাই, সমস্ত মানুষের মধ্যে আমাদের যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে হইবে?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইউরোপে আধুনিক কালে যে নূতন ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে তাহার পূর্ব্বসূচনা রামমোহন রায় কত পূর্ব্বে করিয়া গেছেন। এমন কি তাহার আদর্শও তাঁহার আদর্শেরই অনুরূপ। গত শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব সমস্তই অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহই কেবল হইয়াছে, সত্য লাভ হয় নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশিষ্টতার পথে যতদূর যাইবার গিয়া সংখ্যাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—এখন এত বিশিষ্টতা, এত বৈচিত্র্য মিলাইবে কেমন করিয়া, যাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ তাহাদের মধ্যে ঐক্য খুঁজিয়া পাইবে কি উপায়ে তাহাই ইউরোপের ভাবিয়া দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে, এ কথা ইউরোপ স্থির জানিতেছে যে মিলাইবার শক্তি আছে কেবল ধর্ম্মের। বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্যের মূর্ত্তি নাই। একমাত্র অধ্যাত্মসত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিশিষ্ট সাধনার চরম পরিণাম, সকল নদী সমুদ্রে যেমন করিয়া মেলে সমস্ত বিশিষ্ট সাধনা ধর্ম্মের অখণ্ড সাধনার মধ্যে তেমনি করিয়া মিলিয়া যায়—কোথাও বিরোধ আর থাকিতে পায় না।

ভারতবর্ষই এ কথা বলিয়াছে, যে অধ্যাত্ম সত্য যে ঐক্যকে রচনা করে সে খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডকে জোড়া দিবার ঐক্য নহে, সে একেবারে রাসায়নিক অখণ্ড ঐক্য। সেই অখণ্ড ঐক্যকেই অধুনা ইউরোপ চায়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে ভীত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ আপনার মানবরূপ তাঁহাকে দেখাইলেন। অর্জ্জুন তখন সংবৃত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বিশ্বরূপ এবং মানবরূপকে যখন আমরা স্বতন্ত্র করিয়া

দেখি তখন বিশ্বরূপের অগণ্য বৈচিত্র্য চিত্তকে বিভ্রান্ত করে এবং মানবরূপের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য ব্যক্তিগত ভাবের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া যায়। ইউরোপে বিজ্ঞানদর্শন সেই বিশ্বরূপের সাধনায় নিমগ্ন ছিল এবং খৃষ্টধর্ম্ম মানবরূপের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া বিশ্ববিমুখ হইয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ সেই যুগযুগান্তের বিচ্ছেদ মিলিত হইবার উপক্রম করাতে ইউরোপে নূতন আশা বহুযুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের ভিতর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছে। এবার আর আয়োজন নয়, এবার যজ্ঞের হোমহুতাগ্নি জ্বলিবে, এই আশ্বাস নানা লোকের মুখে পাওয়া যাইতেছে।

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি ঐ বাহির পথে!"

আমি জানি, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক লোকের মনে একটা বিরুদ্ধ ভাব আছে। তাহার প্রধান কারণ আমরা পাদ্রীদের মুখেই খৃষ্টধর্ম্মের কথা শুনি, আমরা তাহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ভিতর হইতে দেখি না। আর একটা কারণ এই যে আমরা জানি কিছুদিন পূর্ব্বেও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব ইউরোপে কিরূপ ম্লান ছিল। বিজ্ঞান তো ইহাকে উড়াইয়াই বসিয়াছিল, শিল্প-সাহিত্যও ইহাকে কোন আমল দেয় নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন এক গির্জ্জায় একদিন একজন উপদেষ্টার মুখে খৃষ্টধর্ম্মের সুতীব্র নিন্দাবাদ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে খৃষ্টের ভিতর দিয়া ভিন্ন ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে না এ কথা যদি বল তবে মানুষ বরং সয়তানকে ভজিবে তথাপি ঈশ্বরকে চাহিবে না। সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মকে যদি রক্ষা করিতে চাও তবে অখৃষ্টান মতামত প্রচার করার প্রয়োজন।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে খৃষ্টধর্ম্মের ভিতরে এমন কি আছে যাহাতে একজন পাদ্রীও তাহার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এমন করিয়া প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হন? যাঁহারা সেই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারাই যদি সে ধর্ম্মের এমন প্রতিবাদী হন তবে আমরা যে তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিব তাহাতে আর বলিবার কথা কি আছে?

খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে আধুনিককালের প্রধান অভিযোগ এই যে সে ধর্ম্মে চারিত্রনীতিকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়াছে যাহাতে মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক্ চাপা পড়িয়া যায়। সৌন্দর্য্যবোধ, কাব্য, কলা, তত্ত্বজ্ঞান এ সব তাহার ভিতরে কোথাও স্ফূর্ত্তি পায় না। অথচ যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে এ সকলেরই স্থান আছে—কারণ আধ্যাত্মিক সাধনা শূন্যতার সাধনা নহে—সে সকল সীমার মধ্যে রন্ধ্র করিয়া অসীমের অপরূপ আনন্দকে ধ্বনিত করিয়া তুলিবার সাধনা, সে "সব ঘট পূরণ পূর রহা হৈ" সকল ঘটকে পূর্ণ-করা পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশিত করিবার সাধনা, তাহার কাছে জীবনের কোন অংশই বাদ পড়িয়া যায় না। অথচ খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত জীবনকে এমন করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিতরে মিলাইয়া লয় না ইহা সত্য,—সে কেবল বিধিনিষেধের ধর্ম্ম হইয়া মানুষকে কোন্‌টা পাপ ও বর্জ্জনীয় এবং কোন্‌টা পুণ্য ও গ্রহণীয় তাহা জানাইয়া দেয়—সমস্তকেই গ্রহণ করিয়া অমৃত করিয়া তুলিবার সাধনা তাহার সাধনা নহে।

এ গেল এক অভিযোগ। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সে ধর্ম্ম খৃষ্টকে ঈশ্বর এবং মানবাত্মার মধ্যস্থ করিয়াছে। খৃষ্ট ভগবানের অবতার। তাঁহারই মধ্যে ঈশ্বরের যে প্রকাশ হইয়াছে এমন আর কোন সময়ে অন্য কাহারও মধ্যে হয় নাই, এ কথা সে বলে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এক দিকে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহত্ত্ব ও বিপুলতা, অপূর্ব্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য মানবমনের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরলোকের একটি সুগভীর আত্মবোধও মানুষের মধ্যে খুলিয়া গেছে। সুতরাং এ কথা মানুষ বুঝিয়াছে যে ভগবানের প্রকাশ কোন এক সময়ে কোন একজন লোকের মধ্যে হইতেই পারে না—প্রত্যেক মানুষের আত্মার তিনি একলা স্বামী এবং সেখানে কেবল খৃষ্টরূপ ধারণ করিয়া তিনি যে দেখা দেন তাহা নহে, সেখানে তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ—তাঁহার বিশ্বরূপ ও মানবরূপ একাধারে বিরাজিত। সেখানে "সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং"—সকল ভূতের মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে সকল ভূতকে দেখা যায়। সেই তো ভগবানের সত্য প্রকাশ। সে কোন গুহ্য প্রকাশ হইতেই পারে না, কোন একটি বিশেষ রূপেরও প্রকাশ হইতে পারে না।

এ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য পরে বিচার হইবে কিন্তু এখন যে পানী বীচ মীন পিয়াসী—জলের মধ্যে থাকিয়াও মীন পিয়াসী, তাহার সে পিপাসা কোন বিশিষ্ট জ্ঞান মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না। ইউরোপের ধর্ম্মকে চাই, অত্যন্ত চাই, একান্তই চাই; শুষ্ক পৃথিবী যেমন আকাশের অমৃতময় বারিবর্ষণকে কামনা করে তেমন করিয়া চাই। তাহার কারণ প্রাকৃতিক শক্তির উপরে জয়ী হইয়া উঠিবার সাধনায় তাহার সমস্ত চেষ্টা অহোরাত্র কেবল বাহিরের দিকেই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, অন্তর একেবারে শূন্য, সেখানে নিখিল রসের উৎস খুলিয়া যায় নাই, সেখানে স্তব্ধতার নিবিড় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছে না, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং দেখা দিতেছেন না।

কেবল যন্ত্র-তন্ত্র কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মের অসংখ্য জাল সৃষ্টি হইতেছে—চাকা ঘুরিতেছে, সুখ দুঃখ আবর্ত্তিত হইতেছে, এক মুহূর্ত্ত কাহারও বিশ্রাম নাই, নিবিষ্ট হইয়া আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইবার শক্তিও নাই।

অথচ আন্তরিকতাই ধর্ম্মের প্রাণ। বাহিরের চঞ্চল সৌন্দর্য্য যখন ধর্ম্মের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, তখন সে আর রূপমাত্র থাকে না সে অপরূপ হয়, তখন বিনাপুষ্পে বন বন পুষ্পিত হইয়া উঠে, সমস্ত শূন্যের মধ্যে অনাহত শব্দে রাগিণী বাজিতে থাকে। বাহিরের কর্ম্ম যখন ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে চায়, তখন সে বাহিরের সফলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, অন্তরের মধ্যে নিরাসক্ত রিক্ততাই তখন তাহাকে আনন্দে ভরিয়া দেয়। ধর্ম্ম কেবলি বাহিরকে ভিতরের দিকে লইয়া আসে—এই তাহার কাজ।

বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চর্চ্চায় ধর্ম্মের এই আন্তরিকতা ইউরোপ হারাইতে বসিয়াছিল। বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলার একটি অংশমাত্র বলিয়া মনে করে, মানুষকে স্বতন্ত্র করিয়া সে দেখেই না। বিজ্ঞান বলে, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত শক্তির দ্বারা মানুষ পরিচালিত, তাহার নিজের একলার কোন বিশিষ্টতা নাই। ধর্ম্মের এ রকমের দৃষ্টিই নয়—বরং ইহার উল্টা। ধর্ম্ম জানে যে সমস্ত বিশ্বজগতের সারসর্ব্বস্ব হচ্ছেন আত্মা—বিশ্ব-অভিব্যক্তির সেই শেষ পঁইঠা—সেই আত্মার মধ্যেই সমস্ত আসিয়া মিলিয়াছে; সুতরাং মানুষ যখন আত্মবান্ জীব, তখন বিশ্বপ্রকৃতি হইতে সে এক জায়গায় স্বতন্ত্র—কারণ বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণ মঙ্গল ভাব ও আদর্শ কেবল মনুষ্যেরই মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। মানুষ শুধু শক্তি দেখে না, নিয়ম দেখে না, সে বিশ্বপ্রকৃতির মঙ্গল অভিপ্রায় দেখে। সে জানে যে এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই জড় হইতে জীবে, জীব হইতে মনুষ্যে ক্রমাগত উদ্ভিন্ন হইতেছে—এই মঙ্গল অভিপ্রায় বিশ্বপ্রকৃতির কণ্ঠের মালা, ইহারি পরিচয় লাভ করিয়া তত্ত্বদর্শিগণ আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে এই কথা নিঃসংশয়ে বলিয়া থাকেন। সুতরাং ধর্ম্ম আত্মার আলোকে বিশ্বকে পাঠ করে, বিজ্ঞানের মত অন্তহীন কার্য্যকারণের শৃঙ্খলকে টানিয়া লইয়া চলে না।

ধর্ম্মে তাই অন্তর বাহিরের পূর্ণ সামঞ্জস্য এবং সে সামঞ্জস্য আত্মায়। সুতরাং ধর্ম্ম না থাকিলে সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া জীবনের সমগ্রতা ভাঙিয়া পড়ে। ইউরোপে তাহাই হইয়াছে। সে বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে মানুষকে অগণ্য বস্তুরাশির অন্তর্গত করিয়া দেখিয়া বাহ্যজগতের জড়প্রবাহের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। জীবনের সমগ্রতা নানা ভাগ বিভাগে ভাঙিয়া গেলে কেবল বিরোধ দ্বন্দ্ব ও বেদনাই জাগিয়া উঠে, আপনাকে লইয়া আপনার অশান্তির আর নির্ব্বাণ হয় না। তখন স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত বাধে, সৌন্দর্য্যবোধে নীতিবোধে বিবাদ করিতে থাকে, শুষ্ক জ্ঞান কেবল কথা সাজাইয়া ও যুক্তির জাল সৃষ্টি করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার দৈন্যকে ঢাকা দিতে চায়, কেবলি বিরোধ জমিয়া উঠে এবং সে বিরোধ কিছুতেই মিটিতে চায় না। আধুনিক ইউরোপে কি আমরা এই ছবিই দেখিতে পাইতেছি না?

বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানে প্রধানভাবে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের পন্থা ও প্রণালী যদি চ বিভিন্ন, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুষ্ক তর্কের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া না দেখিয়া জীবনের ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কতটা কাজে লাগে সেই দিক্ দিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা উভয়দলের মধ্যেই সমান বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে একদল বলেন, আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের বুদ্ধিগম্য নহেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্॥

আত্মাকে বলার দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা বা বহুশাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না—যাঁহাকে ইনি বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহারই নিকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আত্মাকে লাভ করার অবস্থা আমরা যে অবস্থায় আছি তাহার উপরের কথা, সাধনার দ্বারা সেখানে আমাদের উঠিতে হয়,—তার মানে—বাহিরের সঙ্গে অন্তরের পরিপূর্ণ যোগ, এ তত্ত্বকথা মাত্র নয়, এ আমাদের প্রত্যক্ষগম্য সত্য।

পক্ষান্তরে অন্যদল যাঁহাদের মতবাদের নাম প্র্যাগ্ম্যাটিজ্ম্ তাঁহারা বলেন যে জীবন যখন গতিশীল ও উন্নতিশীল তখন নিত্যসত্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা আমরা জানিতেই পারি না। সে জানা তত্ত্বে জানা হয় মাত্র, জীবনে জানা হইতেই পারে না। জীবনের ভিতর দিয়া জানিতে গেলে সত্যকে টুকরা টুকরা করিয়া জানিতে হইবে। প্রথম দল বলেন ধর্ম্ম মানুষের সকল দ্বন্দ্বের সেতু, সে সকল জানাকে অতিক্রম করিয়া আছে—তাহারি মধ্যে সকল জিনিসের চরম সার্থকতা। দ্বিতীয় দল বলেন ধর্ম্মকে আমাদের অতীত করিয়া রাখিলে সে একটা কল্পনামাত্র হয়, সে যখন আমাদের ব্যবহারের জিনিস তখন তাহার মতামত সকল কতটা কাজে লাগে তাহাই দেখিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম দল বলেন, সত্য যেখানে আছেন সেখানে আমাদের উঠিতে হইবে; দ্বিতীয় দল বলেন আমরা যেখানে আছি সেখানে সত্যকে নামিতে হইবে। মোটা-

মুটি এই দুইটি ধারায় বর্ত্তমান চিন্তার আন্দোলন ইউরোপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

একদল যাঁহারা আপনাদের মতকে নূতন ভাববাদ (New Idealism) নাম দেন্ তাঁহাদের প্রধান নেতা অধ্যাপক অয়্কেন্, একজন জর্ম্মাণ—ইংলণ্ডে অধ্যাপক জোনস্, অধ্যাপক ব্রাড্লি প্রভৃতি এই ভাবের পোষকতা করিয়া থাকেন। অন্যদল যাঁহারা আপনাদের মতকে প্র্যাগ্ম্যাটিজ্ম্ নাম দেন তাঁহাদের প্রধান নেতা, আমেরিকার পরলোকগত অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেম্স্ ইংলণ্ডে সিলার ডিউয়ি ও ফ্রান্সে ইঁহাদের গুরু হাঁরি বার্গসঁ এ মতের প্রধান আচার্য্য। আমরা ক্রমে ক্রমে এ সকল মতামত লইয়া আলোচনা করিব।

অধ্যাপক অয়কেন্ খৃষ্টধর্ম্মকে তাঁহার নূতন ভাববাদের দিক্ হইতে বড় করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্যটা কি তাহা দেখা যাইবে।

গোড়ায় একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে খৃষ্টধর্ম্ম তাহার আরম্ভকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিচিত্রতার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সেই অসংখ্য মতামতের ভিড় হইতে তাহার আসল সত্যটি উদ্ধার করা অতি কঠিন। তাহার অবস্থা ঠিক আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মত। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদও আছে আবার ঘেঁটু মনসাপূজাও আছে। সকল ঐতিহাসিক ধর্ম্মেরই ঐ এক দশা, তাহাদের মধ্যে নানাকালের নানা সঞ্চয় আছে।

অয়্কেন্‌প্রমুখ আচার্য্যগণ তাই বলেন যে আমাদের জীবনের ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে পড়িলেই তাহার নিত্যস্বরূপটি কি তাহা স্থির হইতে বিলম্ব হইবে না। জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাহাই দাঁড় করানো যাক্ তাহা বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা মাত্র। জীবনের ভিতর হইতে দেখিলে অনেক বাদ বিবাদের সামঞ্জস্য মিলিয়া যায় কিন্তু কেবল তর্কের দিক্ দিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সংসাধন অসম্ভব। এখানে এ প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক যে অয়্কেন্ জীবন বলিতে কি বুঝিতেছেন? যদি প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিগত জীবন হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মমত ভিন্ন হইতে থাকিবে, তখন ধর্ম্ম হইবে প্রত্যেকের আপন আপন মনগড়া ধর্ম্ম।

কিন্তু জীবন অর্থে অয়কেন্ কেবল মানসিক জীবন বুঝিতেছেন না। আমি বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ সমগ্রতা আছে যেখানে সত্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পান্। সে সত্য আমার তোমার ধারণাগত সত্য নহে, পরন্তু সকল জনের সকল ধারণার অন্তর্নিহিত বাস্তবিক সত্য। সুতরাং সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জীবনই ধর্ম্মের নিত্য সত্য কোথায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কষ্টিপাথর স্বরূপ। আমরা যখন সেই সমগ্রতার বোধে উত্তীর্ণ হই, খণ্ড ধারণা যখন আমাদের মনের মধ্য হইতে ঘুচিয়া যায় তখনই সকল ধর্ম্মের সকল সত্য আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

পণ্ডিত লাইব্‌নিজ্ বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে একটি কথা বলিয়াছেন সে কথাটি জীবনের ভিতর হইতে ধর্ম্মকে দেখিবার এই কথাটির টীকাস্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অতি সরল, কিন্তু নিয়ম যেখানে খাটিতেছে সেখানেই অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশ। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। ধর্ম্মের নিত্য আদর্শগুলি সরল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যুগে যুগে তাহার প্রকাশ বহুধা-বিচিত্র।

ধর্ম্ম কি—ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা মিথ্যা। এইটুকু মাত্র বলা চলে যে আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম এ সমস্তের সাধনের দ্বারা আমরা যাহা পাই তাহা খণ্ড পাওয়া, সে শরীরের পাওয়া, মনের পাওয়া, বুদ্ধির পাওয়া—তাহাতে যখন তৃপ্তি মেলেনা, যখন অখণ্ড পাওয়ার জন্য আমাদের প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে, তখনই আমরা ধর্ম্মকে চাই কারণ ধর্ম্মকে পাওয়াই অখণ্ড পাওয়া।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—

যাহাকে পাইলে অপর লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না, ধর্ম্মের পাওয়া সেই পাওয়া।

জগতে যে কয়েকটি বড় ধর্ম্ম আছে তাহারা কেহ বা নীতির দিকে কেহ বা মুক্তির দিকে বেশি ঝোঁক দিয়াছে। কেহ নিয়ম মানিয়া ভৃত্যের মত চলিতে চায়, কেহ নিয়মের উপরে উঠিয়া সত্যের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ বন্ধুর সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। কাহারও কাছে ঈশ্বর কেবল বিধাতা ও শাস্তা কাহারও কাছে তিনি পিতা মাতা ও বন্ধু। নীতিপ্রধান ধর্ম্ম বলে যে জগতে যাহা আছে তাহা বেশ আছে তাহার মধ্যে নীতিবিধানকে যোগ করিয়া দিলেই মানুষের দৈন্য দূর হয়, মুক্তি যাহাদের শেষ লক্ষ্য সে সকল ধর্ম্ম বলে, যাহা আছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম জগতে নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইবার নহে।

সেমেটিক্ ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে অর্থাৎ মোহম্মদীয় ও ইহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মের মধ্যে একমাত্র খৃষ্টধর্ম্মই মুক্তিকে শেষ লক্ষ্য বলিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মেরও ইহাই শেষ লক্ষ্য। কেবল প্রভেদ এই যে আমরা অদ্বৈত অবধি না পৌঁছান পর্য্যন্ত কোথাও থামিতে চাই না। আমরা মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে, সমাজে, জগতে ও বিশ্বমানবের মধ্যে কল্যাণবুদ্ধিকে ও মৈত্রীকে প্রসারিত করাকেও মুক্তি বলি না—খৃষ্টধর্ম্ম এই পর্য্যন্ত আসিয়াই

থামে—আমরা বলি আত্মা যখন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইয়া আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, আপনার মধ্যে আপনার অন্তরতম আত্মাকে না দেখে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তি নাই। মুক্তি মানে দেহের সংস্কারকে একেবারে ছাড়াইয়া আত্মার লোকে নূতন করিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া—আত্মবান্ হওয়া এবং দ্বিজ হওয়া।

ইউরোপীয়গণ এ জায়গায় হিন্দুদের গালি দিয়া থাকেন। অধ্যাপক অয়কেনও অনেকবার অনেক স্থানে বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মের মুক্তির এই আদর্শে কর্ম্মের প্রেরণা নষ্ট হয়, বৈরাগ্য মানুষকে পাইয়া বসে এবং জীবনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

খৃষ্টধর্ম্মকে ইঁহারা এই বলিয়া শ্রেষ্ঠ আসন দেন যে সে ধর্ম্মেও যদিচ বলে যে "আত্মাকে হারাইয়া যদি সমস্ত জগৎকে মানুষ পায় তাহাতেই বা মানুষের লাভ কি," তথাপি সে ধর্ম্মে বিবেক বৈরাগ্য সাধনের চেয়ে নীতির সাধনার উপর বেশি জোর দিয়া থাকে। পৃথিবীতে মঙ্গলকে পুণ্যকে অমঙ্গল ও পাপের স্থানে সংস্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে হইবে নিয়তই এই দিকে খৃষ্টধর্ম্ম মানুষের চেষ্টাকে ঠেলিয়া দেয়। সেই জন্য এ ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম—বিশেষতঃ আমাদের দেশের ধর্ম্মের ন্যায় দুঃখ হইতে মুক্তি চায় না; সে বলে দুঃখই পূজা, ভগবান স্বয়ং প্রেমে মনুষ্যের দুঃখের কণ্টককিরীট পরিয়াছেন, সেই তাঁহার শ্রেষ্ঠরূপ—সুতরাং সেই দুঃখভার বহন করিয়া মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিতে হইবে।

দুঃখকে বরণ করিয়া দুঃখের উপরে জয়ী হইয়া উঠিবার সাধনা ইউরোপে যদি সত্য না হইত, তবে আমরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতিকে কেতাবী জিনিস বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখি আত্মীয় স্বজন সমাজ সমস্ত পরিহার করিয়া বর্ব্বরদের মধ্যে আফ্রিকার অরণ্যে বা অন্যত্র অসভ্য দেশে খৃষ্টান মিশনারী চিরজীবন উৎসর্গ করিয়া পড়িয়া আছে তখন স্বীকার করিতেই হয় এ দুঃখের সাধনার মূল্য আছে, নিশ্চেষ্টতা ও বৈরাগ্যের চেয়ে ইহার শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য অয়কেন বলেন যে ধর্ম্মনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক এ দোঁহার শুভ সম্মিলন খৃষ্টধর্ম্মে যেমন ঘটিয়াছে এমন আর অন্য কোন ধর্ম্মে হয় নাই। এমন বৈপরীত্যের মিলনও অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় নাই। একদিকে আত্মার সঙ্গে সেই পরমপিতার প্রেমে ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ যোগ, সেই যোগ পত্নীর সঙ্গে স্বামীর ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার মিলনের মত; তিনি মানুষের ভিতরে আসিয়া মানুষের প্রিয়তম হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিতেছেন—আবার অন্য দিকে মানবসেবা, দুঃখভার গ্রহণের দ্বারা তাঁহার বিধানকে মানুষ মানিয়া লইয়া তাঁহার মঙ্গলসৃষ্টিকার্য্যে ও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সার্থক হইতেছে। তিনি পিতা এবং তিনি বিধাতা—তিনি রাজা এবং তিনি স্বামী—এই বিপরীত সম্বন্ধগুলি খৃষ্টধর্ম্ম তাঁহার মধ্যে মিলাইয়াছে।

আমার মনে হয় যে এক বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ আর কোন ধর্ম্মেই এমন অন্তরতম এমন নিকটতম নয়। ঈশ্বর মানুষরূপে অন্তরের সমস্ত দুঃখ দৈন্য পাপের মধ্যে তাঁহার প্রেমে নামিয়া আসেন এবং মানুষও সেবার দ্বারা পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা কঠিন দুঃখের দ্বারা ক্রমাগতই তাঁহার দিকে উন্নীত হয়, ইহাই খৃষ্টধর্ম্মের মূল কথা। যদি বল, এ মূল কথা তো প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম অর্থাৎ গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্ম মানেনা তাহা সত্য। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যে ইহার অভিব্যক্তির সোপানপরম্পরা যে ব্যক্তি অনুধাবন করিয়াছে, তাহার কাছে এ মূল কথাটি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। অবশ্য ইতিহাসের মধ্যেও এ আদর্শের বিকৃতির দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি মেলে—যত অন্যায় যত অত্যাচার ও রক্তসেচন এ ধর্ম্মের নামে হইয়াছে এমন আর কোন ধর্ম্মের নামে হইয়াছে কি না সন্দেহ। তথাপি ইতিহাসকে কেবল ঘটনার দিক হইতে এবং খণ্ডকালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। অন্যায় অত্যাচারের ভিতর দিয়াও যেখানে সত্য ইতিহাসের মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছেন এবং সেই নিত্য সত্যের সূত্রে এক কালের সঙ্গে অন্য কাল অঙ্গাঙ্গভাবে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে ইতিহাসের সেই অন্তরতর চিরন্তনতার দিকে, আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঐতিহাসিক ধর্ম্মমাত্রেই নানা জাতির নানা কালের বিচিত্রভাবের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ক্রমেই বিচিত্র বিচিত্রতর হইয়া উঠে। বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে এমন আর কোন ধর্ম্মের মধ্যে নাই। অথচ কেবল বৈচিত্র্য ধর্ম্মকে প্রাণ দেয় না, ধর্ম্মের মধ্যে একটি নিত্য আদর্শ অচলপ্রতিষ্ঠভাবে বিদ্যমান থাকা চাই। রামমোহন রায় ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মের সেই নিত্য আদর্শকে দেখিয়াছিলেন—খৃষ্টধর্ম্মেরও মূল আদর্শটি কি তাহা ইউরোপীয় ভাবুকগণ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করিতেছেন।

ইহুদিধর্ম্ম হইতে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া উক্ত ধর্ম্মের পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বমূলক ধর্ম্মনীতি ইহার মধ্যে পাপপুণ্যের সংঘাতের ভাবটিকে খুব তীব্র করিয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে। তার পর গ্রীক্ ভাবের সঙ্গে ইহার মিলন যখন ঘটিল তখন গ্রীকদের বৈচিত্র্যের পিপাসা এবং তাহাকে সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্যে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা ইহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিল এবং ইহার একান্ত অন্তর্মুখীন ভাবকে আঘাত করিল। আপনারা সকলেই জানেন যে

ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে প্রাচীন গ্রীসীয় জ্ঞানের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রায় ভাসিয়া যাইবার পথে আসিয়াছিল। তাহার কারণ সেমেটিক অর্থাৎ ইহুদীয় ভাবের সঙ্গে গ্রীক ভাবের সকল বিষয়েই উল্টা। ইহুদীর ঈশ্বর পৃথিবী হইতে দূরে—এবং গ্রীক দেবতাগণ একেবারে পৃথিবীর ভিতরে—তাঁহারা প্রত্যক্ষ মানবরূপী দেবতা। ইহুদীদের মধ্যে পাপপুণ্যের বোধ অত্যন্ত তীব্র গ্রীকদের মধ্যে সেরূপ সংঘাতের ভাব প্রায় নাই বলিলেও চলে।

ইহার পরে ক্রমে ইন্দোজর্ম্মাণজাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম যখন আসিয়া পড়িল তখন এই ইহুদী গ্রীকের সংঘাতোত্থ দূর এবং নিকট, সসীম এবং অসীম এই দ্বৈতভাবকে ভক্তির সূত্রে বাঁধিয়া তাহারা এক অপূর্ব্ব গুহ্যতত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে ঐতিহাসিক দিক দিয়া আলোচনা করিলে এটা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে প্রত্যেক যুগে নানা জাতির নানা ভাবের ভিতর দিয়া খৃষ্টধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শটি ক্রমশঃ বলশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একান্ত অন্তর্মুখীন ভাব কাটিয়া গিয়া সে বিশ্বব্যাপক হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। কোন ধর্ম্মই এমনতর নয় যে সে কোন এককালে হইয়া বইয়া চুকিয়া আছে, কালে কালে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবেনা। যদি এমনই হয় তবে সে তো মৃতধর্ম্ম, তাহাকে লইয়া মনুষ্যের কোন লাভ নাই। ধর্ম্ম কোন মহাপুরুষের একলার জিনিস নয়, কোন গ্রন্থের বা শাস্ত্রের জিনিসও নয়—সকল কালের মানুষের আত্মাই তাহার প্রকাশক, তাহার শাস্ত্র। তাহার মধ্যে একটি অক্ষয় অমর নিত্য সত্য আছে বলিয়াই তাহার কোন কালে শেষ নাই, যুগে যুগে সে কেবলি নূতন নূতন হইয়া চলিয়াছে এবং যুগের সঙ্গে যুগও সেই সত্যের অক্ষয় বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যাইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের সেই মূল নিত্য কথাটা কি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা গেল। আমি বলিয়াছি যে রামমোহন রায় ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা হইবার বহুপূর্ব্বে এই সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখনও খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্যগণের মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মকে অন্য সকল ধর্ম্ম হইতে প্রাধান্য দিবার জন্য অত্যন্ত বেশি ব্যগ্র। সকল দেশে সকল সভ্যতায় সকল ধর্ম্মেই ব্রহ্মের প্রকাশ, তিনি সকল বৈচিত্র্যের ভিতরে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট—সমস্ত বৈচিত্র্যের তলায় তাঁহার সেই এক রূপকে সাধনার দ্বারা দেখিবার আদর্শ ছিল রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং ইহাই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আদর্শ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কোন একটি ধর্ম্মের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত প্রকাশ এরূপ মনে করা মানেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী সে কথা অস্বীকার করা।

অধ্যাপক অয়কেন্ সম্বন্ধে আলোচনা কালে যে দুই একটি কথা বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠকদের মনে হইতে পারে যে তিনিও এই একদেশদর্শিতার দোষে আক্রান্ত। কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহার মত উদারচেতা এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ইউরোপে এখন দ্বিতীয় কেহ নাই। আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি জানেন অতি অল্প তথাপি অনুবাদে যেটুকু যাহা পড়িয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অন্তরের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা খুবই জাগ্রত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার একটি পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত না হইলে এবং তাহার অনেক সার সত্য আপনার মধ্যে গ্রহণ না করিলে খৃষ্টধর্ম্ম যে কোন দিনই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারিবে না আপনার এ মত আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। আমি বিশ্বাস করি যে বিশিষ্ট ধর্ম্মের যুগ এখন চলিয়া গেছে—নিজেদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভাঙিয়া এখন আমাদের নিজ নিজ ধর্ম্মকে বিশ্বমানবের ধর্ম্মে উপনীত করিতে হইবে। এই কার্য্যে ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম পরস্পরের সহায়তা করিবে। ভারতবর্ষে যেমন স্পষ্টতঃ ঐক্যের বাণী এবং অনন্তের বাণী, সকল জড়বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্তি এবং চিন্তার সুগভীর স্তব্ধতার কথা বলা হইয়াছে এমন আর কোথাও হয় নাই। পক্ষান্তরে দ্বন্দ্বমূলক ধর্ম্মনীতি, বিবিধ মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের রচনা ও কর্ম্মের প্রেরণা এই সকল জিনিসের উপরই খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ শক্তিও নির্ভর করিতেছে। এই দুই ধর্ম্মই পরস্পরের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে। আর আমি আশা করি যে এই সকল জীবনের জটিল সমস্যা ক্রমশই মানবসমাজের সম্মুখবর্ত্তী হইবে।"

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

গীতাপাঠ।

(আবহমান)

এই যে একটি কথা—যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অথচ আত্মা যিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠাতা তিনি নির্গুণ, এ কথাটি আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই—বিশেষত সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রে—আবহমান কাল হইতে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে! এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ও-কথাটির অর্থ কি? ত্রিগুণ পদার্থটা কি? এই প্রশ্নের যথাবৎ মীমাংসা করিতে হইলে সত্ত্বগুণের গোড়ার

কাহিনীটি অন্ধকার হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটির নিষ্পাদন অতি সহজে হইতে পারে—হয় না কেবল আমাদের নিজের দোষে। আমরা গোড়ার পইটা হইতে যাত্রারম্ভ না করিয়া আগে-ভাগেই চরম পইটাতে পদনিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, আর সেই জন্য অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। অতএব আমাদের এই চাপল্য-দোষটিকে প্রশ্রয় না দিয়া সর্ব্বাগ্রে সত্ত্বগুণের গোড়ার কাহিনীটির তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

কবি শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ইহা সকলেরই জানা কথা। এটাও তেমনি জানা উচিত যে, সৎ শব্দ হইতে সত্তা এবং সত্ত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—দেখা উচিত যে, কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সত্তা এবং সত্ত্বের মধ্যে অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে-কোনো বস্তুর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ, সত্তার প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে—সেটি হচ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্ ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটি সদ্বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে।

আমরা প্রতিজনে আমাদের আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তা'র সঙ্গের সঙ্গী। "আমি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি আমি যেমন আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইহারই নাম আত্মসত্তার প্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি তেমনি সর্ব্বকালেই যেন বর্ত্তিয়া থাকি" আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার এই যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, এ আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতিজনের আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে। আত্মসত্তাতে যদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে ঐ শুভ ইচ্ছাটি (অর্থাৎ বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা) কোনো কালেই আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তা'র সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর, সেই গতিকে আমরা এটা বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতরে সত্ত্ব আছে—আমরা সৎ-পদার্থ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই এ কথাটি বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রকাশ এবং আনন্দই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ; এমন কি—সত্ত্বগুণের সহিত প্রকাশ এবং আনন্দের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য ইঙ্গিতচ্ছলে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই যে, প্রকাশ এবং আনন্দের নামই সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখিলাম, এখন রজোগুণ এবং তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

নানা কবির কবিতা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই কবিতা দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন এই অর্থে ব্যষ্টিকবিতা। পক্ষান্তরে কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তাঁহার কবিতা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের কবিতা এই অর্থে সমষ্টি-কবিতা। কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ তিনি কে? তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন—তিনি প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। কাব্যানুরাগী বিদ্বজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো নিকটে অবিদিত নাই যে, কালিদাসের কবিতায় যেমন শেক্সপিয়রীয় কবিত্ব-গুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, শেক্সপিয়রের কবিতাতেও তেমনি কালিদাসীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; তেমনি আবার মিল্টনের কবিতাতেও ও-দুই শ্রেণীর কবিত্বগুণের কোনোটিরই নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবেই হইতেছে যে প্রকৃতিদেবীর হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত সমষ্টিকবিতা যেমন পূর্ণমাত্রা কবিত্বের অভিব্যঞ্জক, ব্যষ্টিকবিতা সেরূপ নহে; ব্যষ্টিকবিতা মাত্রই কবিত্বগুণের দেশ-কাল-পাত্রোচিত খণ্ডাংশেরই অভিব্যঞ্জক। কবিতা সম্বন্ধে এ যেমন আমরা দেখিলাম, সত্তা-সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন আরেক শাখার পুষ্প নহে, তেমনি তোমার সত্তাও আমার সত্তা নহে, আমার সত্তাও তোমার সত্তা নহে, এবং তৃতীয় আর যে-কোনো ব্যক্তির নাম করিবে তাহার সত্তাও তোমার বা আমার সত্তা নহে। ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেই জন্য কোনো ব্যষ্টিসত্তাই পূর্ণমাত্রা সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের পরিচায়ক নহে; ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, সুতরাং বৃক্ষের পুষ্পই সমষ্টি-পুষ্প, আর সকল শাখার পুষ্পই সেই সমষ্টি-পুষ্পের অন্তর্ভূত, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা তাঁহার সত্তাই সমষ্টিসত্তা এবং আর

আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টিসত্তার অন্তর্ভূত; আর, সেই জন্য সমষ্টিসত্তা যেমন অবাধিত সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের নিধান, ব্যষ্টিসত্তা সেরূপ নহে। ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের, অথবা যাহা একই কথা—বাধাক্রান্ত প্রকাশ এবং আনন্দের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি, একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর একটি হ'চ্চে আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য অচৈতন্য বা জড়তা এবং অবসাদ বা স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ বা পীড়ানুভব এবং অশান্তি বা প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তমোগুণ এবং রজোগুণ। বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের আর এক নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। তমোগুণ যে কি অর্থে তমোগুণ তাহা তমঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে—তমোগুণ প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোগুণ কি অর্থে রজোগুণ তাহাও রজঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশানুযায়ী কার্য্য কাপড় কাচা তো ছিলই, তা ছাড়া তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল বস্ত্র রঙানো; এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় ধোপা রজক নামে প্রসিদ্ধ—বস্ত্র রঞ্জন করে অর্থাৎ রঙায় এই অর্থে রজক। রঙ বন্ধে জর্ম্মাণ দেশীয় মহাকবি গেটের একটি সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হ'চ্চে—একদিকে সাদা, আর একদিকে কালো এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত নীল পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, কালো রঙ রঙই নহে—তাহা অন্ধকারেরই আর এক নাম। সাদা রঙ কালো রঙের ঠিক্ উল্টা পিঠ সুতরাং তাহাও প্রকৃত পক্ষে রঙ নহে। সাদা রঙ বিচিত্র বর্ণরাজির লয় স্থান—তাহা শুভ্র আলোক। বর্ণক্ষেত্রও যেমন তিন ভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণক্ষেত্রের এ মুড়ায় রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক; ও মুড়ায় রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন; এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রঞ্জন। অর্থাৎ একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের চেতনজ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তা অন্ধকার, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রাগ-দ্বেষরূপী রজোগুণের রঞ্জন। তাহার মধ্যে দ্বেষ তমোগুণ ঘ্যাঁসা রজোগুণ এইজন্য তাহা অন্ধকার ঘ্যাঁসা নীল রঙের সহিত উপমেয়; দ্বেষকে গিলিয়া খাইয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। অনুরাগ সত্ত্বগুণ ঘ্যাঁসা রজোগুণ, ই জন্য তাহা আলোক ঘ্যাঁসা পীত রঙের সহিত উপমেয় —গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাই পীতাম্বর হইয়াছেন; পরন্তু রজোগুণের নিজমূর্ত্তি হ'চ্চে রাগ; তার সাক্ষী রজোগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ—কাম এবং ক্রোধ—দুই রাগধর্ম্মী। কাম তো রাগ বটেই; তা ছাড়া বঙ্গ-ভাষায় ক্রোধের আর এক নাম রাগ। রাগই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের গোড়ার সূত্র। রজোগুণের নিজমূর্ত্তি এই যে, রাগ, ইহা লাল রঙের সহিত উপমেয়। রক্ত শব্দ, রঞ্জন শব্দ, রজঃ শব্দ, রাগ শব্দ, সবাই এরা একই মূলাধাতুর সন্তান সন্ততি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। লাল রঙ দেখিলেই বৃষজাতি ক্ষেপিয়া ওঠে—রক্ত গরম হইলেই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য হয়—দুঃখজ্বরে রক্তের তাপ বৃদ্ধি হয়—এ সমস্তই রজোগুণের লক্ষণ। এই জন্য যদি উপমাচ্ছলে বলা যায় যে, সত্ত্বগুণ সাদা, তমোগুণ কালো, রজোগুণ লাল, তবে প্রকৃত কথাটা যে কি বলা হইল তাহা সাধারণ শ্রোতৃবর্গের সহসা বোধগম্য না হইতে পারুক্, পরন্তু ভাবুক লোকের তাহা বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। এ সকল ফ্যাঁক্ড়া কথা ছাড়িয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবের বাঁধা রাস্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

একটু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সত্ত্বগুণের বাধা জন্মায় যে কে তাহাও আমরা দেখিয়াছি; আমরা দেখিয়াছি যে, যে-দুইটি মূল উপাদান সত্ত্বগুণের সহিত মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে—কিনা প্রকাশ এবং আনন্দ—তাহাদের প্রথমটির (অর্থাৎ প্রকাশের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে তমোগুণ বা জড়তা এবং অবসাদ; দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ আনন্দের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে রজোগুণ বা দুঃখ এবং অশান্তি। তা'ছাড়া, রজোগুণ এবং তমোগুণের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট। বাধার অনুভব হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেরই জানা কথা; এমন কি—বাধানুভবেরই নাম দুঃখ। বাধানুভব যদিচ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ন্যায় সুস্পষ্ট চেতন নহে, কিন্তু তথাপি তাহা যে চেতনের পূর্ব্বাভাস তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; পরন্তু তমোগুণের জড়তার মধ্যে চেতনের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমনি আবার, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের মধ্যে যদিচ কেবল আনন্দ হাত বাড়াইয়া পাইবার জন্য এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন আঁকুবাঁকুর ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়, তা ভিন্ন কর্ত্তৃত্বমূলক কর্ম্মচেষ্টার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাহা যে স্বাধীন কর্ম্মোদ্যমের পূর্ব্বাভাস তাহাতে আর ভুল নাই; পক্ষান্তরে, তমোগুণের জড়তা এবং অবসাদের মধ্যে কর্ম্মোদ্যমের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে শুধুই যে কেবল সত্ত্বগুণের সহিত অপর দুই গুণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাহা নহে; পরন্তু সে প্রদেশে তিন গুণই পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, তিন গুণের কোনো-না-কোনোটির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোনো-না-কোনোটির প্রসুপ্ত ভাব, কোনো না-কোনটির অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক জুড়িয়া সর্ব্বত্রই পরিকীর্ণ রহিয়াছে; সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিও এমন কোনো বস্তু খুঁজিয়া পাইতে পারিবার জো নাই, যাহাতে তিন গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে একত্র যোটবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি না করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ত্রিগুণের একটি-না-একটির সাময়িক প্রাদুর্ভাব এবং সেই সঙ্গে অপর দুইটি গুণের কোনোটির বা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব এবং কোনোটির বা প্রসুপ্ত ভাব যাহা আমরা প্রতি জনে আপনার আপনার মধ্যে কালসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, তাহাই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত আকাশক্ষেত্রে পরিবেশিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রাতঃকালে সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় একদিকে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, ইতিপূর্ব্বে তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশত আমাদের ভিতরে সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ নাই, আর এক দিকে তেমনি দেখিতে পাই যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুর মধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশতঃ সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ, আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ পায় না। ইহা দৃষ্টে কেহ যদি মনে করেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান ছিল না—প্রসুপ্ত ভাবেও বিদ্যমান ছিল না, অথবা যদি মনে করেন যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুতে প্রকাশ এবং আনন্দ তথৈব দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান নাই—বীজভাবেও বিদ্যমান নাই, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। এ তো সোজা কথা যে, আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় যদি আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য প্রচ্ছন্ন ভাবে অর্থাৎ ধামাচাপা ভাবে বিদ্যমান না থাকিবে, তবে আমাদের জাগরণ মুহূর্ত্তে ঐ সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপারগুলি আমাদের মধ্যে আসিয়া জুটিবে কোথা হইতে? তেমনি আবার জড় পরমাণু-নিচয়ের মধ্যে যদি ঐ সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপারগুলি ধামাচাপা না থাকিবে, তবে এককালে তো আমরা মাতৃগর্ভের জরায়ুশয্যায় প্রকৃতপক্ষেই জড়পিণ্ড ছিলাম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ঐ চেতন-ব্যাপারগুলির অস্ফুট আভাস আমাদের এই জড়শরীরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল কোথা হইতে? তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, গোড়ায় সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত আনন্দ না থাকিলে, সেই আনন্দের বাধানুভূতি যাহার আরেক নাম দুঃখ তাহা থাকিতে পারে না; আনন্দের বাধানুভূতি না থাকিলে আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু অর্থাৎ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না; আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু না থাকিলে আনন্দের বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা থাকিতে পারে না; বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিলে, ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জড়পরমাণুচয়ের সঙ্গে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি-ক্রিয়া নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে এটা সকলেরই জানা কথা; কাজেই, এই মাত্র যে-একটা সম্ভাবনীয়তার সোপান-পদ্ধতি দেখাইলাম তাহা হইতে আসিতেছে এই যে, সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ক্রিয়ার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা রহিয়াছে; সেই বাধা অতিক্রমণের চেষ্টার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার জন্য একটা আঁকুবাঁকু রহিয়াছে; আনন্দের জন্য এই যে একটা আঁকুবাঁকু তাহার মূলে আনন্দের বাধানুভূতি রহিয়াছে; আনন্দের বাধানুভূতির মূলে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ রহিয়াছে এবং সেই আনন্দের মূলে সত্তার প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীবের মধ্যেও যেমন, জড় পরমাণুর মধ্যেও তেমনি, উভয়ত্রই তিন গুণই এক সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রকাশ এবং আনন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যও বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়তা এবং অবসাদও বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, জড়জগতে তমোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; নীচের ধাপের জীবজগতে রজোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; উপরের ধাপের জীবজগতে অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজে সত্ত্বগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, জড়বস্তুর মধ্যেও কি সত্ত্বগুণ আছে—প্রকাশ এবং আনন্দ আছে? ইহার উত্তর এই যে, আছে—কিন্তু প্রসুপ্ত ভাবে। ফলে জড়বস্তুর ভিতরে সত্ত্বগুণের বর্ত্তমানতা যতই তর্কের বিষয় হউক্ না কেন—সে সম্বন্ধে অন্ততঃ এটা স্থির যে, জড়বস্তুর সত্তা শুধু কেবল তোমার বা আমার বা অপর কাহারো মনোগত সত্তা নহে—পরন্তু তোমার সত্তা যেমন বাস্তবিক সত্তা, জড়বস্তুর সত্তাও সেইরূপ বাস্তবিক সত্তা। আমি যদি বলি যে তোমার সত্তা তোমার নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, তথৈব জড়বস্তুর সত্তা জড়বস্তুর নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, দুইই কেবল আমার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয় এই যে, প্রভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমার সত্তাই বাস্তবিক সত্তা বই তোমার সত্তা বা আর কোনো কিছুর সত্তা

একটা মনগড়া সামগ্রী বই আর কিছুই নহে। এই জন্ত আমি তাহা না বলিয়া বলি শুধু এই যে, তোমার নিদ্রাবস্থাতে যেমন তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ তোমার সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তোমার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তেমনি তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ জড়পরমাণুর সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তাহার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে—এই যা কেবল; তা বই, জড়বস্তুর মধ্যে ঐ দুইটি সত্ত্বগুণের ব্যাপার মূলেই যে বিদ্যমান নাই তাহা নহে।

মানবসমাজের প্রতিভাশালী আদি গুরুগণের চক্ষুই স্বতন্ত্র। তাহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি একপ্রকার অন্তর্দীপনী আলোকছটা—একপ্রকার X-ray। পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবসায়ীরা যাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পান না—সেই সকল বিশ্বব্যাপী মহাতত্ত্ব অতীব স্বল্প উপলক্ষে প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের দিব্যচক্ষুতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। তা'র সাক্ষী :—নিউটন একটা বৃন্তচ্যুত আপেল ফলকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া তাহার আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ভারাকর্ষণের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। গ্যালিলিও তাঁহার দেশের ভজন-মন্দিরের মূর্দ্ধালম্বিত দীপঝাড়ের দোলনের ভাবগতি দেখিয়া তাহার আলোকে এই একটি বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দোলা-মাত্রেরই পর্য্যাবর্ত্তন সামকালিক। আমাদের দেশের আদিম আচার্য্যেরা তেমনি জীবপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা দেখিয়া তাহার আলোকে সর্ব্বময়ী মহাপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শেষের বার্ত্তাটির আমি সন্ধান পাইলাম কিরূপে তাহা বলিতেছি—প্রণিধান কর। সত্ত্ব শব্দের প্রচলিত অর্থ জীব। তার সাক্ষী :—দেশীয় সাধুভাষায় গর্ভিণী নারীকে বলা হইয়া থাকে অন্তঃসত্ত্বা—অন্তরে সত্ত্ব কি না জীব জাগিতেছে এই অর্থে অন্তঃসত্ত্বা। তা' ছাড়া কাব্য পুরাণাদিতে সমুদ্র-বর্ননার প্রসঙ্গচ্ছলে ভূয়োভূয় এইরূপ স্বভাবোক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্র তিমি মকর প্রভৃতি মহাসত্ত্বগণের বাসস্থান। অতএব প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় সত্ত্ব শব্দের অর্থ যে জীব তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন কথা হচ্চে এই যে, মনুষ্যই জীবের মধ্যে সেরা জীব বা আদর্শ জীব, আর, মনুষ্যের একটি প্রধান জাতি-পরিচায়ক-লক্ষণ হ'চ্চে বুদ্ধিমত্তা। এইজন্য দার্শনিক ভাষায় জীবের পরিবর্ত্তে মনুষ্যজাতি-সুলভ স্থির বুদ্ধিই বিশেষার্থে সত্ত্ব নামে সংজ্ঞিত হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের তৃতীয় পাদের সর্ব্বশেষের সূত্রটির প্রতি যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর তবে দেখিবে যে, সে সূত্রটি এই :—"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যং।" ঐ দর্শনের ভানুমতী টীকায় "সত্ত্বশুদ্ধি" এই বচনটির অর্থ ভাঙিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ :—"সত্ত্বস্য—বুদ্ধিদ্রব্যস্য শুদ্ধিঃ" সত্ত্বের শুদ্ধি কি না বুদ্ধি-পদার্থের শুদ্ধি। এখন দেখিতে হইবে এই যে জীবের নিশ্চয়াত্মিকা স্থির বুদ্ধিই বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নিলয়; জীবের অস্থির মনই দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের নিলয়; জীবের স্থূল শরীরই জড়তা এবং অবসাদের নিলয়। এই জন্য বলিতেছি যে, খুব সম্ভব আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জীবের মধ্যে ঐ তিনটি আদর্শভূত সত্ত্বরজস্তমোগুণের ব্যাপার পরম্পরাশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিয়া তাহারই আলোকে এই মহাতত্ত্বটি প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণের লীলাক্ষেত্র, এমন কি সত্ত্বরজস্তমোগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব। তাঁহারা আরো বলেন এই যে, জগতের মধ্যস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ একত্র যোটবদ্ধ রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, তিনগুণের যে গুণটি এক বস্তুতে প্রকট ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, সেই গুণটি আর এক বস্তুতে অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, এবং তৃতীয় আর এক বস্তুতে তাহা প্রসুপ্ত ভাবে বা বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ মাত্রায় অভিব্যক্ত হয়। এ কথার প্রমাণ আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই সহজে পাইতে পারি। আমাদের নিদ্রাবস্থায় যখন আমাদের মনোমধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমরা জড়পদার্থের—বিশেষতঃ উদ্ভিদ্ পদার্থের—দলভুক্ত হই। তমোগুণের এইরূপ প্রাদুর্ভাবকালেও আমাদের মধ্যে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের কার্য্য ন্যূনাধিক পরিমাণে তলে তলে চলিতে থাকে, তা বই ও-দুয়ের কোনোটির কার্য্য একেবারেই বন্ধ থাকে না। তাহার সাক্ষী :—নিদ্রান্ধকারের মেঘের আড়ালে ঘড়ি ঘড়ি স্বপ্নের ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতে থাকে ইহা সকলেরই জানা কথা; এরূপ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য যে রজোগুণের ব্যাপার তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তা ছাড়া, নিদ্রান্ধকারের আরো গভীর অন্তস্তরে সত্তার প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের সঙ্গাশ্রিত সুনির্ম্মল আনন্দ এই দুই সত্ত্বগুণের ব্যাপারও যে তলে তলে জাগিতে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, কেহ যদি কাহারো সুনিদ্রা বলপূর্ব্বক ভাঙাইয়া দ্যায়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নাবিল এই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া পূর্ব্বানুভূত সুখের বড্ড একটা অভাব অনুভব করে। আমাদের এই স্থূল শরীরাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিদ্রা স্বপ্ন এবং জাগরণ দৈনন্দিন ব্যাপার, পরন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঐ তিনটি অবস্থা-পরিণাম যুগযুগান্তরের ব্যাপার। তাহা হইবারই কথা—কেন না ব্রহ্মার

এক দিন আমাদের এক যুগ। তমোগুণের প্রাদুর্ভাবকালে অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমরা যেমন কার্য্যত অচেতন হই অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে practically unconscious সেই ভাবে অচেতন হই; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের জড়পরমাণু সকল সেই ভাবেই অচেতন; তা বই, এ ভাবে অচেতন নহে যে, তাহাদের মধ্যে চেতন মূলেই বর্ত্তমান নাই—বীজ ভাবেও বর্ত্তমান নাই। আবার রজোগুণের প্রাদুর্ভাবকালে যখন আমাদের মনোমধ্যে স্বপ্নের আধিপত্য হয়—তা' সে নিদ্রাবস্থার খাঁটি স্বপ্নই হো'ক্ আর জাগরিতাবস্থার জাগ্রৎস্বপ্নই হো'ক্ তাহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় না, আর সেই স্বপ্নের ঝাপ্‌সা আলোকে আমরা যেমন প্রবৃত্তির ঝোঁকে ইতস্তত নীয়মান হইয়া কার্য্যত মূঢ়জীব বনিয়া যাই, পশ্বাদি জন্তরা সেই ভাবে মূঢ়জীব। অধুনাতন কালের নব্যতম প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পিপীলিকা মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন জীবদিগের স্বভাব চরিত্র এবং কার্য্যানুষ্ঠান-পদ্ধতি বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা (অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Somnambulist সেই শ্রেণীর ব্যক্তিরা) যেমন ঘুমের ঘোরে কেহ বা কলেরিজের কুব্‌লাখানের ন্যায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখে, কেহ বা গণিতের দুরূহ সমস্যা অবলীলাক্রমে পূরণ করে, কেহ বা সংকটময় দুর্গম পথ অবলীলাক্রমে অতিবাহন করে, মৌমাছি পিপীলিকা প্রভৃতি অমেরুক (avertibrated) শ্রেণীর জীবেরা সেই গোচের এক প্রকার অস্ফুট চেতনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আলোকে প্রবৃত্তির ঝোঁকে নীয়মান হইয়া আপনাদের গার্হস্থ্য সামাজিক এবং আর আর শ্রেণীর নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল যথাবৎ অভ্রান্ত অপ্রমত্ত এবং অবিচলিত ভাবে নিষ্পাদন করে। ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি পদার্থ সকল যেন অচেতন বস্তু—পশ্বাদি জন্তুরা যেন মূঢ় জীব—আমরা কি? "আমরা কি?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা নহি কি? অর্থাৎ আমরা সবই। আমাদের নিদ্রাবস্থায় আমরা উদ্ভিদ্‌পদার্থ, স্বপ্নাবস্থায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান মূঢ়জীব, জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্য। তবেই হইতেছে যে, আমরা প্রতিজনে এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আবার বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ছাঁচে গঠিত। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সবই ব্রহ্মতালের বা সুদীর্ঘচ্ছন্দের গাথা; ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সবই লঘুত্রিপদীচ্ছন্দের পদ্য। আমাদের নিদ্রার কাল এক রাত্রির অধিক নহে, পরন্তু পৃথিবীতে যতকাল পর্য্যন্ত জীবের উন্মেষ হয় নাই ততকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল; তাহার পরে পৃথিবীর নিশাগ্রস্ত অবস্থায় কীট পতঙ্গাদির নড়ন-চড়ন এবং চলাফেরা আরম্ভ হইল; তাহার পরে পৃথিবীর স্বপ্নাবস্থায় মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্যের আবির্ভাব হইল। আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় যেমন তাহার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দ বিরাজ করে, তেমনি সেই সঙ্গে তাহার নীচের স্তরে মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের জাগ্রৎস্বপ্ন এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত দুঃখ ও প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; আর, সময়ে সময়ে যখন সেই রজোগুণের ব্যাপারটা প্রবল হইয়া ওঠে তখন তাহা দর্শকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহার যদি একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন বা নমুনা দেখিতে চাও তবে Elba উপদ্বীপে অবস্থিতি-কালে প্রথম নেপোলিয়নের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহার কোনো প্রকার শারীরিক কষ্ট বা আর্থিক কষ্ট ছিল না অথচ রজোগুণের প্রাদুর্ভাববশত তাঁহার মন নানা প্রকার জাগ্রৎস্বপ্নে, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে এবং দুঃখ যন্ত্রণায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্ করিত, অথচ তাঁহার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দের ন্যূনতা ছিল না। তেমনি আবার মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের নীচের স্তরে স্থূল শরীরাশ্রিত প্রসুপ্ত চেতনের বা প্রাণের ব্যাপার—অর্থাৎ যেমন অন্ন হইতে রক্তের উৎপাদন—রক্ত হইতে অস্থি-মজ্জা মাংসপেশী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চালান্—এই সকল প্রাণের ব্যাপার তমোগুণের অন্ধকারাচ্ছন্ন নাড়ীপথের মধ্য দিয়া চলাফেরা করিতে থাকে এরূপ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানালোকের প্রবেশের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। এতগুলা কথা যাহা আমি সবিস্তরে ভাঙিয়া বলিলাম তাহা যদি সংক্ষেপে এইরূপে সাঁটেসোঁটে বলা যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় তাহার অন্তঃকরণের উপরি স্তরে ভিতরের মনুষ্য বিরাজমান হয়, তাহার এক ধাপ নীচের স্তরে ভিতরের সিংহ ব্যাঘ্র ছাগ-মেষাদি বিচরণ করে, এবং তাহার আরো নীচের স্তরে ভিতরের ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুসকল জমাটবদ্ধ হয়, তবে খুব সম্ভব যে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে শ্রোতৃবর্গের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় এ যেমন দেখা গেল, পৃথিবীর জাগরিতাবস্থাতেও তেমনি উপরের ধাপে সত্ত্বগুণপ্রধান মনুষ্যমণ্ডলীর ব্যাপার সকল চলিতেছে, বুদ্ধির অধীভূত জাগ্রত চেতনের নীচের ধাপে রজোগুণপ্রধান অপরাপর জন্তুদিগের স্বপ্নবৎ অর্দ্ধস্ফুট চেতনের ব্যাপার সকল চলিতেছে, এবং তাহারও নীচের ধাপে তমোগুণপ্রধান উদ্ভিদ্ এবং ধাতু প্রস্তরাদি জড়বস্তু সকলের বীজভাবাপন্ন অস্ফুট চেতনের ব্যাপার সকল চলিতেছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সারা বিশ্বব্রহ্মা-

শের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ত্রিগুণের লীলাক্ষেত্র,—ত্রিগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

ত্রিগুণতত্ত্বের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা আমি বলিলাম এ সকল কথা ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধেই খাটে—সমষ্টি-সত্তার সম্বন্ধে খাটে না। সমষ্টি-সৎ এবং ব্যষ্টি-সৎকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে প্রথমেই দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, তুমি এবং আমি দুই, এই জন্য তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে, আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম কর তবে তাহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসৎ মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে; আর সেই সূত্রে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ এবং তমোগুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে;—সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাত্ত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। কাজেই ব্যষ্টিসত্তা ত্রিগুণাত্মক। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, তোমার বাহিরে যেমন আমি রহিয়াছি, এবং আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ, সমষ্টিসতের বাহিরে সেরূপ দ্বিতীয় কোনো কিছুই নাই; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টিসতের সত্তার সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসতে সাত্ত্বিক-প্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চেতন-জ্যোতি এবং সাত্ত্বিক আনন্দ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই জন্য আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে সমষ্টিসৎ চিদানন্দ স্বরূপ। আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় রহস্য আজ যাহা আমি সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সহিত ডারুইনের মতের কিরূপ ঐক্যানৈক্য আগামীবারে তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইবে; এবং তাহার পরে গীতাশাস্ত্রোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধান।

কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ,—
খুঁজে হয় সারা নাহি পায় সন্ধান।
উষার উদয়ে নিশার তিমির তলে,
সুখের পুলকে দুখের নয়নজলে,
বনমর্ম্মরে নির্ঝর-কলকলে
ধ্বনিত বিপুল তান।
তারি মাঝে শুধু ব্যাকুল পরাণ মোর
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।

কার লাগি এই বিশ্বসভার দ্বারে
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে!
কত খেলা হল কত না পথের শেষে,
কত কাল ধরে ভ্রমিল কতনা দেশে,
কখনো সেজেছে দীন দরিদ্র বেশে,
কখনো রতন হারে।
আলোকে আঁধারে ঘুরিতে ঘুরিতে শুধু
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে।

আপনারে খুঁজে কে আপনি দিশাহারা!
দূরে চলে যায় চোখে বহে জলধারা।
জানেনা জানেনা নিখিল ভুবনমাঝে
তারি আপনার পরম আপন রাজে,
বিশ্ববীণায় তাহারি বিরহ বাজে
বিপুল গানের ধারা।
সকল দৃশ্যে সব সঙ্গীতে তালে
আপনারে খুঁজে কে হলরে আজ সারা!

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র। *

জীবাত্মার মুক্তিতে কি যায় এবং কি থাকে—একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকে কি না এই প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্ব্বতন কোনো কোনো লেখায় আমি আলোচনা করেছি। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তরে আর একবার সে কথাটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি।

জগতে যা কিছু দেখ্‌চি শুন্‌চি সমস্তই চঞ্চল—কিন্তু এই চঞ্চলতাই একটি ধ্রুবকে প্রকাশ করচে। কেননা, সূত্রকে আশ্রয় না করলে যেমন কোনোমতেই মালা গাঁথা চলে না—তেমনি ধ্রুবকে আশ্রয় না করলে চঞ্চলতা টিঁকতেই পারে না। সমুদ্র স্থির আছে বলেই ঢেউয়ের চঞ্চল লীলা তাকে অবলম্বন করে কলগানে নৃত্য করচে। সমস্তই চলেচে, এবং চল্‌তে চল্‌তে বলচে, এক আছেন—সেই চলাও শেষ হচ্চেনা এবং এই বলাও শেষ হচ্চেনা। সংখ্যাহীন গণনার দ্বারা অন্তহীন এক আপনাকে প্রকাশ করচেন। এই যে নানা, এ যেন অনন্তের মাপ-কাঠির মত, কেবলি চলচে আর বলচে, শেষ হলনা শেষ

* কোনো প্রশ্নের বন্ধুর পত্রের উত্তর।

হলনা—নানার পর নানা, তার পরেও নানা—অন্ত নেই। সচল মাপকাঠি ছাড়া অচল অনন্তকে অনন্ত বলে প্রচার করবে কে?

কিন্তু সান্তের ভিতর দিয়ে অনন্ত এই যে আপনাকে প্রকাশ করচেন তার দরকার কি? দরকার কিছুই নেই, অর্থাৎ বাইরের কোনো তাগিদ নেই—তাঁর আনন্দের পূর্ণতাই আপনাকে আপনি প্রকাশ করচে। প্রকাশই তাঁর স্বভাব। এইজন্য বেদে তাঁকে বলেছে "আবিঃ" অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ।

যিনি প্রকাশ স্বরূপ, প্রকাশ যদি তাঁর না হয় তাহলেই তাঁর বাধা; প্রকাশেই তাঁর মুক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের মধ্যেই ব্রহ্মের আনন্দ উন্মুক্ত। এই জগৎকে বন্ধনরূপ বলতে পারিনে কেননা এই ত তাঁর আনন্দরূপ। জগতে তিনি আপনাকে সর্জ্জন করচেন। বদ্ধ করচেন না। বস্তুত জগতে ত কিছুই বাঁধা পড়তে চায় না।

কিন্তু আর একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রকাশের মধ্যেই আপনাকে মুক্তি দিতে গেলেই বন্ধনকেও মানতেই হয়—যদিচ সে আনন্দের বন্ধন। যে আনন্দে কবি কাব্য লেখে সেটাকে যদি অন্তরে রুদ্ধ করে না রাখা হয়, যদি তার স্বাভাবিক প্রকাশচেষ্টাকে মুক্তি দিতে হয় তাহলে স্বেচ্ছায় ছন্দোবন্ধকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

এইজন্যে যদিচ অনন্তের আনন্দ হতেই সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—তবুও স তপোহতপ্যত। এই আনন্দকে প্রকাশ করার যে তপ তা স্বীকার করতেই হয়েছে—বাধার বন্ধনরূপ ছন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া বিশ্বকবির আনন্দ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই বাধা বাইরের বাধা নয়—এ বাধা লীলার—সেইজন্যে; আমরা বিপরীত দিক থেকে দেখতে গিয়ে এ'কে দুঃখরূপে যদিবা দেখি, কবির কাছে এ আনন্দের।

ভাবটাকে বাদ দিয়ে রূপটাকেই আমি যদি একমাত্র করে দেখি তাহলে ভিতরকার আনন্দকে জানতেই পারিনে—কেবল তপটাকেই দেখি, দুঃখটাকেই পাই। এই বাইরের দিকটাই চঞ্চল দিক, এর কেবলি পরিবর্ত্তন। এইটেকেই যখন একমাত্র জানি তখন এই চঞ্চলটাকে স্থির করে পাবার বৃথা চেষ্টা করে মরি। কেননা আমরা স্থিরকেই যথার্থ পেতে চাই। ধ্রুবকে যখন দেখতে পাইনে এবং চঞ্চলকেই যখন ধ্রুব করে তোলবার জন্যে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি তখন আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। কে তখন আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, যা যায় তাকে যেতে দিলেই তবে, যা থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ছন্দ দাঁড়িয়ে নেই, সে কেবলি বয়ে চলেছে; যে পদটা অত্যন্ত ভাল লাগচে তাকেও ত্যাগ করে এগতে হবে—এতে যে দুঃখ বোধ করে সেই মূঢ়। যে লোক কবিতার প্রথম পদ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কবির একই ভাবরসকে অখণ্ড জেনে কাব্য পড়ে, পড়তে তার দুঃখ নেই, এগতেই তার আনন্দ—সে যাকে ছেড়ে চলে, সমস্তের মধ্যে তাকেই আরো বেশি করে পায়—এইজন্যেই সে যাওয়াটাকে ভয় করে না, সে যাওয়ার ভিতর দিয়েই থাকাটাকে দেখে। অনন্ত ধ্রুবকেই চলার মধ্যে যে চিনে নিয়েছে চলাতেই তার সুখ। সমস্তই কেবলি যাচ্চে অথচ কোথাও লেশমাত্র ফাঁক পড়ে যাচ্চে না এরই দ্বারা আমরা পূর্ণতাকে সত্য ভাবে দেখতে পাচ্ছি;—এইরূপে অন্তহীন ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই যখন অক্ষয়কে আমরা দেখতে পাই তখনই তাঁকে আমরা চিনি।

এই জন্যে মৃত্যুর বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অমৃতের পূর্ণতাকে দেখবার সুযোগ পাই। মৃত্যু ত পদে পদেই, সেই জন্য অমৃত পদে পদেই প্রকাশমান। গানের প্রত্যেক সুরটি কেবলি সরে সরে যায় সেই জন্যেই গানের অখণ্ড রাগিণী প্রকাশ পাচ্চে। একই সুর যদি স্থির হয়ে লেগে থাকত তাহলে কেবল সেই সুরটাকেই দেখতে পেতুম রাগিণীকে দেখতে পেতুমনা। সুর চলতে থাকে বলেই রাগিণীর প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। রাগিণীকে মনের মধ্যে যে একবার পূর্ণ করে দেখে নিয়েছে গানের প্রত্যেক খণ্ড সুরেই সে অখণ্ডের আনন্দকে লাভ করে;—কোনো সুরকেই তার আর বর্জ্জন করতে হয় না, যে সুর যাচ্চে এবং যে সুর আসচে সমস্তকেই সে পূর্ণের মধ্যে পেতে থাকে। তার কাছে সুরের চলে যাওয়া লেশমাত্র ক্ষতি নয়।

কেন না, সে তখন কানের মধ্যে নিচ্চে গতিটাকে অন্তরের মধ্যে পাচ্ছে স্থিতিটিকে। নইলে, শুদ্ধমাত্র গতির দিকে তাকালে গতির তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না—সুরকেই একান্ত করে জানলে রাগিণীকে জানা যায় না; সেই রকম শুদ্ধমাত্র স্থিতির দ্বারাই স্থিতিকে জানা যায় না—সুরের গতিকে একেবারে বর্জ্জন করে রাগিণীকে ধরতে পারা যায় না। এই জন্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্য আছে এইটি জানতে গেলেই ভেদ থাকা চাই। এই ভেদের প্রয়োজন, ভেদকেই জানবার জন্যে নয়, অভেদকে জানবার জন্যেই। যখন ভেদকেই জানি তখন আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ; ভেদের মধ্যেই যখন অভেদকে জানি তখনি আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ। ভেদকে তখন লীলা বলেই জানতে পারি এবং সেই লীলাতেই যোগ দিই, সে লীলাকে লুপ্ত করতে চাইনে। কেন না ভেদ তখন বিচ্ছেদের ব্যবধান নয়, ভেদই তখন মিলনের সেতু।

ঈশ্বরের আনন্দ সার্থক হচ্চে বন্ধনে (যেমন কবির আনন্দ সার্থক হচ্চে কাব্যে); জীবের বন্ধন সার্থক

হচ্চে আনন্দে (যেমন পাঠকের পাঠদুঃখ সার্থক হচ্চে কাব্যরসে) ; ঈশ্বর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে জীবাত্মায় প্রকাশমান হচ্চেন, জীব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হচ্চে—মিলনের এই বিচিত্র লীলা নিয়তই চলচে—যেদিক থেকে দেখ এই লীলার মাঝখানে থেকে যাচ্চে একটা বাধা—তাকে মায়া বল, বন্ধন বল, সংসার বল বা খুসি। একে কেউবা গালি দিই, কেউবা অস্বীকার করি, কেউবা ভাল বলি—কিন্তু মাঝখানটাতে এ রয়েইছে। এই বাধাকে যদি চরম বাধা বলে মনে করি তাহলেই ভয়—কিন্তু সেটাকে যদি মাঝখানকার জিনিষ বলেই জানি তাহলে না তার প্রতি ভয়, না তার প্রতি একান্ত আসক্তি থাকে। অথচ তখন তার প্রতি প্রীতি বেড়ে ওঠে। কেননা তার ভিতর দিয়ে যখন আনন্দকে পাই তখন সেও আনন্দময় হয়ে ওঠে; ছন্দের মধ্যে দিয়ে যখন কাব্যরসকে পাই তখন সেও কাব্যরসের আনন্দের অন্তর্ভূত হয়ে প্রকাশ পায়—সেই রস যখন না পাই, তখন সমস্তটাই পরীক্ষার পড়ার মত বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে আমার বলবার কথাটি হচ্চে এই যে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদবিলুপ্তিই মুক্তি নয়, ভেদের চরিতার্থতাই মুক্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাবী ধর্ম্ম।

(২)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুল্লা হুসেন প্রথম এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে পারস্য দেশের চারিদিকে যে ধর্ম্ম প্রচারকেরা প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তাঁহারাও ইঁহার অপ্রতিহত তেজ ও উৎসাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। দিবারাত্র কখনও ইস্পাহানে কখনও কাসানে, কখনও টেহেরানে কখনও মাহসাদে গিয়া তিনি জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তকে স্থির করিয়া এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই শীর্ণ দেহের মধ্যে যে প্রবল শক্তি প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সে শক্তির বিরাম ছিল না, অবসাদ ছিল না। টেহেরান হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি মাহসাদে গেলেন; সেখানে পারস্যের পূর্ব্বতন শাহের খুড়া হামজে মির্জা তাঁহাকে বন্দী করিল। এখান হইতেও পলায়ন করিয়া অল্প দলবল সংগ্রহ করিলেন। ক্রমেই দলের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া মাকু সহরে গিয়া বাবকে কারামুক্ত করিবার বাসনায় পশ্চিমমুখে যাত্রা করিলেন। বাবদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে চিরন্তন শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল এখন সম্মুখ সমরে তাহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার উপক্রম হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ খবর আসিল মহম্মদ সাহ মারা গিয়াছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিল।

পারস্যদেশে রাজার মৃত্যু হইলে পরমুহূর্ত্তেই অরাজকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে রাজ্য-তন্ত্রের কলকারখানা একেবারে বিকল হইয়া যায়, আদালত বন্ধ থাকে, দস্যুবৃত্তি এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার দেশব্যাপী হয় এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে।

এই দেশব্যাপী অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য মুল্লা হুসেনের ডাক পড়িল। এই সময়ে তাঁহাকে নানা দিক্ বিবেচনা করিয়া অক্লান্ত উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। একদিকে যেমন তাঁহার আশা ছিল যে তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগের যে বিরুদ্ধতা ছিল নূতন রাজার শাসনাধীনে তাহা দূর হইয়া যাইতে পারে অন্যদিকে তেমনি অনিষ্টকারীদের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্যও তাঁহাকে কম চেষ্টা করিতে হয় নাই—কারণ অত্যাচারীদিগকে দমন করিবার কোন ব্যবস্থা হওয়া তখন সম্ভবপর ছিল না। এই সকল বিবেচনা করিয়া মুল্লা হুসেন মাজানদারান প্রদেশসন্নিহিত বাদাস্ত সহরে শীঘ্র চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বারফুরুস সহরের মুল্লা মহম্মদ আলির অনুবর্ত্তী শিষ্যমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইলেন।

মুসলমান দেশে স্ত্রীলোক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা প্রায় দেখা যায় না। কাজভিন সহরের হাজি মুল্লামহম্মদ সালি'র কন্যা জারিন তাজ কেবল যে সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাবেরা কুররাতু-উল-অয়ন অর্থাৎ 'নয়নানন্দকর' নাম দিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ রূপসী ছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধিতেও কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না, আরবি ভাষা, কোরাণ, দর্শনশাস্ত্র এ সমস্তই তাঁহার পড়া ছিল; ইহা ছাড়া তিনি একজন বক্তা ছিলেন এবং একজন উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে মুসলমানেরা স্ত্রীলোকদিগকে যে দুশ্চেদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাদের মনোবৃত্তির স্ফুরণের পথে বাধা রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট, জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে ইহা বিদুষী জারিন তা-

জের অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আঘাত করিল। বাবের ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের সহিত সমানভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিবার অনুশাসন রহিয়াছে জানিতে পারিয়াই তিনি এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যখনই দেখিলেন সে ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম বটে তখনই তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যমের অন্ত ছিল না; তাঁহার পরিবারের সকলেই কেহ রাজকর্ম্মচারী কেহ ধর্ম্মযাজক ছিল—তাহাদের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপ বাক্যের প্রতি কর্ণপাতমাত্র না করিয়া তিনি বাবী ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। নানা কারণে তিনি জন্মস্থান কাজ্‌ভিন সহর পরিত্যাগ করিয়া বাদাস্ত সহরে বাবীদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

একবার বাবীরা অবিশ্বাসীদিগকে দলভুক্ত করিবার এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎসাহিত করিবার ভার এই তেজস্বিনীর হস্তে সমর্পণ করিল। কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড এবং প্রস্তর স্তূপীকৃত করিয়া অনতিবিলম্বে একটি বক্তৃতামঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া সেই মহিলাটি বক্তৃতা দিলেন। যখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন নিমেষের মধ্যে সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া গেল। যখন তিনি ওজস্বিনীভাষায় তাহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা মহৎ কর্ত্তব্যপথ হইতে ভয়ে বিমুখ হইও না, মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম আসন্ন তাহার ভীষণতা দেখিয়া হতোদ্যম হইও না,' তখন চতুর্দ্দিক হইতে ব্যথিত হৃদয়ের আর্ত্তধ্বনি স্বরূপে 'এই জান্' (হে জীবন তুল্য) 'এই তাহিরা' (হে পুণ্যময়ী), প্রভৃতি চিৎকার বাক্য উত্থিত হইতে লাগিল। অবসন্ন চিত্তে বল আসিল, বিদ্বেষীর মন অনুকূল হইল, সংশয়ীর দ্বিধা দূর হইয়া গেল এবং অত্যন্ত বলবানও কাঁদিয়া আকুল হইল। সকলেই কঠোর ব্রত ধারণ করিল এবং আমরণ তাহা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহার পর তাহারা যেরূপ অকুণ্ঠিত উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল তাহা হইতেই বুঝা যায় তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। কুররাতু-উল-অয়ন তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া কিছু কালের জন্য নূরের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সেখানে তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিল।

উল্লিখিত ঘটনার পর আট বৎসর কাটিয়া গেছে, এখন যে ঘটনার কথা বলিব তাহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। একবার কল্পনাদৃষ্টিতে দেখ প্রকাণ্ড একটি সমতল ক্ষেত্র—তাহাতে ইতস্তত বড় বড় ঘাস ও উলুবন; মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, আঁকাবাঁকা কর্দ্দমদুর্গম রাস্তা দিয়া সমস্তটা যেন জালবোনা। উত্তর দিকে অস্পষ্ট ধূমবর্ণ কাস্পিয়ান্ হ্রদ নয়নগোচর হইতেছে। দক্ষিণে চষা জমী ক্রমে অগ্রসর হইয়া একটি জঙ্গলে গিয়া মিশিয়াছে এবং এল্‌বারজ্ পর্ব্বত-প্রাচীর এই জঙ্গলটির গতিরোধ করিয়াছে। সেই চষা জমি এবং জঙ্গলের সঙ্গমস্থলে পুরাকালের একজন মহাত্মা সেখ্ তাবার্সির ঝোপঝাড়পরিবেষ্টিত জীর্ণ কবর, তাহার উপর একটি সমাধি মন্দির এবং চতুর্দ্দিকে একটি বাগান। এই বাগানে গুটিকতক বুনো ডালিমের গাছ, এবং স্থানে স্থানে কতকগুলি ভগ্নপ্রায় স্তম্ভ, স্তূপ ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল স্তম্ভ এবং সমাধি মন্দিরের গাত্রগুলি বর্ষণজনিত ছিদ্রে পরিপূর্ণ; স্থানে স্থানে গাঢ় শোণিতের দাগ এবং চারিদিকের শ্যামল ভূমির উপর সদ্যোনির্ম্মিত আরও অনেক কবর দেখা যাইতেছে। কঙ্কালাবশিষ্টতনু, শীর্ণমুখ, কোটরগতচক্ষু, সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্যপীড়নেও অক্ষুণ্ণতেজঃপুঞ্জ কতকগুলি লোককে ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইতেছে। বাদাস্ত-সহরে কুররাতু-উল্-অয়নের ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন উপরিউক্ত লোকগুলি সেই দলের ভগ্নাবশেষ; উল্লিখিত সমাধি-মন্দিরে তাঁহারা গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন। এই স্থানে দীর্ঘ আট মাস ধরিয়া তাঁহারা অনবরত রাজ-সৈনিকদিগকে পরাস্ত, প্রতিহত করিয়া আসিতেছেন—আশ্চর্য্য বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা যে কেমন করিয়া শত্রুসৈন্যকে বিপর্য্যস্ত করিতেছেন তাহা সাধারণের ধারণারও অতীত! এখন কিন্তু শেষ সময় উপস্থিত—মানুষের ক্ষমতারও অন্ত আছে। তাঁহাদের নির্ভীক নেতা মুল্লা হুসেনের মৃত্যু হইয়াছে। একদিন ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে কোথা হইতে একটা গুলি আসিয়া লাগিল, উহাতেই তাঁহার শেষ হইল। শত্রুসৈন্যদল প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, অবশেষে বাবীরা এমন অবস্থায় পড়িল যে, গুরুর অশ্বকে হত্যা করিয়া খাইয়া তবে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল। অনাহারে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না, শত্রুকে প্রতিহত করা আর চলে না! কিন্তু তবু—এই বিপদের সময়েও তাঁহাদের নির্ভীকতা দেখিয়া শত্রুসৈন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে বাবীদিগের নিকট রাজ আজ্ঞা এই মর্ম্মে প্রেরিত হইল যে তাঁহাদের জীবন এবং স্বাধীনতার উপর কোন রূপে হস্তক্ষেপ করা হইবে না যদি তাঁহারা অবিলম্বে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বাবীরা সমাধি-মন্দিরে একত্র হইলেন। অবশেষে দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়া স্থির হইল। রাজপক্ষীয় নেতারা কোরাণের শপথ লইয়া সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন, ইহার উপর আর কথা

নাই! অবশেষে বাবীরা ধীরে ধীরে একে একে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং রাজ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

প্রথমে শত্রুরা তাঁহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে লাগিল। অনশনক্লিষ্ট বাবীদের সম্মুখে আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সম্রাটের দুই সৈন্যাধ্যক্ষ রাজকুমার মাহদিকুলি মির্জা এবং আব্বাসকুলি খাঁ বাবী-নেতাদিগকে প্রাতর্ভোজনে আমন্ত্রণ করিল। খাইবার সময় চতুর শত্রুবর্গ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। সরলচিত্ত বাবীরা নিঃসংশয়ে আপনাদের হৃদয়ের কথা সরল, সহজ ভাবে বলিতে লাগিল। রাজকুমার খুব একাগ্রচিত্তে সমস্ত শুনিলেন। এমন সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইল দেখিয়া বড় ক্রূর হাসি হাসিলেন। হঠাৎ তিনি লাফাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 'অতিথিরা ঈশ্বর নিন্দাত্মক কথা বলিতেছেন,—বুঝিতেছি উঁহারা বলিতে চান উঁহারা মহম্মদের সমকক্ষ, এমন কি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তি। নাস্তিক বিধর্ম্মীর নিকট সত্যে বদ্ধ হইলেও সে সত্য পালনীয় নহে এবং সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।' সৈনিকগণ আসিয়া অসহায়, নিরস্ত্র বাবী-নেতাদিগকে বন্দী করিল, অন্য একদল সৈন্য বাবীদের বাসায় গিয়া সম্মুখে উপস্থিত অন্নে হাত দিবার পূর্ব্বেই অভুক্ত অবস্থায় তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বন্দীদিগকে রাজসৈন্যাধ্যক্ষগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। মাটিতে ফেলিয়া তাঁহাদের গাত্রচর্ম্ম ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহাদিগকে বধ করা হইল। কেবল পাঁচ ছয় জন বাবী-নেতাকে বিজয়ী রাজপুত্রের সহিত বারফুরুস সহরে লইয়া যাইবার জন্য জীবিত রাখা হইল। সৈনিকগণ এই বন্দী লইয়া এবং হতদিগের মস্তক বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সহরে প্রবেশ করিল। পথে ধর্ম্মযাজক মুল্লারা তাহাদিগকে ধন্য ধন্য করিল এবং হতাবশিষ্ট কয়জনের রক্ত দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজসৈন্যাধ্যক্ষদিগের ইচ্ছা ছিল বাবীদিগকে টেহেরান সহর পর্য্যন্ত লইয়া যায় এবং যুবক সম্রাটের সম্মুখে দুঃসাহস শত্রুদিগকে একবার উপস্থিত করে। মুল্লারা কোনমতেই ছাড়িল না; অবশেষে তাহাদের কথাই রহিল এবং হাজিমুল্লা মহম্মদ আলি এবং অন্যান্য অবশিষ্ট বাবীদিগকে বারফুরুস সহরের হাটে লইয়া গিয়া প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইল। বীরের ন্যায় অকাতর চিত্তে তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিলেন, অবশেষে রক্তমাখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলির উপর রাত্রির অন্ধকার আসিয়া অবতীর্ণ হইল। ক্রমশঃ

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপনিষৎ।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদ উপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। কিছুদিন হইল, অধ্যাপক পোল্ ডয়্সন 'The Philosophy of the Upanishads' অর্থাৎ উপনিষদের তত্ত্ব নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ ব্যাপক আলোচনার অভাব এদেশে ছিল। হীরেন্দ্র বাবু তাহা দূর করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদের উপরে ব্রাহ্মসাহিত্য ছাড়া দু-একখানি পুস্তক দেখিয়াছি, কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য মনে করি না। কেননা সেগুলি মূলতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা নয়। সেরূপ আলোচনা করিতে গেলে তত্ত্বের আসল সমস্যাগুলি কি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার সমাধানই বা কিরূপে হইয়াছে তাহার পরিচয় থাকা চাই। নহিলে কেবল কথার জঞ্জালই সৃষ্টি করা হয়, কিছুই জানা যায় না।

হীরেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে আমাদের অভাব মোচন হইয়াছে। তিনি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ বিষয় সকলের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের এক একটি দিক্—সগুণবাদ, নির্গুণবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি এমন করিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন যাহাতে উপনিষদগুলি নিজেই নিজের কথা বলে, লেখকের ব্যাখ্যার বাহুল্য ঘুচিয়া যায়। বস্তুত উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার ভাষা যে এমন আশ্চর্য্য বিশদ হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

অথচ আমাদের দেশের চিন্তাভীরু লেখকদিগের ন্যায় সকল মতামতের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখ তাকাইবার কোন লক্ষণও তাঁহার গ্রন্থে দেখা গেল না। তাঁহার আলোচনায় পদে পদে তাঁহার স্বাধীন অনুসন্ধান ও বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে প্রাচীন ভারতে জীবনকে যেমন চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিল চারি আশ্রমের উপযোগী বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যের সময়ে শ্রুতিধারণ করিতে হইত, গার্হস্থ্যে ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত, অরণ্যে গমন করিলে আরণ্যকগ্রন্থ প্রধান উপজীব্য ছিল এবং শেষ অবস্থায় ছিল উপনিষদ্। এই মত সত্য অথবা ইউরোপীয়দের মত সত্য আমরা তাহার বিচারে অধিকারী

* উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে লোটাস্ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নহি। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে একই সময়ে মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ্ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছিল এ কথা বলিলে অভিব্যক্তির নিয়মকে অস্বীকার করা হয়। উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব যে বিদ্যমান তাহা লেখক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। একদিকে মন্ত্র ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড, অন্যদিকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, এই দুই ধারাকে এক ধারা বলিলে চলে না। এই দুই ধারা যে একই কালে উৎপন্ন, ইহাদের মধ্যে পারম্পর্য্য কিছুই নাই তাহা মন স্বীকার করিতে চায় না। অবশ্য, এ কথা সম্ভবপর হইতেও পারে যে, ইহাদের উৎপত্তি-কালের পূর্ব্বাপরতা এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতর অনৈক্য থাকিলেও কোনো বিশেষ একসময়ে আমাদের সমাজে সকল গুলিই সমান শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং সে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের জন্য বেদের এই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হওয়াতে ইহাদের ভিতরকার বিরোধের একপ্রকার সমাধান হইয়া গিয়াছে। বস্তুত যাগযজ্ঞ ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের চিত্ত সে দিকে স্বাধীন ছিল এবং বাহ্য অনুষ্ঠানের জটিল জালের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া সহজেই তাঁহাদের চিন্তা ব্রহ্মবিদ্যার মুক্ত আকাশে সঞ্চরণ করিতে পথ পাইয়াছিল এই কথা অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, যে দুইজন মহাপুরুষ লোকপ্রচলিত পন্থাকে অস্বীকার করিয়া উদার ধর্ম্মপথের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শাক্যসিংহ উভয়েই ক্ষত্রিয়।

অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন যে উপনিষদে পরিস্ফুট আকারে আমরা যে সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করি তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অনেক লোকের গবেষণার ফল। ডয়সন্ সেই জন্য উপনিষদের ভিতর হইতে নানা কালের চিন্তার স্তরপর্য্যায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন উপনিষদের প্রথম স্তর—নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। নেতি নেতি শব্দবাচ্য এক বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় নিরাকার সত্তা আছেন এবং আর কিছু নাই এই তত্ত্ব প্রথমে বৈদিক বহুদেববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছিল। তারপর যখন জগতে ও ব্রহ্মে যোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইল তখন জগৎ এবং ব্রহ্ম একই এই মত প্রচারিত হইল। ইংরাজীতে ইহাকে বলে প্যান্থীজম্। ইহাই উপনিষদের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে ব্রহ্ম ও জগতের দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ স্থির করা হইল। অর্থাৎ জগতে যদিচ ব্রহ্মের আবির্ভাব আছে তথাপি জগৎকে তিনি বহুগুণে ছাড়াইয়া আছেন। ইংরাজীতে এ মতের নাম থিইজম্। শেষে যখন ব্রহ্মতত্ত্ব একদিকে, সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যদিকে স্বতন্ত্র হইয়া দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করিল তখনই উপনিষদ যুগের পরিণাম এবং সাংখ্য শাস্ত্র প্রভৃতির আরম্ভ।

অধ্যাপক ডয়সন্ অনেক প্রমাণের দ্বারা এই ক্রমবিকাশের স্তরপর্য্যায় উপনিষদের ভিতর হইতে বাহির করিবার বিধিমতে চেষ্টা পাইলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষার বিভেদের প্রমাণের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় নাই। বিশুদ্ধ অনুমানের উপরই তাঁহার প্রমাণচেষ্টার প্রধান নির্ভর। এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, যে কোন উপনিষদ্ টানিয়া লওয়া যাক্ না কেন তাহার মধ্যে ডয়সন্‌কথিত সকল মতবাদই এক সঙ্গে গায়ে গায়ে মিলিয়া আছে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার মধ্যে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ উভয়ই আছে—ব্রহ্মে জগতে ভিন্ন কখনো বলা হইতেছে কখনো বা উভয়ে অভিন্ন বলা হইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে উপনিষদ্ তত্ত্বগ্রন্থ নয়, তাহা ঋষিকবিদের উপলব্ধির প্রকাশ মাত্র। তর্কযুক্তির সাহায্যে সত্যকে প্রমাণ করিবার ব্যস্ততা ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না, ইহা শারীরক মীমাংসাও নয়, শ্রীভাষ্যও নয়—একেবারে বিশুদ্ধ উপলব্ধির কথা, সহজ প্রজ্ঞালব্ধ সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা। সুতরাং তাহার মধ্যে সকল মতবৈচিত্র্যেরই অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। জীবনের মধ্যে যেমন বিচিত্র বিরুদ্ধ জিনিসের মিল ঘটে তেমনি নানা বিরুদ্ধ মতামত এই উপনিষদের মধ্যে মিলিয়াছে। উপনিষদ যদি দর্শনশাস্ত্র হইত তবে তাহাকে তর্কের চুলচেরা পথে চলিতে হইত এবং তাহা হইলেই যাহা অখণ্ড উপলব্ধির জিনিস তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া পরস্পর যুঝিয়া মরিত।

হীরেন্দ্র বাবু যদিচ ডয়সনের মতের সমালোচনা কোথাও করেন নাই তথাপি তাঁহার গ্রন্থে আমরা এই ভাবেরই সাক্ষ্য পাইয়াছি। তাঁহার আলোচনাকে এক প্রকার ডয়সনের আলোচনার প্রতিবাদ বলিলেও চলে। কারণ তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে সগুণনির্গুণ, এই দুই কোটির মিলই উপনিষদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ্ যে দর্শনশাস্ত্র বা ভাষ্যমাত্র নয়, তাহা যে আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর হইতে উপলব্ধ অখণ্ড সত্যের সাক্ষাৎকারের কথা, তাহাও তিনি একাধিক স্থানে অসঙ্কোচেই বলিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি কথা আমাদের জানাইতে হইতেছে। লেখক উপনিষদের মতের সহিত থিয়সফির মতকে মিলিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর প্রভৃতি সম্বন্ধে থিয়সফিকথিত সংস্কারগুলিকে উপনিষদের বাক্যে

চাপাইয়া দিয়াছেন। হইতে পারে যে ও সকল গুহ্যতত্ত্বও উপনিষদের ভিতরে কোন না কোন আকারে নিহিত ছিল; কারণ, থিয়সফি তো মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার বহির্ভূত জিনিস নয়; থিয়সফির মূল কত কালের কত গুহ্য সাধনার মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তবে ইহাতে অনিষ্ট হয় এই যে, গোড়াতেই যে পাঠকেরা আধুনিক সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের প্রতি আস্থাবান্ নয় তাহারা একদিকে তাঁহার যুক্তি ও অপরদিকে তাঁহার সংস্কারের ঘাতপ্রতিঘাতে পীড়া বোধ করিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আধুনিক জীববিজ্ঞানে বলে যে যদিও কোষাণুর (cell) সমষ্টি মিলিয়া স্থূল শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে তথাপি প্রত্যেক কোষাণু এবং তাহার সূক্ষ্মতম ভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। লেখক এই কথাটাকে লইয়া উপনিষদের "বিরাট" ও "হিরণ্যগর্ভ" এ দুয়ের প্রভেদ বুঝাইলেন এইরূপ:—কোষাণুর সমষ্টিসমন্বিত স্থূল শরীরের মত ব্যষ্টি স্থূল দেহের যে সমষ্টিমূর্ত্তি তাহারই নাম "বিরাট" এবং প্রত্যেক কোষাণুর সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ন্যায় সূক্ষ্মব্যষ্টি যে সমষ্টি শরীর ধারণ করেন তাহারই নাম "হিরণ্যগর্ভ"। এই সূক্ষ্মব্যষ্টির শরীরই মহাত্মাগণ কালে কালে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের উপলব্ধি সূক্ষ্মতর হইয়া থাকে। এ সকল মতবাদের স্বতন্ত্র স্থান থাকিতে পারে কিন্তু উপনিষদের মতব্যাখ্যার সহিত ইহাদিগকে জড়িত করা আমরা সঙ্গত মনে করি না।

এটুকু দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও পুস্তকখানি যে অতীব উপাদেয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখকের যাহা প্রধান বক্তব্য বিষয়—ব্রহ্মতত্ত্বের যে দুইটি দিক্ উপনিষদ্ স্বীকার করিয়াছেন—একটি জীবাত্মার দিক্ বা সীমার দিক্ এবং অপরটি পরমাত্মার স্বরূপের দিক্ বা অসীমের দিক্—এবং এ দুয়ের যে অভিন্ন যোগের কথা উপনিষদ্ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাতেই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ব্রহ্ম যেখানে আপনাতে আপনি, সেখানে তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় সকল গুণাতীত; কিন্তু যেখানে তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন সেখানে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস, চিদ্ঘন ও আনন্দময়। অর্থাৎ সত্তা এবং প্রকাশ, ভাব এবং রূপের যে দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে আছে তাহা তাঁহার মধ্যে নাই। আমাদের বুদ্ধি সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; দেখিয়া আমরা নিত্যকে এবং অনিত্যকে সীমাকে এবং অসীমকে একই সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না, সেই জন্য আমাদের বুদ্ধি কল্পনা করে যে এ দুই বুঝি বাস্তবিক বিচ্ছিন্ন। এ দ্বৈত কেবল আমাদের বুদ্ধির কাছে। অথচ আমরা ইহাও বুঝি যে আমাদের বুদ্ধি যদি সীমা-পরিচ্ছিন্ন না হইত তবে এ দ্বৈত তাহার মধ্যেও থাকিত না। সেই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মের মধ্যে এ দ্বৈতের অবসান আছে এ কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনিই সজোরে বলিয়াছেন যে বুদ্ধির দ্বারা তিনি গম্য নহেন। তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তাঁহাকে একরকম করিয়া উপলব্ধি করা যায়। তিনি অন্তরে "অন্তর্যামী" বাহিরে "মহেশ্বর", বিশ্বাভিব্যক্তিতে "বিধাতা" অথচ "বিশ্বাতিগ"—সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব কোনদিনই বিশুদ্ধ প্যান্থিইজ্‌ম্‌ও নয় বিশুদ্ধ আইডিয়ালইজ্‌ম্‌ও নয়।

পরিশেষে একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া আমরা এ আলোচনা বন্ধ করিব। সেটি "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি"র তত্ত্ব। উপনিষদের মধ্যে লেখক এই তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করিয়া আবিষ্কার এবং ইহাকে বিশদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এ জন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

প্রধান বলিতে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে পুরুষকে বুঝায়। সাংখ্যের দ্বৈতবাদের উৎপত্তি যে ঐ তত্ত্বে তাহা দেখাই যাইতেছে।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই প্রকৃতি এবং পুরুষ—একটি ক্ষয়শীল এবং অপরটি অক্ষয়—এ উভয়ই একই সঙ্গে বিদ্যমান—উপনিষদের এই সৃষ্টিতত্ত্বটি খুবই আশ্চর্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এ কথার আভাস আছে। সমস্ত বিচিত্র বিশ্বশক্তির আমরা একটি ক্ষয়শীল পরিবর্ত্তনশীল রূপ দেখিতেছি কিন্তু তাহার অন্তরতর রূপটি অক্ষয় অবিনাশী। এই কারণেই শক্তির রূপান্তর ঘটিতেছে কিন্তু বিনাশ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ তাহার মধ্যে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই তত্ত্বই একত্র বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতিপুরুষের একত্র অবস্থানের এই মূলতত্ত্বটি উপনিষদে কি সাহসের সঙ্গে চিন্তিত এবং ঘোষিত হইয়াছে!

অথচ যিনি প্রধানও নন্ ক্ষেত্রজ্ঞও নন্—দুয়েরই সমন্বয় যাঁহাতে, উপনিষদে তিনিই প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতি এবং তাহার সাক্ষী জ্ঞাতা পুরুষ এ দুইই সেই একের মধ্যে সমাহিত। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধের দিনে এই একের বার্ত্তার জন্য কি প্রাচীন উপনিষদের দিকে দ্বৈতবাদী জগৎকে তাকাইতে হইবে না?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

নানাকথা।

ওলাউঠার প্রতিষেধক।

ইংলণ্ডের একজন চিকিৎসক ডাক্তার মল্‌সন্ ওলাউঠা নিবারণের এক অভিনব উপায় সম্প্রতি এক পত্রিকায়

প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা এই :—একটা ডবল পয়সার মত আয়তন ও ১/১৬ ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট একটী অমিশ্রিত তাম্রখণ্ড ছিদ্র করিয়া গলায় ঝুলাইতে হয়। নাভীর প্রায় দুই ইঞ্চি উপরে পেটের সংস্পর্শে ইহা আসা চাই। ত্বক ও পরিচ্ছদের সঙ্গে তাম্রখণ্ডের পুনঃপুনঃ ঘর্ষণে ত্বকের ভিতর দিয়া যথেষ্ট তাম্র শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহাই পরিধানকারীকে ওলাউঠার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যখন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয় তখন ইহা সর্ব্বদা পরিধান করা যাইতে পারে। এই তাম্রখণ্ড রক্ষাকবচ বা দৈব শক্তিসম্পন্ন কিছু নহে, ইহা যে বিজ্ঞানসম্মত একটী রোগ নিবারক, তাম্রখনির শ্রমজীবিদের মধ্যে যে এই রোগের প্রকোপ নাই ইহা তাহারই প্রমাণ। হানিম্যান তাঁহার এক গ্রন্থে ("Lesser writings") বলিয়াছেন যে পরিমিত আহার করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাম্র-ধাতুর ব্যবহার ওলাউঠার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।" হাঙ্গেরিতে যাহারা ত্বকের সংস্পর্শে তাম্রখণ্ড ব্যবহার করে তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয় না। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন সেণ্ট্-পিটার্সবর্গে ওলাউঠার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় তখন ডাক্তার মল্সন্ সেই নগরে গিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাম্রখণ্ড ধারণ করিতেন এবং সেই জন্যেই সম্ভবতঃ রোগাক্রান্ত হন নাই। এই সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেহ কেহ প্রমাণ বলিয়া গণ্য না করিতে পারেন কিন্তু তাম্রসংক্রান্ত ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবিরা যে এই মহামারী হইতে নিরাপদ থাকে ইহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য।

উচ্চ হইতে পতন।

অনেক উচ্চ হইতে পড়িয়াও যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে তাহাদের অপেক্ষা দর্শকগণ অধিকতর ক্লেশ পান। ফরাসি লেখক ম্যান্জিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বহু উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও মৃত্যু ঘটে নাই এমন একটি অদ্বিতীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। এই লোকটী সম্রাট্ নেপোলিয়নের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্যারিসের গির্জ্জার অত্যুচ্চ গম্বুজের উপর সাজাইবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একটা মই সরাইবার সময় সে নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া একেবারে মঞ্চ হইতে চিৎকার করিয়া তাহার সহযোগি বন্ধুদিগকে Tiens, me voila parti বলিতে বলিতে লম্ফ প্রদান করিল। গির্জ্জার ছোট একটা গম্বুজের উপর পড়িয়া সেখান হইতে গির্জ্জার তোষাখানার ছাদের উপর আসিয়া পড়িল এবং টালি ভাঙ্গিয়া একেবারে ঘরের চালের কড়ার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্য এই, তখনও সে সংজ্ঞা হারায় নাই; প্রশ্ন করিলে সে তার নাম ধাম বলিল। কিছুকাল পরে বিছানায় শায়িত হইলে সে অচেতন হইয়া পড়িল; কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে সে চেতনা লাভ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। বাল্য-কালে একবার ম্যান্জিনি নিজে বহু উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন; দ্রুতবেগে পড়ার দরুণ সমস্তই যেন তাহার কাছে অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইতেছিল এবং নিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে তাঁহাকে কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

নয় বৎসর পূর্ব্বে একজন জর্ম্মাণ ভূতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার আলপাইন পর্ব্বত হইতে পড়িবার সময় তাঁহার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছিল বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িবার সময় তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অতীত জীবনের সৌন্দর্য্যময় একটি চিত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তখন তিনি জীবনমরণের কথা স্থির হইয়া চিন্তা করিতে পারিয়াছিলেন। ভূমিসাৎ হইয়াও তিনি কোনো বেদনা-নুভব করেন নাই, কেবলমাত্র পাথরের গায়ে তাঁহার মাথার সংঘাতজনিত একটি শব্দ মাত্র তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

আর একজন আল্পাইন পরিব্রাজক পড়িবার সময় তাহার পরিবার ও জীবনবীমার কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার নিশ্বাস রোধ হয় নাই; কেবলমাত্র তুষারাবৃত ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তিনি হঠাৎ অচেতন হইয়াছিলেন। কোনো কোনো আল্পাইন আরোহীগণ বলেন পড়িবার সময় তাঁহাদের চিত্ত কোনো প্রকার চিন্তাকুল হয় না।

সম্প্রতি একজন ইংরেজ ডোভারে ৪০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের শিখর হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কিছু-কাল পরে তাঁহাকে পাঁচ ফুট জলে সংজ্ঞাহীনাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পায়ে জুতা ছিলনা। ইহাতে প্রমাণ হয় যে লোকটি জলে পৌঁছিয়া জুতা খুলিবার চেতনাটুকু হারায় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী,
পুত্রের বিবাহোপলক্ষে

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

গীতাপাঠ।

(আবহমান)

এখন ডারুইনের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের কথার কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

ডারুইনের মোট কথাটা'র ঘাটস্থান তিনটি;— তাহার প্রয়াণ-স্থান হ'চ্চে Natural selection অর্থাৎ প্রাকৃতিক পাত্র-নির্ব্বাচন; গম্যস্থান Survival of the fittest যোগ্যতমের উদ্বর্তন; এবং মাঝ-পথ, Struggle for existence, সত্তা-রক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি। প্রকৃতির পাত্র-নির্ব্বাচন-প্রণালী একপ্রকার জল-শোধন প্রণালী। বর্ষাকালের পঙ্কিল গঙ্গাজল ভাল করিয়া ছাঁকিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট প্রণালী কিরূপ তাহা বোধ করি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন—তাহা এইরূপ:—একটি নিশ্ছিদ্র খালি কলসের উপরে দুইটি তলায়-ঝাঁঝ্‌রি-কাটা কলস উপর্য্যুপরি স্থাপন করা হো'ক্; উপরের কলসটার ছ-আনা অংশ কয়্‌লার কুচিতে ভরাট্ করা হো'ক্ এবং মাঝের কলসটার ঐ পরিমাণ অংশ বালির গাদায় ভরাট্ করা হো'ক্; তাহার পরে উপরের কলসটা শোধিতব্য জলে গলাগলি পূর্ণ করা হো'ক্। তাহা হইলে জলের বারোআনা দূষিত অংশ কয়্‌লার কুচিতে খাইয়া গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা মাঝের কলসে স্থিতি-লাভ করিবে; তাহার পরে জলের অবশিষ্ট দূষিতাংশ বালির গাদায় খাইয়া গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, সেই ঝর্ঝরে পরিষ্কার জল নীচের খালি-কলসে স্থিতি লাভ করিবে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জীবের মধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই শ্রেণীর জীবের মধ্যে যাহারা অযোগ্য তাহারা চারিদিগের পাঞ্চভৌতিক শত্রু এবং বিজাতীয় জীবশত্রুর সহিত সত্তা-রক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি-গতিকে মারা পড়িয়া যায়, এই-রূপে অযোগ্য জীবেরা মারা পড়িয়া গিয়া যাহারা উদ্বৃত্ত হয়, তাহারাই প্রথম দফার যোগ্যতম জীব। এই যে প্রথম দফার যোগ্যতম জীব ইহাদের নির্ব্বাচন প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে "বিজাতীয় জীবন-সংগ্রাম"; কেননা প্রথম দফার যোগ্যতম জীবেরা বিজাতীয় শত্রুর অথবা পাঞ্চভৌতিক শত্রুর হস্ত হইতে অথবা দুয়েরই হস্ত হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে। এইরূপে, বিজাতীয় জীবন-সংগ্রামের পথ দিয়া প্রথম দফার যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন-কার্য্য হইয়া চুকিলে দ্বিতীয় দফার যোগ্যতম-জীবের নির্ব্বাচন-কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দ্বিতীয় দফার যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন-প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে সজাতীয় (অর্থাৎ সমজাতীয়) জীবন-সংগ্রাম। যূথস্থ বানরী-বৃন্দের স্বামিত্বের অধিকার-প্রাপ্তির জন্য বীর-বানরদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে যে কিরূপ সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ বাধে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এইরূপ স্ত্রীপরিগ্রহের উপলক্ষে সজাতীয় (অর্থাৎ সমজাতীয়) জীবগণের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম বাধে তাহা-রই আমি নাম দিতেছি "সজাতীয় জীবন-সংগ্রাম।" পূর্ব্বোক্ত বিজাতীয় জীবন-সংগ্রামের উদ্দেশ্য হ'চ্চে জীবের ব্যক্তিগত সত্তা-রক্ষা; সজাতীয় জীবন-সংগ্রামের উদ্দেশ্য হ'চ্চে জীবের জাতিগত সত্তা-রক্ষা। জাতিগত সত্তা-রক্ষা আর কিছু না—পুরুষানুক্রমে যাহাতে যোগ্য-

তম সন্তানসন্ততির প্রবাহ চলিতে পারে তাহারই গোড়া-পত্তন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথম দফার ঐ যে বিজাতীয় জীবন-সংগ্রাম উহার প্রধান নেতা বা প্রবর্ত্তক কে? আর দ্বিতীয় দফার এই যে সজাতীয় জীবন-সংগ্রাম ইহারই বা প্রধান নেতা কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, বিজাতীয় সংগ্রামের প্রধান নেতা যে ক্রোধ এবং সজাতীয় সংগ্রামের প্রধান নেতা যে, কন্দর্পদেব, ইহা বলা বাহুল্য; কেননা সকলেরই তাহা জানা কথা। এখন বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের নীচের ধাপের জীব-রাজ্যে জীবন-সংগ্রাম চালাইবার ঐ যে দুই প্রধান অধিনায়ক—কাম এবং ক্রোধ—ও দুই ধনুর্দ্ধর রজোগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত। এই জন্য ডারুইনের ঐ মোট মন্তব্য কথাটি আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিলে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক! তা'র সাক্ষী—পুরাণাদির অনেকানেক স্থানে এইরূপ একটি কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সংহারকর্ত্তা মহাদেব তমোগুণ মূর্ত্তিমান্, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণ মূর্ত্তিমান্, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রজোগুণ মূর্ত্তিমান্। ডারুইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের কথার কোন্ খানটিতে ঐক্য তাহা সংক্ষেপে দেখাইলাম; কোন্খানটিতে অনৈক্য তাহাও সংক্ষেপে দেখাইতেছি প্রণিধান কর।

ডারুইনের এই যে একটি কথা—Struggle for existence, সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি, এ কথার ভিতরে আর একটি কথা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সে কথাটি কিন্তু প্রকৃতির পর্দার আড়ালের কথা, আর, সেই জন্য ডারুইন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে পথের পন্থী, সে পথে অন্তঃপুরবাসিনী মর্ম্ম-কথাটি মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া জনতা'র মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে নিতান্তই পরাঙ্মুখ। এ বিষয়ে বেশী বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। যেহেতু হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞানের যে কিরূপ দশা হয়, আমাদের দেশের সাধারণ-শ্রেণীর লোকেরা—বিশেষত. প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা খুবই বোঝেন।

ডারুইনের কোনো শিষ্যানুশিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "তুমি বলিতেছ যে, জীবজগতে সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি হয় অনবরত,—কেন এরূপ হয়?—উহার ভিতরের কথা কি?" তবে সে প্রশ্নের একটা সদুত্তর প্রদান করা তাঁহার কর্ম্ম নহে—যেহেতু ডারুইন সে বিষয়ে মূলেই কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। আমরা কিন্তু ত্রিগুণ-তত্ত্বের চাবি দিয়া প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ঐ নিগূঢ় রহস্যটির কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, সমুদ্রের তরঙ্গ-চাপল্যের নীচের স্তরে যেমন গভীর জলের অটল শান্তি চাপা দেওয়া রহিয়াছে, তেমনি সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির মূলে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে; আমরা দেখিয়াছি যে, "আমি ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এ বৃত্তান্তটি আমার নিকটে অপ্রকাশ নাই; আর, আমার সত্তার এই যে প্রকাশ ইহা আমার আনন্দের বিষয়; তেমনি আবার, ভূতকাল হইতে বর্ত্তিয়া-থাকা ব্যাপারটি বর্ত্তমান কালে আমার আনন্দের বিষয় বলিয়াই আমি ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ আমার শুধু একলার নহে পরন্তু জীবমাত্রেরই পৈত্রিক সম্পত্তি। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের মধ্যে যেমন সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাধীন আনন্দ রহিয়াছে, তেমনি সেই প্রকাশ এবং আনন্দের বাধাও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, আনন্দের বাধানুভূতি যদিচ আনন্দানুভবের বিপরীত পক্ষ তথাপি আনন্দের বাধানুভূতি অনুভবকর্ত্তার অন্তর্নিগূঢ় বীজভাবাপন্ন আনন্দের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করে না। একজন ক্ষুধার্ত্ত পথিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া আপনার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রকৃতিস্থ হয় না অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শরীরে স্বাস্থ্য থাকে না। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুধার জ্বালা শারীরিক স্বাস্থ্যের বিপরীত পক্ষ, এমন কি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালাতেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। ক্ষুধার জ্বালা যদিচ, এইরূপ স্বাস্থ্যের বিপরীত পক্ষ, তথাপি এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ক্ষুধার তীব্রতা শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ, পক্ষান্তরে ক্ষুধামান্দ্য মস্ত একটা রোগের লক্ষণ। এই সঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের প্রতি সে ব্যক্তির মূলেই লক্ষ্য থাকে না—পরন্তু কতক্ষণে অন্নব্যঞ্জনাদি তাহার তৃষিত নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে এই ভাবনাটিই তাহার মনোরাজ্যে একাধিপত্য করে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি জীবেরা যখন আপনাদের অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের বাধাপনয়ন-চেষ্টায় প্রাণপণে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই বাধার অনুভূতিই তাহাদের সংগ্রামকার্য্যের একমাত্র নেতা হয়, তা বই, সেই বাধানুভূতির মূলে যে সত্তাঘটিত আনন্দের আস্বাদ অবিচ্ছেদে লাগিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি তাহাদের মূলেই লক্ষ্য থাকে না। অতঃপর আমি বলিতে চাই এই যে, এক ব্যক্তি সহস্ররোগী হইলেও যতক্ষণ

পর্য্যন্ত তাহার নাড়ীতে প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রোগের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য কোনো-না-কোনো পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা স্বাস্থ্যের ঐকান্তিক অভাবের নামই মৃত্যু। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, রোগ-যন্ত্রনার অন্তর্নিগূঢ় স্বাস্থ্যকে তাহার নিভৃত গুহার মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কাজে খাটানো রোগীর তো অধিকারায়ত্ত নহেই, তা'ছাড়া, তাহা চিকিৎসকেরও অধিকারায়ত্ত নহে। এই জন্য সুচিকিৎসকেরা আপনাদের ব্যবসায়ের লাঘব স্বীকার করিয়া এ কথা বলিতে একটুও সংকুচিত হ'ন না যে, ধরিতে গেলে প্রকৃতিই রোগের প্রতিবিধানকর্ত্রী, তাঁহারা কেবল উপলক্ষ মাত্র। তা বলিয়া চিকিৎসকের সাধু-প্রকৃতির পরিচায়ক ঐ সত্য-বচনটিতে মুগ্ধ হইয়া রোগী ব্যক্তি যেন এরূপ মনে না করেন যে, ঔষধ-পথ্যের সেবনে তবে আর প্রয়োজন নাই—রোগ আপনা-আপনিই ভাল হইয়া যাইবে। চিকিৎসকের ঐ সার-কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সুচিকিৎসার অনুষ্ঠান দ্বারা স্বাস্থ্যের অভিব্যক্তিপথের বাধা অপনয়ন করা খুবই আবশ্যক—বাধা অপনীত হইলে স্বাস্থ্য প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে—তা বই তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া লইয়া আসিতে হইবে না। এই উপমাটির প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করিয়া দেখিলেই আমরা বেস্ বুঝিতে পারি যে, সত্তা-রক্ষার জন্য মহা একটা ধস্তাধস্তি ব্যাপার যাহা ডারুইন্ জীবজগতের পুরাতন কাহিনীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা কথাটা আর কিছু না—কেবল সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অপসারণের চেষ্টা মাত্র। যে জীব আপনার সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা-অপসারণে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়, সেই জীবের অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে প্রকাশ এবং আনন্দ আপনা-হইতে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে—তাহার জন্য দ্বিতীয় কোনোপ্রকার ধস্তাধস্তির প্রয়োজন হয় না। এ যাহা বলিলাম এ তো খুব সোজা কথা; কিন্তু তাহা সোজা কথা হইলেও তাহার আশুফলদর্শিতা পাকচক্রময় বাঁকা কথা অপেক্ষা বেশী বই কম নহে। পৃথিবীপথের যাত্রীদিগকে নদ-নদী-পর্ব্বত প্রভৃতি নানাপ্রকার পথের বাধার পাশ কাটাইয়া অনেক্বার অনেক দিকে ঘোরফের করিয়া প্যাঁচাও পথ দিয়া গম্যস্থানে উপনীত হইতে হয়—এ যেমন একদিকে, আর একদিকে তেমনি আকাশপথের যাত্রীরা নবাবিষ্কৃত বিমানে ভর করিয়া সোজা পথ দিয়া অবলীলাক্রমে গম্যস্থানে উপনীত হ'ন, ইহা সংবাদপত্রের পাঠকদিগের কাহারো অবিদিত নাই। আমরা তেমনি আমাদের ঐ সোজা কথাটিতে ভর করিয়া সোজা পথ দিয়া অতীব একটি গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। সে সিদ্ধান্ত এই যে, রজোগুণপ্রধান নীচের শ্রেণীর জীবেরা যখন সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অতিক্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়, তখন সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দ যাহা সর্ব্বপ্রথমে জড়রাজ্যে বীজভাবে অন্তর্নিগূঢ় ছিল এবং তাহার পরে যাহা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত-ভাবে জীবরাজ্যের তলে তলে জানান্ দিতেছিল, তাহা প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, তা বই, তাহাকে সাধাসাধনা করিয়া লইয়া আসিতে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, ডারুইন্ কেবল জীবদিগের বহিঃক্ষেত্রের জীবন সংগ্রামের প্রতিই ষোলো আনা মাত্রা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন;—ভালই করিয়াছিলেন—কেননা তাঁহার লক্ষ্যসাধনে তিনি ঐরূপ একাগ্রতার সহিত উঠিয়া-পড়িয়া না লাগিলে তাঁহার হাতের কাজ তিনি অমনতর পাকাপোক্তরূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারিতেন না। কিন্তু ডারুইনের লক্ষ্য বিষয় হইতে আমাদের লক্ষ্য বিষয় যে অংশে ভিন্ন সে অংশে আমরা আরেক পথের পন্থী—এ পথ হ'চ্চে মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতের পর্য্যালোচনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডারুইন বহির্জ্জগতের ক্রমবিকাশের মূলে যেরূপ রাজসিক কুরুক্ষেত্রকাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন—মনুষ্যের অন্তর্জগতে আমরা অবিকল তাহারই আর এক পৃষ্ঠা দেখিতে পাইতেছি; প্রভেদ কেবল এই যে, ডারুইনের হস্তের সাধনীযন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বাহ্য পরীক্ষা; আমাদের হস্তের সাধনীযন্ত্র স্বানুভূতি, মহচ্চরিতের আলোচনা এবং আত্মপরীক্ষা। জীবেরা যেমন তাহাদের বহিঃক্ষেত্রের বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; মনুষ্যের অন্তর্জগতে তেমনি রিপুগণের সহিত কঠোর সংগ্রামের পথের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয়; আর, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যাওয়ার নামই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। মনুষ্য কিন্তু পশ্বাদি জন্তুদিগের ন্যায় শুধুই কেবল সত্ত্বগুণের বাধামাত্র অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, পরন্তু সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ প্রকাশ এবং আনন্দ তাহাও অন্তঃকরণে উপলব্ধি করে। মনুষ্য তাহার পশ্চাৎপদের ভর আপনার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের উপরে স্থাপন করে, এবং অগ্রপদের ভর সেই প্রকাশ এবং আনন্দের বাধানুভূতির উপরে স্থাপন করে—এইরূপে অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে যোগ রক্ষা করিয়া রিপুগণের সহিত

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নিপুণ সেনাপতি যেমন পিছনের যে পথ দিয়া নূতন বলের সমাগম হইবে সে পথের আদ্যোপান্তে বিধিমতে পাহারা স্থাপন করিয়া তাহার আটঘাট আগ্‌লিয়া রাখেন—সাধক তেমনি যখন আত্মপ্রভাবের প্রকটন দ্বারা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন পিছনের যে পথ দিয়া দেবপ্রসাদের সমাগম হইবে সে পথ বিধিমতে আগ্‌লিয়া রাখেন—অর্থাৎ রিপুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া যাহাতে রিপুগণের কুস্বভাবের ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত না হ'ন, সে বিষয়ে বিধিমতে সাবধান হ'ন। চৈতন্য মহাপ্রভু যদি জগাই-মাধাইএর উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে ক্রোধ দ্বারা জয় করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় জগাই-মাধাই হইতেন—তাহা না করিয়া তিনি প্রেম দ্বারা ক্রোধকে জয় করিলেন। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, অগ্নি দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা যায় না—অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে হইলে জলের প্রয়োজন। এই জন্য রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সময় রাজসিক উৎসাহ এবং উদ্যমের সঙ্গে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের যোগ রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক—আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের যোগ রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক—তা নহিলে সাধকের জয়লাভের চেষ্টা চরম সাফল্যে পৌঁছিতে পরাভব মানিয়া মাঝপথে গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া ভূতলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্তর্জগতের রিপুগণের উপরে বিহিত বিধানে জয়লাভ করিলে সাধকের অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের ফোয়ারা কিরূপে আপনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া যায় তাহার যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে তাহার দুইটি সেরা দৃষ্টান্ত জগতে সুপ্রসিদ্ধ—তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই দেখিতে পারো। বোধিবৃক্ষের তলে বুদ্ধদেব প্রশান্তভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন মারের শতসহস্র দলবলের উপরে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা কেমন স্বর্গীয়ভাবে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল; এবং তাহার আর কতিপয় শতাব্দী পরে ঈসামহাপ্রভু যখন বিজনপ্রান্তরে সয়তানের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরের প্রসাদ তাঁহার মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হইয়া কেমন আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার সমস্ত দুঃখ ক্লেশ মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্তিসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিল—ইহা পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সকলেরই জানা কথা।

ডারুইনের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মন্তব্য কথার ঐক্য কোন্‌স্থানটিতে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি; জীবজগতে রজোগুণের প্রবর্ত্তিত জীবন সংগ্রাম জীবের ক্রমোন্নতিপথ উন্মুক্ত করিয়া দ্যায়—এ কথাটি ডারুইনও বলেন, আমরাও বলি; তা ছাড়া আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমাদের ন্যায় ডারুইন এ কথা বলেন না যে, সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির মূলে যে বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে তাহার বাধা অপনীত হইলেই তাহা আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; তা ছাড়া, ইহার পরে তাহা যখন আর কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া মনুষ্যের অন্তর্নিহিত পাশব প্রকৃতির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাদের উপরে রীতিমত জয় লাভ করিবে, তখন তাহা আরো জাজ্বল্যতররূপে ফুটিয়া বাহির হইবে—তখন মনুষ্যসমাজে সকলেই সকলের দুঃখমোচনের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে; সুবিবাহিত নরনারীরা যথোপযুক্ত বয়সে মনুষ্যের মতো মনুষ্যের বংশ পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত করিবে; ডারুইনের মতানুযায়ী ধস্তাধস্তীর পরিবর্ত্তে পৃথিবীর মনুষ্যজাতির আপাদমস্তক জুড়িয়া প্রেম এবং সদ্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; এক কথায়—মনুষ্য প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য হইবে। এই খানটিতে আমাদের মতের সহিত ডারুইনের মতের মিল হয় কি না সন্দেহ—মিল না হইবারই বেশী সম্ভাবনা। আজ আমি যাহা বলিলাম তাহার মূলমন্ত্র হচ্চে উপনিষদের এই বচনটি—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"। সাধক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে জীব অবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ যেমন ডারুইনের অভিপ্রেত সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি সেইরূপ ধস্তাধস্তিদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি পথের বাধা অপসারণ করেন; তাহার পরে এক প্রকার দিব্যজ্ঞান-গর্ভা বিদ্যা অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তিপথের বাধা আত্মপ্রভাবের বলে অপনীত হইলে ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ অশেখা বিদ্যা যাহার আরেক নাম বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ তাহা অন্তর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া জীবকে অমৃতে অভিষিক্ত করে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহা ত্রিগুণাত্মক, আর সমষ্টিসত্তা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহার অন্তর্ভূত সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দ রজস্তমোগুণ দ্বারা কলুষিত বা বাধিত হইতে পারে না। তবেই হইতেছে যে সমষ্টিসত্তা শুদ্ধসত্ত্বের কিনা পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আনন্দের আলয়। এককথায় সমষ্টি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা; আর সেই জন্য পরমাত্মার সচ্চিদানন্দ নাম আমাদের দেশের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রে সমস্বরে উদ্গীত হইয়াছে। ফলে, রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরমোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ যে ঈশ্বরের বিশেষত্বের নিদান এ বিষয়ে পাতঞ্জল এবং বেদান্তদর্শনের মত-সাদৃশ্য

অতীব সুস্পষ্ট। পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম পাদের ৩৪ সূত্রে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

ইহার অর্থ এই :—

যিনি ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট সেই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষই ঈশ্বর-শব্দের বাচ্য।

ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো পুরুষই নিত্যকাল ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট নহে। কর্ম্মবিপাকাশয় যে কাহাকে বলে তাহা ভোজকৃত টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ :—

"বিপচ্যন্তে ইতি বিপাকাঃ কর্ম্ম-ফলানি" কর্ম্মফল যথাকালে পাকিয়া ওঠে এই অর্থে কর্ম্মবিপাক। "আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরতে ইত্যাশয়াঃ বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাঃ" বাসনাখ্য সংস্কারগুলির যাবৎ পর্য্যন্ত না ফল বিপাক হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেগুলি চিত্তভূমিতে শয়ান থাকে (অর্থাৎ প্রসুপ্তভাবে নিলীন থাকে) এই অর্থে আশয়।

ভোজরাজ-কৃত এই পরিষ্কার সূত্র-ব্যাখ্যা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, কর্ম্মফলের প্রসুপ্ত বীজস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের নামই কর্ম্মবিপাকাশয়। কথাটা আর কিছু না—আমরা যেরূপ যেরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি সেই সেই কর্ম্মের সংস্কার আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, আর, তাহার পরে সেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কার হইতে সেই সেই কর্ম্মের ফলাফল যথাযথ সময়ে ফুটিয়া বাহির হয়। এই সকল কর্ম্মফলের বীজভূত সংস্কারের নাম বাসনা। এই রকমের যত সব বাসনা আমাদের মনের মধ্যে প্রগাঢ় অন্ধকারে নিলীন রহিয়াছে তাহাদের ভিতরে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না বলিয়া তাহারা সবসুদ্ধ ধরিয়া মোটের উপর অদৃষ্ট নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাসনাখ্য সংস্কার-সমষ্টি—কর্ম্মবিপাকাশয়, যাহার আর এক নাম অদৃষ্ট, তাহার ভিতরে মূলেই যখন আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাহা তমোগুণেরই আর এক নাম; তা ছাড়া, ক্লেশ যে রজোগুণের আর এক নাম তাহা পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। তবেই হইতেছে যে, ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলাও যা, আর, রজস্তমোগুণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলাও তা, একই কথা। সূত্রকার কোন্ দুই গুণ ঈশ্বরেতে নাই তাহা ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—পরন্তু টীকাকার তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া কোন্ গুণ ঈশ্বরেতে সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতে ত্রুটি করেন নাই। টীকাকার বলিতেছেন :—"যদ্যপি সর্ব্বেষাং আত্মনাং ক্লেশাদিসংস্পর্শো নাস্তি তথাপি চিত্তগত স্তেষাং উপচর্য্যতে। যথা যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ স্বামিনঃ। অস্য তু ত্রিষ্বপি কালেষু তথাবিধোঽপি ক্লেশাদি-পরামর্শো নাস্তি। অতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবান্ ঈশ্বরঃ। তস্য চ তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ইহার অর্থ এই :—

"জীবাত্মাকে যদি তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় তবে জীবাত্মাতেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ নাই" এ কথা সত্য হইলেও দেখিতে হইবে এই যে, রাজা যেমন তাঁহার সৈন্যবর্গের জয়পরাজয় আপনার গায়ে মাখিয়া ল'ন জীবাত্মা তেমনি তাঁহার অন্তঃকরণের ক্লেশাদি আপনার গায়ে মাখিয়া ল'ন; ঈশ্বরেতে কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের কোনো কালেই সে রকম গায়ে মাখিয়া লওয়া ক্লেশাদিরও সংস্পর্শ নাই এইজন্য ভগবান ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোনো কালেই ক্লেশাদি দ্বারা স্বপ্নমাত্রও সংস্পৃষ্ট না হওয়া-ব্যাপারটি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অতএব সত্ত্বগুণের উৎকর্ষই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের গোড়া'র কথা। ভাব এই যে, ঈশ্বরেতে ঐরূপ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ আছে বলিয়াই তিনি ঈশ্বর। আমরা একটু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সে কথাটি, অর্থাৎ "রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরমোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের বিশেষত্বের কিম্বা ঈশ্বরত্বের নিদান" এই কথাটি শুধু যে কেবল পাতঞ্জলদর্শনের কথা তাহা নহে—বেদান্তদর্শনেও ঐ কথা বিবিধতে সমর্থিত হইয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, পাতঞ্জলদর্শনের মতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের ঐশী প্রকৃতি, বেদান্তদর্শনের মতে উহা ঈশ্বরের মায়া-সংজ্ঞক উপাধি। তার সাক্ষী, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহ গ্রন্থে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞানির্ব্বাচন উপলক্ষে তাঁহার বক্তব্য কথাটি আরম্ভ করিতেছেন এইরূপে :—

"মায়োপহিত চৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ব-বৃংহিতং • • • ঈশ ইত্যপি গীয়তে"

ইহার অর্থ এই :—

যে চৈতন্য মায়া উপাধিতে উপহিত, প্রতিবিম্ব-সহ বর্ত্তমান, এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিপুষ্ট, তিনি ঈশ নামে অভিহিত হ'ন। "প্রতিবিম্ব সহবর্ত্তমান" এ কথাটির ভাবার্থ এই যে, ঈশ্বর চৈতন্য উপাধিতে বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্ব হ'ন। পাতঞ্জলদর্শনের মতেও দ্রষ্টা পুরুষ সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হ'ন—আর শেষোক্ত দর্শনে ঐরূপ প্রতিবিম্বিত হওনের নাম দেওয়া হইয়াছে চিচ্ছায়াসংক্রান্তি।

পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে মায়াশব্দের সহিত একযোগে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ :—

"চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ * * ॥"

ইহার অর্থ এই :—

চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসমন্বিতা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং তাহা দুই প্রকার—শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী ও মলিনসত্ত্বরূপিনী। শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতির নাম মায়া, আর, মলিনসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। যিনি সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী মায়াকে বশীভূত করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হ'ন তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া অবধারিতব্য; আর, সেই যে মলিন-সত্ত্বরূপিনী প্রকৃতি অবিদ্যা—ঈশ্বর ব্যতীত আর সকলেই সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন।" মলিনসত্ত্ব-শব্দের অর্থ যে, রজস্তমোগুণ দ্বারা বাধাগ্রস্ত সত্ত্বগুণ তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে।

এইখানটিতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে সহজেই একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে এই যে, গোড়া'র সেই যে শুদ্ধসত্ত্বময়ী সমষ্টিসত্তা তাহা সমস্তেরই গোড়া'র কথা ইহা কেহই অস্বীকার করেনও না করিতে পারেনও না, অথচ আমাদের চর্ম্মচক্ষের বা মনশ্চক্ষের সম্মুখে যখন যে-কোনো সত্তা উপস্থিত হয় সমস্তই যে ত্রিগুণাত্মক ব্যষ্টিসত্তা এ কথাটি আমাদের আটপহরিয়া দেখা কথা; তার সাক্ষী—এই যে একটি বৃত্তান্ত—যে, আমার সত্তা স্বতন্ত্র, তোমার সত্তা স্বতন্ত্র, এবং তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নাম করিবে তাহার সত্তা স্বতন্ত্র;—প্রত্যেক মনুষ্যের, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক জড়পরমাণুর সত্তা স্বতন্ত্র—এ বৃত্তান্তটি পৃথিবীশুদ্ধ আপামর সাধারণ সমস্ত লোকই অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, ঐ সর্ব্ববাদিসম্মত গোড়া'র কথাটির সঙ্গে শেষের এই দেখা কথাট খাপ খাইবে কিরূপে? গোড়া'র সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্ন অপরিচ্ছিন্ন মহাসত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা ইহাতে যখন ভুল নাই, তখন শেষের এই ত্রিগুণাত্মক ব্যষ্টিসত্তার দলবল বসিবার স্থান পাইবেই বা কোথায়, আসিবেই বা কোথা হইতে? এই দুরূহ প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে হইলে বেদান্ত-দর্শন এবং পাতঞ্জল-দর্শনের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ে যে স্থানটিতে সম্পূর্ণ ঐকমত্য আছে সেই স্থানট বিধিমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। সে স্থানটি আমি যথাবৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর :—

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের ২৪ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকার যতখানি অংশ আমরা একটু পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, টীকাকার তাহার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন—

"তস্য চ তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ; সত্ত্বোৎকর্ষশ্চ প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদেব। ন চানয়োঃ জ্ঞানৈশ্বর্যয়োঃ ইতরেতরাশ্রয়ত্বং, পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ।"

ইহার অর্থ এই :—

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের গোড়া'র কথা হ'চ্চে অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ, এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এইরূপ আমরা দুইটি বিষয় পাইতেছি; একটি বিষয় হ'চ্চে জ্ঞান, আর একট বিষয় হ'চ্চে ঐশ্বর্য্য বা শক্তিমত্তা। যদিচ ঈশ্বরেতে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য দুইই একাধারে বর্ত্তমান, তথাপি ও দুইটি পৃথক্ থাকের বিষয়, কেননা উভয়ে পরস্পরকে অপেক্ষা করে না। ভোজরাজের এ কথাটির তাৎপর্য্য যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি—তাহা এই :—

সেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয়বিধ সাংখ্যের মতেই দ্রষ্টা পুরুষ স্বতই জ্ঞানস্বরূপ; তবেই হইতেছে যে দ্রষ্টা পুরুষের জ্ঞান অপর কিছুকে অপেক্ষা করে না। তেমনি আবার, প্রকৃতির সত্ত্বগুণ প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি, সুতরাং সত্ত্বগুণের জন্য প্রকৃতি অপর কাহারো নিকটে ঋণী নহে। সাধারণ সাংখ্য-দর্শনের মতে দ্রষ্টাপুরুষমাত্রই জ্ঞানস্বরূপ; তাহার মধ্যে পাতঞ্জল সাংখ্যদর্শনের বিশেষ একটি কথা এই যে, ঈশ্বর যদিচ জীবেরই ন্যায় দ্রষ্টা পুরুষ—কিন্তু তথাপি একটি বিষয়ে কোন জীবেরই তাঁহার সহিত তুলনা হয় না; সে বিষয়টি হ'চ্চে এই যে, নিত্যকাল প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশের সহিত ঈশ্বরের একাত্মভাব যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোনো দ্রষ্টা পুরুষেরই অধিকারায়ত্ত নহে। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে একদিকে দ্রষ্টা পুরুষ স্বয়ং জ্ঞানের নিদান, এবং আর একদিকে প্রকৃতির সারভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের নিদান; এই দুই দিকের ঐ যে দুই সার বস্তু অর্থাৎ পুরুষের দিকের সারবস্তু জ্ঞান এবং প্রকৃতির দিকের সারবস্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ যাহার আর এক নাম মহাশক্তি বা মহৈশ্বর্য্য এই দুই সারবস্তুর অনাদি একাত্মভাবই পাতঞ্জলদর্শনের মতে ঈশ্বরত্বের নিদান। ফল-কথা এই যে, পাতঞ্জলদর্শনের মতে দুইটি অনন্যসাধারণ গুণ ঈশ্বরেতে একাধারে বর্ত্তমান—একটি হ'চ্চে অপরিসীম জ্ঞান এবং আরেকটি হ'চ্চে অপরিসীম শক্তি। বেদান্তদর্শনের মতেও তাই; তার সাক্ষী শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"সর্ব্বশক্তি গুণোপেতঃ সর্ব্বজ্ঞানাবভাসকঃ।
স্বতন্ত্রঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ॥

তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণোর্মহাশক্তির্মহীয়সঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বান্মনীষিণঃ।
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্ববৃংহিতং ॥"

ইহার অর্থ এই :—

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র সত্যসংকল্প এবং সত্যকাম তিনিই ঈশ্বর। সেই মহাবিষ্ণু মহীয়ান্ পরমেশ্বরের যে এক মহতীশক্তি আছে, যাহার আরেক নাম সমষ্টিভূত সত্ত্বগুণ, সেই মহাশক্তি যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরত্বাদির কারণ এই জন্য মনীষীরা সেই সত্ত্বগুণের সমষ্টিরূপা মহতীশক্তির নাম দিয়াছেন কারণ শরীর। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল এবং বেদান্ত উভয় দর্শনেরই মতে মহাশক্তি এবং মহৈশ্বর্য্যের নিদান-ভূত বাধাবিহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান দুইই একাধারে বিদ্যমান।

প্রকাশ এবং আনন্দ যে সত্ত্বগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত—এ বিষয়টি আমি পূর্ব্বে বিধিমতে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; কিন্তু সাত্ত্বিক আনন্দের সঙ্গে যে একটি শক্তির ব্যাপার মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে সে বিষয়টির সম্বন্ধে আমি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত মূলেই কোনো কথার উচ্চবাচ্য করি নাই। অথচ আমাদের দেশের বেদ পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রেরই একটি প্রধান মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের সহযোগ ব্যতিরেকে, অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞান এবং শক্তির সহযোগ-ব্যতিরেকে জগৎকার্য্যের প্রবাহ তো চলিতে পারেই না, তা ছাড়া—জগৎ বলিয়া একটা পদার্থ হইতেই পারে না;—এমন কি নব্যতম যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতেও বিশ্বভুবনে শক্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ জোড়ে মিলিয়া এক সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। এক্ষণে সেই কথাটি অর্থাৎ সাত্ত্বিক আনন্দের সহিত একটি মৌলিক ধাঁচার শক্তি একত্রে বাস করিতেছে এই কথাটি শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টিক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইবার সময় উপস্থিত, এই জন্য তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "আমি ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটির প্রকাশ যেমন আমার মনের মধ্যে ক্রমাগতই লাগিয়া আছে, তেমনি সেই প্রকাশের সঙ্গে ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে আর সেই সঙ্গে এটাও বলিয়াছি যে, সেই যে ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার গোড়ার কথা হ'চ্চে আত্মসত্তা'র রসাস্বাদনজনিত আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানবান্ জীবের মর্ম্মাধিষ্ঠিত সেই যে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা, সে ইচ্ছাটি কি বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইবার ন্যায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই পর্য্যবসিত? সত্তার রসবোধ যখন সত্তার প্রকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেই রসবোধজনিত আনন্দ হইতে যখন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রসূত হইয়াছে, তখন সেই ইচ্ছার মূলে তাহাকে ফলবতী করিতে পারিবার মতো কোনো সহায়-সামর্থ্য কি বিদ্যমান নাই—শক্তি বিদ্যমান নাই? প্রকৃত কথা এই যে, অভীষ্ট-সাধনে সাধকের শক্তি আছে কি না তাহা কার্য্যাভিব্যক্তির পূর্ব্বে জানা যাইতে পারে না; কেবল "ফলেন পরিচীয়তে" এই চিরকেলে প্রবাদটিই শক্তি পরীক্ষার একমাত্র কষ্টিপাথর। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো জ্ঞানবান্ মনুষ্যমাত্রেরই আছে; কিন্তু ইচ্ছা যেমন আছে, তেমনি মনুষ্য-জাতির বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি আছে কি না তাহা ফলেন পরিচীয়তে'র কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক্। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরা মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ বলবান্, তা ছাড়া তাহারা যেরূপ দুর্ভেদ্য চর্ম্মবর্ম্মে এবং আশু কার্য্যদর্শী দন্ত-নখাস্ত্রে সুসজ্জিত মনুষ্য তাহার তুলনায় নিতান্তই অসম্পূর্ণ জীব; কেননা বর্ত্তিয়া থাকিবার জন্য যে সকল সাধনোপকরণ তাহার পক্ষে আশু প্রয়োজনীয়, প্রকৃতিমাতা তাহাকে তাহার শতাংশের একাংশও দে'ন নাই; অথচ ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সহায়সম্পত্তিবিহীন অসম্পূর্ণ জীবের দোর্দণ্ড প্রতাপে পশুরাজ্যের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থরহরি কম্পমান। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে, বাধাবিঘ্নের প্রতিকূলে বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি মনুষ্যের ভিতরে যেমন আছে এমন আর কোনো জীবের ভিতরেই নাই। তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে—সে কথাটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য। সে কথা এই যে, মনুষ্যের বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের ঐরূপ শক্তি অপেক্ষা মাত্রায় শুধু বেশী তাহা নহে, পরন্তু মনুষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত পশ্বাদি জন্তুদিগের প্রাকৃত শক্তির তুলনাই হয় না। পূর্ব্বে এই যে একটি কথা আমি বলিয়াছি যে, বাধার অনুভূতিই—দুঃখই—রজোগুণই, বিশেষতঃ দুইটি মূর্ত্তিমান্ রজোগুণ কাম এবং ক্রোধ জীবজন্তুদিগের জীবনসংগ্রামের প্রধান সেনাপতি, এ কথা মনুষ্যের পক্ষে খাটে না। মনুষ্যের কার্য্যকলাপ একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনুষ্যের জীবনসংগ্রামে বাধানুভূতি সেনাপতি অপেক্ষা অনেক নিম্নপদবীস্থ যোদ্ধা; এই উচ্চ শ্রেণীর জীবনসংগ্রামে সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দই প্রধান সেনাপতি-পদের যোগ্য পাত্র। মনুষ্যের এই বিশেষত্বটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; কেননা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে উহার গুরুত্ব অপরিমেয়। একটি লোকপ্রসিদ্ধ ইংরাজি প্রবাদ এই যে Necessity is the mother of invention, বাধানুভূতিই কার্য্যকৌশলের জননী। মানিলাম যে, কার্য্যকৌশলের জননী বাধানুভূতি, কিন্তু তাহার জনক

কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহার জনক হ'চ্চে সত্তার রসবোধজনিত আনন্দ। যদি প্রমাণ চাও—তবে মনুষ্যের নীচের থাকের জীবজন্তুদিগের স্বভাবচরিত্র এবং আচার-ব্যবহারের প্রতি একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই অনায়াসে তাহা তুমি পাইতে পার। তাহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ তোমাকে আমি দেখাইতেছি—প্রণিধান কর। একটা বলবান্ গরিল্লা যদি কোনো মনুষ্যের হস্তের লগুড় দ্বারা আহত হয়, তবে খুব সম্ভব যে, গরিল্লাটা বাধানুভূতিজনিত ক্রোধের উত্তেজনায় সেই লগুড়টা প্রহারকের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহা ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। বাধানুভূতির বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত; তা বই, বাধানুভূতি যে, গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়া গরিল্লাকে গাছের একটা লম্বাচওড়া গোছের ডাল ভাঙিয়া ভীমের গদার ন্যায় একগাছি আশুফলপ্রদ লগুড় নির্ম্মাণ করিতে শিখাইবে, তাহার সে কোনো অংশেই যোগ্য পাত্র নহে। আদিম মনুষ্যেরাও এক সময়ে নদী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে সাঁতার দিয়া নদী পার হইত। কিন্তু সে প্রকার বাধার অনুভূতি কোনো জন্মেই মনুষ্যকে নৌকা নির্ম্মাণ করিতে শেখায় নাই ইহা বেদবাক্য। মনুষ্যের নৌকা-নির্ম্মাণ-বিদ্যার আদিগুরু তবে কে? মনুষ্য নাবিকের আদিগুরু যে কে তাহা নৌকার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। নৌকার গঠন দেখিলেই জহরী লোকের চক্ষে এ কথা ঢাকা থাকে না যে, নৌকা একপ্রকার কাঠের হাঁস। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, আদিম মনুষ্য-নাবিককে সর্ব্বপ্রথমে হালবর্জ্জিত দু-দেঁড়ে ডিঙিতে ভর করিয়া নদনদী-সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় ঘোরাফেরা করিতে শিখাইয়াছিল হংসাচার্য্য। এমন কি, উত্তর মেরুপ্রদেশীয় এস্‌কুইমো জাতীয় নাবিকেরা এখনো পর্য্যন্ত ঐ ধাঁচার ডিঙিতে ভর করিয়া সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় ঘোরাফেরা করে। তাহার অনেক শতাব্দী পরে মনুষ্য-নাবিককে হালওয়ালা চারদেঁড়ে নৌকায় ভর করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল মৎস্যাচার্য্য। তাহার কতিপয় শতাব্দী পরে মনুষ্য-নাবিককে মাঝসমুদ্র দিয়া পা'লভরে জাহাজ চালাইতে শিক্ষা দিয়াছিল নাবিক-নামক (অর্থাৎ Nautilus নামক) একপ্রকার ভূমধ্যসাগরনিবাসী জলজন্তু। এ তো গেল মনুষ্য-নাবিকের সামান্যশ্রেণীর গুরুপরম্পরা। কিন্তু পিতা গুরুর গুরু—যেহেতু পিতারাই বালকদিগকে উপযুক্ত গুরুগণের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাহাদের জ্ঞানোদ্দীপনের পথ প্রমুক্ত করিয়া দ্যা'ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আদিম নাবিকদিগের পিতৃতুল্য গুরুর গুরু কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, আদিম নাবিকদিগের গুরুর গুরু হ'চ্চেন সেই মহাপুরুষ যাঁহাকে আমি বলিতেছি সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আদিম নাবিক যে খুব একজন ভাবুক লোক ছিলেন—কবি ছিলেন—তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তিনি যখন ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া, হংস মিথুন কিম্বা হংসযূথ অপূর্ব্ব সুন্দর ঠামে সরোবর বক্ষে গা ভাসাইয়া জল কাটিয়া চলিতেছে দেখিতেন তখন তাহা তিনি এরূপ কায়মনঃপ্রাণে দেখিতেন যে সেই হংসযূথের জলতরঙ্গের অপূর্ব্ব ভাব-সৌন্দর্য্যে তিনি তাঁহার অন্তর্নিগূঢ় বিমল আনন্দকে চক্ষের সম্মুখে যেন প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তিমান দেখিতেন। এইখেকে সুরু করিয়া হংসযূথের অনুপম-ঢঙের সন্তরণলীলা তাঁহার মনকে এরূপ পাইয়া বসিল যে, অবশেষে তিনি তাঁহার অন্তরের ভাবটিকে দারুখণ্ডে মূর্ত্তিমান না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ইতিহাসে তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যজাতীয় মনুষ্যমণ্ডলীর আদি-গুরুরা বিশিষ্ট রকমের কবি ছিলেন, আর সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা গুরুপরম্পরাগত কবিত্বরসাভিষিক্ত প্রাণ ঘাঁসা জ্ঞানের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে বহুকালের পরে সাধন-ঘাঁসা বিজ্ঞান-পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তার সাক্ষী—আগে বেদ, পরে বেদান্ত। বেদশাস্ত্র আদিম কবিদিগের অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের অথবা যাহা একই কথা, সত্বগুণপ্রধান প্রকৃতির অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস বলিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী বেদশাস্ত্রের উপরে অপৌরুষেয়-বিশেষণ আরোপ করিয়া থাকেন। আমি তাই বলিতেছি যে, নৌকানির্ম্মাণ, মন্দিরনির্ম্মাণ, কাব্য-রচনা প্রভৃতি মানবীয় কার্য্যকৌশলের জননী যেমন বাধানুভূতি, জনক তেমনি সেই মহাপুরুষ যাঁহাকে আমি বলিতেছি সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আমরা এইরূপ ফলেনপরিচীয়তে'র কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই শুভ বার্ত্তাটির সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইলাম যে, সত্বগুণের আনন্দ-অবয়বটির সহিত মনুষ্যের বিশ্ববিজয়ী সাধনী শক্তি মাথামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ঐ কষ্টিপাথরের প্রামাণিকতায় ভর করিয়া এতক্ষণের পরে আমরা যে একটি সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা এই যে, জ্ঞানবান্ জীবমাত্রেরই অন্তঃকরণে যেমন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আছে তেমনি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তিও তাহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে; আর মনুষ্যের সেই যে বিশ্ববিজয়ী শক্তি তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আগামী বারে সমষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে কিরূপ শক্তিঘটিত সম্বন্ধ তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে—আজ আর পুঁথি বাড়াইব না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্মের অর্থ।*

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়র দিক আছে, একটা ছোটর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোট থাকিয়াও তাহাকে বড় হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে—কখনো সে ছোটটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়টাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুই-য়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়টিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রথমে ধরা যাক্ আমাদের এই শরীরটাকে। এটি একটি ছোট পদার্থ। ইহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড বড় পদার্থ আছে, সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া এই শরীরটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যেন এ শরীর আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এ শরীরের কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাই না। আপনাকে লইয়া এ শরীর করিবে কি? থাকিবে কোথায়? আপনার মধ্যে এই শরীরের প্রয়োজন নাই সমাপ্তি নাই।

বস্তুত আমাদের এই শরীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, সে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বশরীরের সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার মিল হয় সেই পরিমাণে তাহার অর্থ পাওয়া যায়। গর্ভের ভ্রূণ যে নাক কান হাত পা লইয়া আছে গর্ভের বাহিরেই তাহার সার্থকতা। এই জন্য জন্ম-গ্রহণের পর হইতেই চোখের সঙ্গে আকাশব্যাপী আলোর, কানের সঙ্গে বাতাসব্যাপী শব্দের, হাত-পায়ের সঙ্গে চারিদিকের নানাবিধ বিষয়ের, সকলের চেয়ে যেটি ভাল যোগ সেইটি সাধন করিবার জন্য মানু-ষের কেবলি চেষ্টা চলিতেছে। এই বড় শরীরটির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিবে ইহাই ছোট শরীরের একান্ত সাধনা—অথচ আপনার ভেদটুকু যদি না রাখে তাহা হইলে সে মিলনের কোনো অর্থই থাকে না। আমার চোখ আলো হইবে না, চোখরূপে থাকিয়া আলো পাইবে, দেহ পৃথিবী হইবে না, দেহরূপে থাকিয়া পৃথিবীকে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার সমস্যা।

বিরাট বিশ্বদেহের সঙ্গে আমাদের ছোট শরীরটি সকল দিক দিয়া এই যে আপনার যোগ অনুভব করি-বার চেষ্টা করিতেছে এ কি তাহার প্রয়োজনের চেষ্টা? পাছে অন্ধকারে কোথাও খোঁচা লাগে এই জন্যই কি চোখ দেখিতে চেষ্টা করে? পাছে বিপদের পদধ্বনি না জানিতে পারিয়া দুঃখ ঘটে এই জন্যই কি কান উৎসুক হইয়া থাকে?

অবশ্য প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিব একটা আছে—প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূত। সেটা আর কিছু নহে পূর্ণতার আনন্দ। চোখ আলোর মধ্যেই পূর্ণ হয়, কান শব্দের অনুভূতিতেই সার্থক হয়। যখন আমাদের শরীরে চোখ কান ফোটেও নাই তখনো সেই পূর্ণতার নিগূঢ় ইচ্ছাই এই চোখ কানকে বিক-শিত করিবার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া যে শিশু কথা কহিবার চেষ্টায় কলস্বরে আকাশকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে কথা কহিবার প্রয়োজন যে কি তাহা সে কিছুই জানে না। কিন্তু কথা কাহার মধ্যে যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা দূর হইতেই তাহাকে আনন্দআহ্বান পাঠাইতেছে, সেই আনন্দে সে বারবার নানা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কিছু-তেই ক্লান্ত হইতেছে না।

তেমনি করিয়াই আমাদের এই ছোট শরীরটির দিকে বিরাট বিশ্বশরীরের একটি আনন্দের টান কাজ করি-তেছে। ইহা পূর্ণতার আকর্ষণ, সেইজন্য যেখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই সেখানেও আমাদের শক্তি ছুটিয়া যাইতে চায়। গ্রহে চন্দ্রে তারায় কি আছে তাহা দেখিবার জন্য মানুষ রাত্রির পর রাত্রি জাগিতে শ্রান্ত হয় না। যেখানে তাহার প্রয়োজনক্ষেত্র সেখান হইতে অনেক দূরে মানুষ আপনার ইন্দ্রিয়বোধকে দূত পাঠাইতেছে। যাহাকে সহজে দেখা যায় না তাহাকে দেখিবার জন্য দূরবীন অণুবীক্ষণের শক্তি কেবলি সে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এমনি করিয়া মানুষ নিজের চক্ষুকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেছে; যেখানে সহজে যাওয়া যায় না সেখানে যাইবার জন্য নব নব যানবাহনের কেবলি সে সৃষ্টি করিতেছে; এমনি করিয়া মানুষ আপ-নার হাত পাকে বিশ্বে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করি-তেছে। জলস্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ অবা-রিত করিবার উদ্যোগ কত কাল হইতে চলিয়াছে। জলস্থল আকাশের পথ দিয়া সমস্ত জগৎ মানুষের চোখ কান হাত পাকে কেবলি যে ডাক দিতেছে। বিরা-টের এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণের পর মুহূর্ত্ত হইতেই আজ পর্য্যন্ত কেবলি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া পথ তৈরি

* ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত।

করিতে লাগিয়াছে। বিরাটের সেই নিমন্ত্রণ প্রয়োজনের নিমন্ত্রণ নহে, তাহা মিলনের নিমন্ত্রণ, আনন্দের নিমন্ত্রণ; তাহা ক্ষুদ্র শরীরের সহিত বৃহৎ শরীরের পরিণয়ের নিমন্ত্রণ; এই পরিণয়ে প্রেমও আছে সংসারযাত্রাও আছে, আনন্দও আছে প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এই মিলনের মূল মন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।

শুধু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নয়। তাহার একটা মানসিক কলেবর আছে। নানা প্রকারের বৃত্তি প্রবৃত্তি সেই কলেবরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই সব মনের বৃত্তি লইয়া আপনার মনটিকে যে নিতান্তই কেবল আপনার করিয়া সকল হইতে তফাৎ করিয়া রাখিব তাহার জো নাই। ঐ বৃত্তিগুলাই আপনার বাহিরে ছুটিবার জন্য মনকে লইয়া কেবলি টানাটানি করিতেছে। মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে যতদূর পারে পূর্ণরূপে মিলিতে চাহিতেছে। নহিলে তাহার স্নেহ প্রেম দয়ামায়া, এমন কি, ক্রোধ দ্বেষ লোভ হিংসারও কোনো অর্থই থাকে না। সকল মানুষের মন বলিয়া একটি খুব বড় মনের সঙ্গে সে আপনার ভাল রকম মিল করিতে চায়। সেই জন্য কত কাল হইতে সে যে কত রকমের পরিবারতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যেখানে বাধিয়া যায় সেখানে তাহাকে আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, গড়িয়া তুলিতে হয়, এই জন্যই কত বিপ্লব কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। বৃহৎ মনঃশরীরের সঙ্গে আপনার মনটিকে বেশ ভালরকম করিয়া মিলাইয়া লইতে না পারিলে মানুষ বাচে না। যে পরিমাণে তাহার ভাল রকম করিয়া মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা। যে ব্যবস্থায় তাহার মিল অসম্পূর্ণ হয় ও কেবলি ভেদ ঘটিতে থাকে সেই ব্যবস্থায় তাহার দুর্গতি। এখানেও প্রয়োজনের প্রেরণা মূল প্রেরণা এবং সর্ব্বোচ্চ প্রেরণা নহে। মানুষ পরিবারের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিত্তবিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছে এ তাহার প্রয়োজনের আপিসযাত্রা নহে, এ তাহার অভিসারযাত্রা। ছোট হৃদয়টির প্রতি বড় হৃদয়ের একটা ডাক আছে। সে ডাক এক মুহূর্ত্ত থামিয়া নাই। সেই ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয় বাহির হইয়াছে সে খবরও আমরা সকল সময়ে জানিতে পারি না। রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসে, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠে, বারবার পথ হারাইয়া যায়, পা কাটিয়া গিয়া মাটির উপর রক্তচিহ্ন পড়িতে থাকে তবু সে চলে; পথের মাঝে মাঝে সে বসিয়া পড়ে বটে কিন্তু সেখানেই চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আবার তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

এই যে মানুষের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলি বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়? এই বিস্তারের অন্ত কল্পনা করিব কোন্‌খানে? শুনিয়াছি সেকেন্দর শা একদিন জয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন জিতিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় আর একটা পৃথিবী তিনি পাইবেন কোথায়? কিন্তু মানুষের চিত্তকে কোনোদিন এমন বিষম দুশ্চিন্তায় আসিয়া ঠেকিতে হইবে না যে, তাহার অধিকার বিস্তারের স্থান আর নাই। কোনো দিন সে বিমর্ষ হইয়া বলিবে না যে, সে তাহার ব্যাপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলি কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌছান নাই? অন্তহীন বহু কেবলি কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে—সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি—গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি—আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যাহা পাইবার তাহা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই পাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি—কিন্তু কেবল আসিলেইত হইল না—তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এই জন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে ত পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই—আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারাণ্ডায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্ব্বত্রই তাহার শেষ; সর্ব্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।

এ রাজবাড়ির এই ত কাণ্ড, ইহার কোথাও শেষ নাই অথচ ইহার সর্ব্বত্রই শেষ। ইহার মধ্যে সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। এই জন্য এখানে কোনো খানে আমরা বসিয়া থাকি না অথচ প্রত্যেক পদেই আমরা আশ্রয় পাই। মাটি ফুঁড়িয়া যখন অঙ্কুর বাহির হইল তখন সেইখানেই আমাদের চোখ বিশ্রাম করিতে পারে। অঙ্কুর যখন বড় গাছ হইল তখন

সেখানেও আমাদের মন দাঁড়াইয়া দেখে। গাছে যখন ফুল ধরে তখন ফুলেও আমাদের তৃপ্তি। ফুল হইতে যখন ফল জন্মে তখন তাহাতেও আমাদের লাভ। কোনো জিনিষ সম্পূর্ণ শেষ হইলে তবেই তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণতাকে পাইব আমাদের এমন দুরদৃষ্ট নহে—পূর্ণতাকে আমরা পর্ব্বে পর্ব্বে পাইয়াই চলিয়াছি। তাই বলিতে-ছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাইতে থাকি সেই জন্যই ব্যাপ্তি আনন্দময়—নহিলে তাহার মত দুঃখকর আর কিছুই হইতে পারে না।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্ব্বত্র এক-সঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনো যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মত বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ—এইখানেই মানুষের পর্য্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলি-য়াছে এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বাহির হইতে যখন দেখি তখন বলি মানুষ নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিতেছে, মানুষ আহার করিয়া বাঁচিতেছে, রক্ত চলাচলে মানুষ বাঁচিয়া আছে। এমন করিয়া কত আর বলিব? বলিতে গিয়া তালিকা শেষ হয় না। তখন দেখি শরীরের অণুতে অণুতে রসে রক্তে অস্থিমজ্জাস্নায়ু-পেশিতে ফর্দ্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেই থাকে। তাহার পরে যখন প্রাণের হিসাব শেষ পর্য্যন্ত মিলাইতে গিয়া আলোকে উত্তাপে বাতাসে জলে মাটিতে আসিয়া পৌঁছাই, যখন প্রাকৃতবৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক শক্তি-রহস্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এমন করিয়া অন্তহীনতার খাতায় কেবলি পাতা উল্টাইয়া শ্রান্ত হইয়া মরিতে হয়। কিন্তু বাহির হইতে প্রাণের ভিতর বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া আছে। আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিশ্বাস লইতেছি, খাইতেছি, দেহরচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্নায়ুর তার-গুলিকে কেবলই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারিদিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য সাধন করি-তেছে।

এমন কি, বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যু-কেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দেই প্রাণ দিতেছে। কর্ম্মী মৌমাছিরা আপনাকে অঙ্গহীন করিতেছে কেন? সমস্ত মৌচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহাদিগকে ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের জন্য মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড় করিয়া জানিতে চায়—সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জ্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহা-রই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিষটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; তাহার মধ্যে তালমান লয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে স্বরবিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে; সেই নিয়মের মূলে স্বরতত্ত্বের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্য-যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই; সেই নিয়মগুলি কার্য্যকারণের বিশ্ব-ব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তান-গুলি অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়।

মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্ব্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্ব্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক না কেন গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্য্যলোক; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই জায়গায় আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না;—তাহা সম্পূর্ণই ছিল, তাহার লেশমাত্র ত্রুটি ছিল না—কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন—তিনি এককে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল। এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি, কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ম্মী মুক্তি লাভ করে। কবির কাব্য, কর্ম্মীর কর্ম্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

যাহা আপনার ভাব হইতে উঠে তাহাই স্বাভাবিক—তাহার মধ্যে অন্যের তাড়না নাই, তাহাতে নিজেরই প্রেরণা। যে কর্ম্ম আমার স্বাভাবিক সেই কর্ম্মেই আমি আপনার সত্য পরিচয় দিই।

কিন্তু এখানে আমরা যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকি। এই ঠিক আপনটিকে পাওয়া যে কাহাকে বলে তাহা বুঝা শক্ত। যখন মনে করিতেছি অমুক কাজটা আমি আপনি করিতেছি অন্তর্যামী দেখিতেছেন তাহা অন্যের নকল করিয়া করিতেছি—কিম্বা কোনো বাহিরের বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে একঝোঁকা প্রবৃত্তির জোরে করিতেছি।

এই যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্ম্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া লইতেছে। এই জড়ধর্ম্মের জোরে অগ্নি জলিতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এই জন্যেই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জ্বলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং মৃত্যুকে পৃথিবীসুদ্ধ লোকে মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এইরূপ জড়ধর্ম্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অন্যান্য জড়বস্তুর সামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণই জড় হইত তাহা হইলে কোথাও তাহার বাধিত না। সে পাথরের মত অগত্যা গড়াইত, জলের মত অগত্যা বহিয়া যাইত এ সম্বন্ধে কোনো নালিশটিও করিত না।

মানুষ কিন্তু নালিশ করে। প্রবৃত্তি যে তাহাকে কানে ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া লয় ইহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি আজও থামিল না। সে আজও কাঁদিতেছে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্!

সে ভিতরে ভিতরে এই কথাটা অনুভব করিতেছে যে, আমি যে কাজ করিতেছি সে গারদের মধ্যে কয়েদির কাজ—প্রবৃত্তিপেয়াদার তাড়নায় খাটিয়া মরিতেছি।

কিন্তু সে ভিতরে জানে এমন করিয়া অভাবের তাড়নায় প্রবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করাই তাহার চরম ধর্ম্ম নহে। তাহার মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্য্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, জরামৃত্যুর দ্বারা যাহা অভিভূত

হয় না। আপনার সেই সত্য পরিচয় সেই নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্যই তাহার চরম বেদনা।

পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্ম্মী আপন কর্ম্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে; সে তখন বাহিরের অক্ষরগণা কাব্য হয় না; ততই কর্ম্মীর কর্ম্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়,—এইখানেই স্বতউৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।

এইজন্যই শাস্ত্রে বলে

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং—

যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আত্মবশ তাহাই সুখ। অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে—আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

এত বড় কথাটাকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। যখন বলিতেছি সুখ মানুষের আপনের মধ্যে, তখন ইহা বলিতেছি না যে, সুখ তাহার স্বার্থসাধনের মধ্যে। স্বার্থপরতার দ্বারা মানুষ ইহাই প্রমাণ করে যে সে যথার্থ আপনার স্বাদটি পায় নাই তাই সে অর্থকেই এমন চরম করিয়া এমন একান্ত করিয়া দেখে। অর্থকেই যখন সে আপনার চেয়ে বড় বলিয়া জানে তখন অর্থই তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে লইয়া যায়—তখনই সে পরবশতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদিনই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যে ব্যক্তি স্বার্থপর তাহাকেও আপনার অর্থ ত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু অধিকাংশস্থলেই দায়ে পড়িয়া অর্থেরই জন্য সে অর্থ ত্যাগ করে—সেই তাহার প্রয়োজনের ত্যাগ দুঃখের ত্যাগ। কেননা, সেই ত্যাগের মূলে একটা তাড়না আছে, অর্থাৎ পরবশতা আছে। অভাবের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহাকে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এক একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সে খুসি হইয়া খরচ করিয়া ফেলে। তাহার পুত্র জন্মিয়াছে খবর পাইয়া সে তাহার গায়ের দামি শালখানা তখনি দিয়া ফেলে। ইহা একপ্রকার অকারণ দেওয়া, কেননা কোনো প্রয়োজনই তাহাকে দিতে বাধ্য করিতেছে না। এই যে দান ইহা কেবল আপনার আনন্দের প্রাচুর্য্যকে প্রকাশ করিবার দান। আমার আপন আনন্দই আমার আপনার পক্ষে যথেষ্ট এই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য ঐ শালখানা দিয়া ফেলিতে হয়। এই আনন্দের জোরে মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড় পাওয়া। সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে, সে জগতের সমস্ত শাল দোশালার চেয়ে অনেক বড়—এই জন্য চকিতের মত মানুষ তাহার দেখা যেই পায় অমনি বাহিরের ঐ শালটার দাম একেবারে কমিয়া যায়। যখন মানুষের আনন্দ না থাকে, যখন মানুষ আপনাকে না দেখে, তখন ঐ শালটা একেবারে হাজার টাকা ওজনের বোঝা হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় চর্ম্মের মত সর্ব্বাঙ্গে চাপিয়া ধরে—তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তখন ঐ শালটার কাছে পরবশতা স্বীকার করিতে হয়।

এমনি করিয়া মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া আপনাকে দেখিতে পায়। মাঝে মাঝে এমন এক একটা আনন্দের হাওয়া দেয় যখন তাহার বাহিরের ভারি ভারি পর্দ্দাগুলাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উড়াইয়া ফেলে। তখন বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—কৃপণ যে সেও ব্যয় করে, বিলাসী যে সেও দুঃখ স্বীকার করে, ভীরু যে সেও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন যে নিয়মে সংসার চলিতেছে সেই নিয়মকে মানুষ এক মুহূর্ত্তে লঙ্ঘন করে। সেইরূপ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ এমন একটা যুগান্তর উপস্থিত হয়—পূর্ব্বেকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া যাহার কোনো প্রকার হিসাব পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাইবে? স্বার্থের প্রয়োজনের হিসাবের সঙ্গে আত্মার আনন্দের হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না—কেননা সেই যথার্থ আপনার মধ্যে গিয়া পৌঁছিলে মানুষ হঠাৎ দেখিতে পায়, খরচই সেখানে জমা, দুঃখই সেখানে সুখ।

এমনি করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটি আপনাকে দেখিতে পায়, বাহিরের সমস্তের চেয়ে যে বড়। কেন বড়? কেননা সে আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত। তাহাকে গুণিতে হয় না, মাপিতে হয় না—সমস্ত গণা এবং মাপা তাহা হইতেই আরম্ভ এবং তাহাতে আসিয়াই শেষ হয়। ক্ষতি তাহার কাছে ক্ষতি নয়, মৃত্যু তাহার কাছে মৃত্যু নহে, ভয় তাহার বাহিরে এবং দুঃখের আঘাত তাহার তারে আনন্দের সুর বাজাইয়া তোলে।

এই যাহাকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া পায়—যাহাকে কখনো কখনো কোনো একটা দিক দিয়া সে পায়—যাহাকে পাইবামাত্র তাহার শক্তি স্বাভাবিক হয়, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়, তাহার কর্ম্ম আনন্দের কর্ম্ম হইয়া উঠে; যাহাকে পাইলে তাহার উপর হইতে বাহিরের সমস্ত চাপ যেন সরিয়া যায়, সে আপনার মধ্যেই আপনার একটি পর্য্যাপ্তি দেখিতে পায়—তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করে। সেই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে অন্তরতমভাবে আছে বলিয়াই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় সে

যে সকল কাজ করে সে কাজকে সে গারদের কাজ বলে। অথচ প্রকৃতি যে নিতান্তই জবরদস্তি করিয়া বেগার খাটাইয়া লয় তাহা নহে—সে আপনার কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বেতনটিও শোধ করে, প্রত্যেক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সুখও বাঁটিয়া দেয়। সেই সুখের বেতনটির প্রলোভনে আমরা অনেক সময়ে ছুটির পরেও খাটিয়া থাকি, পেট ভরিলেও খাইতে ছাড়ি না। কিন্তু হাজার হইলে তবু মাহিনা খাইয়া খাটুনিকেও আমরা দাসত্ব বলি—আমরা এ চাকরি ছাড়িতেও পারিনা তবু বলি হাড় মাটি হইল, ছাড়িতে পারিলে বাঁচি। সংসারে এই যে আমরা খাটি—সকল দুঃখ সত্ত্বেও ইহার মাহিনা পাই—ইহাতে সুখ আছে, লোভ আছে। তবু মানুষের প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং বলে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসারগারদে থাকি বল্!

এমন কথা সে যে বলে, বেতন খাইয়াও তাহার যে পুরা সুখ নাই তাহার কারণ এই যে, সে জানে তাহার মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে—সে জন্মদাস নহে—সমস্ত প্রলোভনসত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়—প্রকৃতির দাসত্বে তাহার অভাবটাই প্রকাশ পায় স্বভাবটা নহে। স্বভাবতই সে প্রভু;—সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু, যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সে জন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মত সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এই জন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য্য কথা বলে যে, আমি মুক্তি চাই। কি হইতে সে মুক্তি চায়? না, যাহা কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত কর—আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ঐ বেতন-চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। যদি সে নিশ্চয় না জানিত যে বেতন না চাহিলেও তাহার চলে, নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সম্পদ আছে এ বিশ্বাস যদি তাহার অন্তরতম বিশ্বাস না হইত তবে সে চাকরির গারদকে গারদ বলিয়াই জানিত না—তবে এ প্রার্থনা তাহার মুখে নিতান্তই পাগলামির মত শুনাইত যে আমি মুক্তি চাই। বস্তুত আমাদের বেতন যখন বাহিরে তখনি আমরা চাকরি করি কিন্তু আমাদের বেতন যখন আমাদের নিজেরই মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা ধনী তখন আমরা চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আসি।

চাকরি করি না বটে কিন্তু কর্ম্ম করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। কর্ম্ম বরঞ্চ বাড়িয়া যায়। যে চিত্রকর চিত্ররচনাশক্তির মধ্যে আপনাকে পাইয়াছে—যাহাকে আর নকল করিয়া ছবি আঁকিতে হয় না, পুঁথির নিয়ম মিলাইয়া যাহাকে তুলি টানিতে হয় না, নিয়ম যাহার স্বাধীন আনন্দের অনুগত—ছবি আঁকার দুঃখ তাহার নাই, তাই বলিয়া ছবি আঁকাই তাহার বন্ধ এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ উল্টা। ছবি আঁকার কাজে আপনাকে সে আর বিশ্রাম দিতে চায় না। বেতন দিয়া এত খাটুনি কাহাকেও খাটানো যায় না।

ইহার কারণ এই যে, এখানে চিত্রকর কর্ম্মের একেবারে মূলে তাহার পর্য্যাপ্তির দিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন কর্ম্মের মূল নহে, আনন্দই কর্ম্মের মূল—বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন তেমনি করিয়াই আনন্দকেই ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সম্বল সঞ্চয় করিয়া আনে। কিন্তু কলের জলে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি না, তাহার হাওয়া খাইতে পারি না, তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাই না—তা ছাড়া, কেবল কাজের সময়টিতেই সে খোলা থাকে—অপব্যয়ের ভয়ে কৃপণের মত প্রয়োজনের পরেই তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরে কল বিগড়াইতেও আটক নাই।

কিন্তু আনন্দের মূল গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাই সেখানে কর্ম্মের অবিরাম স্রোত বিপুল তরঙ্গে আপনি বহিয়া যাইতেছে, লোহার কল অগ্নিচক্ষু রাঙা করিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে না। সেই জলের ধারা পাইপের ধারার চেয়ে অনেক প্রবল, অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর। শুধু তাই নয়—কলের পাইপ-নিঃসৃত কাজে কাজই আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নাই আরাম নাই—আনন্দের গঙ্গায় কাজের অফুরান প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সৌন্দর্য্য ও আরাম অনায়াসে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্ম্মের মূলে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, আনন্দে গিয়া পৌঁছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্ম্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্ম্মের দ্বারাই আনন্দের পরিমাপ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি। এই জন্যই কার্লাইল বলিয়াছেন—অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই

বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে। প্রতিভার দ্বারা মানুষ সেই আপনাকেই পায় বলিয়া কর্ম্মের মূল আনন্দ-প্রস্রবণটিকে পায়। সেই আনন্দকেই পায় বলিয়া কোনো দুঃখ তাহাকে আর দুঃখ দিতে পারে না। কারণ প্রাণ যেমন আপনিই খাদ্যকে প্রাণ করিয়া লয়, আনন্দ তেমনি আপনিই দুঃখকে আনন্দ করিয়া তোলে।

এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা কথাটা এই যে, যেখানে আপনার সমাপ্তি সেই আপনাকে মানুষ পাইতে চাহিতেছে, আপনার মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কারণ সেইখানেই তাহার স্থিতি, সেইখানেই তাহার আনন্দ। সেই তাহার স্বাধীন আপনার সঙ্গেই তাহার সংসারকে তাহার সমস্ত কর্ম্মকে যোজনা করিতে চাহিতেছে। সেখান হইতে যে পরিমাণে সে বিচ্ছিন্ন হয় সেই পরিমাণেই কর্ম্ম তাহার বন্ধন, সংসার তাহার কারাগার। সেখানকার সঙ্গে পূর্ণযোগে কর্ম্মই মানুষের মুক্তি, সংসারই মানুষের অমৃতধাম।

এইবার আর একবার গোড়ার কথায় যাইতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম, মানুষের সমস্যা এই যে, ছোটকে বড়র সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর। আমরা দেখিয়াছি তাহার ছোট শরীরের সার্থকতা বিশ্বশরীরের মধ্যে, তাহার ছোট মনের সার্থকতা বিশ্বমানবমনের মধ্যে। এই শরীর মনের দিক্ মানুষের ব্যাপ্তির দিক্। আমরা ইহাও দেখিয়াছি শুদ্ধমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়ম-পরম্পরার দ্বারা চালিত,—এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদিগকে কাজ করায়। আমাদের মধ্যে যেখানে একটি সমাপ্তির দিক্ আছে, যে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগসাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অনুগত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুত্বের দুঃসহ ভার একের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু যেখানে তাহার সমাপ্তির দিক্, যেখানে তাহার সমগ্র একের দিক্ সেখানেও কি তাহার সমস্যাটি নাই?

আছে বই কি। সেখানেও মানুষের আপন, আপনার চেয়ে বড় আপনের সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। মানুষ যখনি আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনি বৃহৎ আনন্দকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড় আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড় আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি। মানুষের শরীর বড় শরীরকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের মন বড় মনকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের আত্মা বড় আত্মাকে সহজে দেখে।

এইখানে পৌঁছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। বস্তুত ইহাই মানবের ধর্ম্ম; মানুষের ইহাই স্বভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম্ম ধর্ম্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না। মানুষের সকল কর্ম্মের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম্ম কাজ করিতেছে। অন্য সকল কাজের উদ্দেশ্য হাতে হাতে বোঝা যায়—ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই, শীত নিবারণের জন্য পরি কিন্তু ধর্ম্মের উদ্দেশ্যকে তেমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবার জো নাই। কেননা, তাহা কোনো সাময়িক অভাবের জন্য নহে, তাহা মানুষের যাহা কিছু সমস্তের গভীরতম মূলগত। এইজন্য কোনো বিশেষ মানুষ তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে পারে, কোনো বিশেষ বুদ্ধিমান তর্কের দিক্ হইতে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু সমস্ত মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম্ম রহিয়াই গিয়াছে;—তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, খ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয়; তাহাকে বাদ দিলেও শস্য ফলে, বৃষ্টি পড়ে, আগুন জ্বলে, নদী বহে; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অসুবিধাই ঘটে না; কিন্তু মানুষ তাহাকে বাদ দিতে পারিল না। কেননা, ধর্ম্মকে কেমন করিয়া ছাড়িবে? প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্ অগ্নি তাহার তাপধর্ম্মকে ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাই তাহার স্বভাব। বাহির হইতে দেখিলে বলা যায় অগ্নি কাঠকে চাহিতেছে, কিন্তু ভিতরের সত্য কথা এই যে, অগ্নি আপন স্বভাবকে সার্থক করিতে চাহিতেছে—সে জ্বলিতে চায় ইহাই তার স্বভাব—এইজন্য কখনো কাঠ, কখনো খড়, কখনো আর কিছুকে সে আত্মসাৎ করিতেছে; সে দিক দিয়া তাহার উপকরণের তালিকার অন্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু মূল কথাটি এই যে, সে আপনার স্বভাবকেই পূর্ণ করিতে চাহিতেছে। যখন তাহার উজ্জ্বল শিখাটি দেখা যায় না কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধূমই উঠিতে থাকে, তখনও সেই চাওয়া তাহার মধ্যে আছে; যখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে তখনো সেই চাওয়া তাহার মধ্যে

নির্ব্বাপিত হয় না। কারণ তাহাই তাহার ধর্ম্ম। মানুষেরও সকলের চেয়ে বড় চাওয়াটি তাহার ধর্ম্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ, তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এই চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ ইহার হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এই জন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত। সেই জন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই। মানুষের একটা প্রয়োজন আজ মিটিতেছে আর একটা প্রয়োজন কাল মিটিতেছে, যেটা মিটিতেছে সেটা চুকিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই। অবশ্য এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে—ইহাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে ইহার বিপরীত আমরা মনুষ্যসমাজে দেখি কেন? চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু ত দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারম্বার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি, যে, শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলি তাহাকে নীচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনো তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়—টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না;—ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধূলায় টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের ধর্ম্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলি চেষ্টা করিতেছে—যখন ধূলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইলেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে—দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনি তোমার ধর্ম্ম সার্থক হইবে—তখনি তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই চরিতার্থতা, হইতে এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে—কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এই যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ, নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্ত্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা ত কখনই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা; ভিতরের দেখা নহে; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত—তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি না কেন, কোন অর্থ নাই; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলি দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই—মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।

দ্বারী দরজার কাছে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেছে। আমি তাহার ভাষা বুঝি না। আমার কেবলই মনে হয়, একটার পর আর একটা শব্দ চলিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের কোনো সম্বন্ধ জানি না। ইহাই মৃত্যুর রূপ; ইহাই অর্থহীনতা। ইহাতে কেবল পীড়া দেয়। যখন ভাষা বুঝি, যখন অর্থ পাই, তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে আর শুনি না—তখন অর্থের অনবচ্ছিন্ন ঐক্যধারাকে দেখি, তখন অখণ্ড অমৃতকে পাই, তখন দুঃখ চলিয়া যায়। তুলসীদাসের রামায়ণে অর্থের অমৃত শব্দের খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতেছে। সেই পূর্ণটিকে দেখাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িবার চরম

উদ্দেশ্য—যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক শব্দই কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবে। ততক্ষণ পাঠকের মন কেবলি বলিতে থাকিবে, অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ লইয়া আমি কি করিব—অমৃত যদি না পাই তবে ইহাতে আমার কিসের প্রয়োজন!

আমাদেরও সেই কান্না। আমরা যখন কেবলি অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়—একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতিপদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে জগৎকে এবং জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়। তখন সা রি গা মা র অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মরি না—রাগিণীর পরিপূর্ণ রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় লাভ করি।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা দেশে নানা কালে নানা জাতির নানা ইতিহাসে মানুষ এই রাগিণী শিখিতেছে। যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তানের মত কেবলি আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে—সেই আনন্দ রাগিণী মানুষ সাধিতেছে। ওস্তাদের ঘরে তাহার জন্ম, পিতার কাছে তাহার শিক্ষা। পিতার অনাদি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সে সুর মিলাইতেছে। সেই একের সুরে যতই তাহার সুর মিলিতে থাকে, সেই একের আনন্দে যতই তাহার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে, বহুর তানমানের মধ্যে ততই তাহার বিঘ্ন কাটিয়া যায়, দুঃখ দূর হয়—বহুকে ততই সে আনন্দের লীলা বলিয়া দেখে; বহুর মধ্যে তাহার ক্লান্তি আর থাকে না, সমস্তের সামঞ্জস্যকে সে একের মধ্যে লাভ করিয়া বিক্ষেপের হাত হইতে রক্ষা পায়। ধর্ম্ম সেই সঙ্গীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মায় সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সঙ্গীতশালায় যে সর্ব্বত্রই সঙ্গীত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের এক রকমের ভুল নয়, সকলের একজাতীয় বাধা নহে, কাহারো বা সুরে দোষ আছে, কাহারো বা তালে, কেহ বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এইজন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূজা।

ভরি লয়ে সাজি বাহিরিনু আজি
পূজিবারে দেবতায়,
শূন্য আকাশে দেবতা সকাশে
হের হের পূজা যায়।
হৃদয় কালিমা শূন্য নিলীমা
মাখিল আপন অঙ্গে,
ঢালি দিনু তার চরণে আমার
কালো যাহা ছিল সঙ্গে;
কালো সনে কালো মিলাইয়া গ্যালো
কালের কালিমা শেষ,
নিরখিল হৃদি সে কাল-জলধি
কালের সে কালো বেশ।
না জানি কেমনে দেবতা গোপনে
ছিল সে কালোর মাঝ,
কালো করি পার আলোকে আমার
পূজা তুলি নিল আজ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বেদান্তবাদ।

তৃতীয় প্রপাঠক

দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ

১

শ্রীনিম্বার্কদর্শন

(ক)

(অনুবর্ত্তমান)

শ্রীরামানুজমতাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই তিন পদার্থ। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্ম শরীরী, অতএব ব্রহ্ম চিদচিদ্-বিশিষ্ট; এই চিদচিদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—ব্রহ্ম যদি চিদচিদ্-বিশিষ্ট, তাহা হইলে বলিতে হইবে ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ। এখন বিশেষণের স্বভাবই এই যে, ইহা নিজ হইতে অন্যকে ব্যা-

বৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্ করে; যেমন 'লোহিত পুষ্প' স্থলে লো হি ত নিজ হইতে নী ল, পী ত প্রভৃতিকে ব্যাবৃত্ত করে। চিৎ ও অচিৎও যদি বিশেষণ হয়, তাহা হইলে এমন কোন পদার্থ থাকা চাই, যাহাকে ঐ চিৎ ও অচিৎ ব্যাবর্ত্তন অর্থাৎ পৃথক্ করিতে পারে। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে সেরূপ কোন পদার্থ নাই, কেননা, তাঁহারা বলেন যে, চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তিন ভিন্ন পদার্থ নাই; ইহার মধ্যে চিৎ ও অচিৎ ত বিশেষণই হইল, এবং ব্রহ্ম বিশেষ্য। চিৎ ও অচিৎ কাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ যাহাকে তাঁহারা নিজ হইতে ব্যাবর্ত্তন করিতে পারে? *

অন্যান্য বাদিগণ কি বলেন না বলেন তাহা লইয়া এখানে অধিক আলোচনা করিলে সুবিধা হইবে না, এবং বিষয়টি আরো জটিল হইয়া উঠিবে, এজন্য যৎকিঞ্চিন্মাত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আমরা আলোচ্য-দর্শনের অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব, এবং সমস্ত দর্শনের প্রধান মতগুলি জানা হইলে তাহার পর তৎসমুদয়কে পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা করিব। এখন ইঁহারা জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক; কেননা, ইহা দ্বারাই ভেদাভেদের যুক্তি পরিস্ফুট হইবে।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় নিম্বার্কদর্শনেও এই অতর্কনীয় বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। আমরা দেখিতে পাই কোন একটি মাটির ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে, সেই ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, এবং উৎপাদনকারী নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকারের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এই উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার পরস্পর বিভিন্ন। এখন এই জগৎকে যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহার নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু তাহার উপাদান-কারণ কি? কোন্ উপাদানে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন? যেমন ঘটের উৎপত্তিস্থলে তাহার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার ও উপাদান-কারণ মৃত্তিকা পরস্পর বিভিন্ন, জগতের উৎপত্তিস্থলেও সেইরূপ তাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ভিন্ন হইবে; নিমিত্ত-কারণই কিছু উপাদান-কারণ হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকিলে তাহার উপাদান কি?

ইঁহারা বলেন, জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ উভয়ই ঈশ্বর; ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও ঈশ্বরই জগতের উপাদান। ইঁহাদের এই কথাটি প্রথমত অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে; তাঁহারা বিনা যুক্তিতে এ মত প্রচার করেন নাই।

কার্য্যের উৎপত্তি তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়; যথা, (১) প্রথম সংঘাত অর্থাৎ সম্মিলনের দ্বারা, যেমন পান-চুণ প্রভৃতি একত্র সংহত অর্থাৎ সম্মিলিত হইলে লোহিত-বর্ণ উৎপন্ন হয়; (২) দ্বিতীয় আরম্ভ দ্বারা, যেমন তন্তুতে পূর্ব্বে বস্ত্র থাকে না, পরে অপরাপর কারণ উপস্থিত হইলে ঐ তন্তুতেই বস্ত্র আরব্ধ বা উৎপাদিত হয়; তন্তুই কিছু বস্ত্র নহে, কেননা, তন্তুর কার্য্য অন্য,—তন্তু দ্বারা ভিন্ন কার্য্য করা যায়, এবং বস্ত্রের কার্য্য অন্য,—বস্ত্রের দ্বারা ভিন্ন কার্য্য করা হইয়া থাকে; এইরূপ মৃত্তিকায় পূর্ব্বে ঘট থাকে না, পরে অপরাপর কারণের সাহায্যে ঐ মৃত্তিকাতে ঘট আরব্ধ হয়; এবং (৩) তৃতীয় পরিণাম দ্বারা, যেমন দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়।

ইহার মধ্যে প্রথম সংঘাতবাদ নাস্তিকগণের এবং দ্বিতীয় আরম্ভবাদ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের। তাঁহারা এতাদৃশ কার্য্যকারণভাবকে সর্ব্বত্র ঐ প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যে সমস্ত দর্শন বেদবচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা কেহই ঐ সংঘাতবাদ ও আরম্ভবাদ স্বীকার করে না। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবচন ভিন্ন যুক্তিও অনেক আছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না। বৈদিক দর্শনগুলি পরিণামবাদ স্বীকার করেন; * অবশ্য এই প রি ণা ম শব্দের ব্যাখ্যা ভিন্ন-ভিন্ন আছে। সাঙ্খ্যেরাও পরিণামবাদী; ইঁহারা পরিণাম-শব্দের যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করেন; অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রকারান্তরে বিকারের নামই পরিণাম, যেমন দধি দুগ্ধের পরিণাম। এই পরিণামকে প্র কৃ তি প রি ণা ম, বা স্ব রূ প প রি ণা ম বলে।

কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বস্তুত এরূপ পরিণাম স্বীকার করেন না, করিতে পারেনও না; ব্রহ্মের প্রকৃতিপরিণাম বা স্বরূপপরিণাম হইতেই পারে না। ইঁহাদের পরিণাম-শব্দের তাৎপর্য্যার্থ শ ক্তি বি ক্ষে প, † অর্থাৎ শক্তির প্রসারণ। ‡ ইঁহারা কিরূপে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত

---

* বেদান্তকৌস্তভপ্রভা, ২. ৩. ৪৬; সিদ্ধান্ত জাহ্নবী, সূ. ১. ১; বেদান্ততত্ত্ববোধ, ২৭ পৃঃ।

* ইহা বেদান্তকৌস্তভপ্রভাকারের (বে. দ. ১. ৪. ২৬) উক্তি:—"দ্বিতীয়ন্ত্বৌপনিষদাম্।" যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা শাঙ্করদর্শনকে অবৈদিক বলিবেন, এবং স্বমতের বিরোধী মতান্তরকেও অবৈদিক বলিতেও ইঁহাদের আপত্তি না হইতে পারে।

২। বেদান্তমঞ্জুষা, ৬৫ পৃঃ; সিদ্ধান্তজাহ্নবী, (বে.দ. ১.১.২) ১১৬-১১৭ পৃঃ; বে.দ. ১.৪.২৬, শ্রীনিম্বার্কভাষ্য, বেদান্তকৌস্তভ।

৩। "শক্তিবিক্ষেপলক্ষণেতি শক্তিপ্রসারণলক্ষণেতি" —সিদ্ধান্তসেতুকা, ১১৯।

হইয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, এবং তাহা হইলেই এই কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

ইঁহারা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই স্বীকার করেন ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তৎ-সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন :—"যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, এবং (বিনাশ-কালে) যাঁহাতে গমন করিয়া বিলীন হইয়া থাকে, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর,:তিনিই ব্রহ্ম", * ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনি যে নিমিত্ত কারণের ন্যায় উপাদানকারণও, তাহা এই বেদান্তসূত্রই প্রকাশিত করিতেছে :—

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ॥" বে. দ. ১. ৪. ৩। ইহার অর্থ এইরূপ :—(ব্রহ্ম কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণই নহেন) কিন্তু প্রকৃতিও (অর্থাৎ উপাদানকারণও); কেননা, (তাহা হইলেই) প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপ-রোধ (অর্থাৎ অবাধা) হয়। ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই স্বীকার না করিলে উপনিষদে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, ও তৎসম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের সামঞ্জস্য থাকে না। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬.১.৩) পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শ্বেতকেতু দীর্ঘকাল আচার্য্যগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত অভিমানী ও অবিনম্র হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (১) 'সৌম্য, তুমি যে এইরূপ আপ-নাকে সাঙ্গবেদজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেছ ও অনম্রস্বভাব হইয়াছ, আচ্ছা, তুমি কি সেই আদেশকে (অর্থাৎ আদেশ-কর্ত্তা-নিয়ামক ব্রহ্মকে) † আচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহাতে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত (অতর্কিত) মত (তর্কিত) হয়, এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়?' পুত্র বলিয়াছিলেন—'ভগবন্, সেই আদেশ কি প্রকার?' পিতা উত্তর করিলেন—(২) 'হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃন্ময় (অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার—মৃত্তিকাজাত দ্রব্য) জানা যায়, (কেননা), বিকার (মৃত্তিকার ঘট-কলস-প্রভৃতি) বাক্যের অবলম্বনভূত নাম-মাত্র, (তাহা পৃথক্ পদার্থ নহে, সেখানে পরমার্থত) মৃত্তিকা এই মাত্র সত্য;…(সেই আদেশও এইরূপ)।'

এখানে (১) প্রথম বাক্যটি প্রতিজ্ঞা, এবং (২) দ্বিতীয় বাক্যটি দৃষ্টান্ত। এখন এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্ম যে উপাদানকারণ তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। কেননা উপাদানেরই শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা উপাদেয় অর্থাৎ উপাদানের কার্য্যের শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান হইতে পারে; নিমিত্তকারণকে শ্রবণ করিলে, মনন করিলে, বা জানিলে কার্য্যের শ্রবণ, মনন, বা বিজ্ঞান হয় না। কুম্ভ-কারকে শুনিলে বা মনন করিলে বা জানিলে ঘটকে শুনা যায় না, তাহাকে মননও করা যায় না, এবং জানাও যায় না। অপর পক্ষে ঘটের উপাদানকারণ মাটিকে শুনিলে মনন করিলে বা জানিলে ঘটকে শুনা যায়, মনন করা যায় ও জানা যায়। কেননা ঘট ইহা একটি বাক্যের অবলম্বনস্বরূপ নামমাত্র, বস্তুতঃ মাটী ভিন্ন ঘট পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। অতএব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়েরই দ্বারা ব্রহ্ম যে সমগ্র জগতের উপাদানকারণ তাহাই জানা যাইতেছে। এবং তিনি উপাদান বলিয়াই তাঁহার শ্রবণাদির দ্বারা সমস্তেরই শ্রবণাদি হইতে পারে।

এস্থানে কেহ বলিতে পারেন যে, লোকে চেতনকে উপাদানকারণ হইতে দেখা যায় না, চেতন সর্ব্বত্র নিমিত্তকারণই হইয়া থাকে; কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণই হয়, উপাদান কারণ নহে। এই অনুমানে ব্রহ্ম-কেও নিমিত্তকারণই বলিতে হয়, তাঁহাকে আমরা উপা-দান বলিতে পারি না।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এ সম্বন্ধে বলেন যে, আমরা যদি কেবল অনুমানপ্রভৃতির দ্বারা জগৎ-কারণকে প্রমাণ করিতে বসিতাম, তাহা হইলে ঐ কুম্ভকারের দৃষ্টান্তের অপেক্ষা হইত, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে; আমরা বেদ-বিরুদ্ধ সমস্ত প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশকেই অনুসরণ করিয়া চলি।* আর চেতন যে কখনই উপাদানকারণ হয় না, তাহাও নহে। আমরা দেখিতে পাই চেতন পুরুষ হইতে কেশ, লোম, নখাদি উৎপন্ন হইতেছে, অতএব বলিতে হয় এই কেশা-দির উপাদানকারণ চেতন পুরুষ। এবং সেই জন্যই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যেমন সৎ পুরুষ হইতে কেশ ও লোম-সমূহ হয়, সেই প্রকারই অক্ষর হইতে এখানে বিশ্ব সম্ভূত হইয়া থাকে।" † আবার চেতন ঊর্ণনাভ হইতে ঊর্ণাতন্তু উৎপন্ন হয়, ইহাও আমরা সকলে দেখিতে পাই; অতএব চেতন ঊর্ণনাভ যে ঊর্ণাতন্তুর উপাদান কারণ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে, "ঊর্ণনাভি যেমন (তন্তু-সমূহ) সৃষ্টি করে ও উপসংহৃত করে, সেইরূপ অক্ষর

---

* । তৈত্তি—৩.১-১। দ্রঃ—বে.দ.১.১.২ ভাষ্য।

† ইহা শ্রীনিবাসাচার্য্যের অর্থ (দ্রঃ—বে.দ.১-৪-২৩); মূল "আদেশম্," শঙ্করাচার্য্য আদেশ অর্থাৎ উপদেশ-গম্য অর্থ করিয়াছেন; পূর্ব্বোক্ত অর্থও ইহার অসঙ্গত বোধ হয় না।

* শ্রীনিবাস ভাষ্য, বে. দ. ১. ৪. ২৩।

† মুণ্ডক. ১. ১. ৭।

হইতে বিশ্ব সম্ভূত হইয়া থাকে।" অতএব চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণের ন্যায় উপাদানকারণও হইতে পারেন।

এস্থানে কেহ বলিতে পারেন যে, পুরুষ হইতে যে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয়, অথবা ঊর্ণনাভ হইতে যে ঊর্ণাতন্তু জাত হয়, তাহাতে চেতন পুরুষ বা ঊর্ণনাভকে তাহাদের উপাদানকারণ ঠিক বলিতে পারা যায় না; কেননা পুরুষের রক্তমাংসপ্রভৃতিরূপ অংশ হইতেই কেশলোমাদি, এবং ঊর্ণনাভের ক্ষুদ্রজন্তুভক্ষণজনিত লালা হইতেই ঊর্ণাতন্তু উৎপন্ন হয়। অতএব ঠিক বলিতে গেলে ঐ সকল বস্তুই তাহাদের উপাদান কারণ।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, যদি তাহাই হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেননা, কেশলোমাদি ও ঊর্ণাতন্তুর উপাদানভূত অংশবিশেষ যেমন পুরুষ ও ঊর্ণনাভে থাকে, তেমনি এই জগতের উপাদানভূত অংশবিশেষ চেতন ব্রহ্মে আছে, এই অংশ বিশেষেরই নাম প্রকৃতি, ইহাকেই দে বা ত্ম শ ক্তি অর্থাৎ দেব ব্রহ্মের স্বকীয় শক্তি বলিয়া শ্রুতিতে * উল্লেখ করা হইয়াছে। †

অতএব ইঁহাদের মতে বলিতে পারা যায় যে, পুরুষের রক্ত মাংসাদিই যেরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া কেশাদিরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহা হইলেও যেমন ঐ পুরুষকেই কেশলোমাদির উপাদানকারণ বলা হয়, অথবা যেমন লালা হইতে উৎপন্ন হইলেও ঊর্ণনাভকেই ঊর্ণাতন্তুর উপাদান বলিয়া মনে করা হয়, সেইরূপ বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তিই পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া জগৎ-রূপে পরিণত হইলেও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু ‡ ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়া থাকে।

জল যেমন হিমরূপে অথবা দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎ-রূপে পরিণত হন। ইহা ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়। § এবং পরিণাম শব্দে এইরূপ পরিবর্ত্তনকেই বুঝা যায়। ব্রহ্ম যদি এইরূপই পরিণত হন, তবে দুই দিকে দোষ উপস্থিত হয়। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব, ¶ অতএব নিরয়ব ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে পরিণত হন, তবে বলিতে হয় যে. তিনি সমগ্রটাই পরিণত হন। কোন সাবয়ব বস্তুর পরিণামে কোন অবয়ব বা অংশ পরিণত হইলেও, অপর অবয়ব বা অংশ অপরিণত থাকিতে পারে—এই অংশ অবিকৃত থাকিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব. তখন তাঁহার অংশত পরিণাম ও অংশত অপরিণাম বলিতে পারা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম সমগ্রটাই পরিণত হন। কিন্তু এরূপ বলিলে বহু দোষ আসিয়া পড়ে; ব্রহ্মও তাহা হইলে সাধারণ ঘট-পটাদি কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবেন, তিনিও তবে সংসারের মধ্যেই থাকিলেন, সংসারের অতীত হইলেন না, মুক্ত ব্যক্তিগণ যে ব্রহ্মের নিকট গমন করিবেন, সেরূপ কোন ব্রহ্ম থাকিল না; শাস্ত্রে যে তাঁহাকে দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বলিয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইল না; এবং তিনিও সাধারণ জড় হইয়া পড়িলেন; এইরূপ আরও বহু দোষ আসিয়া পড়ে। * অপর পক্ষে যদি বলা যায় যে, ব্রহ্মের অংশবিশেষ অপরিণত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে শ্রুতিতে যে তাঁহাকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব, কিপ্রকারে তাঁহার পরিণামকে অনুভব করিতে পারা যায়? অতএব জগৎ তাঁহার পরিণাম ইহা বলিতে পারা যায় না।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অন্যান্য বৈদিক দর্শনের ন্যায় এই আপত্তির সম্বন্ধে প্রথমত শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন যে, শ্রুতিই বলিতেছে ব্রহ্ম নিরবয়ব, এবং শ্রুতিই বলিতেছে যে, তাঁহার পরিণামও হয়। ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত ও বিচিত্র বলিয়া তাঁহাতে ঐরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াও বলেন যে, ইহা একবারে অযৌক্তিকও নহে। পূর্ব্বে যে আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরবয়ব বস্তুর পরিণাম হইতে পারে না, সাবয়ব বস্তুরই পরিণাম হইয়া থাকে; দুগ্ধ ও জল সাবয়ব, আমরা ইহাদের পরিণাম দেখিয়া থাকি। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অবয়ব থাকাই যে পরিণামের কারণ তাহা বলিতে পারা যায় না। দুগ্ধের অবয়ব আছে বলিয়া যে, তাহা দধিরূপে পরিণত হয় তাহা নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জলেরও যখন অবয়ব আছে, তখন তাহাও দুগ্ধ রূপে পরিণত হয় না কেন? অতএব অবয়ব থাকাই যে, পরিণামের কারণ তাহা বলা চলে না। দুগ্ধের একটি বিলক্ষণ শক্তি আছে বলিয়াই দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়; অতএব দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের প্রতি

* শ্বেতাশ্ব· ১. ৩।

† শ্রীনিবাসভাষ্য; বে. দ. ১. ৪. ২৩।

‡ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তি ভিন্ন নহে, যেমন অগ্নি ও তাহার উষ্ণিতা। শ্রীনিবাসভাষ্য, বে. দ. ২. ১. ২৫।

§ "বে. দ. ২. ১. ২৩।

¶ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং"—শ্বেতাশ্ব. ৬. ১৯; "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ"—মুণ্ডক. ২.১.২; এইরূপ অনেক শ্রুতি আছে।

* শ্রীদেবাচার্য্য, বে. দ. ১. ১. ২; শ্রীনিবাসাচার্য্য, বে· দ. ২. ১. ২৫।

দুগ্ধের ঐ বিলক্ষণ শক্তি থাকাই কারণ। * ব্রহ্মেরও সেইরূপ বিবিধ শক্তি † থাকা হেতুই পরিণাম হইয়া থাকে। এবং এইরূপে ব্রহ্মের পরিণাম সাধিত হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ উপস্থিত হইতে পারে না।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এই প্রকারে তর্কের দ্বারা ব্রহ্মের পরিণাম সমর্থন করিয়া বলেন যে, প রি ণা ম বলিতে আমরা বস্তুতঃ প্র কৃ তি প রি ণা ম, বা স্ব রূ প প রি ণা ম বলিতেছি না, শ ক্তি বি ক্ষে প অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তির প্রসারণকেই আমরা প রি ণা ম শব্দে ধরিতেছি। এই সংসার চেতন-ও অচেতন-ময়। চেতনকে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব ইত্যাদি নামে, ও অচেতনকে প্রকৃতি, ক্ষেত্র, জড় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই চেতন ও অচেতন বস্তুত ব্রহ্মের শক্তি ভিন্ন কিছু নহে। এই শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক। প্রলয়কালে এই সকল চেতন-ও অচেতন-ময় শক্তি অতিসূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। সংসারে এই যে-সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় তৎসমুদয়ও স্ব স্ব কারণপরম্পরাক্রমে অতিসূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপে প্রলয়সময়ে যে শক্তিপুঞ্জ ব্রহ্মে সংক্ষিপ্ত বা সংহৃত হইয়া থাকে, সৃষ্টিসময়ে তাহাই তিনি বিক্ষেপ বা প্রসারণ করেন। প্রলয়াবস্থায় অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে অবস্থিত সংক্ষিপ্ত শক্তি দর্শন যোগ্য থাকে না, সৃষ্টি অবস্থায় তাহাই বিক্ষিপ্ত বা প্রসারিত হইয়া স্থূলরূপে নয়নগোচর হয়। ইহারই নাম শ ক্তি বি ক্ষে প।

দুগ্ধে ঘৃত থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না, তিলে তেল থাকিতেও তাহা দেখা যায় না; কেন না তখন তাহা সূক্ষ্মাবস্থায় স্ব স্ব কারণে নিলীন হইয়া থাকে; তাহার পর তাহাই কার্য্যভাবে স্থূলরূপে পরিণত হইয়া নয়নগোচর হয়। বীজে সমস্ত অঙ্কুরই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে থাকে, এবং পরে তাহাই ক্রমশ প্রকাশিত হয়। তপ্ত কটাহে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে দেখিতে দেখিতে তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়, আমরা তাহার কোন অবশেষ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহা হইলেও যেমন তাহা বাষ্পপ্রভৃতি আকারে অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে থাকেই, এবং কালে মেঘাদিরূপে আবার তাহা জলরূপে প্রকাশিত হয়, সৃষ্টিপ্রলয়-অবস্থায় জগৎকেও এইরূপ মনে করিতে হইবে। এই জগৎও সেইরূপ প্রলয়কালে অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। অনন্তবিচিত্রশক্তিময় ব্রহ্মের ঐ জগৎও অন্যতম শক্তি, তিনি এই শক্তিকেই সৃষ্টিকালে কেবল বিক্ষেপ অর্থাৎ প্রসারণ করেন, ঐ শক্তিকে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাতেই তিনি জগতের উপাদান, এবং ঐ কার্য্যই হইতেছে তাঁহার প রি ণা ম বা শ ক্তি বি ক্ষে প। মহাভারতে এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছেঃ—"কূর্ম্ম যেমন নিজের অঙ্গ সমূহ প্রসারিত করিয়া আবার তাহাদিগকে সংহৃত (সংক্ষিপ্ত) করে, ভূতাত্মা (ভগবান্‌ও) সেইরূপ সৃষ্ট ভূতসমূহকে আবার গ্রাস করেন।" *

ব্রহ্মকে যে জগতের নিমিত্ত কারণ বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—জীবসমূহ স্ব স্ব অনাদি কর্ম্ম সংস্কারের বশীভূত হওয়ায় প্রলয়কালে তাহাদের জ্ঞান এতদূর সঙ্কুচিত হইয়া থাকে যে, তাহাদ্বারা তাহারা নিজের ভোগ সম্বন্ধে কিছুই স্মরণ করিতে পারে না। সৃষ্টিসময়ে ভগবান্ তাহাদের সেই জ্ঞানকে এরূপ প্রকাশিত করিয়া দেন যে, তাহাতে তাহা কর্ম্মফলভোগের যোগ্য হইতে পারে, এবং এইরূপে জীবকে সেই সেই কর্ম্মফল ও ঐ কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি) সাধনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেন। †

সাঙ্খ্যদর্শনেও পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে; সাঙ্খ্যদর্শনের মতে প্রকৃতিই এই জগৎ-রূপে পরিণত। দ্বৈতাদ্বৈতদর্শনেও দেখা যাইতেছে যে, পরিণামবাদ গৃহীত হইয়াছে, এখানেও শক্তিনামক প্রকৃতিরই পরিণাম। এখন ইহাদের মধ্যে ভেদ কি দেখা যাউক। সাঙ্খ্যবাদীরা প্রতিপাদন করেন যে, ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার, এবং উপাদানকারণ মৃত্তিকা। মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকার যেমন সম্পূর্ণ পৃথক্, পুরুষ হইতে প্রকৃতি বা প্রধানও সেইরূপ সম্পূর্ণ পৃথক্; পুরুষের স্বরূপ পৃথক্, এবং প্রকৃতির স্বরূপ পৃথক্; প্রকৃতি কখনই পুরুষাত্মক নহে। প্রকৃতির স্থিতি সম্পূর্ণ স্বাধীন, এজন্য পুরুষের কোন অপেক্ষা নাই। প্রকৃতি যে জগৎ-রূপে পরিণত হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রবৃত্তিও প্রকৃতির স্বাধীন; বৎসের বৃদ্ধির নিমিত্ত অচেতন দুগ্ধ যেমন স্বতই প্রবৃত্ত হয়, স্বতই ক্ষরিত হইয়া থাকে, পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতিও সেইরূপ

---

* শ্রীদেবাচার্য্য, বে. দ. ১. ১. ২।

† "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—শ্বেতাশ্ব. ৬. ৮, ব্রহ্মের শক্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (১. ৩. ২) এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ, সমস্ত পদার্থেরই যখন অচিন্ত্য অথচ জ্ঞানের বিষয়ীভূত শক্তিসমূহ আছে, তখন ব্রহ্মেরও অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় সৃষ্টি প্রভৃতির কারণভূত শক্তিসমূহ আছে, এই সকল শক্তি তাঁহার স্বভাবভূত অর্থাৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন।—"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপসাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥"

* শান্তিপর্ব্ব।

† বেদান্ত কৌস্তুভ, ১. ১. ২; সিদ্ধান্তজাহ্নবী, ১. ২. ২; বেদান্তমঞ্জুষা, ১ম কোষ্ঠ, ৬৫ পৃঃ; বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১. ৪. ২৩।

প্রবৃত্ত হয়, তাহার এই প্রবৃত্তির জন্য কোন চেতন অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণরূপ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। * কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদীগণ বলেন—উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অনন্তশক্তি। ব্রহ্মের শক্তির নামই প্রকৃতি, এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের অধীন, ইহার স্থিতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত; এই শক্তি অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। তাঁহার অনন্তশক্তির মধ্যে একটি শক্তির নাম ভোগ্যাশক্তি, ও আর একটি শক্তির নাম ভোক্তৃশক্তি। ব্রহ্ম সৃষ্টি সময়ে নিজের জড়রূপ ভোগ্যাশক্তিকে বিক্ষেপ অর্থাৎ প্রসার করিয়া আকাশ পৃথিবী প্রভৃতি অচেতনবর্গরূপে পরিণমিত করেন, এবং চেতন ভোক্তৃশক্তিকে বিক্ষেপ করিয়া দেবমানবাদিরূপে পরিণমিত করেন, এবং তাহাদের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং তত্তৎ কর্ম্মফলের বিধান করেন। সূর্য্য যেমন নিজের রশ্মিসমূহকে, অথবা কূর্ম্ম যেমন নিজের অবয়বকে প্রসারিত ও সংহৃত করে, ব্রহ্মও সেইরূপ ঐ ভোগ্য-ভোক্তৃনামক শক্তিদ্বয়কে সৃষ্টিসময়ে প্রসারিত ও প্রলয়সময়ে সংহৃত করেন। অতএব প্রকৃতির পরিণাম উভয়মতে থাকিলেও পরস্পর অনেক ভেদ। †

সেশ্বরসাঙ্খ্যমতের সহিতও ইহার যথেষ্ট ভেদ। কেননা, সেশ্বরসাঙ্খ্য যদিও অচেতন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর স্বীকার করে, তথাপি দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ (শক্তিনামক) প্রকৃতিকে যেমন ঈশ্বর হইতে অভিন্ন স্বীকার করেন, সেশ্বরসাঙ্খ্যবাদিগণ সেরূপ স্বীকার করেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করেন। ঘটের উৎপত্তিস্থলে কুম্ভকার ও মৃত্তিকার যে ভেদ, জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধে ঈশ্বর ও প্রকৃতিরও সেই ভেদ, ইহাই সেশ্বর সাঙ্খ্যবাদীর মত। অপর কথায় ঘটের উৎপত্তিস্থলে ঘটের উপাদান ও নিমিত্তকারণ যেমন পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন, জগৎ-সৃষ্টিস্থলেও সেইরূপ জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ ভিন্ন-ভিন্ন। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ভেদ স্বীকার করেন না; তাঁহারা এক ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকেই 'জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয়ই বলিয়া মনে করেন। ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ‡

জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধে আর একটি কথা আলোচনা করিবার আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মই যে জগতের কারণ তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এমন কতকগুলি শ্রুতি আছে, যাহা দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকেও জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেহ কেহ শ্রুতিবিশেষ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জগতের কারণ জীব; জীব হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, জীবেতেই তাহা স্থির হইয়া রহিয়াছে, এবং জীবেই তাহা প্রলীন হয়; জীব হইতে অন্য কারণ নাই। * কেহ কেহ বলেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ বা চতুর্মুখ ব্রহ্মা; † কেহ কেহ বলেন শিব; ‡ কেহ কেহ বলেন কাল; §, আবার কেহ কেহ বলেন স্বভাব; ¶ এবং অপরেরা কহিয়া থাকেন যে অভাব। ‖

দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ তর্ক দ্বারা এই সমস্ত মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে যদিও জীব প্রভৃতিকে কারণ বলা হইয়াছে, তথাপি তাহাদেরও কারণ বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তিনি যে প্রধান তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মকে কাল, স্বভাব প্রভৃতি সমস্ত কারণেরই অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। ** অতএব যিনি সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকেই জগতের কারণ বলা উচিত। বিশেষত জীব প্রভৃতি শব্দ বিশেষ-বিশেষ অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তাহারা ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। ব্রহ্ম সমস্তকে জীবিত রাখেন বলিয়া তিনি জীব। তাহা না হইলে অনেক শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়। 'যিনি অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন' †† এ শ্রুতিদ্বারা জীব যে ব্রহ্মের নিয়ম্য তাহা বুঝা যাইতেছে; এখন জীবই যদি জগৎকারণ হয়, তবে তাহাকেই নিয়ন্তা বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে তাহাকে যে নিয়ম্য বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি

---

* সাঙ্খ্যকারিকা, ৬৫।

† শ্রীনিবাসাচার্য্য, বে· দ. ২. ১. ২৬।

‡ দ্রঃ—দ্বৈতাদ্বৈতভাষ্য, বে· দ. ১. ৪· ২৬।

* "জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ। জীবে প্রলয়মিচ্ছন্তি, ন জীবাৎ কারণং পরম্" শ্রীদেবাচার্য্য (সিদ্ধান্ত জাহ্নবী, ১. ১· ২) এই বচনকে শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কোন প্রসিদ্ধ প্রধান উপনিষদে নাই, অন্যত্র কোথায় আছে অনুসন্ধেয়।

† "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে…," ঋ· স· ১০. ১২১; "আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত…।"

‡ "যখন কেবল তিমির ছিল, যখন দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না; সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, তখন কেবল শিবই ছিলেন"—শ্বেতা, ৪· ১৮; দ্রষ্টব্য শ্রীকণ্ঠকৃত শৈবভাষ্য, ১· ১. ২।

§ "কালং তথান্যে"—শ্বেতা· ৬. ১; বিষ্ণুপু, ৫· ৩৮· ৫৭।

¶ শ্বেতা, ৬· ১; ১· ২; দ্রষ্টব্য—ভামতী, ১. ১. ২।

‖ "অসদেবেদমগ্র আসীৎ"—ছান্দো, ৬· ২· ১; দ্রঃ—"অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্যপ্রাদুর্ভাবাৎ"—ন্যায়দ, ৪. ১· ১৪—১৫।

** "যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ"—শ্বেতা, ১· ৩; দ্রঃ—ঐ ২।

†† বৃহদা. ৩· ৭· ৩।

অন্যান্য শব্দও এইরূপ বিশেষ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মকেই প্রতিপাদিত করিতেছে, অতএব ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ।*

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

কাব্যের অধিকারের প্রসরতা।

আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়াছে। অর্থাৎ যে বাক্যে আমাদের মনে কোন একটি বিশেষ আনন্দের আস্বাদন জন্মে তাহাই কাব্য।

বাক্যের মধ্যে রস সঞ্চার করিতে গেলে তাহার উপকরণ প্রধানতঃ দুইটি। একটি ছবি আর একটি গান। অনির্দ্দিষ্ট ভাবকে নির্দ্দিষ্টরূপে আনিবার জন্য ছবির প্রয়োজন, আবার ছবির নির্দ্দিষ্টতার বাঁধনকে সঙ্গীতের অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ছন্দের প্রয়োজন।

সুতরাং রসাত্মক ভাষার দুইটি দিক্—একটি স্থিতির দিক্ অন্যটি গতির দিক্। এই দুয়ের সামঞ্জস্যেই কাব্যের ভাষার প্রধান উৎকর্ষ।

আধুনিক ইউরোপে তত্ত্বালোচনার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে যে তত্ত্বালোচনা কেবল শব্দের এবং ন্যায়শাস্ত্রের বাঁধা নিয়মের কসরৎ। যে জীবনকে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব আপনাকে খাড়া করিবে তাহাই যখন ক্রমাগত গতির মুখে এবং পরিবর্ত্তনের মুখে রহিয়াছে তখন তাহার সম্বন্ধে চরমকথা কেমন করিয়া বলা চলে? জীবনের যদি সবটা জানা যাইত, তবে তাহার সত্যকে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করাও যাইত। তত্ত্বালোচনার আগাগোড়াই বানানো, উহার মধ্যে যথার্থ সত্য কিছু পাওয়া যায় না এমনতর একটা কলরব উঠিয়াছে।

অবশ্য কোন ধীমান্ ব্যক্তি এ কথা বলেন না যে, তাই বলিয়া দর্শনশাস্ত্রেরই কোন প্রয়োজন নাই। সকলের চেয়ে বড় সত্যকে প্রকাশ তো করিতেই হইবে, মানুষ তো কিছুই জানিব না বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কথা উঠিয়াছে এই যে, তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকরণপদ্ধতির পরিবর্ত্তন দরকার। বাস্তবিক সত্যকে দূরে রাখিয়া চিন্তার দ্বারা নাম এবং সংজ্ঞা তৈরি করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের পুটে পাক করিয়া যে একটি শব্দমাত্রসার তত্ত্ব বাহির হয় তাহাকে লইয়া আর কাজ চলিবে না। দেখিতে হইবে তত্ত্ব জীবনের তত্ত্ব কি না, তাহার সঙ্গে বাস্তবের যোগ আছে কি না। অর্থাৎ তর্ক যুক্তির দ্বারা সংজ্ঞা নিরূপণ এবং খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখিয়া জোড়া লাগাইবার চেষ্টা করা নয়, একেবারে অব্যবহিতভাবে প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে দেখিতে হইবে।

ভাবীকালের দর্শনের যদি ইহাই কাজ হয়, তবে এ কাজ তো আধুনিক কাব্যে এতকাল হইতে আরম্ভ হইয়া গেছে। সমগ্র জীবনকে চোখের সামনে রাখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুসন্ধান করা এবং আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করার কাজই তো ওয়াডস্বার্থ গ্যয়্টে ব্রাউনিং প্রভৃতি আধুনিক মহাকবিগণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঠিক "আইডিয়ালিষ্ট" নহেন অর্থাৎ বাস্তব কি তাহার খোঁজখবর না লইয়া আপনার মনগড়া ভাবের দ্বারাই সব জিনিসকে তাঁহারা দেখিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা প্রত্যক্ষ জগৎ এবং প্রত্যক্ষ মানবজীবনকে একের মধ্যে পূর্ণের মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন।

আমি বলিয়াছি যে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্যে কাব্যের ভাষার প্রধান উৎকর্ষ। কিন্তু অধুনা স্থিতির চেয়ে কাব্যের ভাষার গতিশীলতাই অধিকতর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এখন মহাকাব্যের কাল আর নাই, বর্ণনাবহুল কাব্যও এখনকার জিনিস নয়, কারণ চিত্রশিল্পের মধ্যেও এখন সূক্ষ্মভাবের সন্নিবেশ দেখা যাইতেছে। যাহা চোখে ভাল লাগে তাহাই এখন শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া গণিত হয় না, পরন্তু যাহা বিরলবর্ণবিন্যাসে স্বল্পরেখাপাতে বৃহৎ ভাবকে যতই সূচিত করিয়া তোলে তাহা ততই চিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। এখনকার কাব্য প্রধানত গীতিকাব্য এবং নাট্যকাব্য। এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে স্থিতি অপেক্ষা গতির বেশি স্থান। কিন্তু প্রমাণের ভাষা নিছক স্থিতি প্রধান। তাহার কারণ তাহাকে সংজ্ঞা দিতে হয়, তাহাকে খণ্ড-খণ্ড ভাব লইয়া এক একটি স্বীকার্য্যকে খাড়া করিতে হয়। সবটাকে এককালে দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা প্রমাণের ভাষায় থাকিতে পারে না।

আমি কি বলিতে চাহিতেছি তাহা একটি উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিলেই সকলের বোধগম্য হইবে। মনে কর, আমার সম্মুখবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে আমি বেশ অখণ্ডরূপে দেখিতেছি—প্রান্তর, দিগন্ত, স্তরে স্তরে নামিয়া-যাওয়া শস্যরাজি, দূর গ্রামের তালীবনরেখা, মধ্যে মধ্যে সর্পাকৃতি দু-একটি মেঠো পথ— এ সমস্তই স্বতন্ত্র করিয়া এবং এক করিয়া একই সময়ে আমি দেখিতে পাইতেছি এইজন্য, যে ইহার মধ্যে গতি নাই—ইহাকে আমি আকাশে দেখিতেছি। কিন্তু কল্পনা করা যাক্ যে ইহাকে আকাশে না দেখিয়া যদি কালের চঞ্চল প্রবাহের মধ্যে দেখিতে হইত তবে আমি কি এই দৃশ্যের যে অখণ্ডভাবটি

---

* শ্রীদেবাচার্য্য, বে. দ. ১. ১. ২ (৯৫-১০৭ পৃঃ); "জগজ্জন্মস্থিত্যাদিবিষয়েষু বাক্যেষু কচিচ্ছ্রূয়মাণা হিরণ্যগর্ভাদিশব্দা উক্তলক্ষণব্রহ্মপরা জ্ঞেয়াঃ"—শ্রীনিবাসাচার্য্য বে. দ. ১. ১. ২।

পাইতেছি তাহা এমন সুনিশ্চিতে পাইতাম? কখনই না। কারণ কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্ত্তের যোগও আছে বিচ্ছেদও আছে। সে কিনা চলিয়াছে।

জীবনটাও যখন এমনি একটি দৃশ্যের মত—নানা বৈচিত্র্যসমন্বিত—এবং তাহাকে যখন আমরা আকাশে দেখি না কালে দেখি, তখন যদি তাহার অখণ্ড মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে হয় তবে কে তাহা পারিবে? প্রমাণের ভাষা? কখনই নয়। আমাদের মন বলিতেছে কাব্যের ভাষা। এবং তাহা বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হইল না, বলিতে হইবে, গীতিকাব্যের ভাষা। কারণ, সঙ্গীতে আরম্ভেই পরিণামকে প্রত্যক্ষ করা যায়, খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ড রাগিণী আপনার পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং যাহা চলিয়াছে, যাহার রূপরূপান্তরের অন্ত নাই, তাহার সম্বন্ধে যদি ঘরে বসিয়া শেষ কথা না বলিতে দাও, অথচ যদি তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগাভাগি না করিয়া সব মিলাইয়া এক করিয়া এবং পূর্ণ করিয়া জানিতে হয় ও জানাইতে হয় তবে কাব্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

আধুনিক কোন একজন প্রসিদ্ধ লেখক লিখিয়াছেন যে "ভাবার এই অখণ্ডরূপ-প্রকাশক্ষমতা আবিষ্কৃত হইলে এবং কাজে লাগিতে থাকিলে তবেই দর্শনের আশা আছে যে তাহার বক্তব্য কথাটি কোন কালে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।" এ কথায় আমার মন খুবই সায় দেয়। আমার খুবই বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে সাহিত্য যেমন তত্ত্বাশ্রয়ী হইবে তত্ত্বও তেমনি কাব্যাশ্রয়ী না হইয়া পারিবে না! প্লেটোর ভাববাদের মধ্যে প্রমাণের ভাগ তত নাই, যত কল্পনার ও কবিত্বের। স্পিনোজার মধ্যেও তাহাই লক্ষ্য করা যায়। হিগেল যে অমন সূক্ষ্ম তার্কিক তথাপি বহু স্থানে তাঁহার কল্পনা ও কবিত্বই সত্য নিরূপণ করিয়াছে, যুক্তি নহে। চিন্তনের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা যে পরিপূর্ণ সত্য পাওয়া যায় এ ভ্রম তত্ত্বকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

দেখনা কেন, বিজ্ঞানই প্রমাণপরীক্ষার বাঁধা পথ দিয়া যে জায়গায় আজ আসিয়া পড়িয়াছে সে জায়গাতে সকল প্রমাণ কেমন ভাসিয়া যাইতেছে। বস্তুর মূল উপকরণটা কি? অভিব্যক্তিরই বা গোড়ার কারণ কি—পরিণামই বা কি? মানুষ যে চেতনা পাইয়াছে তাহার উৎপত্তি কোন্ জায়গায়? এ সকল প্রশ্নের সম্মুখে আমরা বিজ্ঞানকে থই পাইতে দেখিতেছি না। আমরা এ সকল প্রশ্নের যে সহজ উত্তর সহজ দৃষ্টিতে বুঝিয়া রাখিয়াছিলাম ক্রমে তত্ত্ববিদ্যাকে সেই উত্তরই মানিতে হইতেছে। আমরা বলিয়াছি যে আমাদের ভিতরের বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তা আপনার আনন্দে নানার ভিতর দিয়া যাত্রা করিয়া করিয়া বাহিরের সকল বস্তুর সঙ্গে আপনাকে একেবারে গ্রথিত করিয়া বাহিরের সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। বিশ্ব ও আত্মা তাই ভিন্ন পদার্থ নন্—আনন্দে উভয়ে একাকার। যে স্পন্দন আলোকরূপে উত্তাপরূপে এবং অন্যান্য নানা শক্তিরূপে ক্রমাগত স্পন্দিত হইতেছে আমাদের চেতনার বিচিত্র তন্তুর সমস্ত স্পন্দন তাহার সমজাতীয়, সেইজন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবনতরঙ্গলীলাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে আমাদের কোথাও বাধা পাইতে হয় না। সবই সত্তা এবং সবই প্রকাশ এবং আনন্দ। বাহিরে যাহা শক্তি অন্তরে তাহাই জ্ঞান, বাহিরে যাহা নিয়ম অন্তরে তাহাই সৌন্দর্য্য ও প্রেম, বাহিরে যাহা বিচিত্র অন্তরে তাহাই এক এবং অখণ্ড।

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমিহে
তুমি বিচিত্ররূপিণী!

* * *

এবং অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী!"

এই প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎ ছাড়িয়া কোন অবচ্ছিন্ন চিন্তা আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়াই দর্শনের পূর্ব্ব প্রকরণপদ্ধতি অনাদৃত হইতেছে।

অধ্যাপক জোন্স্ তাঁহার 'প্র্যাক্‌টিক্যাল আইডিয়ালিজ্‌ম্' নামক গ্রন্থে যে একটি কথা এক জায়গায় বলিয়াছেন তাহাতে এই আধুনিক চিন্তার গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। তিনি বলিতেছেন "চারিত্রনীতি, দর্শন, আর্ট, ধর্ম্ম—এ সকলের বিশেষ কাজই হচ্ছে প্রকাশ করা। যে সঙ্গীত বাজিতেছে তাহাকেই উদ্ধার করা—যেমন পাইন-অরণ্যের অব্যক্ত মর্ম্মর রোলকে সমীরণ জাগাইয়া তোলে। চারিত্রনীতি মনুষ্যকে কেবল তাহার ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে তৈরি করিয়া তুলে না—যে ভ্রাতৃত্ব মনুষ্যে মনুষ্যে আছে তাহাকেই সে প্রকাশ করে মাত্র। দর্শনও কোন নূতন সৃষ্টি করে না। সে আবিষ্কার করে। তাহার সমস্ত চেষ্টার মূলে একটি আশা ভাসিতেছে এই যে, যে সত্য সমস্ত জিনিসের তলে তলে আছেন তাঁহার সাক্ষাৎকার হইবে। আর্টও তেম্নি কৌশলমাত্র নয়। সে একটি দর্পণের মত বিশ্বপ্রকৃতির সাম্‌নে আপনাকে মেলিয়া দেয়, বিশ্বসৌন্দর্য্য সেইখানে আপনাকে আপনি প্রতিফলিত করেন। ধর্ম্মও কি ঈশ্বরকে রচনা করে?—সে তাঁহাকে দেখে—সর্ব্বত্রই তাঁকে দেখে।"

অধ্যাপক জোন্‌সের এই কথাটিকে খুব তলাইয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমান যুগে এই সকল বিচিত্র সাধনা মিলিবার পথেই চলিয়াছে। তাহারা সকলেই বাস্তব সত্যের প্রকাশক।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে পূর্ব্বেই বা এই সত্যের প্রকাশ

কিরূপ এবং পরেই বা কিরূপ হইতেছে তাহার দুটি একটি উদাহরণ না দিলে আমরা কাব্যের অধিকারের প্রসরতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছি তাহা সম্যক্ অনুভূত হইবে না।

ধরা যাক্ হিগেলের কথা। হিগেল কহিলেন এমন কোন ধারণা (conception) নাই যাহার উল্টাটা আমাদের মনের মধ্যে একই সঙ্গে জাগরূক নহে। যে কোন একটা ধারণা হোক্, আমরা তাহাকে যে নাম যে রূপ দিই, তাহা সে জায়গায় দাঁড়াইয়া নাই—সে তৎক্ষণাৎ অন্য নাম এবং অন্য রূপের মধ্যে গিয়া মিলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হিগেলের মতে ঐক্য বলিয়া কোন ভাবই থাকিতে পারে না কারণ ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অনৈক্যও লাগিয়াই আছে। হিগেলের নিজ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে "আমরা যে বলি গ্রহ হচ্ছে গ্রহ, বা মন হচ্ছে মন—এই যে ঐক্যের কথা বলি—ইহাতে আমাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিই মাত্র। আমরা এই ঐক্যের নিয়মানুসারে কোন কথা কহিতে বা কোন ধারণা চিন্তা করিতে পারি না। ঐক্য আছে—অনৈক্য নাই—এমন অবচ্ছিন্ন (abstract) করিয়া ঐক্যকে দেখা চলে না। একটা জিনিস বা ভাব তাহার আপনার সদৃশ কখন্—যখন সে বিসদৃশও বটে।" হিগেল অন্যত্র লিখিতেছেন "সীমাবদ্ধ যে কোন জিনিস বা ভাব আপনার উপস্থিত রূপকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং আপনিই আপনার উল্টাটা হইয়া বসে। যেমন আমরা বলি অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। অতি হাসি যেমন কান্না। 'না'র দিক্ দিয়া বলিলেও নিস্তার নাই। বিশৃঙ্খলা একপ্রকার দূষিত শৃঙ্খলা বই আর কিছুই নয়, 'কিছুই না' এক রকম 'না'-যুক্ত-হাঁ বই আর কিছুই নয়।" এমনি করিয়া চিন্তার দ্বৈত হইতে কোন জায়গায় আমাদের নিষ্কৃতি নাই। একটা নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈত বোধের জন্যই এই দ্বন্দ্ব বোধ আছে এই কথাই হিগেলের শেষ বক্তব্য। আমাদের সমস্ত ধারণা যখন ক্রমাগত দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে তখন এমন একটা অদ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ সত্য আছে যেখানে এ দ্বন্দ্বের আর প্রয়োজন নাই।

হিগেলের সঙ্গে অধ্যাপক রয়্‌স নামক একজন প্রসিদ্ধ আধুনিক লেখকের রচনার তুলনা করিলে দার্শনিক প্রকরণপদ্ধতি যে কত পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। হিগেল নৈয়ায়িক, রয়্‌স আদৌ তাহা নহেন। হিগেল দ্বৈতের পাশ কাটাইবার জন্য অদ্বৈতের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দ্বৈত অদ্বৈতের মধ্যে পূর্ণ এবং পর্য্যবসিত নহে। তাহার কারণ তিনি তর্কের রাস্তা দিয়া অখণ্ড সত্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে রাস্তায় কেবলি বিভ্রান্তি। রয়্‌সের লেখা পড়িলেই টের পাওয়া যায় যে অখণ্ড সত্যকে তিনি অখণ্ড করিয়াই জানিতে চাহিয়াছেন, সেইজন্য খণ্ড সত্যও সেই অখণ্ডের মধ্যে আপনার স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে তাঁহার একটা লেখার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল;—"জাগতিক ব্যাপারে মন্দ আছে এই তথ্যটাই নিত্যলোকে সম্পূর্ণতা যে কোথাও আছে তাহারি সূচনা করে। সেই সম্পূর্ণতার জন্য অদ্বৈতের জন্য আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা যে আছে তাহার অর্থ এই যে আমাদের মধ্যে অদ্বৈতের নিজেরও একটি ব্যাকুল ইচ্ছা আছে—তিনি আমাদেরই এই পার্থিব দ্বন্দ্ববিরোধের ভিতরে সকল কালাতীত অনন্তশান্তিকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। খণ্ডকালের মধ্যে যদি এই ব্যাকুলতা না থাকিত, অনন্তকালে শান্তি তবে থাকিত কোথায়? আমি এখানে যাহা পাইতেছি না আমার মধ্যে ঈশ্বর তাহাই পাইতে চাহিতেছেন। আমি যে লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করিতেছি তিনি তাহা অনন্তের মধ্যে লাভ করিয়া বসিয়া আছেন এবং আমার এই অসম্পূর্ণতা এবং বেদনার দ্বারাই তিনি তাহা লাভ করিয়াছেন। আমার এই দুঃখের দ্বারাই অনন্তের জয় সপ্রমাণ। সেই অনন্তেই আমিও পরিপূর্ণ। এই খণ্ডতাকে খণ্ডতা জানিয়া অতিক্রম করিলেই আমিও সম্পূর্ণ হইব।"

শুধু বিদেশের লেখা হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছি কেন? আমাদের দেশের একজন আধুনিক পরম পূজনীয় আচার্য্যের একটি লেখা * উদ্ধৃত করিলেও দর্শন যে তাহার হাল বদল করিয়া কবিতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে কেমন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে:—

"সুব্যক্ত জ্ঞানে বাস্তবিক সত্তা যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়, যাহা তোমাতে প্রকাশ পায়, আমাতে প্রকাশ পায়, জীবজন্তুতে প্রকাশ পায়, তরুলতা উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, কাষ্ঠ লোষ্ট্র পাষাণে প্রকাশ পায়, স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্যে প্রকাশ পায়, তাহা কিরূপ পদার্থ? তাহা মোহের নিদ্রা নহে, কল্পনার স্বপ্ন নহে; পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ সত্য—তাহা জাগ্রত জীবন্ত সত্য। তবে এটা সত্য যে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি সমস্তই ঘড়ি ঘড়ি রূপান্তরিত হইতেছে। হউক্ না রূপান্তরিত * * সবই সত্য; সকলেরই সত্তা বাস্তবিক সত্তা; কাহারো সত্তা আমাদের মন-গড়া কাল্পনিক সত্তা নহে। এমন কি যাহা কিছু আমরা মনে করি আমাদের মন-গড়া মাত্র—যেমন স্বপ্নের হাতি ঘোড়া তাহারও ভিতরে বাস্তবিক সত্তা জাগিতেছে; কেননা প্রতিধ্বনি যেমন রূপান্তরিত ধ্বনি, কাল্পনিক সত্তা তেমি রূপান্তরিত বাস্তবিক সত্তা। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহার প্রকাশ তাঁহারই অপ্রকাশ—নিখিল জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ববৈচিত্র্য একই সত্যের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।"

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "হারামণির অন্বেষণ।"

উদ্ধৃত লেখাটি হইতে বুঝা যায় যে এ ভাষাও যুক্তি তর্কের ভাষা নয়, এ কবিতার ভাষা। সকল সত্তাই যে বাস্তবিক সত্তা এ কথাকে পূজনীয় লেখক প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই অথচ প্রমাণ তলে তলে সমস্তই আছে মজুত। এ একেবারে অখণ্ড আনন্দ দৃষ্টির দ্বারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করা—এ উজ্জ্বল এবং সুন্দর ভাষায় লিখিবার যোগ্য এবং লেখাও হইয়াছে তাহাই।

কবিতার দ্বারা দর্শন যেমন নূতন প্রাণ পাইতেছে দেখা গেল তেম্নি দর্শনের ভাবের দ্বারা কবিতাও কিরূপ রূপান্তর লাভ করিতেছে তাহারও দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা উচিত। জর্ম্মান মহাকবি গ্যয়টের একটি পত্রে এ দুয়ের সম্বন্ধ বড় সুন্দররূপে নির্ণীত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন:—"দর্শন যখন ভাগ বিভাগ করিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে চলা আমার পক্ষে দায়, কিন্তু সে যখন যোগ করে—আমাদের ভিতরকার আদিম অনুভূতিকেই সত্য অনুভূতি বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়—যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমরা এক এবং এই একটি সহজ আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ উপলব্ধিকে আনিয়া দেয় যে, সকল বাহিরের দ্বন্দ্বের নীচে একটি অখণ্ড অমৃত জীবন রহিয়াছে—আমরা সে জীবন পাই বা নাই পাই—তখন সত্যসত্যই আমি দর্শনকে গ্রহণ করিতে পারি।"

ওয়াডস্বার্থ যখন লিখিতেছেন:—

"And I have felt
A Presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air
And the blue sky and in the mind of man:
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things."

"করিয়াছি অনুভব
মহা আবির্ভাব। তারি আনন্দ-গৌরব
নিবিড় চিন্তার দোলে দোলায়েছে মোরে।
সব সনে সব-যোগ উঠে চাহে ভ'রে
পরম চেতনা সেই কিসের না জানি
জেগেছে আমার প্রাণে! তারি সত্তাখানি
পশে সর্ব্ব ঠাঁই—অস্তমান রবিকরে
অতল অম্বুধি মাঝে, সুনীল অম্বরে
পবন হিল্লোলে আর মানবের মনে
এক আত্মা! এক গতি! সকল মননে
মনন-বস্তুরে আর করে সে প্রেরণ
যায় বহি সবার ভিতর দিয়া!"

তখন এই কয়েকটি ছত্রে ওয়াডস্বার্থ বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের যে পরিপূর্ণ যোগের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন যাহা দর্শন নানা কথার জালে কোনমতেই ভাল করিয়া বলিতে পারে না তাহাই দেখিবার বিষয়। আমরা প্রকৃতিকে বলি জড় এবং আমাদের চৈতন্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাই না—এই দ্বন্দ্ব দর্শনের মধ্যেও মস্ত দ্বন্দ্ব। কিন্তু আত্মার অখণ্ড আনন্দের তরফ হইতে দেখিলে কোথাও দ্বন্দ্ব নাই—কারণ বাহিরেও সেই আত্মা শক্তি-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন অন্তরে তিনিই সৌন্দর্য্যরূপে আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই এ দুয়ের সেতু। হিগেল যেমন বলিয়াছেন, "What is rational is real, what is real is rational" যাহা বাস্তব তাহাই বুদ্ধিগম্য সত্য এবং বুদ্ধিগম্য সত্যই বাস্তব—বাস্তবিক সত্যে এবং বাস্তবিক সত্তায় কোন ভেদ নাই—ওয়াডস্বার্থ তাহাকে আরও একটু দূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বলিতেছেন যে বাস্তবিক সত্য এবং সত্তা আনন্দেই অভিন্ন। সত্যে এবং আনন্দে কোন প্রভেদ নাই। সৎ, চিৎ, এবং আনন্দ এই তিনের সামঞ্জস্যের উপর সমস্ত সত্যের চিরপ্রতিষ্ঠা। সৎ অর্থাৎ যাহা আছে চিৎ অর্থাৎ যাহা চেতনায় আছে—এবং আনন্দ যাহা এ দুয়ের সংযোগ। বাহিরের সঙ্গে অন্তরের যোগ আনন্দে—জ্ঞানের সঙ্গে প্রাণের যোগ আনন্দে। এ আনন্দ অনির্ব্বচনীয়, এ আনন্দ বুদ্ধিমনের অগোচর।

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্যয়টে ওয়াডস্বার্থ প্রভৃতির মধ্যে অখণ্ডসত্যের যে আনন্দময় উপলব্ধি দেখা গেল—যে উপলব্ধি দর্শনের জিনিস অথচ দর্শন যেখানে নাগাল পায় নাই—ঠিক সেই একই জিনিস ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে উপনিষদ প্রভৃতিতে এবং মধ্যযুগে কবীর নানক দাদু প্রভৃতির রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া বৈদিকযুগের পরে কত দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইল কিন্তু উপনিষদ্ তো তাহাদের মত তর্ক যুক্তির দ্বারা সত্যকে জানিবার চেষ্টা করে নাই—সে একেবারে অব্যবহিতভাবে জানিয়াছে। সে অখণ্ড সত্যকে কত রকম করিয়া দেখিয়াছে—কখনো বলিয়াছে প্রাণ, কখনো জ্ঞান, কখনো অন্তর্য্যামী, কখনো সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র সেই এক সত্তাকে উপনিষদ্ উপলব্ধি করিয়াছে এবং তাহাকে কেবল সত্য বলে নাই আনন্দ বলিয়াছে, "এই" বলিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কবীর দাদু প্রভৃতির বচনও এমনিই পূর্ণ। সকল সীমার মধ্যে তিনি, সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া একাকী অসীম

তিনি, এমনি করিয়া ভাবে রূপে বন্ধনে মুক্তিতে সকল দ্বৈতে সেই এক অদ্বৈতকে তাঁহারাও আশ্চর্য্যরকমে অনুভব করিয়া সকল দ্বৈতকে ভঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। আবার আমাদের দেশেও আধুনিক কাব্য সাহিত্যের দিকে মনোনিবেশ করিলে দেখা যাইবে যে এই একই কাজ আমাদের সাহিত্যেও চলিতেছে।

কেবলি

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"

কাব্যের ভাষা যে ক্রমে সমস্ত চিন্তাকে আয়ত্ত করিবে—সে যে সমস্ত সত্যকে রসময় করিয়া প্রকাশ করিবে তাহার পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত।

(আয়র্ল্যাণ্ড)

(২)

One great strong unselfish soul in every community would actually redeem the world.

দারিদ্র্যক্লিষ্ট আয়র্লণ্ডে অল্পকালমধ্যে কি করিয়া কৃষি-উন্নতির জন্য এমন একটা জাগ্রত চেষ্টা সম্ভবপর হইল, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই বাক্যটির সত্যতা উপলব্ধি হইবে। আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষকেরা মিষ্টার প্ল্যাঙ্কেটের নাম কখনও ভুলিতে পারিবে না—আয়র্ল্যাণ্ডের মাটির উপর তিনি তাঁহার নাম লিখিয়া গিয়াছেন।

যে দেশ ভারতবর্ষের মতন বিচিত্র বিভিন্ন আচার-পদ্ধতির কঠোর শাসনে ও অন্ধ সংস্কারের গণ্ডীতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে সে দেশে কোন প্রকার সংস্কার ও উন্নতিসাধনের চেষ্টাকে সফল করিয়া তোলা কতদূর শ্রমসাধ্য তাহা যাঁহাদের ধারণা আছে তাঁহারা মিষ্টার প্ল্যাঙ্কেটের সাধনার কঠোরতা বুঝিতে পারিবেন। আইরিশ শ্রমজীবিদের দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু পন্থা অবলম্বন করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সমবায় মহাসমিতির Co-oparative Congress অধিবেশনে যোগদান করিয়া তাঁহার মনে হইল সমবায় চেষ্টা দ্বারা আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষি-উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে। হোরেস্ প্লাঙ্কেট্ তাঁহার অন্তরে আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্যদেবতার মঙ্গলধ্বনি শুনিতে পাইলেন। নিঃস্বার্থভাবে অনশনক্লিষ্ট আইরিশ চাষীদের উন্নতির জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম আজ সার্থক হইয়াছে। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষকদের কাছে আয়র্ল্যাণ্ডে সমবায় চেষ্টার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা যুক্তি উপস্থিত করিলেন এবং যাহাতে স্থানে স্থানে সেই প্রণালী অনুসারে দুধের ব্যবসা (Co-operative dairy) স্থাপিত হইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রথমত কৃষকেরা তাঁহার পরামর্শে কান না দিলেও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, এবং ইঁহার পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে একে একে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৬৭টী Co-operative dairy স্থাপিত হইল। এই সমবায় দুগ্ধশালাগুলির কাজকর্ম্ম যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, যাহাতে সমবায় চেষ্টার সার্থকতা সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারে, এবং যাহাতে আয়র্ল্যাণ্ডে কৃষিকর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয় এই উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত উন্নতিশীল কৃষকদলকে আহ্বান করিয়া মিষ্টার প্ল্যাঙ্কেটের উদ্যোগে আইরিশ কৃষিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাসমিতি Irish agricultural Organisation Society গঠিত হইল। মিষ্টার প্ল্যাঙ্কেট্ দেখিলেন সমিতির কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইলে হয় গভর্ণমেণ্টের না হয় আইরিশ নেতৃবর্গের সাহায্য ও সহানুভূতি আবশ্যক। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার যোগ্যতা নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। তখন তিনি বিভিন্ন আইরিশদলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটা কমিটি স্থাপন করিলেন। এই কমিটি বিদেশ হইতে কৃষিসংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেশে অভিনব কৃষিপ্রণালী প্রচলন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং কি কি উপায়ে আয়র্ল্যাণ্ডের চাষীর ঘরে ঘরে অন্নভাণ্ডার ভরিয়া উঠিতে পারে সেজন্য নানা উপায় সৃষ্টি করিতে লাগিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যে দেশে একটী সমবায় দুগ্ধশালা স্থাপন করিতে মিষ্টার প্ল্যাঙ্কেট্কে পঞ্চাশটী বিভিন্ন গ্রামে কৃষকদের সভা করিয়া বক্তৃতাদ্বারা তাহার আবশ্যকতা বুঝাইতে হইয়াছিল, সেই দেশে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গণনা অনুসারে ৩৬৭টী সমবায় দুগ্ধশালা আয়র্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে—ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ৪২০০০; প্রতি বৎসর এই দুগ্ধশালাগুলি দেড় কোটি টাকার ব্যবসা করে। অল্পকাল মধ্যেই আইরিশ কৃষকগণ সমবায় চেষ্টার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নানা বিভাগেই ইহা প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল; কৃষিসংক্রান্ত যতগুলি সমিতি গঠন করা হইয়াছে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গণনানুসারে তাহার সংখ্যা ৮৫০ এবং মোট সভ্যসংখ্যা ৯০,০০০; এই সকল সমিতি আইরিশ কৃষিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং তাহারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

যে তিনটী প্রধান সমিতি আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষকদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব। প্রথম—কৃষিব্যাঙ্ক। যেমন জাপানে কৃষি উন্নতি করিতে গিয়া গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে

অর্থদৈন্য হইতে কৃষিজীবিদিগকে না বাঁচাইয়া কোনো প্রকার সংস্কারকার্য্যই সম্ভবপর হইবে না, আয়র্ল্যাণ্ডে কৃষিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাসমিতিও সেই কথাটি বুঝিতে পারিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

আইরিশ কৃষকদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের কৃষকদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কৃষিকর্ম্মের সময় ইহারা যদি সামান্য কিছু কর্জ্জ সংগ্রহ করিতে না পারে তাহা হইলে ইহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না। ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে যে জমিটুকু তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সেই ভূমিখণ্ডই ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। বাংলাদেশের কৃষকদেরও সেই অবস্থা; চাষের সময় একটী হালের গরু কিংবা একখানি লাঙ্গলের জন্য দশ পনরটী টাকা কর্জ্জ করিতে পারা না পারার উপর জমিদারকে বাৎসরিক খাজানা চুকাইয়া দিয়া পরিবার প্রতিপালন করা নির্ভর করে। কিন্তু নিঃসম্বল চাষীকে এই সামান্য টাকা ক'টি কে দেয়? অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া অবশেষে চাষীকে অর্থলোলুপ মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। মহাজনের জালে জড়িত হইয়া চাষীদের কি দুরবস্থা হয়, পাঠক যদি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কিছুকাল ভ্রমণ করুন, দেখিবেন, প্রায় অধিকাংশ চাষী তাহার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া নিজের মাথা পর্য্যন্ত মহাজনের কাছে বিকাইয়া দিয়াছে। যতদিন সে বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন সে মহাজনের দেনাই শোধ করিবে। যে দিন মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইবে মহাজন তখন পিতার দেনার জন্য পুত্রকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে।

আয়র্ল্যাণ্ডে কৃষিব্যাঙ্ক সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে সাধারণ ব্যাঙ্ক (Joint stock Bank) কর্জ্জ যোগাইত, কিন্তু কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য এই ব্যাঙ্কের ছিল না বলিয়া ইহা দ্বারা চাষীদের কোনো কল্যাণ সাধিত হইত না। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষেরা দশ পনর টাকা কর্জ্জ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং যে ক্ষেত্রে কর্জ্জপ্রার্থী উপযুক্ত জামিন দেখাইতে না পারিত সে ক্ষেত্রে সে কর্জ্জ পাইত না। এতদ্ব্যতীত ২০।২৫ টাকা কর্জ্জ করিতে হইলে কর্জ্জপ্রার্থীকে নানা প্রকার খরচপত্র বাবদ প্রায় ১০।১২ টাকা ব্যয় করিতে হইত; কর্জ্জের টাকা হইতেই তিন মাসের সুদ অগ্রিম কাটিয়া লওয়ারও নিয়ম ছিল।

আইরিশ কৃষিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাসমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় যখন কৃষিব্যাঙ্ক Agricultural Credit Bank স্থাপিত হইল, দারিদ্র্যক্লিষ্ট আইরিশ চাষীগণ তখন বুঝিতে পারিল এতদিনে তাহাদের ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন। আশ্চর্য্য এই নিরক্ষর নিঃসম্বল আইরিশ কৃষিজীবিদিগকে উন্মুক্ত হস্তে কর্জ্জ দিয়াও ব্যাঙ্ক আজ পর্য্যন্ত কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। রিপোর্ট দৃষ্টে দেখা যায় এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কেবল একজনমাত্র আসামী পলাতক হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, এই যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানটি ইহাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে কোনোপ্রকার দুর্ব্যবহার দ্বারা তাহার গৌরবকে খর্ব্ব করার মতন দুর্বুদ্ধি ইহাদের মনে স্থান পায় নাই—কঠোর দারিদ্র্যও নিরক্ষর আইরিশ কৃষকদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে তেমন শিথিল করিয়া দিতে পারে নাই। একদিকে কল্যাণব্রতী আইরিশ-কৃষিব্যবস্থা-সমিতির উদ্যোগ, অপর দিকে কৃষকদের সহানুভূতি—এই দুইটি সহায় অবলম্বন করিয়া ব্যাঙ্ক ক্রমশঃই সমস্ত আয়র্ল্যাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কোনো কোনো জিলায় প্রায় দুই শত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

সুধু প্রজাদিগকে কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করা ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল না, যাহাতে কৃষক নিজে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। যে দু-এক পয়সা সাংসারিক খরচ হইতে উদ্বৃত্ত করিয়া কৃষকপত্নী কখনো হাঁড়ির মধ্যে, কখনো ঘরের চালের মধ্যে, কখনো পুরাতন একটি থলির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত, যাহাতে এই সঞ্চিত টাকা কয়েকটী ব্যাঙ্কে জমা হইয়া কৃষক কিছু কিছু সুদ পাইতে পারে, ব্যাঙ্ক তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে।

কৃষিব্যাঙ্ক ব্যতীত আর একটি ব্যবস্থা আইরিশ কৃষকদের কল্যাণসাধন করিতেছে,—কৃষিকর্ম্মের জন্য যে সকল আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়, যাহাতে কৃষকেরা সহজে তাহা সংগ্রহ করিতে পারে এইজন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাইকারী দরে কৃষি সংক্রান্ত জিনিষপত্র কিনিবার উদ্দেশ্যে এক সমিতি স্থাপন করা হয়। (Irish agricultural wholesale Society.) বীজ, সার, কৃষিকর্ম্মোপযোগী যন্ত্রাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য সমিতি হইতে পারদর্শী লোক নিযুক্ত করা হয়। কৃষকদিগকে সমিতির সভ্য হইতে হয়, এবং এক একটী গ্রামে সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। গ্রামের কৃষকেরা একত্র হইয়া আবশ্যক দ্রব্যের তালিকা স্থানীয় শাখা-সমিতির সম্পাদকের কাছে উপস্থিত করিলে তিনি ডাবলিনে প্রধান সমিতির অধ্যক্ষের কাছে ইহা পাঠাইয়া দেন। তালিকার সঙ্গে সভ্যদের প্রত্যেককে তাহার লিখিত আদেশানুযায়ী দ্রব্য পৌঁছিলে উপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিবে এমন একখানি স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতে হয়। ডাবলিন হইতে জিনিষ ক্রয় করা হয়। এইরূপে সমিতি কৃষকের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বীজ, সার ও অন্যান্য দ্রব্য অল্প মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারে। প্রতি বৎসর এই সমিতির সাহায্যে পনের লক্ষ টাকার কৃষিসংক্রান্ত জিনিষপত্র ক্রয় করা হইয়াছে।

আইরিশ কৃষকেরা অল্পকাল মধ্যে যে এই সমিতির সার্থকতা অনুভব করিতে পারিয়াছে তাহার কারণ জানিতে হইলে সমিতি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কৃষিসংক্রান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ইহাদিগকে কি প্রকার লাঞ্ছিত হইতে হইত তাহা জানা আবশ্যক। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে যত অব্যবহার্য্য বীজ, শস্য আয়র্ল্যাণ্ডে পাঠান হইত এবং মূর্খ আইরিশ চাষী না জানিয়া তাহা ক্রয় করিত। বহু পরিশ্রম করিয়া তাহারা যে জমিটুকু প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাতে এই অব্যবহার্য্য বীজ বপন করিয়া তাহারা কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে। শুধু বীজ নহে, সার সম্বন্ধেও কৃষককে এই প্রকার লোকসান দিতে হইত। আজ কৃষকের এই দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে; উৎকৃষ্ট জিনিষ অল্পমূল্যে ঘরে বসিয়া পাইতেছে। যে সমিতি এমন করিয়া তাহাদের পর্ণকুটীরে অন্নপূর্ণার আসন স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে সেই সমিতির প্রতি কেন তাহাদের হৃদয়ের সহানুভূতি জাগিয়া উঠিবে না? বাংলাদেশের চাষীরা যাহাতে ভাল বীজ, উৎকৃষ্ট সার ও কৃষি কর্ম্মোপযোগী যন্ত্রাদি পাইতে পারে, দেশের জমিদারগণের উদ্যোগে যদি জিলায় জিলায় এমন এক একটি সমিতি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ইহারাও যে অল্পকাল মধ্যে সমবায় চেষ্টার সার্থকতা অনুভব করিয়া আইরিশ কৃষকদের মত সমিতিকে নানা ভাবে সাহায্য করিবে না আমার বোধ হয় বাংলাদেশের চাষীরা এখনও তেমন অসাড় হইয়া পড়ে নাই।

ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিয়া চাষের সময় কৃষককে সাহায্য করিতে পারে, পাইকারী মূল্যে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া সমিতি তাহাকে উৎকৃষ্ট বীজ, সার, সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে কিন্তু তবু আর এমন একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন যাহার সাহায্যে কৃষক তাহার ক্ষেত্রের শস্য, দুগ্ধশালার মাখন, বাগানের ফল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে। গ্রামে তাহার শস্যাদির উপযুক্ত দাম পাওয়া যাইবে না; লাভ করিতে হইলে তাহাকে সহরে যাইতে হইবে। কিন্তু ফসল সহরে পাঠাইবার রেলভাড়া অত্যন্ত বেশি; তাহার সামান্য ফসলের জন্য এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবপর নহে। যাহাতে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে সে জন্য আইরিশ সমবায় এজেন্সির সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক কৃষককে ইহার সভ্য হইতে হয়; গ্রাম হইতে সভ্যগণ সমস্ত ফসল একত্র করিয়া নিকটবর্ত্তী কোনো সহরে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। বড় বড় সহরে সমিতির গুদাম ঘর রহিয়াছে— সেখানে সমস্ত ফসল রাখা হয়। প্রচুর পরিমাণে ফসলাদি পাঠান হয় বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানী ভাড়া খুব কমাইয়া দিতে পারিয়াছে। এইরূপে কৃষক তাহার ঘরে বসিয়া লিভারপুল, গ্লাস্‌গো, ডবলিন্ প্রভৃতি সহরে তাহার ফসল বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারিতেছে।

একক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইলে দেশের সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা একের সঙ্গে অপরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডে যখন দেখা গেল কৃষি-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তখন আইরিশ সমাজের সমস্ত অঙ্গে পরিবর্ত্তন সুরু হইয়া গেল—পুনরায় তাহাদের একঘেয়ে জীবনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইল। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আইরিশ শ্রমজীবিদের জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল; সমস্ত দিবসের কর্ম্মক্লান্তির অবসানে গ্রামস্থ কোনো বন্ধুর ঘরে মিলিত হইয়া গল্প, নৃত্যগীত, কবিতা-আবৃত্তি ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদের আয়োজন হইত; এইরূপে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা দেশের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল তখন গ্রাম্য জীবনের এই কল্যানমূর্ত্তিটিও তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল। যে আইরিশগণ আপনার গ্রামটীকে ঘরটীকে, প্রীতির সম্বন্ধকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য দান করিত, তাহারা নানা প্রকার উৎপীড়নের আঘাতে দলে দলে আমেরিকাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। শুধু যে অর্থদৈন্যের নিষ্পেষণেই আইরিশ কৃষিজীবিরা স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাহা নহে, সমস্ত দৈন্যাপেক্ষা সামাজিক বন্ধনের শিথিলতাই আইরিশ কৃষককে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়া দেয়। এই জন্যেই আইরিশ নেতাগণ সর্ব্বপ্রকার কৃষি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া নানাভাবে গ্রাম্য সমাজে নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অনেক সমিতির গৃহে, ব্যাঙ্কের বাড়ীতে, নৃত্যগীতাদির জন্য প্রশস্ত ঘর রাখা হইয়াছে; সপ্তাহের মধ্যে একদিন সেখানে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়; কোনো কোনো স্থানে সংবাদপত্র, বই ইত্যাদি রাখা হইয়াছে—কৃষক, তাহার অবসরমত সেখানে গিয়া পড়িতে পারে।

আইরিশ নেতাগণ এই প্রণালীতে কার্য্য না করিলে কোনো মতেই ইহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন না, কেন না দেখা গিয়াছে সমিতিতে যোগদান করিলে তাহার ফসল ভাল বিক্রী হইবে, অথবা তাহার কৃষিকর্ম্মের সুবিধা হইবে ইত্যাদি যুক্তি উল্লেখ করিয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরা সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু সমিতিকে পোষণ করিলে তাহার দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে, সমস্ত শ্রমজীবিগণ একত্রে কোনো কাজ করিলে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি করিতে শিখিবে,

এইরূপে তাহাদের গ্রাম্যজীবন পূর্ণতর সৌন্দর্য্যে আনন্দে ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে, এই কথা বলিয়াই সমাজপ্রিয় স্বদেশানুরাগী আইরিশ কৃষকের চিত্ত জয় করা সহজ।

মিষ্টার প্ল্যাঙ্কেটের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে; সমিতি নানা ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিজীবিদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে। ডব্লিন্ সহরে কিছুকাল পূর্ব্বে একজন ব্যাঙ্ক-স্থাপন-উদ্যোগী নেতা কৃষকদিগকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা ব্যাঙ্ক হইতে উন্মুক্ত হস্তে টাকা কর্জ্জ দিব কিন্তু কেহ যদি টাকা শোধ না দেয় তাহা হইলে সমস্ত সভ্যদিগকে সে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।" বক্তা এমন প্রস্তাবে সম্মতির আশা করিতে পারেন নাই এমন সময়ে একদল কৃষক বলিয়া উঠিল—"Sure that's nothing; anyone would do that to help his neighbour. অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ আর কি—যে কেহ নিজের প্রতিবেশীকে সাহায্য করিবার জন্যে ইহা করিবেই।

আয়র্ল্যণ্ডের মত দেশে, যেখানে আমাদের দেশের মত বহুকালের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেখানে পৌরোহিত্যের শাসন মানুষকে চিরঅন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যেখানে নানাপ্রকার রাজনৈতিক মতামত নিরন্তর বিরোধের বীজ ছড়াইয়া দিতেছে, সেখানে উচ্চতর স্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য আহ্বান আসিলেই সমস্ত আবরণ ছিন্ন করিয়া সমস্ত বিরোধ, বিভিন্নতা, বিচ্ছেদ ভুলিয়া ইহারা একত্রিত হইতে পারে, আর আমাদের দেশের উপর দিয়া এত ঝড় বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু "মরা গাঙ্গে বাণ" ত আর আসে না। আমাদের সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত চেষ্টা বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যায়—হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষোভ করিলে কি হইবে? আমরা সভা করিয়া, কংগ্রেস্ করিয়া রিজোলিউশন্ পাশ করিয়াই দেশের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিতে চাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে! সাধে কি মহাত্মা বিদ্যাসাগর চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন "সাত হাত মাটি খুঁড়িয়া ফেলিলে, তবে যদি এ দেশে মানুষ জন্মে।"

এই সাত হাত মাটি খুঁড়িয়া ফেলিবার লোকও কি আমাদের নাই?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাবীধর্ম্ম।

(৩)

মাজানদারানের রাজবিদ্রোহ দমন হইবার পর কিছু দিন শান্তিতে কাটিল বটে কিন্তু অল্পকাল পরেই পারস্যের উত্তরপশ্চিমে জানসান সহরে ঠিক ঐ প্রকারের বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল। এইবারের ঘটনাস্থানের দৃশ্য পূর্ব্বেকার মত নহে; বন এবং চষাজমীর পরিবর্ত্তে পারস্য সহরের একটি মৃত্তিকাপ্রাচীর পরিবেষ্টিত অসরল, সরু রাস্তা, তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পপ্লার কুঞ্জ, এবং সেই রৌদ্রতাম্র প্রস্তরবহুল সমতল ভূমির মধ্য দিয়া একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। ঘটনাস্থলের দৃশ্য স্বতন্ত্র হইল বটে ঘটনা একই প্রকারের ঘটিল। বাবীদিগের সেই প্রকারেরই অদম্য উৎসাহ তেজ এবং রাজসৈনিকেরও তদ্রূপ ভীরুতা, অসংযম এবং অব্যবস্থা। অনবরত গুলিবর্ষণের জন্য বন্দুকগুলি যখন তপ্ত হইয়া ফাটিয়া যাইতেছিল তখন বাবী স্ত্রীলোকেরা চুল কাটিয়া ভগ্ন অংশ তাহার দ্বারা বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন এবং আসন্ন বিপৎপাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভ্রাতা এবং স্বামীদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। লড়াই করিয়া কিছু হইল না দেখিয়া শত্রুপক্ষ অবশেষে রসদ আমদানীর পথ রুদ্ধ করিল—অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও তাহারা দেখিল অনাহারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শত্রুপক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ আশ্বাস দান করিল, বাবীরা আত্মসমর্পণ করিল এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে হত্যা করিল।

জানসানে যখন এই ব্যাপার চলিতেছিল তখন পারস্যের দক্ষিণে নিজির সহরেও আর একদল বাবীর সহিত শত্রু পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। রাজার দল অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং বাবীধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বাবকে তিন বৎসর ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল কাজেই তাঁহার অনুবর্ত্তীরা কি করিল না করিল তাহার জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না। তথাপি পারস্যরাজ ইঁহাকেই প্রাণদণ্ড দিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন ইঁহার মৃত্যু হইলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যাইবে। কিন্তু উল্টা হইল। শান্তি হওয়া দূরে থাক্ ইহাতে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বস্তুত বাব দুইটি উপায়ে এই ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার প্রতি নির্ভরতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; প্রথমেই তিনি বলিয়াছিলেন ইহাই শেষ নহে, পরে আরও মহত্তর ব্যক্তি আসিয়া আরও উন্নততর সত্য প্রচার করিবেন; দ্বিতীয়ত জীবিত কালেও তিনি এই আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারের কার্য্যভার একাকী বহন করেন নাই, আপনাকে "কেন্দ্র" করিয়া চতুর্দ্দিকে আঠার জন লোককে লইয়া একটি যাজকতন্ত্র সৃষ্টি করিলেন, এবং ইহার নাম দিলেন 'মিলন'। এই লোকদিগকে জীবিত বর্ণমালা বলা হইত। কোন একটি বিশেষ গুণবাচক শব্দের উনিশটি

অক্ষর ছিল এই জন্যই বিশেষ ভাবে উনিশ জন লোক লইয়া এই রাজকতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইল; কোন একজনের মৃত্যু হইলে তাঁহার গুণসমন্বিত আর একজনকে গ্রহণ করিয়া শূন্য পূরণ করা হইত। কেন্দ্রস্বরূপ 'বাব'-এর পরেই 'মিলন'-এর দুই জন প্রধানতম অক্ষর ছিলেন মুল্লা হুসেন এবং মুল্লা মহম্মদ আলি। শেখ তাবারসির গোরস্থানে লড়াইয়ের সময়ে এই দুইজন নিহত হইলে মিরজা ইয়াহ্‌ইয়া নামে একজন যুবক মিলনের মধ্যে বাবের পরেই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন; এই যুবকটিকে বাবেরা 'সুব্‌-ই-এজেল' 'অনন্তের প্রভাত' এই উপাধি দিয়াছিল। মুসলমানেরা এই সমস্ত খবর জানিত না, তাই তাহারা ভাবিল যে প্রতিষ্ঠাতা বাবকে হত্যা করিলেই বাবীধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে এবং তাহা আর কোনমতেই টিঁকিবে না।

বাবকে চিহ্‌রিক্ হইতে তাব্রিজ আনা হইল এবং বিচারের জন্য বিচারপতিদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল—কিরূপে বিচার করিবেন তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। বিচার হইল নামে মাত্র, তাঁহার উপর কটু বাক্য এবং অপমান অজস্র বর্ষিত হইল। বাবকে এই ধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার জন্য তাহারা একবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের সমস্ত ভীতিপ্রদর্শন এবং আশার কথা উপেক্ষা করিয়া তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন 'যে ইমাম মাহ্‌দির অভ্যুদয় তোমরা আশা করিতেছ আমিই সেই, আমিই সেই'। তাহারা তাঁহার এই উক্তিটি ধৃষ্টতা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং বলিল, যে ইমামের অভ্যুদয়ের অপেক্ষায় তাহারা আছে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং সেই বিজয়ী আসিয়া সমস্ত অবিশ্বাসীদিগকে বিনাশ করিয়া আপন বিজয়বার্ত্তা সগর্ব্বে জগতে ঘোষণা করিবেন। বাব ইহার উত্তরে বলিলেন "এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা মহাপুরুষদিগকে হত্যা করিয়াছে। যখন মেরির পুত্র যিশু আসিলেন তখন য়িহুদিরাও বলিয়াছিল তাহারা মেসায়ার আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল। তাহারাও কি বলে নাই যে তাহাদের মেসায়া বিজয়ী রাজারূপে আবির্ভূত হইয়া শত্রুকে পরাজিত করিয়া জগতে মুসাপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবেন এবং আপনি একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসিবেন? এখন মুসলমানেরা য়িহুদিদের ন্যায় ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছে এবং তাহাই আঁকড়িয়া ধরিয়া রাহিয়াছে; তাহারা জানেনা যে সে জয়লাভ পার্থিব নহে তাহা আধ্যাত্মিক।

বিচারকেরা চরম দণ্ডের আদেশ দিলেন এবং ধর্ম্মযাজকেরা তাহা সমর্থন করিলেন; মির্জ্জাআলি মহম্মদকে পুনরায় কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল। পৃথিবীতে তাঁর শেষ রাত্রি তিনি নির্জ্জনে কাটাইলেন, কেবল তাঁহার দুইজন ভক্ত শিষ্য তাঁহার নকলনবিস আকা সৈয়দ হুসেন এবং তাব্রিজ সহরের সওদাগর আকা মহম্মদ আলি তাঁহার সহিত ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিটি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন—তাঁহার আত্মীয়েরা সকলেই গুরুকে ত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছিল। গুরুর মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে তিনি তাহাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই—"আমার ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই, ধন্য দয়াময়; এই সকল অশান্তি নিশ্চয়ই শান্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। তুমি বলিয়াছ ইহার অন্ত নাই। কোন্ জিনিষেরই বা অন্ত আছে? আমাদের ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না—ইহার জন্য উপযুক্তরূপে দয়াময়কে ধন্যবাদ দিতেও আমরা অক্ষম। ইহার শেষ, সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন, ইহা হইতে সুখের কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তাঁহার বিধানের পরে মানুষ কি করিয়া হস্তক্ষেপ করিবে? তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইবে; শক্তি বল, ক্ষমতা বল সবই তাঁহার। ভাই, মরিতেই হইবে, সকলকেই মরিতে হইবে। যদি সর্ব্বশক্তিমান মহিমময় ঈশ্বরের এই ইচ্ছা হয় যে আমাকে তিনি পৃথিবী হইতে লইয়া যাইবেন তবে তাহাই হউক—তিনিই আমার বংশের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন এবং তুমি তাঁহার ইচ্ছা সংসারে কার্য্যে পরিণত করিবে। ঈশ্বর যাহাতে সন্তুষ্ট হন এইরূপ কার্য্য সর্ব্বদা করিবে, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি যদি জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকি তবে তাহা মার্জ্জনা করিও, সকলকে বলিও তাঁহারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমাকে তোমরা তাঁহাতেই সমর্পণ কর। এখন আমি তাঁহারই হইলাম, তাঁহাকে প্রভুরূপে পাইলে কত আনন্দ!"

৯ই জুলাই; রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে প্রভাতের আলোক আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিল। কয়েদীদিগকে বাহির করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত তাব্রিজ সহর চঞ্চল হইয়া উঠিল; অবশেষে যখন ঘাতকেরা তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল তখন সমস্ত রাস্তা এবং গলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কেহ এই আশা করিয়া আসিল যে হয় ত কোন উপায়ে ইহারা বাঁচিয়াও যাইতে পারে; কেহ বা এই প্রসিদ্ধ মহাত্মাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারা সকলে ইঁহার পাণ্ডুর শান্ত মুখখানি, শীর্ণ হস্ত এবং বিরল শুভ্র বেশ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল; অন্য সমস্ত নৃশংস লোকেরা পুরো-

হিতের আদেশ অনুসারে তাঁহাদের গায়ে পাথর, ঢিল, কাদা ছুড়িতে লাগিল এবং কোনটি ঠিক লাগিবামাত্র উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ইঁহাদিগকে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরান হইল; অবশেষে সৈয়দ হসেন আর সহ্য করিতে পারিলেন না; ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া এইরূপে আর কতক্ষণ মানুষে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে? তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ঘাতকেরা তাঁহাকে টানিয়া ধরিয়া তুলিয়া বলিল 'এখনও বাঁচিতে চাও ত গুরুর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ কর।' সৈয়দ হসেন তাহাই করিলেন। মুসলমানেরা বলে যে তিনি শারীরিক যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়াই এইরূপ করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল; বাবীরা বলেন যে জগতে বাবীধর্ম্ম যাহাতে প্রচার হয় এইজন্য স্বয়ং গুরুই তাঁহাকে এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। লোকের ভিড় কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই তিনি টেহেরান্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার স্বধর্ম্মীরা হয় তিনি গুরুর আদেশে এইরূপ করিয়াছেন ইহাই বিশ্বাস করিয়া কিংবা তাঁহার আন্তরিক অনুতপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কথা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তাহা দুই বৎসর পর যখন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবার আহ্বান তাঁহার নিকট আবার পৌঁছিল তখন তিনি সপ্রমাণ করিলেন। সৈয়দ হসেনকে সহজেই হাত করা গেল দেখিয়া শত্রুরা আকা মহম্মদ আলিকেও সেই উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টা করিল। তাঁহার স্ত্রী পুত্রদিগকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল, ভাবিল তাহাদের বিলাপ এবং অনুরোধে যদি কিছু কাজ হয়। ইহাতেও কিছু ফল হইল না, তিনি এইমাত্র বলিলেন যেন তাঁহার গুরুর পূর্ব্বেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া সৈনিকেরা আর মিথ্যা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের দুইজনকে নগর-দুর্গের মধ্যস্থিত বাঁধানো একটি রাস্তায় লইয়া গিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া প্রাচীরের উপর ঝুলাইয়া দিল। বন্দুকধারীরা যখন সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল তখন আকা মহম্মদ আলি গুরুকে বলিলেন প্রভু, আমাকে লইয়াই কি আপনি সন্তুষ্ট থাকিবেন?' তাহাতে গুরু উত্তর করিলেন, 'নিশ্চয়ই, মহম্মদ আলিও আমাদের সহিত স্বর্গে বাস করিবে।' এই কথা শেষ হইবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল এবং ধূম অপসারিত হইবার পর দুইটি লম্বমান মৃতদেহ সকলের নয়নগোচর হইল এবং উপস্থিত লোকেরা ভয়ে, বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। শিষ্যের মৃতদেহ প্রাচীরের উপর দুলিতে লাগিল, কিন্তু বাবের দেহের কোন চিহ্ন প্রথমে কেহই দেখিতে পাইল না। সকলেই ভাবিল ইহা নিশ্চয়ই একটা দৈব ঘটনা এবং পাছে যে লোককে তাহারা ইতিপূর্ব্বেই অপমান করিয়াছে এবং ঢেলা মারিয়াছে তাহাকেই মহৎ-লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া বসে এই চিন্তায় সৈনিকেরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাস্তবিক যদি এই ঘটনা সত্য হইত তবে বাবীধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্মকে দেশছাড়া করিত এ বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই এবং রাজার রাজাসন এবং ইস্লামধর্ম্মের আসন টলমল্ করিয়া উঠিত কিন্তু তাহা হইল না। বাবের বন্ধনরজ্জুতে একটা গুলি লাগিয়া বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল; একজন সৈনিক ইহা দেখিবামাত্র তরবারীর এক কোপে হত্যাকার্য্য সমাধা করিল। যখন শোণিতের ধারা সকলের নয়নগোচর হইল তখন সকলে আশ্বস্ত হইয়া শেষ কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হইল। দুইটি মৃতদেহ টানিয়া লইয়া গিয়া বড় দরজার বাহিরে শৃগাল কুক্কুরের উদরপূর্ত্তির জন্য নিক্ষেপ করা হইল। কিন্তু রাত্রে সুলেমান খাঁ এক হস্তে তরবারী আর এক হস্তে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্বারীকে বলিলেন 'দুইটার মধ্যে কোন্‌টা চাও?' দ্বারী আর কথাটি না বলিয়া মৃতদেহ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল; তিনি তাহা রেশমে আবৃত করিয়া শব-সিন্দুকে বন্ধ করিয়া লুকাইয়া টেহেরানে লইয়া গেলেন।

বাব ছয় বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন 'যে দিন আমি প্রকাশ হইয়া পড়িলাম সেই দিন হইতে সুখও আমাকে ত্যাগ করিয়াছে।' এইখানেই শেষ হইল না। যে দিন বাব মৃত্যুকে বরণ করিলেন সেই দিনই নিজির সহরে বিদ্রোহ এবং তাহার কয়েক সপ্তাহ পর জানসানের লড়াইয়ে রক্তের নদী বহিয়া গেল। এই দুই ঘটনার মাঝামাঝি সময়ে রাজমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মিথ্যা অপরাধে সাত জন বাবীকে হত্যা করা হইল। তখনকার পারস্যের ইংরাজ-দূতের স্ত্রী লেডি শীলের দৈনিক লিপি হইতে জানা যায় যে, সমস্ত লোকই ইঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল, এবং ইহারা যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে হাজি সৈয়দ আলি নামে একজন ছিলেন, ইনি বাবের খুল্লতাত এবং তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে ইনিই উঁহার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। হাজি সৈয়দ আলিকে যখন ঘাতক মারিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময়ে তিনি আদেশপত্র পাইলেন যে ঐ ধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করা হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। এবং সাতজন নির্ভীক চিত্তে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ইহাদের মধ্যে কুরবান আলি নামে একজন,

দরবেশও ছিলেন। ঘাতকের প্রথম আঘাতে ইঁহার ঘাড়ে সামান্য আঘাত লাগিল এবং তাঁহার শিরস্ত্রাণ মাটিতে খসিয়া পড়িয়া গেল; দ্বিতীয় আঘাতের পূর্ব্বে তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

শির কিংবা শিরস্ত্রাণ কি পড়িল বন্ধু পদতলে—
ভেদ নাহি করে জ্ঞান প্রেমিক না জানি কোন্ বলে!

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা। *

সুফীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে সুফীমতের বীজ আদমের সময়েই রোপিত হইয়াছে এবং নোহার সময় ইহা অঙ্কুরিত, ইব্রাহিমের সময় পল্লবিত, মূসার সময় বর্দ্ধিত ও খৃষ্টের সময় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদের সময় ইহা বিশুদ্ধ মদিরা উৎপন্ন করিয়াছে। এই মদিরা যে কেহ ভালবাসে সে ইহা এত অধিক পরিমাণে পান করে যে আত্মশূন্য হইয়া যায়। সে ঘোষণা করে যে "আমি ধন্য— আমা অপেক্ষা মহত্তর আর কে আছে? আমিই সত্য, আমি ব্যতীত অন্য আর কোন ঈশ্বর নাই।" প্রাচীনতম সুফীদের মধ্যে রাবিয়া নাম্নী একজন স্ত্রীলোকের কথা ইবন খাল্লিকান উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাত্রিকালে বাড়ীর ছাদে যাইতেন ও বলিতেন "হে ঈশ্বর দিবসের কোলাহল শান্ত হইয়াছে, প্রেমিক আপন প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে, আমার প্রেমিক তুমিই, এবং একাকী তোমার সহিত মিলনেই আমার আনন্দ।" সুফীরা বিশ্বাস করে:—

দিব্য আত্মার কণাংশস্বরূপ এই জীবাত্মাসমূহ পরিমাণে তাঁহার অপেক্ষা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহার সহিত অভিন্ন, এবং পরিণামে তাঁহাতেই তাহারা বিলীন হইবে; ঈশ্বরের আবির্ভাব বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বকর্ম্মে ও বিশ্ববস্তুতে ইহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান; একমাত্র তিনিই পরিপূর্ণ দয়া, পরিপূর্ণ সত্য ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য; তাঁহার প্রতি প্রেমই সত্য প্রেম (ইস্ক-ই-হকীকি) অন্যান্য বস্তুর প্রতি প্রেম মায়াময় প্রেম (ইস্ক-ই-মজাজী); দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এই দিব্য সৌন্দর্য্যেরই ক্ষীণ আভাস মাত্র; এই পরম দয়া অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আনন্দ বিতরণে নিযুক্ত আছেন। স্রষ্টার সহিত জীবাত্মারা যে "আদিম অঙ্গীকারে" আবদ্ধ আছে তাহাই পালন করিয়া জীব এই আনন্দলাভে সমর্থ হয়; একমাত্র চিৎপদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুরই বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সত্তা নাই; জড় বস্তু সকল এই চিরন্তন চিত্রকরের দ্বারা আমাদের চিত্তপটে নিরন্তর প্রতিফলিত সুশোভন চিত্র মাত্র; এই সকল ছায়ার প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য; তিনিই সত্যরূপে আমাদের মধ্যে এবং আমরাও তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান; আমাদের প্রিয়তম হইতে এই বিচ্ছেদের অবস্থাতেও দিব্য সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও সেই আদিম অঙ্গীকারের স্মৃতি চিত্তের মধ্যে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য; সুমিষ্ট সঙ্গীত, মৃদু বায়ু ও সুগন্ধ পুষ্পসকল আমাদের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিকে ও সেই আদিম ভাবকে নিত্য নূতন করিয়া তুলিতেছে এবং সুকোমল অনুরাগে আমাদিগকে দ্রবীভূত করিতেছে; এই অনুরক্তিকে পোষণ করা ও অসৎ পদার্থ হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করিয়া সেই সার সত্তার সন্নিকট হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য যাঁহার সহিত চরম মিলনেই আমাদের ভূমানন্দ।

আধুনিক সুফীরা কোরাণে বিশ্বাস করে এবং যে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে অনাদি অনন্তকালের দিনে (অলস্ত-দিনে) যে অঙ্গীকারবাণী ঘোষিত হইয়াছে সেই অঙ্গীকারেও তাহারা বিশ্বাস করে।

সুফীমতে চারিটি অবস্থার কথা আছে। এই চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে মনুষ্য শারীরিক আবরণ হইতে মুক্ত হয়। তখন সেই মুক্ত আত্মা সেই মহামহিম সার সত্তার সহিত যোগযুক্ত হয় যে সত্তার সহিত সে কেবলমাত্র পৃথক হইয়াছিল কিন্তু বিভক্ত হয় নাই:

১। (সরিয়ৎ)

এই অবস্থায় মুরিদ (শিষ্য) ইস্লামধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল পালন করে; তাহার শেখকে (গুরু) সর্ব্বদা স্মরণ করে; ধ্যানের দ্বারা গুরুতে তন্ময়ীভূত হয়; মন্দ চিন্তা সকল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শেখকে (গুরু) বর্ম্ম-স্বরূপে ব্যবহার করে এবং শেখের আত্মাকে তাহার আত্মার রক্ষক বলিয়া গণ্য করে। ইহাই শেখেতে (গুরুতে) তন্ময়তা।

২। (তরিকৎ)

এই অবস্থায় মুরিদ শক্তিলাভ করে; সুফীমতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান পরিত্যাগ

---

* সুফীধর্ম্মের সমস্ত বিধি-বিধান, ইহার সাধনাপদ্ধতি আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীসম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত গুরু মহম্মদ্-ই-সরবর্দ্দি অবারিফুল মআরিফ নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ইংরাজি অনুবাদ হইতে আমরা সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ আমাদের দেশের প্রচলিত সাধনপদ্ধতির সহিত অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন। এ সম্বন্ধে সুফীদের সহিত ভারতের ভক্তদের যে আদানপ্রদান ছিল তাহা ঐতিহাসিকদের আলোচ্য।

সম্পাদক।

করে, বাহ্য পূজা আভ্যন্তর পূজায় পরিণত হয়। যে মহাপুণ্য, সাধুতা ও ধৈর্য্য মানবাত্মার মাহাত্ম্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহার সাহায্য ব্যতীত মনুষ্য এই অবস্থা লাভকরিতে সক্ষম হয় না।

শেখ তখন মুরিদকে পীরের (ধর্ম্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তা প্রাচীন গুরু) প্রভাবাধীন করে। মুরিদ তখন সর্ব্ববস্তুতে পীরকেই দেখিতে থাকে। ইহাই পীরে তন্ময়তা।

৩। (মরীফৎ)

এই অবস্থায় মুরিদ অপার্থিব জ্ঞান লাভ করে এবং দেবদূতগণের সমকক্ষ হয়।

ক্রমে শেখের দ্বারা মুরিদ মহম্মদের সমীপে নীত হয় এবং সর্ব্ব বস্তুতে মহম্মদকেই দেখে। ইহাই মহম্মদে তন্ময়তা।

৪। (সত্য) হকীকৎ।

এই অবস্থায় মুরিদ সত্যের সহিত যুক্ত হয় এবং সর্ব্ব বস্তুতে সত্যরূপকেই দেখে। ইহাই ঈশ্বরে তন্ময়তা।

সুফীরা অসংখ্য শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে দুইটি মূল শাখা :—

১। (হালুলিয়া) দেবানুপ্রাণিত। এই শাখা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এবং দিব্য আত্মা তাঁহার ভক্তমাত্রেরই মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

২। (ইত্তিহাদিয়া) অভেদ-মিলনবাদী। এই শাখা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর জ্ঞানীমাত্রের সহিত যুক্ত আছেন; তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় এবং জীবাত্মা দাহোন্মুখ অঙ্গার সদৃশ এবং আত্মা ঈশ্বরের যোগে ঈশ্বর হইয়া উঠে।

সুফীদের মধ্যে কবিরাই বিশেষ বিখ্যাত। সুমিষ্টতম ছন্দে জেলালুদ্দিন রুমী বলেন সমস্ত প্রকৃতি দিব্যপ্রেমে এমনই পরিপূর্ণ যে তাহার তরুলতাও কামনার পরম সামগ্রীকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। নুরুদ্দীন আবদুর রহমনী জামীর রচনার প্রতি পংক্তিতে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

গুলিস্তান, বুস্তানা সাদি ও দেওয়ানা হাফেজের রচনা-সমূহকে সুফীদিগের শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। সুফীদের মধ্যে কেহ কেহ অমঙ্গলকে অস্বীকার করিয়া বলেন :—"ঈশ্বর হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে তাহা সমস্তই মঙ্গল।" তাঁহারা ঘোষণা করেন :—"আমাদের যিনি ভাগ্যলেখক তিনি একজন সুন্দর রচয়িতা, যাহা কিছু মন্দ তাহা তিনি কখনো লেখেন না।"

জগতের সকল বস্তুকেই তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার প্রতিরূপ বলিয়া গণ্য করেন। সুন্দর মুখের আরক্ত কপোলে তাঁহারা ঈশ্বরেরই সৌন্দর্য্য দেখেন, এমন কি, ফিরৌণের ধর্ম্মবিদ্রোহিতায় তাঁহারা ঈশ্বরেরই শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। সাহল ইবন আবদুল্লা গুস্তরি বলেন :—আত্মার নিগূঢ় রহস্য তখনই প্রকাশ পাইয়াছিল যখন ফিরৌন স্বয়ং আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। জেলালুদ্দিন তাঁহার রচনায় গুপ্তহন্তা দ্বারা আহত আলি নামক একজন সুফীর দ্বারা বলাইতেছেন :—যদিও আমিই এই ভূখণ্ডের প্রভু তথাপি আমার এই শরীরের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। তুমি আমাকে আঘাত কর নাই, তুমি কেবল ঈশ্বরের একটি যন্ত্রস্বরূপ। ঈশ্বরের কার্য্যের প্রতিশোধ কে লইতে পারে? দুঃখিত হইও না কারণ মৃত্যুর পরে কল্যই (বিচারের দিনে) আমিই তোমার হইয়া মধ্যস্থতা করিব।

গুরু সম্বন্ধে সুফীরা বলেন :—মুর্সিদ-ই-কামিল ব কমাল (উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট গুরু) দুর্লভ। যদি বা তাঁহারা জীবিত থাকেন তথাপি তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য।

যে পূর্ণ সে ব্যতীত কে পরিপূর্ণতার সন্ধান পাইবে?

জহুরী ব্যতীত কে জহরতের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে পারিবে?

অনেকেই এইজন্য পথভ্রষ্ট হইয়া ভ্রমে পতিত হয়। অনেকেই বাহ্যদৃশ্যে প্রতারিত হয় এবং পরিপূর্ণতাবোধে অপূর্ণতার অনুসরণ করিয়া জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। ভিতরকার মানুষটিকে কিরূপে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে সে সম্বন্ধে মুর্শিদ (গুরু) মুরিদকে এইরূপ উপদেশ দেন :—

অন্তঃকরণকে পবিত্র করিতে হইবে, জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে হইবে ও আত্মাকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। পরে মুর্শিদ বলিতেছেন :—মুরিদের (শিষ্য) ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; তাহার নীচ গুণসকল প্রশংসনীয় গুণে পরিণত হইবে; সে আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশের এবং সিদ্ধিলাভের বিভিন্ন অবস্থাগুলি বুঝিবে ও অবশেষে ঈশ্বর দর্শনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উত্তীর্ণ হইবে।

উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট গুরু না হইলে মুরিদের (শিষ্য) কেবল অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং পরিণামে হয় সে একজন ভণ্ড হইয়া দাঁড়ায় নয় সে, সকল সুফীকে তাহার গুরুরই মত জানিয়া সুফীমাত্রকেই নিন্দা করিতে থাকে। সে তখন যাহা কিছু পড়িয়াছে ও শুনিয়াছে সমস্তকেই সন্দেহ করিয়া নাস্তিকতার মধ্যেই সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করে এবং যে সকল সাধুব্যক্তি হকীকৎ (সত্য) লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাসকে অমূলক কাহিনী বলিয়া জ্ঞান করে।

সুফী বাহ্য আকার অনুষ্ঠান সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। তাহাদের মত এই যে মনুষ্য যেরূপে বিচার করে ঈশ্বর সেরূপে বিচার করেন না; তিনি অন্তঃ

করণের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। জেলালুদ্দিন রুমী বলেন:—"প্রেমিক যদি বা ভাল মন্দের দ্বারা মলিন হইয়া উঠে, তথাপি তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিবে। সুফী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্রসাধন, বাধ্যতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মের জন্য পরিবার, প্রতিপত্তি ও ধন সম্পদ পরিহারের যে অনুশাসন শাস্ত্রে আছে তাহা পালন করে। ঈশ্বর ব্যতীত আর সমস্তকেই সুফী অস্বীকার করে, এবং এই অসৎ সংসারকে ঈশ্বরের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ জানিয়া ইহার জন্য সে জীবন সমর্পণ করে।

স্বর্গ নরক ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বাহ্যমতগুলি সুফীর কাছে রূপক মাত্র, তাহার গূঢ় মর্ম্ম যে কি তাহা সেই জানে।

আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ঈশ্বরে যুক্ত হইবার জন্য সুফী ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার একত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকে।

এই একাত্মক মিলন, ফৈজুল্লা (ঈশ্বরের অনুগ্রহ) ব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারে না তবে যে-কেহ অনবরত তাঁহাকে প্রার্থনা করে তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন না।

মনুষ্যের মধ্যে যে সত্তার স্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে তাহা অনন্ত সত্তার সহিত অভিন্ন, কিন্তু মনুষ্য যতক্ষণ সত্যে অসত্যে জড়িত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ সে অসত্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া সত্য হইতে পৃথক হইয়া থাকে এবং এই পার্থক্য হইতেই অমঙ্গলের উৎপত্তি।

এইরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে বিধি নিষেধ ও শাস্ত্রমতের প্রয়োজন হয়।

দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মনুষ্য অহংসমেত সমস্ত সংসারকে মিথ্যা মায়া সুতরাং অমঙ্গল বলিয়া জানে।

এই অসত্যকে অপসারিত করিয়া অহংকে বিলুপ্ত করা এবং সত্য স্বরূপের সহিত যোগযুক্ত হইবার চেষ্টা করাই মানুষের সত্য সাধনা।

অহংকে অস্বীকার করাই সত্যপথ। এইরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি ক্রিয়া করিবার অবকাশ পায়। তখনি ঈশ্বরের জ্যোতি ও প্রসন্নতা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যকে সত্যে আকর্ষণ করে ও একের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। *

শ্রীহেমলতা দেবী।

* এবারকার সঙ্কলনে যে অংশ প্রকাশিত হইল তাহা ইংরেজ অনুবাদকের রচিত ভূমিকা হইতে গৃহীত।

টল্‌ষ্টয়ের শেষবাণী।

(ধর্ম্ম ও দর্শন)

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণার মূল কথাটা এই যে, যাহা কিছু সমস্তেরই গোড়াতে এমন একটা কিছু আছে যাহা অনির্ব্বচনীয়; ইহাই আত্মা এবং পরমাত্মা। এই কথাটা সর্ব্বপ্রথমেই এমন একান্ত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই তাহাকে কিছুতেই সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেবল এই বলা যায় যে, ইহা আছে, "অস্তীতি;" ইহাই সমস্তের মূল এবং এই মূলকে আশ্রয় করিয়া আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই। মানুষের ধর্ম্মবোধ মানুষের সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ের মধ্য হইতে যেটুকু অনির্ব্বচনীয় তাহাই গ্রহণ করে এবং বলে "আমি জানি না।" মানুষকে যাহা জানিতে দেওয়া হয় নাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের এই ভাবটি রক্ষা করাই সত্য জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। জরথুস্ত্র, বুদ্ধ, লা-ওট্‌জে, খৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণরা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার এই তাৎপর্য্য।

ধর্ম্মের কথা ত এই গেল, আর দর্শনের কথাটা কি? দর্শন বাহ্যব্যাপারের জ্ঞানের সঙ্গে আত্মাপরমাত্মার জ্ঞানকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে চায় না—সে মনে করে রাসায়নিক যোগ বিয়োগ এবং নিজের চৈতন্য, জ্যোতিষ্কের গতিবিধি এবং প্রাণশক্তির উৎপত্তির মূল, সমস্তকেই মনে করে একই প্রকারে যুক্তি ও বাক্যের দ্বারা সংজ্ঞার শিকলে বাঁধা যাইতে পারে। এইরূপে যাহা জানা যায় না এবং যাহা জানা যায়, দুইয়ের খিচুড়ি পাকাইয়া অনিরুক্তকে নিরুক্ত করিবার বৃথা চেষ্টায় পরস্পরবিরুদ্ধ অদ্ভুত মতবাদকে রাশীকৃত করা হইতেছে। অ্যারিস্টট্‌ল্, প্লেটো, লাইব্‌নিজ্, লক্‌স্, হেগেল, স্পেন্সর এবং অন্যান্য নানা লোকেরই শিক্ষাদানের পদ্ধতি এইরূপ।

একজন পৌত্তলিকও একথা স্বীকার করে যে অস্তিত্বমাত্রের গোড়াতে একটা কিছু ব্যাখ্যার অতীত পদার্থ আছে এবং সেই ধারণাকে একটা কোন আকার দিয়া সে পূজা করে। তাহার সে ধারণা ভুল হইতে পারে কিন্তু তবু যে দার্শনিক সমস্ত জ্ঞানের মূলে অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকার করেন না তাঁহার অপেক্ষা ঐ পৌত্তলিকের ধারণা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ পৌত্তলিক এ কথা স্বীকার করে যে অনির্ব্বচনীয় একটা কিছু আছে এবং তাহাই সমস্ত অস্তিত্বের মূল কারণ; ভাল হউক্ মন্দ হউক সেই অনির্ব্বচনীয় সত্তার ভিত্তির উপরেই তাহার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা সে গড়িয়া তোলে; সে এই অনির্ব্বচনীয় মূল কারণের

নিকট নতি স্বীকার করে এবং জীবনপথে তাহারই দ্বারা পরিচালিত হয়। এ দিকে দার্শনিক :করে কি? যাহা অন্য সমস্তকে নির্ব্বচন করে সেই অনির্ব্বচনীয়কে সে নির্ব্বচন করিতে বসে—অর্থাৎ কি না যে অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেই অগ্নিকে কাষ্ঠের দ্বারা দগ্ধ করিতে যায়; ফলে এই হয় যে তাহার জীবনের বোধ কোন একটা দৃঢ় ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত হয় না এবং তাহাকে জীবনপথে পরিচালিত করিবার কেহ থাকে না।

এইরূপ না হইয়া যায় না। কেননা কার্য্যকারণের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করাই জ্ঞানের কাজ। কারণ-পর্য্যায়ের অন্ত নাই; এই অনন্ত পর্য্যায় হইতে বিশেষ-ভাবে কেবল গুটিকয়েককে বাছিয়া লইয়া তাহারই উপরে বিশ্ববোধের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা চলে না। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তির মূল কারণগুলি যে যান্ত্রিক জড়কারণ তাহা সন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, কেবলমাত্র চৈতন্যের আদি কারণটার এখনো কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ তিনি বলিতে চান "সমস্ত যন্ত্রটাকে আমরা দিব্য বুঝিয়া লইয়াছি কিন্তু কে সে যন্ত্র চালায় এবং কি করিয়া চালায় তাহা কিছুই জানি না।" ভারি আশ্চর্য্য! কেবলমাত্র চৈতন্যটাকেই যন্ত্রের নিয়মের মধ্যে ধরিতে পারা যায় নাই! (এই "কেবল মাত্রটি"র বাহার আছে!) চৈতন্যটার আজও কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না—অধ্যাপক মহাশয় বোধ করি আশা করিয়া বসিয়া আছেন কোনো একদিন বর্লিনের কোন এক মহাপণ্ডিত বা ফ্রাঙ্কফোর্টের কোন এক জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য চৈতন্যের কারণটিকে অর্থাৎ মানবাত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মাকে যান্ত্রিক কারণরূপে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে। যে বুড়ি চাষার মেয়ে স্বর্গের রাণী কল্যান্ দেবীকে মানে সেও কি :এই অধ্যাপকটির চেয়ে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ নহে?

এখন এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর যখন নির্ভর করা যায় না তখন বিশ্বের ধারণার ভিত্তিটাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? ভিতর-দিয়া ছাড়া কি জ্ঞানলাভের অন্য পন্থা নাই? ইহার উত্তর স্পষ্টই পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা এই যে, প্রত্যেক মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যে এমন একটি জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করে যাহা যুক্তিবিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কার্য্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলের সহিত যুক্ত নহে। এই জ্ঞানই তাহার আত্মবোধ।

মানুষ নিজের মধ্যে যখন এই বোধকে আবিষ্কার করে তখন সে তাহাকে চৈতন্য নামে অভিহিত করে, কিন্তু যখন সে এই বোধকে, এই সর্ব্বমানবের মধ্যে অধিশ্রিত বোধকে, ধর্ম্মশিক্ষার ভিতর দিয়া, যুক্তিতর্কের অতীতরূপে অনুভব করে তখনই সে তাহাকে বিশ্বাস নামে অভিহিত করে। সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক ধর্ম্মবিশ্বাসই এই শ্রেণীর। কোনো ধর্ম্মমত যতই অদ্ভুত এবং বিকৃত হউক না কেন তথাপি তাহা জ্ঞানের এমন একটি ভিত্তিকে নির্দ্দেশ করে যদ্দ্বারা মানুষ জীবনের সত্যধারণা লাভ করিতে পারে—যে সত্য কার্য্য-কারণ-পরম্পরার অতীত।

এদিকে বড় বড় পণ্ডিত দার্শনিকেরা জ্ঞানকে কার্য্য-কারণের অন্তহীন শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া জানিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের ধর্ম্মগত আশ্রয়কে স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না, সুতরাং তাঁহারা এমন একটি কারণের কারণকে খুঁজিয়া মরিতেছেন যাহা অসম্ভব এবং কাল্পনিক। ধর্ম্মাত্মা যিনি তিনি এই কারণের কারণকে জানেন এবং তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। সেই জন্যই জীবনসম্বন্ধে তাঁহার একটি ধ্রুব জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং কর্ম্মের পথে চলিবারও অক্ষুণ্ণ নীতি তিনি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি।

দীনদুঃখী কুম্ভকার যখন বসিয়া বসিয়া সকলের নিত্য-প্রয়োজনীয় ঘটকলস প্রস্তুতকর্ম্মে ধ্যানমগ্ন তখন অতুলনীয় রূপসী এক তরুণী আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওগো কুম্ভকার আমার মূর্ত্তি তুমি গড়িয়া দিবে? আমার কিন্তু কিছুই দিবার সাধ্য নাই; যদি খুসী হয়, তবেই আমার মূর্ত্তি গড়িতে পার।"

কুম্ভকার সেই ভুবনমনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত। কি এই রূপ!

সে কহিল, "সুন্দরী, এমন রূপ তো আমি আঁকিতে শিখি নাই। আমার গুরু এমন রূপ গড়িতে ও আঁকিতে জানিতেন না।"

তরুণী কহিলেন, "ইহার গুরু হয় না। আমার রূপই তোমার গুরু হইবে। তুমি চাহিয়া থাক, দেখিবে তোমার সকল তনু মন প্রাণ আমার রূপে শিল্পশক্তিতে ভরিয়া উঠিবে।"

কুম্ভকার বড় আনন্দে বলিল, "আচ্ছা।"

তখন তাহার চিন্তা হইল সুন্দরীকে বসিতে দেয় কোথায়। অগত্যা তাঁহাকে ঘটকলসের মাচার উপরই বসাইল। মাচা উজ্জ্বল ও সার্থক হইয়া গেল।

কি দুই খানি রক্তকোমল চরণতল তাঁর! কি রূপ! কি প্রভা! কুম্ভকার বড় আনন্দে গড়িতে লাগিল। কি

মুখ! কি চোখ! কি ভুরু! কি অলকাবলী! কুম্ভকার বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহার আঙুল বাহিয়া তাহার অন্তরের বিস্ময় মূর্ত্তি হইয়া গড়িয়া ওঠে!

আঁকিতে আঁকিতে সব শেষ হইয়া আসিল। কেবল চরণের নূপুরটুকু মাত্র আঁকা বাকী। হাতের শঙ্খ পায়ের নূপুর ছাড়া আর তো কোনো অলঙ্কার তাঁর ছিল না—আর ছিল তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি অরুণ পদ্ম।

শঙ্খ শেষ করিয়া কুম্ভকার যখন নূপুর আঁকিবে, তখন হঠাৎ দেখিল যে তাঁহার বামহস্ততলে এক প্রচ্ছন্ন ঝাঁপি। সে ঝাঁপিটি তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

তখন হঠাৎ কুম্ভকার কহিল, "ওগো সুন্দরী, ওটা কি? ওটাও কি আঁকিতে হইবে?"

তখন তিনি অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, "কিছু না, কিছু না; তুমি আঁক, আমার নূপুর আঁক; আমার মূর্ত্তিটি দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল রহিয়াছে।"

কুম্ভকার অমনি মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে নূপুর আঁকিতে লাগিয়া গেল।

* * * *

এমন সময়ে হঠাৎ সেই ঘরে পণ্ডিত আসিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "ওরে হতভাগা, এ কার মূর্ত্তি আঁকিস্।"

কুম্ভকার কহিতে গেল, "ওই যে ওঁর—"

কিন্তু চাহিয়া দেখে আর তো তিনি নাই। কুম্ভকারের হৃদয় তখন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

তখন পণ্ডিত চিৎকার করিয়া বলিলেন, "এ যে আমাদের শাস্ত্রের লক্ষ্মী, মন্দিরের রমা! ওরে মূঢ়, তুই করিয়াছিস্ কি? তুই তাঁহাকে কি ঘোর অপমানই করিলি!"

কুম্ভকার যেন বজ্রাহত হইল। ভয়ে তাহার হাতের সূত্র কাজের কাঠী গেল পড়িয়া।

* * * *

এমন সময় পুরোহিত আসিয়া চীৎকার করিয়া বজ্রের মত স্বরে কহিল, "তোর ঘরে এ কি মূর্ত্তি! কাঠের মঞ্চে যে বসাইয়াছিস্ লক্ষ্মীর প্রতিমা।" তখন সে ক্রোধে এক আঘাতে মূর্ত্তি করিল চূর্ণ বিচূর্ণ।

কুম্ভকার মাটিতে পড়িয়া গেল।

* * * *

ঝড় যখন থামিয়া গেল, তখন কুম্ভকার তাহার দীন কুটীরের বাহিরে আসিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সমস্ত আকাশ পৃথিবী ভরিয়া সেই সুন্দরীর রূপ! তখন কাতর হৃদয়ে জোড়হাতে সে কহিল, "আগে বুঝি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, হে সুন্দরী, তোমার মাটির মূর্ত্তি যে চূর্ণ হইয়াছে সে ভালই হইয়াছে। ওগো সুন্দরী, যখন পণ্ডিত তোমাকে দেবী বলিয়া ধরাইয়া দিল তখন আর তোমার মূর্ত্তি আমার ঘরে থাকা ভাল হইত না। তখন পুরোহিতের হাতের যষ্টিই আমার ঘরের মাটির মূর্ত্তি খানি চূর্ণ করিয়া তোমার ভুবনভরা রূপখানিকে জলে স্থলে আকাশে মুক্তি দিল।

"এখন যে সমস্ত আকাশ ভরিয়া তুমি দেখা দিয়াছ, ইহাতে আর তো কোনো ভয় নাই। এই যে তোমার আপন ঘরে তোমাকে এখন দেখিলাম, এখানে আর কোনো ভয় নাই। তোমার জীবন্ত বিরাট ঘরে কিছুই তো পচিয়া ওঠে না, কিছুই তো বদ্ধ রহে না।

"ধন্য আমি যে রূপ হইয়া দেখা দিয়াছিলে আমার ঘরে, আর তোমার আপন ঘরে দেখা দিলে অপরূপ হইয়া!"*

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

প্রজ্ঞা।†

ঈশ্বরের ভক্ত দাসদিগের অন্তঃকরণে মহাপুরুষদের দিব্যবাণীর আলোকই প্রজ্ঞা—এই প্রজ্ঞার দ্বারা ভক্ত ঈশ্বরের অভিমুখে, ঈশ্বরের কার্য্যের অভিমুখে ও ঈশ্বরের বিধানের অভিমুখে পথ দেখিতে পান্।

প্রজ্ঞা মনুষ্যের একটি বিশেষ পরিচয়; ইহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়বোধ ও সাধারণ বিচারবুদ্ধি (আক্‌ল্) হইতে স্বতন্ত্র।

বুদ্ধি (আক্‌ল) একটি স্বাভাবিক আলোক; ইহার দ্বারা আমরা ভাল মন্দের ভেদ বুঝিতে পারি।

যে আক্‌ল্ এই পৃথিবীর ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে তাহা বিধর্ম্মী ও ধর্ম্মবিশ্বাসী উভয়েরই আছে। যে আক্‌ল্ পরলোক সম্বন্ধে আমাদের ভালমন্দবিচার উদ্বোধিত করে তাহা কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসীরই আছে।

প্রজ্ঞা বিশেষ ভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠেরই সামগ্রী। প্রজ্ঞা এবং (আক্‌ল্) বুদ্ধি পরস্পরের পক্ষে আবশ্যক।

প্রজ্ঞাদৃষ্টি ধর্ম্মপথে চলিবার আলোকে সমুজ্জ্বল এবং সদাচারের কজ্জলে সজ্জিত।

প্রজ্ঞা পদার্থটি মূলে অখণ্ড কিন্তু ইহাকে দুইরূপে দেখা যায়:—ইহার একটি ভাব সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাহাই ধর্ম্মপথের চালক ও ভক্তদের বিশেষ সম্পদ। অপরটি সৃষ্ট জীবদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাহা আমাদের জীবনযাত্রায় সহায়।

যাঁহারা ভক্ত এবং যাঁহারা ঈশ্বরলাভ ও পার-

---

* জ্ঞানদাস বয়েলীর চিত্রাবলী হইতে।

† এবারকার সঙ্কলনে যে অংশ প্রকাশিত হইল তাহা ইংরেজ অনুবাদকের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

লৌকিক সম্পত্তি কামনা করেন তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন হইয়া থাকে।

তাঁহাদের ব্যবহার বুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধির যখন ঐক্য হয় তখনই তাঁহারা ব্যাবহারিক বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন, ইহাদের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে ব্যাবহারিক বুদ্ধিকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন ও তাহার প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ করেন না। এই কারণে সাংসারিক লোকেরা ঈশ্বরভক্তদের প্রতি বুদ্ধিহীনতার অপবাদ আরোপ করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে তাহাদের বুদ্ধির বাহিরেও অন্য বুদ্ধি আছে।

প্রজ্ঞা তিন শ্রেণীর :—

১। (ইল্‌ম্—ই-তৌহিদ) ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান।

২। (ইল্‌ম্—ই মরিফৎ) ঈশ্বরের কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান—অর্থাৎ প্রলয়, সৃষ্টি, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও দূরত্ব, প্রাণদান করা ও বিনাশ করা, বিচ্ছিন্ন করা ও একত্র করা, পুরস্কার দেওয়া, দণ্ড দেওয়া এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান।

৩। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান।

এই তিন পথের প্রত্যেকটির যাত্রী স্বতন্ত্র।

(ক) প্রথম পথটি ঈশ্বরবিদ্‌দিগের, অন্য দুই পথের জ্ঞান নির্ব্বিরোধে তাঁহাদের জ্ঞানের অন্তর্গত।

(খ) দ্বিতীয় পথটি পরলোকবিদ্‌দিগের, শাস্ত্রীয় আচারের জ্ঞান অবিরোধে তাঁহাদের জ্ঞানের অন্তর্গত।

৩। তৃতীয় পথটি সংসারবিদ্‌দিগের; অন্য দুইটি জ্ঞানের কিছুই তাঁহাদের মধ্যে নাই। যদি তাঁহাদের এ দুই জ্ঞান থাকিত তবে তাঁহারা তাহা ব্যবহারে লাগাইতে পারিতেন। কারণ ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাববশতই লোক সৎকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যদি সংসারবিদ্‌গণের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত থাকিত এবং পরলোকে তাহাদের বিশ্বাস থাকিত তবে সৎকার্য্য সকলের সাধন হইতে তাহারা কখনো ভ্রষ্ট হইতে পারিত না।

ঈশ্বরবিদ্‌রা যুক্তি ও প্রত্যয়ের সহিত ঈশ্বরের ঐক্যে, পরলোকে ও ঈশ্বরের কার্য্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

পরলোকবিদ্‌দের পরলোকে বিশ্বাস ছাড়াও সম্ভবমত ইস্‌লাম্ সম্বন্ধীয় জ্ঞানেও অধিকার আছে; এবং তাঁহারা তাহা ব্যবহারও করিয়া থাকেন।

সংসারবিদ্‌গণের ইস্‌লাম্ সম্বন্ধে বাহ্যিক জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানই নাই এবং তাহাও শেখা কথা। যাহা তাহারা শিখিয়াছে তাহা তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না। বিশ্বাসের অভাববশত এই সংসারবিদ্‌রা ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

ঈশ্বর ও পরলোকবিৎদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই এবং সংসারবিৎ অপেক্ষা নিকৃষ্টও আর কেহ নাই।

ঈশ্বর লাভের জন্য লোকেরা যে বিদ্যাকে কামনা করে তাহা অপেক্ষা লাভজনক পদার্থ আর কিছুই নাই। বিষয়ের জন্য যে বিদ্যা তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছুই নাই।

খাদ্যবস্তু যেমন সবল ও ব্যাধিমুক্ত শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর এবং রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেহের পক্ষে পীড়ার কারণ বিদ্যা সেইরূপ।

হৃদয়বৃত্তি যখন আসক্তির সহিত সংসারের প্রতি উন্মুখ হয় এবং মানবের সত্তা দূষিত রসে পূর্ণ হইয়া উঠে বিদ্যা তখন কামনা, অহঙ্কার ঔদ্ধত্য, বিদ্বেষ ও অন্যান্য অসৎ প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। উপকারী সৎবিদ্যা মানব প্রকৃতিতে ধার্ম্মিকতা, নম্রতা, ও বৈরাগ্য বৃদ্ধি করে এবং ভগবৎ প্রেমকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলে।

অপকারী অসৎবিদ্যা মানব প্রকৃতিতে গর্ব্ব, ঔদ্ধত্য, অভিমান এবং বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে।

মনুষ্যদিগের মধ্যে ঈশ্বরবিৎ পুরুষের অবস্থিতি ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের নিদর্শন। তাঁহার অনুপস্থিতি ভগবদ্‌কৃপার অভাব ও ভ্রান্তি, অজ্ঞান অন্ধকারের মূল।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

(১) অঙ্কুরোৎপত্তির তত্ত্ব।

বীজ ও মাটি উভয়ের মধ্যেই জল লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় এবং যে ক্ষেত্রে মাটি বীজ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে জল শোষণ করিয়া লইতে পারে সে ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ফরাসীদেশের একজন বৈজ্ঞানিক মিঃ মুন্‌টজ বহুকাল অঙ্কুরোদ্গম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি এই অভিনব তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন জলের জন্য মাটির যে তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না মিটিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনোমতেই বীজ রস গ্রহণ করিয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না; এমন কি ভিজানো বীজ পুঁতিলেও তৃষিত বসুন্ধরা নিঃশেষে বীজ হইতে সমস্ত জলটুকু শোষণ করিয়া লয় এবং ইহার ফলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। বীজ ও মাটি উভয়েরই পিপাসা মিটাইবার জন্য বীজ পুঁতিবার পূর্ব্বে মাটিকে বেশ করিয়া জলসিক্ত করিতে হয়।

(২) কাঁচা মাংস চিকিৎসা।

কিছুকাল ধরিয়া যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় কাঁচা মাংস

ব্যবহার করা হইতেছে। সম্প্রতি ডাক্তার মেনার্ড নামক একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ইহার স্বপক্ষে কতকগুলি অভিনব যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন খাদ্যরূপে ব্যবস্থা না করিয়া ঔষধরূপেই ইহা ব্যবহার করা সঙ্গত। মাংসপেশীর শারীরতন্তুর মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান আছে যাহা যক্ষ্মারোগের জীবাণুর উপাদেয় খাদ্য নহে। কাঁচা মাংস যখন খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয় তখন রন্ধন করাই শ্রেয় কিন্তু চিকিৎসার নিমিত্ত মাংস কাঁচা থাকাই প্রয়োজন। কেননা রন্ধনের দ্বারা শারীরতন্তুস্থিত উপাদানগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং যে বিশেষত্বটুকুর জন্য ইহা ঔষধ বলিয়া আদৃত হইতেছে তাহা আর থাকে না।

অধ্যাপক হেইম্ প্রমাণ করিয়াছেন যে মাংসপেশীতেই প্রচুর পরিমাণে ব্যাধিমুক্তির উপাদান বিদ্যমান। নিউমোনিয়া প্রতিষেধক পদার্থ সকল মাংসপেশীতে যথেষ্ট আছে। যক্ষ্মারোগসম্বন্ধেও এ কথা খাটিতে পারে কেননা মাংসপেশীতে ক্ষয়রোগ অতি অল্পই দেখা যায়। শারীরতন্তুতে যক্ষ্মারোগের জীবাণু প্রবেশ করাইয়া য়ুরোপের দু'একজন প্রধান চিকিৎসক দেখাইয়াছেন যে রোগের জীবাণু মাংসপেশীর কোষগুলিও ভেদ করিতে পারে নাই। এই সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় কাঁচা মাংসের ব্যবহার চিকিৎসক সমাজে আদৃত হইয়াছে বটে কিন্তু বহুকাল হইতেই চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার স্থান হইয়াছে। গত শতাব্দীর মধ্যকালে ফুস্টার নামক একজন চিকিৎসাবিদ্ যক্ষ্মারোগে কাঁচা মাংস ব্যবহার করিতেন।

(৩) লৌহের জমা খরচ।

প্রচুর পরিমাণে লৌহ ক্রমাগত খনি হইতে উদ্ধার করা হইতেছে অথচ ব্যবহার্য্য লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। দেখা গিয়াছে পৃথিবীর ব্যবহার্য্য লৌহের চারি ভাগের এক ভাগ দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হয় না; প্রশ্ন এই, লৌহরাশি যায় কোথায়?

বষ্টন সহরের সিভিল ইঞ্জিনীয়র-সোসাইটী এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে লৌহ কিছু পরিমাণ নষ্ট হয় কিন্তু ব্যবহারজনিত ক্ষয়ও নিতান্ত কম নহে। নিউইয়র্ক সহরে বৈদ্যুতিক ট্রামে কেবলমাত্র ব্রেক্ হইতে প্রতি মাসে প্রতি মাইলে এক টন্ লৌহ-রেণু বাহির হয়। ইহার সঙ্গে চাকা, রেল ইত্যাদির সংঘর্ষজনিত ক্ষয়ের পরিমাণ যোগ করিলে অনুমান করিতে পারা যাইবে কত লৌহ এই ভাবে নষ্ট হয়। রেলওয়ে কোম্পানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে মোটের উপর প্রথম বৎসরে লৌহনির্ম্মিত গাড়ী গুলির ওজন কিছু কম এক মন কমিয়া যায়।

মরিচা পড়িয়াও যথেষ্ট লৌহ ক্ষয় হইয়া ক্রমশঃ মাটিতে, জলে, বাতাসে মিশিয়া যায়। নিউইয়র্ক, সিকাগো প্রভৃতি বড় বড় সহরের যেখান হইতেই একটু ধুলা তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন, যথেষ্ট লৌহরেণু বিদ্যমান দেখিতে পাইবে।

বিশ্বসংসারের এই ভাঙাগড়ার রহস্য ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যুগযুগান্ত ধরিয়া লৌহরাশি এক একস্থানে সঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন সাধন করিতেছে, পুনরায় ইহা মানুষের কাজে কিছু কিছু করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া কোন্ ভবিষ্যৎযুগের বিজ্ঞানকুশলীর দ্বারা ধূলিরাশি হইতে পুনরায় আহরিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে!

(৪) উপবাসসম্বন্ধীয় দু'একটী কথা।

শরীরের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত নিয়মিত আহার যেমন আবশ্যক, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপবাসেরও তেমনি প্রয়োজন। মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার নামক একজন আমেরিকান্ লেখক কন্‌টেম্পোরারি রিভিয়ুতে কিছু দিন পূর্ব্বে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া অতিরিক্ত ভোজনবিলাসী আমেরিকান্‌দের চমকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে উপবাসের যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোনো কোনো চিকিৎসক তাঁহার প্রবন্ধকে আরব্যোপন্যাস মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের মতে কোনো মানুষ পাঁচ দিনের অধিক কোনো প্রকার পুষ্টিকর আহার গ্রহণ না করিয়া বাঁচিতে পারে না; অথচ মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার বলেন আমেরিকার অনেক স্বাস্থ্যাবাসে কুড়ি ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত উপবাস সচরাচরই দেখা যায়—ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘ উপবাসের ঘটনা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। নর্থডেকোটায় কোনো এক ভোজনাগারের মালিক মিষ্টার ফসেল্ নব্বই দিন উপবাস করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক তাঁহার ৩৮৫ পাউণ্ড (প্রায় ৩৷৷০ মণ) ওজনের বিপুল দেহযষ্টিখানির ভার কমাইবার জন্যই এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। চল্লিশ দিন উপবাসের পর তাঁহার ওজন ১৩০ পাউণ্ড হইল—তখন তিনি ব্রত ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি আবার বাড়িয়া উঠিলেন। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য এইবার তিনি সচেষ্ট হইলেন, এবং সিকাগো সহরের মিঃ ম্যাক্‌ফ্যাডেনের স্বাস্থ্যাবাসে আশ্রয় লইয়া নব্বই দিন ধরিয়া উপবাস করিলেন। এই সকল ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই কেননা উপবাসীর দেহে উপবাসের লক্ষণ স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ শরীরের ওজন প্রতিদিন

এক পাউণ্ড করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়ত জিহ্বার উপরে একপ্রকার ময়লা জমিতে থাকে। উপবাস ভঙ্গ হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জিহ্বা পরিষ্কার হইয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন খাদ্যদ্রব্য দেখিলে উপবাসী চঞ্চল হইয়া পড়ে কিন্তু দেখা গিয়াছে তিন দিবসের পর খাদ্যের প্রতি উপবাসীর কোনই আকর্ষণ থাকে না।

যাঁহারা উপবাস গ্রহণ করিয়া রোগমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। উপবাস কালে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন এবং উপবাস ভঙ্গ করিলে কিছুদিন আহারাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সংযত হওয়া কর্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৫) দিগ্বলয়ের নিকটে চন্দ্র সূর্য্য বৃহদাকার দেখায় কেন?

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে চন্দ্র সূর্য্য যখন দিগ্বলয়ের ঠিক উপরেই থাকে তখন, আকাশে উচ্চতর স্থানে সে গুলিকে যত বড়টি দেখায় তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

এই প্রশ্নটির উত্তরে 'নানা মুনির নানা মত' আছে। অল্পদিন হইল প্যারিসের কস্‌মস্‌ পত্রিকায় এই প্রশ্নের একটি নূতন উত্তর বাহির হইয়াছে। এই উত্তরটির একটি বিশেষত্ব আছে যে ইহাতে পরীক্ষা খাটে। চন্দ্র সূর্য্য আকাশপথে যেখানেই থাকুক একখানি ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের সাহায্যে তাহাদের ছবি দিগ্বলয়ের নিকটে প্রতিফলিত করিয়া দেখিলে এই প্রতিফলিত ছবি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়। দূরবর্ত্তী কোনো গাছ কি মানুষকে যখন দিক্‌প্রান্তে ছায়ার আকারে প্রতিফলিত দেখা যায় তখন সে গুলিকে অত্যন্ত বড় দেখায় ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সে গুলি প্রকৃতপক্ষে যত বড় তাহাদের সেই ছায়ার ন্যায় আকার আমাদের মনে তদপেক্ষা বড় ছবি আঁকিয়া দেয়। সূর্য্য যখন আকাশে উপরে থাকে তখন এবং যখন দিক্‌প্রান্তে থাকে তখন তাহার ব্যাস মাপিয়া দেখা গিয়াছে, কোনো পার্থক্যই লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু মাপ রাখিলা, চোখে দেখিতে গেলেই মনে হয় এখানকার সূর্য্য আর ওখানকার সূর্য্য কখনোই এক মাপের নহে। মোট কথা, এই ব্যাপারটি চোখের ধাঁধা মাত্র।

আমরা অভিজ্ঞতায় জানি যে, কোনো পদার্থ যতই দূরে থাকে তাহাকে ততই ছোট বলিয়া বোধ হয়। এই অভিজ্ঞতার ফলেই দূরবর্ত্তী পদার্থের প্রতীয়মান আকার হইতে বস্তুটির দূরত্ব অনুমান করিবার শক্তিও আমাদের আছে। ইহার উল্টা কার্য্যটিও আমাদের শক্তির অতীত নহে; অর্থাৎ দূরত্ব জানা থাকিলে বস্তুর আকার কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধেও আমাদের অনুমান করিবার ক্ষমতা আছে। যখন আমরা কোনো বস্তুকে তাহার প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষাও দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ করি তখন সেটিকে তাহার প্রকৃত আকার অপেক্ষা বৃহদাকার বলিয়া মনে হয়।

ইহার কারণ এই—আমাদের ধারণায় বস্তুটির দূরত্ব বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা তখন সেটিকে যে আয়তনের দেখি তাহাই তাহার সেই বর্দ্ধিত দূরত্বেরও উপযোগী আকার বলিয়া মনে করি। বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে অত দূরে থাকিলে আকারে আরো ছোট দেখাইত। উল্টাইয়া বলা যাইতে পারে, বস্তুটির আকার তাহার প্রকৃত আকার অপেক্ষা বড় হইলে তবেই অতদূরে, আমরা যেরূপ দেখি, সেই আকার সে পাইতে পারে। বস্তুটিকে তাহার প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষা অধিক দূরে মনে করার জন্যই এইরূপে আমাদের ধাঁধা লাগে।

যখন চন্দ্র কি সূর্য্য দিগ্বলয়ের ঠিক উপরে থাকে, তখন আমরা তাহাদের পার্শ্বে যে সমস্ত বস্তু (দিক্‌প্রান্তের নিকটবর্ত্তী গাছ প্রভৃতি) দেখি সেগুলি আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরের পদার্থ। কিন্তু যখন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে আরো উপরে থাকে তখন ইহাদের পার্শ্বে আমরা যে সকল বস্তুকে দেখিতে পাই সেগুলি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো গাছ কি গৃহ কিম্বা অমনি আর কিছু। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রে, ইহাদের পার্শ্বস্থিত অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী পদার্থের সঙ্গে মিলাইয়া দ্বিতীয় ক্ষেত্র অপেক্ষা চন্দ্র সূর্য্যকে আমরা অধিকতর দূরবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করি। এই কল্পনাই আমাদের দৃষ্টিতে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, এবং তখন চন্দ্র সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে যত বড়টি দেখাইবার কথা তাহা অপেক্ষা বড় দেখায়। এই উভয়ক্ষেত্রে তাহাদের পার্শ্বের বস্তুগুলির দূরত্বের যে তারতম্য ঘটিতেছে তাহাই এই ধাঁধার কারণ।

এ ব্যাপারটি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। পারা লাগানো না থাকিলেও কাচ দর্পণের ন্যায় কাজ করিতে পারে। সাসীতে অনেকেই মুখ দেখিয়া থাকিবেন। কাচের এই গুণের সাহায্যেই পরীক্ষাটি হইয়া থাকে। খুব পাতলা একখানি ক্ষুদ্রাকার কাচ লইয়া তাহা চক্ষুর সম্মুখে ধর, এবং তাহাতে আকাশে ঊর্দ্ধপথস্থিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, দর্পণের সাহায্যে যেমন করা যায় ঠিক সেইরূপে, একটু বাঁকাইয়া দিগ্বলয়ের দিকে প্রতিবিম্বটি প্রতিফলিত কর। এখন যদি সেই কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া দিক্‌প্রান্তে চন্দ্রের প্রতিবিম্বটিকে দেখা যায় চন্দ্রকে আকারে বড় দেখাইবে। সেই প্রতিবিম্বকেই কোনো নিকটবর্ত্তী বস্তুর উপর প্রতিফলিত করিলে চন্দ্রকে

ছোট দেখাইবে। কাচখণ্ডটি খুব পাতলা হওয়া আবশ্যক এবং দিক্‌প্রান্তে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ একটু নিপুণতার সহিত করা দরকার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৬) হাতীর দন্তচিকিৎসা।

আমেরিকার কোন বিখ্যাত চিড়িয়াখানায় 'গুণ্ডা' বলিয়া এক বৃহৎকায় ভারতবর্ষীয় হাতী আছে। একবার কিছু দিন তাহার মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়া যাওয়াতে তাহার রক্ষক ডাক্তার ব্লেয়ারকে আনিয়া দেখাইল। এই প্রকাণ্ড জন্তুটির বরাবর রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধার তেজ দেখা গিয়াছে কিন্তু কয়েক দিন হইতে হঠাৎ সে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অথচ তাহার যে ক্ষুধামান্দ্য ঘটিয়াছিল এমন নহে, কারণ সর্ব্বদাই তাহাকে ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখা যাইত। সে তাহার প্রকাণ্ড শুঁড় দিয়া খাবার তুলিয়া লইত কিন্তু কোনো কারণবশত মুখে দিতে চাহিত না। তাহার মুখের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে একটি দাঁতের গোড়ায় মস্ত গর্ত্ত হইয়াছে ও তাহার চারিপাশে মাড়ি ফুলিয়া উঠিয়াছে—বেচারা নিশ্চয়ই বড় যন্ত্রণা পাইতেছিল। প্রথমে ডাক্তার ব্লেয়ার ভাবিয়াছিলেন যে হয়ত দাঁতটি উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে; কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নয়, হাতীর এক একটি দাঁত আমাদের এক একটি মুঠোর সমান। তা ছাড়া আর একটি বিপদের আশঙ্কা আছে—দাঁত তুলিবার সময় বেদনায় অস্থির হইয়া ক্ষেপিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য ডাক্তার ব্লেয়ার গুণ্ডার দাঁতের গর্ত্ত ভরিয়া দেওয়াই নিরাপদ মনে করিলেন।

পাছে গুণ্ডার ছট্‌ফটানি দেখিয়া তাহার জুড়িটি ভয় পায় এইজন্য গুণ্ডাকে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনা হইল। তাহার রক্ষক গুণ্ডাকে আদর করিয়া দুই চারিটি কথা বলিতেই সে এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন তাহাদের উদ্দেশ্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাকে মাটিতে বসিতে বলিলে ধীরে ধীরে সে আদেশ পালন করিল। তাহার রক্ষকের আদেশে গুণ্ডা তাহার মস্ত মাথাটা তুলিয়া অতি ধীরে ধীরে ও সন্তর্পণে শুঁড়টি উঁচু করিল। কিন্তু তাহাকে হাঁ করাইবার চেষ্টা করিবামাত্র শুঁড় নামাইয়া ফেলিল। সে এমন করিয়া কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল যে মনে হইল সে তাহার মানব-বন্ধুদের নিকট ব্যথার উপর আর ব্যথা না বাড়াইতে আবেদন করিতেছে। তাহার পশুবুদ্ধিতে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে কিন্তু সে বেদনায় যে তাহার উপকারই হইবে ইহাও সে অনুভব করিয়াছিল।

অনেক আদর উপরোধের পর গুণ্ডা মুখ খুলিল। ডাক্তার ব্লেয়ার তাঁহার বৃহৎ ও বিকটাকার যন্ত্রগুলি লইয়া যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত যখন গর্ত্তটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন তখন বেশ বড় রকমের একটি নেবু অনায়াসে তাহার ভিতর প্রবেশ করান যাইতে পারিত। দাঁতের স্নায়ুট প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং বেচারা গুণ্ডার পক্ষে বোধ হয় সে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল তথাপি সে একবারও তাহার ডাক্তারকে শুঁড় দিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হয় নাই। সমস্তক্ষণ কেবল কাতরাইতেছিল ও মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। গর্ত্তটি পরিষ্কার হইয়া যাইবামাত্র অতি শীঘ্র ধাতুদ্রব্য দিয়া সেইটি ভর্ত্তি করিয়া ফেলা হইল ও কার্বলিক-লোশান্ দিয়া মাড়ি ধোয়ান হইল। এইরূপে দাঁতের চিকিৎসা সাঙ্গ হইয়া গেলে যন্ত্রণামুক্ত পশুটি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—সে স্বর এতক্ষণকার কাতর শব্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্রীঅতসী দেবী।

দাদু।

নিমিষ ন ন্যারা কীজিয়ে
অন্তরসে উর নাম

অন্তর হইতে নিমেষের জন্যও অন্তর করিও না, প্রাণস্বরূপ সেই নাম।

দাদু দুখিয়া তব লগই
জবলগ নাউ ন লেই
তবহীঁ পাবন পরমসুখ
মেরী জীবনী যেই॥

হে দাদু, সেই পর্য্যন্তই লাগে দুঃখ যে পর্য্যন্ত নাহি লও নাম। তখনই পাওয়া যায় পরমানন্দ (যখন লই সেই নাম), তিনি যে আমার জীবন।

অহনিস সদা সরীরমেঁ
হরি চিতবত দিন জাই।
প্রেম মগন লয়লীন মন
অন্তরগতি লব লাই॥

অহর্নিশি সদা শরীরের মধ্যে হরিচেতনায় (ধ্যানে) চলিয়াছে দিন। প্রেমে মগ্ন ধ্যানে লীন (আমার) মন। অন্তরের গতিতে আন-ধ্যানকে।

নিমিষ এক ন ন্যারা নহীঁ
তন মন মাঁঝ সমাই।
এক অঙ্গ লাগা রহই
তাকো কাল ন খাই॥

এক নিমেষের জন্য দূরে নহে, তনু মন মাঝে (হরি) সমাহিত। এক অঙ্গ হইয়া যে লাগিয়া থাকে কাল তাহাকে না করে গ্রাস।

জহাঁ রহউ তঁহ রামসোঁ
ভাবই কংদরি জাই।
ভাবই গিরি পরবত রহউ
ভাবই গেহ বসাই॥
ভাবই জাই জলহি রহউ
ভাবই সীস নবাই।
জহাঁ তহাঁ হরিনাউ সোঁ
হিরদৈ হেত লগাই॥

যেখানে থাক সেখানেই থাক সেই প্রিয়তমের (রাম) সঙ্গে, চাই গুহাতেই যাও, চাই গিরি পর্ব্বতেই থাক, চাই গৃহেই বাস কর। চাই গিয়া থাক জলে, চাই নত কর তোমার শির। যেখানে সেখানে হরিনামের সঙ্গে হৃদয়ে লাগাও প্রেম।

রাম কহে সব রহত হৈঁ
নখ সিখ সকল সরীর।
রাম কহে বিন জাত হৈ
সব ঝউ মনবা বীর॥
রাম কহে সব রহত হৈ
লাহা মূল সমেত।
রাম কহে বিন জাত হৈ
মূরখ মনবা চেত॥
রাম কহে সব রহত হৈ
আদি অন্ত লোঁ সোই।
রাম কহে বিন জাত হৈ
যহমন বহুরি ন হোই॥
রাম কহে সব রহত হৈ
জীব ব্রহ্ম কী সার।
রাম কহে বিন জাত হৈ
রে মন হো হুসিয়ার॥

রাম (প্রিয়তম) কহিলে সবই রহিল, নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সকল শরীর; রাম কহা বিনা সকল যাইতেছে চলিয়া, হে বীর মন, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ।

রাম কহিলে সবই যায় থাকিয়া, মূল সহিতে লাভ; রাম কহা বিনা যাইতেছে চলিয়া, ওরে মূর্খ মন, সচেতন হ'।

রাম কহিলেই সব থাকে, আদি অন্ত লইয়া তিনিই; রাম কহা বিনা যাইতেছে চলিয়া; হে মন, আর কি ইহা ফিরিয়া মিলিবে?

রাম কহিলেই সব যায় থাকিয়া, জীব যে ব্রহ্মের প্রেমাস্পদ; রাম কহা বিনা সব যাইতেছে চলিয়া, রে মন, হ' সতর্ক।

হরি ভজ কাফির জীবনা
পর উপকার সমাই।
দাদূ মরনা তঁহ ভলা
জহাঁ পসু পংখী খাই॥

হরি ভজ রে কাফের মন, পর উপকারে হইয়া সমাহিত। হে দাদূ, মরণও সেখানে ভাল যেখানে পশু পক্ষী খাইবে (আমার দেহ)।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

নানা কথা।

(১) আমেরিকার চীনজয়।

জাতি যতই শিক্ষিত হইবে, তাহার প্রয়োজন ও অভাব ততই বাড়িয়া চলিবে ইহাই অর্থশাস্ত্রের মত। চীনকে শিক্ষিত করার ফলে বাণিজ্যের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; উত্তরোত্তর আমেরিকা বাণিজ্যের জালেও চীনকে ঘিরিয়া ফেলিবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

চীনের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অকস্মাৎ সংঘটিত হইয়াছে। কেননা কর্ম্মিষ্ঠ আমেরিকা চীনের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়-ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিতে এবং বিগত দশ বৎসর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। স্যান্সাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ সুটহিল্ চীনের নূতন ও পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কন্টেমপোরেরি রিভিয়ুতে লিখিয়াছেন :—

চীনের শিক্ষা-পদ্ধতির যে সংস্কার একান্ত আবশ্যক দশ বৎসর পূর্ব্বে এ কথাটি শিক্ষিত চীনেরা কোনোমতেই স্বীকার করিতে রাজি হইতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীতে কোনো খুঁত নাই; এই যে বিশাল সাম্রাজ্যে শতকরা ৯৫ জন পড়িতে পারে না এবং ৯১ জন লিখিতে পারে না, ইহাও তাঁহাদের কাছে স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়াই বোধ হইত, কেননা ইঁহারা মনে করিতেন যে সরস্বতী দেবীর শুভদৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ অল্পসংখ্যক লোকের জন্য—সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি নহে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের শিক্ষাপদ্ধতি-সংস্কারের প্রস্তাব সমগ্র চীনকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাটকে এই দুঃসাহসিকতার জন্য সিংহাসনচ্যুত হইতে হইয়াছিল; কিছুকাল পরে প্রকারান্তরে তাঁহার জীবন নাশ করা হইয়াছে। সম্রাট-মাতা সম্রাটের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারও অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

আজ শিক্ষার সংস্কার ও বিস্তারের জন্য চীন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষাজালে সকলকেই বদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন ব্যবস্থা সঙ্কলিত হইয়াছে;

সত্বরই ইহা প্রচলিত হইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এত বড় দুরূহ প্রস্তাবটী গ্রহণ করিবার সময় চীনে এখনো আসে নাই কিন্তু য়ুরোপীয় চীনবাসীরা চীনের জাতীয় উন্নতির আশাকে পদে পদে যেরূপ খর্ব্ব করিয়া দেখেন তাহা তাঁহাদের অন্ধ-সংস্কারবশত। দেশ হইতে অহিফেন নির্ব্বাসন দিবার জন্য সম্প্রতি যে আন্দোলন হইতেছে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী মিসনরীরাও সন্দিহান। অথচ স্যান্সাই প্রদেশে এক বৎসরের মধ্যে অহিফেন-চাষ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মিঃ টিং নামক একজন কর্ম্মিষ্ঠ চৈন (যিনি পূর্ব্বে নিজে অহিফেন সেবন করিতেন) এমন উপায়ে অহিফেন চাষ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে যখন ব্রিটিশ-মন্ত্রী এই স্যান্সাই প্রদেশে অহিফেন সংগ্রহার্থে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়াও তিনি কোথায়ও একটী অহিফেনের গাছ পর্য্যন্ত পান নাই। সার্ব্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধেও সেইরূপ। বর্ত্তমান অবস্থায় চীনে ইহা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া কেহ কেহ বিদ্রূপ করিতে পারেন কিন্তু সামান্য বেতনের শিক্ষকের বা স্বল্পমূল্য পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সাম্রাজ্যের নিঃস্ব জনসাধারণকে যে শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাইতেছে না চীন তাহা আজ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছে। শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করিলে স্থানীয় শিক্ষা-বিভাগই এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা দেখিবেন।

শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত যে অর্থ আবশ্যক তাহাও এক উপায়ে সংগৃহীত হইতেছে। চীনদেশে দেবোত্তর জমি ও মঠবৃত্তিদ্বারা বহুকাল অবধি এক দল অলস পরান্নপুষ্ট জীব কতকগুলি অনর্থক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে; শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এই সকল নানাপ্রকার অকর্ম্মণ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও বহু শতাব্দীর স্তূপীকৃত দেশাচারকে আজ যে চৈনেরা আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্ববাধা-বিজয়ী উজ্জ্বল মহিমা সূচনা করিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(২) ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্।

৫৬ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন উষার স্নিগ্ধ আলোকে ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেলের সহিত যে সেবিকার ক্ষুদ্র দলটি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈন্যদলের শুশ্রূষা করিবার লক্ষ্য লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন মাত্র এখন জীবিত আছেন। ইংলণ্ডের এক রোমান ক্যাথলিক মঠের সন্যাসিনী সেণ্ট জর্জ্জ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের কোন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট তৎকালীন ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন। ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবকাশ পাইয়া তিনি বার্দ্ধক্যঘটিত জড়তা ও মঠের অবরোধপ্রথার বাধা মানেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ অত্যন্ত স্নেহশীলা সদ্‌গুণসম্পন্না আদর্শ নারী ছিলেন।

যে রাত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার জন্য আমাদের ডাক পড়িল সেই রাত্রি আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। মঠে তখন আমি নূতন আসিয়াছি এবং তখন আমার শরীর দেখিলে মনে হইত না যে আমার অধিক পরিশ্রম করিবার শক্তি আছে। আমার বয়স যখন ১৭ তখন লোকে মনে করিত আমি তিন চারি বৎসরের বেশী বাঁচিব না। শুশ্রূষা সম্বন্ধে আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না—আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত পড়িলে আমি শিহরিয়া উঠিতাম।

রবিবারের কর্ম্মহীন নিস্তব্ধ রাত্রে আমরা বিশ্রাম করিতে যাইতেছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী (তখন টেলিগ্রাফ ছিল না) দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া আমাদের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের ধর্ম্মযাজক এই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্য হইতে যে-কোন পাঁচ জন মঠবাসিনীকে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, পরদিনেই প্রত্যূষে ছয় ঘটিকার সময় লণ্ডন-ব্রিজের নিকট উপস্থিত থাকিবার জন্য আমাদের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল। এই সংবাদে আমরা সকলেই কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিলাম বুঝিতেই পারিতেছেন।

ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের সেই আহ্বান-লিপি পাঠ সমাপ্ত হইল। এখন কে এই ব্রতকে বরণ করিয়া লইবে? বিশ্বাস করিবেন কি?—আমরা সকলেই সম্মতিসূচক হস্তোত্তোলন করিলাম। কাজেই আমাদের মধ্য হইতে পাঁচ জনকে বাছিয়া লইতে হইল। আমাকেও সেই দলে গ্রহণ করা হইল। সে রাত্রে আর আমাদের ঘুম হইল না। জিনিষপত্র গুছাইবার কথা ভাবিবারও সময় ছিল না। আমরা যথাসময়ে লণ্ডন-ব্রিজে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পথে সর্ব্বত্রই আদর অভ্যর্থনা লাভ করিতে করিতে আমরা মার্শেলে পৌঁছিলাম। জাহাজের জন্য সেখানে আমাদিগকে তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইল। মনে আছে শুক্রবার দিন জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল। শুক্রবার দিন অযাত্রা * বলিয়া জাহাজের কাপ্তেনের সে দিন যাত্রা করিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মিস্ নাইটিঙ্গেলের দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে তাঁহাকে হার মানিতে হইল। হঠাৎ কোথা হইতে এক কালো বিড়াল আসিয়া আমাদের

* এদেশে যেমন বৃহস্পতিবার বিলাতে তেমনি শুক্রবার অশুভ বলিয়া গণ্য।

জাহাজে দেখা দিল। এই দুর্লক্ষণে নাবিক মহলে জাহাজ-ডুবি হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। নিরীহ বিড়ালটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। বস্তুতই আমরা জাহাজডুবি হইতে হইতে কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম।

আমরা যখন স্কুটারিতে পৌঁছিলাম তখন মিস্ নাইটিঙ্গেল্ সামুদ্রিক পীড়ায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আর অসুখের কথা ভাবিবার সময় ছিল না—কত হতভাগ্য তখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সে কি ভীষণ দৃশ্য! স্কুটারির হাঁসপাতালের সে দৃশ্য আমি কখন ভুলিব না। সে যেন একটা কসাইখানার মত; চারিদিকে অজস্র হাত-পা-ভাঙ্গা সৈনিক পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের বেদনা উপশম করিবার কোন উপায় নাই। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই একে আহত তাহার পরে শীতে জর্জ্জর, মৃতপ্রায়। কেহ কেহ হয় ত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া কাটাইয়াছে, তাহাদের চর্ম্ম জমিয়া কাপড়ের সঙ্গে আঁটিয়া গেছে।

জানেন বোধ হয়, যদিচ ডাক্তারের নিকট হইতে আমরা শিষ্ট ব্যবহার পাইতাম তথাপি প্রথম প্রথম মিস্ নাইটিঙ্গেল্ তাঁহাদিগের কাছে তেমন উৎসাহ পান নাই। অবশেষে মিস্ নাইটিঙ্গেলের অশ্রান্ত সেবাপরায়ণতা ও ধৈর্য্যেরই জয় হইল। প্রথমে তাঁহারা একটু বিদ্রূপের ভাবে তাঁহার নামের অর্থ লইয়া তাঁহাকে 'পাখী' বলিয়া ডাকিতেন শেষে ঐ নামই সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিল। 'পাখীর' কোনো ইচ্ছাই অসম্পন্ন থাকিতে পারিত না। মিস্ নাইটিঙ্গেল্ সকলের শেষে বিশ্রাম করিতে যাইতেন ও সকলের আগে শয্যাত্যাগ করিতেন। তাঁহার উপর হাঁসপাতালের গুরুতর দায়িত্ব ও ব্যবস্থার ভার ছিল তৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের সহিত সমান খাটিতেন।

শ্রীঅতসী দেবী।

অজানা।

গানে দেব কোন্ সুর লয়
বাঁধব কেমন ছন্দে!
ভরে দেব কোন্ দেবালয়
কোন্ কুসুমের গন্ধে!
একলা বসে সুখে দুখে
রইব চেয়ে কাহার মুখে;
মাতিয়ে নেব নয়ন আমার
কোন্ পুলক আনন্দে!

কোন্ বেদনায় বাজবে আমার
হৃদয়-বীণার তন্ত্রী!
কোন্ পরশে জাগবে সে তার,
কে হবে তার যন্ত্রী!
সাগর আমার কূলে কূলে
কোন্ জোয়ারে উঠবে দুলে;
ময়বে আমার নিশীথ রাত্রি
কোন্ সুধাময় চন্দ্রে!

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প

প্রথম ভাগ।

৮২০ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২। ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
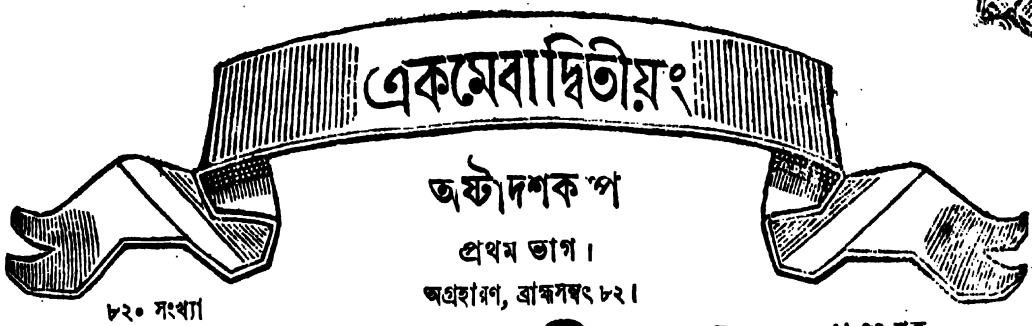
অনন্ত পথে।

রথের চূড়ার ধ্বজা এখনো দেখিনি রাজপথে,
বিপুল জনতা মাঝে দাঁড়ায়ে রয়েছি কোনমতে
আশায় বাঁধিয়া বুক। সুদূরের স্তব্ধ সভামাঝে
রহি রহি শুনি শুধু গম্ভীর বিজয়ভেরী বাজে।
প্রভাতে অরুণ স্পর্শে, দিবসের দীপ্ত তপনের
ভীষণ মহিমাতলে, সন্ধ্যারাগে মুগ্ধ স্বপনের
বরণ লীলার মাঝে, রজনীর প্রেম আলিঙ্গনে,
বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে, ঋতুর মধুর আবর্ত্তনে,
অনন্ত জীবনপথে চলিয়াছি চির-অভিসারে
একান্ত নির্ভরভরে; মেলিয়াছি আঁখি বারেবারে
তারি সাথে মিলনের আশে, ভাবি ঐ এল হায়!
কোথা রথ, কোথা পথ, বাঁশীটুকু শুধু কেঁদে যায়!
বিজয়ীর একি খেলা! তবু জানি পাইব সন্ধান
তাই সুখ, তাই তৃপ্তি, সে আনন্দে হিয়া কম্পমান।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ। *

(আবহমান)

শ্রোতৃবর্গের মনে সহজে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গীতাপাঠ উপলক্ষে ত্রিগুণতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা-বাহুল্যের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গীতাশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত জুড়িয়া গুণ শব্দ নানা কথাপ্রসঙ্গে, নানা স্থলে, নানা ছলে, পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা কোনো গীতাপাঠকের চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। এইজন্য ত্রিগুণ যে পদার্থটা কি, আর, তাহার ভিতরে আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাগুলি কেমন আশ্চর্য্যরূপে আগ্‌লাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা বিবৃত করিয়া দেখানো গীতাশ্রাবয়িতার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায়, আমি এই দুরূহ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার স্বপক্ষসমর্থন এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; অতএব শেষোক্ত বাজে কাজে অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক।

ত্রিগুণের ভিতরের কথার অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক।

আমরা দেখিয়াছি যে, সত্তা কাহারো একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সত্তা তোমারও আছে, আমারও আছে, পশু-পক্ষীরও আছে, ধাতু-প্রস্তরেরও আছে। সত্তা যখন সকলেরই আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেরই আছে। কেন না, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার কোনো নিদর্শন থাকে না; সত্তার কোনো নিদর্শন না থাকিলে—"সত্তা আছে" এ কথা একেবারেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। অতএব যখন তুমিও বলিতেছ, আমিও বলিতেছি এবং সকলেই একবাক্যে বলিতেছে যে, সত্তা সকলেরই আছে, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে; অথবা, যাহা একই কথা—সকলেরই সত্তার সঙ্গে চেতনা ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সকলেরই সত্তা আত্মসত্তা। তোমার সত্তাও তোমার আত্মসত্তা, আমার সত্তাও আমার আত্মসত্তা, গোমহিষের সত্তাও গোমহিষের

---

* শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধপাঠ সভায় পঠিত।

আত্মসত্তা, ধাতুপ্রস্তরের সত্তাও ধাতুপ্রস্তরের আত্মসত্তা। প্রভেদ কেবল এই যে, আত্মসত্তা'র প্রকাশ সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট, রজঃপ্রধান মূঢ় জীবদিগের মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত, তমঃপ্রধান জড় বস্তুর মধ্যে প্রসুপ্ত বা বীজভাবাপন্ন। আবার, মনুষ্যের মধ্যেও আত্মসত্তার প্রকাশ জাগরিতাবস্থায় সুপরিস্ফুট হয়, স্বপ্নাবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত ভাব ধারণ করে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সুপ্তি-সাগরে নিমগ্ন হয়। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যেখানে যখন প্রকাশ পায়, সেই খানেই ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে। তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, আত্মসত্তার প্রকাশ যখন সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছাও সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা যখন সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মসত্তা সকলেরই আনন্দের আস্পদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের কথাপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

ইহার অর্থ:—

ব্রহ্মরসামৃতপানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে যেরূপ ভরপুর আনন্দ বিরাজ করে,তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ-বিন্দু'র বলে অন্যান্য জীবেরা জীবন ধারণ করে:—ভাব এই যে, স্থির সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের শান্ত-সমাহিত চিত্তে তেমনি আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ পরিষ্কার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে; আবার, তরঙ্গিত নদীস্রোতে চন্দ্রের প্রতিমা যেমন শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে প্রকাশ পায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃ-প্রধান অন্তঃকরণে তেমনি গোড়ার সেই অখণ্ড আনন্দের আভাস শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখে পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—প্রকাশ এবং আনন্দ, তাহা কি জ্ঞানবান্ মনুষ্য, কি পশ্বাদি মূঢ় জীব, কি ধাতুপ্রস্তরাদি জড়বস্তু—সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে।

সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—কিনা সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ, এ দুইটি ছাড়া সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়লক্ষণ আছে: সেটাও দেখা চাই; সেটি হচ্চে সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বাম হস্ত, আত্মসমর্থনী-শক্তি (সংক্ষেপে আত্মশক্তি) সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এই স্থানটিতে সত্ত্বগুণের গোড়ার বৃত্তান্তটি আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশেই সত্তার আত্ম-সমর্থন হয়; কেন না প্রকাশ ব্যতিরেকে সত্তা সত্তাই হয় না। তবেই হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশের মধ্যেই সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি সম্ভূত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, সে পর্য্যন্ত প্রকাশের মাত্রা পূর্ণ হয় না। ফল কথা এই যে, "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যখন দ্রষ্টা পুরুষের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তখন সে-যে প্রকাশ তাহা প্রকাশের নবোন্মেষ মাত্র—অরুণোদয় মাত্র; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বৃত্তান্ত যখন প্রকাশ পায়,—এটাও যখন প্রকাশ পায় যে, যে প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া আমি ভূতকালের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে দণ্ডায়মান হইয়াছি, সেই প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া ভবিষ্যতে দণ্ডায়মান হইতে পারা আমার অধিকারায়ত্ত; এইরূপে যখন সত্তার সঙ্গে শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন সত্তা এবং শক্তির সেই যে সমবেত প্রকাশ, তাহাতেই প্রকাশের মাত্রা পূরণ হয়, আর, সেই সঙ্গে আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়। "আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়" বলিতেছি এই জন্য, যেহেতু আধ-পেটা অন্ন-ভোজনে যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির উদর পূরণ হয় না, তেমনি "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই অর্দ্ধ-বৃত্তান্তটিতে আনন্দের মাত্রা পূরণ হয় না;—আনন্দের মনের কথা এই যে, আত্ম-সত্তা যেমন ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছে—ভবিষ্যতেও তেমনি তাহা চিরজীবী হইয়া বর্ত্তিয়া থাকুক্। এইজন্য আত্মসত্তার সঙ্গে যখন ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার যোগ্যতা বা আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন আনন্দের অর্দ্ধমাত্রা পূর্ণমাত্রায় পদ-নিক্ষেপ করে। এই স্থানটির সহিত ডারুইনের মুখ্য সিদ্ধান্তটি দিব্য সংলগ্ন হয়। সে সিদ্ধান্ত এই যে, জীব-জগতে ভূতকালের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সত্তা যখন যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা দীনহীন সত্তা নহে, পরন্তু তাহা যোগ্যতম সত্তা; সত্তার উদ্বর্ত্তন যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest)। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ডারুইনের মতে সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্থনের যোগ্যতার অভ্যুদয় হয়—আত্মসমর্থনী শক্তির অভ্যুদয় হয়। ডারুইনের প্রদর্শিত এই যে এক মহা-

নাট্য—কি না সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্থনী শক্তির উদ্বোধন—এ নাট্য অভিনীত হয় জীবজগতের সর্ব্বত্রই; কিন্তু পশ্বাদি জন্তুরা এই পরমাশ্চর্য্য নাট্যলীলার রসাস্বাদনে একেবারেই বঞ্চিত—এ নাট্যলীলার দর্শক পৃথিবীস্থ সারারাজ্যের জীবদিগের মধ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্য। কেননা মনুষ্যই সত্ত্বগুণপ্রধান জীব, আর, প্রকাশ সত্ত্বগুণেরই ধর্ম্ম। মনুষ্যের ন্যায় সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণেই আত্মসত্তা এবং আত্মসত্তার প্রিয়সখী আত্মসমর্থনী শক্তি উভয়েই পরিষ্কার জ্ঞানালোকে বিভ্রাজমানা। পক্ষান্তরে, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে আত্মসত্তা এরূপ ঝাপ্‌সা আলোকে প্রকাশ পায় যে, তাহা প্রকাশ না পাওয়ারই মধ্যে। অর্থাৎ মনুষ্যের সজ্ঞান অবস্থার চিৎপ্রকাশ বলিতে যেরূপ চিৎপ্রকাশ বুঝায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণস্থিত চিৎপ্রকাশ সেরূপ জাগ্রত ভাবের চিৎপ্রকাশ নহে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনোপ্রকার বাধানুভূতির উত্তেজনায় যখন পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণে চিদাভাস উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মচেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, তখন উপস্থিত বাধার প্রতিবিধানকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত চিৎপ্রকাশ গ্রস্ত হইয়া যায়; তা বই, সুখদুঃখের ছায়াবাজির পর্দার ওপিঠে প্রকাশ এবং আনন্দের যে এক বাঁধা রোসনাই রহিয়াছে, তাহা তাহাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধরা দ্যায় না।

ডারুইনের প্রদর্শিত ঐ যে মহানাট্য উহা বহির্জগতের আম্‌দরবারে অভিনীত হয়, আর সেই জন্য অধুনাতন কালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উহার সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ। তা ছাড়া, আর এক নাট্য যাহা মনুষ্যের অন্তর্জগতের খাস্‌দরবারে অভিনীত হয় তাহা কম মহানাট্য নহে;—আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মহানাট্যের সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত মহানাট্যে বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে জড়রাজ্যের বিদেশ হইতে মনুষ্য-রাজ্যের স্বদেশে উপনীত হয়, এই বৃহদ্ব্যাপারটির অভিনয় হয়। শেষোক্ত মহানাট্যে মনুষ্যের অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্নময় কোষের প্রবাস হইতে আনন্দময় কোষের নিবাসে উপনীত হয়, এই নিগূঢ় রহস্যটির অভিনয় হয়। বর্ত্তমান স্থলে শেষোক্ত মহানাট্যের মর্ম্মস্থানীয় ব্যাপারগুলি পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিয়া দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম যে, আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গে আত্মশক্তির প্রকাশ হইলে—তবেই আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে—শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। আত্মসত্তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরিষ্কার জ্ঞানালোকে অভ্যুত্থান করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন আত্মসত্তার প্রকাশ সম্যক্ পর্য্যাপ্তি লাভ করে না, আত্মশক্তি তেমনি যতক্ষণ না মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বিরাট-রাজার অন্তঃপুরচারী বৃহন্নলার ন্যায় অপরিজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে, বৃহন্নলা-সারথী যেমন কুরুসেনা জয় করিয়া—তিনি যে কিরূপ অজেয় সারথী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্যের আত্মশক্তি অন্তরের রিপু-জয় করিয়া—সে যে কিরূপ অজেয় শক্তি তাহার পরিচয় প্রদান করে। উপস্থিত বাধার প্রতিবিধানকার্য্য—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু—সকল জীবকেই বাধ্য হইয়া করিতে হয়; কাজেই সেরূপ কার্য্য জীবের অশক্তিরই পরিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে, মনুষ্য যখন মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরতম আনন্দের নিগূঢ় অভিপ্রায় সমর্থন করে, তখন সে-যাহা সে করে তাহা ভিতর-হইতে করে; তা বই, বাহিরের কোনোকিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া করে না। এইরূপ কার্য্যই মনুষ্যের স্বশক্তির পরিচায়ক—আত্মশক্তির পরিচায়ক। দিবালোক অবশ্য সূর্য্য হইতেই আসে, তা বই, তাহা মনুষ্যের আত্মশক্তি হইতে আসে না; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, গৃহবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদ পরিচালনা করিয়া ঘরের জালনা-দরজা উদ্ঘাটন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিবালোক তাহার ভোগে আসে না। প্রকৃত কথা এই যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না;—এটা যেমন সত্য যে, দিবালোক প্রেরণ করা সূর্য্যের কার্য্য, এটাও তেমনি সত্য যে, দিবালোকের বাধা অপসারিত করা গৃহবাসীর কার্য্য।

দিবালোকের প্রেরণকর্ত্তা যেমন সূর্য্য, সত্ত্বগুণের প্রেরণকর্ত্তা তেমনি পরমাত্মা। পার্থিব অগ্নির আলোকের মূলাধার যে সূর্য্যের আলোক ইহা বিজ্ঞানের একটি নবতম সিদ্ধান্ত। কিন্তু সূর্য্যের আলোক যেমন পরম পরিশুদ্ধ আলোক, পার্থিব অগ্নির আলোক সেরূপ নহে; পার্থিব অগ্নির আলোকে ইন্ধনের দোষগুণ কোনো-না-কোনো আকারে দেখা দিতে ছাড়ে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণে তেমনি সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় আক্রান্ত, আর আত্মশক্তির কার্য্য হ'চ্চে সেই সকল বাধা অপসারিত করিয়া দেবপ্রসাদের আগমন-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেইটি এখানে বিশেষ মতে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কর্ষিত ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়; আর, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের গুণে উপ্ত ধান্য-

বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয়—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের মধ্য হইতে মেঘনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ জল কোথাও পলাইয়া যায় না; পলাইয়া যাওয়া দূরে থাকুক্—তাহা সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলাজলের জলত্ব-সাধন কার্য্যে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত থাকে না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বৃক্ষের উৎপাদনে ঘোলা-জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা—মঙ্গল-কার্য্যের উৎপাদনে আত্মপ্রভাবের সেইরূপ কার্য্যকারিতা; আর, ঘোলাজলের জলত্ব-সাধনে বিশুদ্ধ জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা, আত্মপ্রভাবের সামর্থ্য-সাধনে দেবপ্রসাদের সেইরূপ কার্য্যকারিতা অতীব সুস্পষ্ট। প্রথমে, দেবপ্রসাদে মনুষ্যের অন্তঃকরণে আত্মসত্তা প্রকাশিত হয়। তাহার পরে তাহার সঙ্গে আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ আসিয়া যোটে। তাহার পরে সেই আনন্দের সঙ্গে আত্মসত্তার প্রকাশকে মোহমেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিবার ইচ্ছা আসিয়া যোটে। তাহার পরে আত্মশক্তি মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার প্রভাব পরিস্ফুট করিয়া আনন্দের অন্তরের অভিলাষকে পূরণ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে, শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। "কর্ম্মযোগে" অর্থাৎ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠানে। মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক হচ্চে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক আনন্দ। যে কার্য্য সেই অন্তর্নিহিত বিমল আনন্দের অনুমোদিত, সংক্ষেপে অন্তরাত্মার অনুমোদিত, তাহাই মঙ্গল-কার্য্য—বা আত্মশক্তির কার্য্য; আর, তাহার বিপরীত শ্রেণীর কার্য্যই অমঙ্গল কার্য্য—বা অশক্তির কার্য্য। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২০৬ অধ্যায়ে আছে

"মূঢ়ানাং অবলিপ্তানাং অসারং ভাবিতং ভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবারূপমিবাংশুমান্।"

ইহার অর্থ

মূঢ় গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের মনের যত কিছু ভাবনা-চিন্তা সমস্তই অসার; সূর্য্য যেমন দিবসের রূপ প্রদর্শন করে (অর্থাৎ দৃশ্য বিষয় সকল প্রদর্শন করে) অন্তরাত্মা তেমনি তাহাদের সেই সকল ভাবনা-চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করে। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥"

ইহার অর্থ :—

যে কর্ম্ম করিলে সাধকের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তিনি সেই কর্ম্ম প্রযত্ন সহকারে করিবেন, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কালের আচার্য্যেরা স্বভাবী ছিলেন, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—"অন্তরাত্মা মঙ্গল কার্য্যের পথপ্রদর্শক"; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নব্য আচার্য্যেরা নিতান্তই পরভাবী (অর্থাৎ পরের বুলি বোল্‌নেওয়ালা)। এই জন্য, যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথ-প্রদর্শক conscience, তবে শেষোক্ত শ্রেণীর আচার্য্যেরা বলিবেন "খুব ঠিক!" কিন্তু যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক মনুষ্যের অন্তরাত্মা, তবে তাঁহারা হয় তো বলিবেন "অন্তরাত্মা বলিতেছ কাহাকে? আমরা তো জানি conscience শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ বিবেক।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহা তাঁহারা যেমন জানেন, তেমনি এটাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, আমাদের দেশের স্বভাবী আচার্য্যগণের অভিধানে বিবেক-শব্দের অর্থ মূলেই conscience নহে। আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রকারদিগের মতে ত্রিগুণাত্মক তত্ত্বের সংস্পর্শ হইতে ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব বিবিক্ত করিয়া লওয়াই বিবেকের মুখ্যতম কার্য্য। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিবেকের লক্ষ্য পাপপুণ্যের অধিকার-বহির্ভূত ত্রিগুণাতীত প্রদেশের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে conscienceএর লক্ষ্য পুণ্যপাপের অধিকারায়ত্ত প্রদেশের ভিতরেই নিয়ত আবদ্ধ থাকে, তাহার ঊর্দ্ধে যায় না। দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রভেদ, তখন বিবেককে conscience-এর প্রতিশব্দ করিয়া দাঁড় করানোও যা, আর কোনো যোগী মহাপুরুষকে ধরিয়া-বাঁধিয়া ইংরাজ সাজানোও তা—একই কথা। Kant প্রজ্ঞাকে (Reason কে) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন Practical (অর্থাৎ Ethical) এবং Speculative (অর্থাৎ Theoretical)। এখন দ্রষ্টব্য এই যে পাশ্চাত্য ভাষায় consciousness শব্দ দার্শনিক জ্ঞানের (theoretical reason এর) যে স্থান অধিকার করে, conscience শব্দ ব্যাবহারিক জ্ঞানের (practical reason এর) বা নৈতিক জ্ঞানের (Ethical reason-এর) অবিকল সেই স্থান অধিকার করে। consciousness সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের ন্যায় উদাসীন সাক্ষী; তাহার চক্ষে ধর্ম্মও যেমন, অধর্ম্মও তেমনি, দুইই জ্ঞেয় বিষয় মাত্র—তাহার অধিক আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, conscience পাপ-পুণ্যের সেরূপ উদাসীন সাক্ষী নহে। conscienceএর চক্ষে পুণ্য অনুরাগ-ভাজন; পাপ বিরাগভাজন। Consciousness কেবল মাত্র দ্রষ্টা—তাহা নিছক জ্ঞান। পরন্তু conscience দ্রষ্টা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা তিনই একাধারে; conscience পাপপুণ্যের দ্রষ্টা এই অর্থে সাক্ষী পুরুষ, পাপপুণ্যের ভোক্তা তাই পুণ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন এবং পাপের প্রতি

অপ্রসন্ন; conscience পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের শাস্তা এই অর্থে অন্তর্যামী পুরুষ; conscience আত্মপ্রকাশ, আত্মানন্দ, এবং আত্মশক্তি তিনই একাধারে, এই অর্থে অন্তরাত্মা। তাই আমাদের স্বদেশীয় ভাষার অন্তরাত্মা শব্দে conscienceএর মর্ম্মগত ভাবার্থটি যেমন খোলে এমন আর কোনো দেশীয় ভাষার কোনো শব্দে নহে। ইহা সত্ত্বেও আমাদের দেশের নব্য আচার্য্যেরা যে স্বভাষার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের প্রতি ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়া পরভাষিত্ব ব্রত অবলম্বন করেন, ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বামহস্ত এবং আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এখন বলিতে চাই এই যে, সত্ত্বগুণের সেই যে হৃদয়—কি না আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ, তাহাই অন্তরাত্মার বসতি স্থান। মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আত্মশক্তির কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহার সন্ধান পাইতে হইলে, এই স্থানটির আদ্যোপান্ত বিশেষমতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। আগামী বারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি।

তিন শতাব্দীর প্রাচ্য প্রভাবে রোমীয় বহুদেববাদের যে পরিণতি ঘটিয়াছিল, জর্ম্মান পণ্ডিত ফ্রান্‌জ্ কুমণ্ট্ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত রোমের তাৎকালিক অবস্থার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যেমনতর ব্রাহ্মণেরা হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্র মূর্ত্তি-উপাসনার মাঝখানেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন, যেমনতর রোমীয় আইনব্যবস্থাপকেরা নানা বর্ব্বর জাতির বংশপরম্পরাগত প্রথা বিশ্লেষণ করিয়া রাজবিধিতন্ত্রের এমন সকল মূলতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা এখনকার সভ্যসমাজ চালিত হইতে পারিয়াছে, তেমনি রোমের নিকৃষ্ট পূজাপদ্ধতির উপর এসিয়াবাসী মনীষীগণ প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে একটি সুসম্পূর্ণ অধ্যাত্মবিদ্যা ও পরকালতত্ত্বের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। রাজ্যের কল্যাণার্থ কেবল কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত ও নানা প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করাই প্রাচীন রোমের যে ধর্ম্ম ছিল এই প্রাচ্য প্রভাবে তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিল না; তাহার পরিবর্ত্তে যে ধর্ম্মতন্ত্রের উদ্ভব হইল তাহা বিশ্বতত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিল এবং জীবনের পরিধিকে পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দেখিয়া তদনুসারে মানুষের জীবনযাত্রা নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিল। সম্রাট্ অগষ্টাস্ রোমের যে সনাতন পূজাবিধি পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা খৃষ্টানধর্ম্মের যত বিরুদ্ধ ছিল নূতন ধর্ম্মতন্ত্রটি তেমন ছিল না। বরঞ্চ যে খৃষ্টধর্ম্ম ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্যই ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া এবং শীলের দিক দিয়া তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী মত প্রায় একই ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল, এমন কি অব্যাঘাতেই ইহাদের একটি হইতে আর একটিতে পদক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত।

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। সেই জন্যই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ অথবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শেষ বয়সের মতের সহিত হিন্দুসমাজের মতের মিলন এরূপ সম্ভবপর হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে এক সময়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী মতপরিবর্ত্তনে কোনো গুরুতর বিঘ্ন ঘটায় নাই। বস্তুত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমের ন্যায় ভারতেও ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন মতের সহিত নবীন মতের যে একটি আনাগোনা চলিতেছে তাহা একটু দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে; ইহাদের বিরুদ্ধতা ক্ষয় হইয়া ইহাদের ভেদচিহ্ন যে প্রতিদিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষ যুগের লাটিন লেখকদের রচনা পাঠকালে অনেক সময়েই লেখক বহুদেববাদী কি খৃষ্টান তাহা স্থির করা কঠিন হয় সেইরূপ বর্ত্তমান হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখকদের রচনার মধ্যে নীতিমূলক ও তত্ত্বমূলক সাদৃশ্য দেখিয়া পরবর্ত্তীকালের পাঠকেরা বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রাচ্য প্রকৃতির ধর্ম্মবোধের মধ্যে যে একটা গূঢ় গভীর তাত্ত্বিকতা আছে তাহারই দ্বারা রোমের সমস্ত সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে অনুপ্রাণিত হইয়া এমন উদার ভাবের অবতারণা করিয়াছিল যাহাতে একদিন নানাজাতিকে একই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মব্যবস্থার মধ্যে একত্র করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও কি প্রাচ্য প্রকৃতি সমস্ত ধর্ম্মভেদের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এখনি আমাদের গোচরে ও অগোচরে কাজ করিতেছেনা?

খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে যে ধর্ম্মসমাজের মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা আশ্চর্য্য বৈচিত্র্যময়। তখন প্রাচীন কালের ইতালীয়, কেল্টিয় ও আইবেরিয় দেবতাগণের মহিমা যদিও ম্লান হইয়াছিল তথাপি তাহাদের তিরোধান ঘটে নাই। বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীগণের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিতেছিলনা বটে তবু ইতর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধায় ও পল্লীগ্রামের লোকাচারে তাহারা আশ্রয়লাভ করিয়াছিল।

বহুকাল অবধি প্রত্যেক সহরে রোমীয় দেবদেবী স্থাপিত ছিল এবং প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এক একজন রাজপুরোহিতের উপর তাহাদের পূজা অর্চ্চনাদির ভার দেওয়া হইত। কিন্তু তাহাদের পাশেই সমস্ত এসিয়ার দেবতা সমাজের প্রতিনিধিগণ জনসমাজের একাগ্র ভক্তিনিষ্ঠা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। এসিয়া মাইনর, ইজিপ্ট, সাইরিয়া, পারস্য হইতে নূতন প্রভাবের জোয়ার আসিয়া ইতালীকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বদেশের প্রখর সূর্য্যের কিরণ রশ্মি ইতালীর নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বলতাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল। একদিকে যেমন নানামূর্ত্তিধারী বহুদেববাদ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল তেমনি অন্যদিকে ইহুদী একেশ্বরবাদীগণ ও খৃষ্টান সম্প্রদায় আপন আপন ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করিয়া তুলিল। এইরূপে লোকের সংশয়াকুল চিত্তকে বিভিন্ন ধারায় আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং বহুতর বিরুদ্ধমতের উপদেশ তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে নানাভাবে মথিত করিয়া তুলিল।

সর্ব্বপ্রথমে এসিয়া মাইনরের দেবমণ্ডলী ইতালীতে স্থান পায়। প্যুনিক যুদ্ধের অবসানে পেসিনুস্-নাম-ধারিণী (Pessinus) মহামাতাদেবীর কৃষ্ণপ্রস্তর বিগ্রহপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। ক্লডিয়সের রাজত্ব-কালে এই ধর্ম্ম পূর্ণমহিমায় বিকসিত হইয়া উঠিল; ইন্দ্রিয়াকর্ষক উগ্রভাবোন্মাদপূর্ণ প্রাচ্যধর্ম্ম রোমের প্রাচীন গম্ভীর ও বর্ণচ্ছটাহীন ধর্ম্মকে আবৃত করিয়াছিল।

খৃষ্ট শতাব্দীর দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বহুবাধাসত্ত্বেও মিশরের আইসিস্ ও সেরাপিস্ পূজার গুহ্য তান্ত্রিকতা আলেক্জান্দ্রিয় সভ্যতা বহন করিয়া ইতালিতে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল। এই তান্ত্রিকতা মিশরের অন্যান্য ধর্ম্মমতের ন্যায় অত্যন্ত অনুন্নত বিচ্ছিন্ন মতসমূহের সমষ্টি-মাত্র ছিল; ইহার সম্মুখে কোনো উচ্চ নৈতিক আদর্শও ছিলনা; কিন্তু ইহার প্রাচীন পূজাপদ্ধতির অতুলনীয় মাধুর্য্য ক্রমশঃ রোমীয় জনসমাজকে বিচিত্র ভাবাবেশে মুগ্ধ করিয়াছিল; সুধু তাহা নহে অমরত্ব ও দেবত্বলাভের আশ্বাসও রোমানদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার অন্যতম কারণ ছিল।

কিছুকাল পরে সিরিয়ার সূর্য্য উপাসনা রোমে প্রচলিত হইল। পারসিক মিথ্রাপূজার তান্ত্রিকতায় কালকে আকাশের সহিত মিলিত করিয়া তাহাকেই আদিকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইত এবং এই তান্ত্রিকগণ নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার সহিত বাবি-লোনীয় ধর্ম্মমত সম্মিলিত হইয়া রোমে প্রচার লাভ করিল এবং পারসিক ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বন্দ্ববাদও এই সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিল।

রোমে এই বহুবিচিত্র ধর্ম্মবাহুল্যের ফল কি হইল? রোমীয় সাম্রাজ্যগঠননীতির অগ্নিময় সমন্বয় চুল্লির মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এই নানা বর্ব্বর পদার্থগুলি কিরূপে সংশোধিত হইয়া উঠিয়াছিল? এককথায় রোমের প্রাচীন বহুদেববাদ নানা বিদেশী ধর্ম্মবাদের দ্বারা বিজড়িত হইয়া কোন্ মূর্ত্তিতে চতুর্থশতাব্দে অন্তর্ধান করিল?

লেখক এইখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, কোথাও কি একটিমাত্র অমিশ্র স্বতন্ত্র বহুদেববাদ দেখা যায়? তিনি বলেন, যেখানে নানা-বিভিন্ন জাতির সম্মিশ্রন হইয়াছে সেইখানেই বহুদেববাদের উৎপত্তি। নানামতের উচ্ছাস-সংঘাতেই ধর্ম্ম খণ্ড খণ্ড হইয়াছে এবং তাহাদের সকলগুলিকেই একত্রে স্থান দিবার চেষ্টা-তেই তাহারা কেবলই বহুগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বহুদেববাদের প্রাদুর্ভাব সেখানে কোনো ধর্ম্মমত সহসা আঘাত পাইয়া মরে না তাহা বহুকালে ক্রমে জীর্ণ ও রূপান্তরিত হয়। নূতনমত আসিয়া পুরাতন মতকে স্থানচ্যুত করে না—সেও তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে। রোমে চতুর্থশতাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল তাহার ধর্ম্মতত্ত্বটি যে বেশ সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপক ছিল তাহা বলা যায় না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিলই। চাষারা তখন তৈলাক্ত শিলা-খণ্ডকে, বিশেষ বিশেষ ঝরণা ও পুষ্পিত তরুকে পূজা করিত; বীজ বপন ও শস্যকর্ত্তনের সময় তাহাদের উৎসব ছিল। এই সমস্তই কুসংস্কাররূপে ঘৃণিত হইয়াও অনেকদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টান-যুগেও নানা আকারে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

এদিকে সমাজের অপর-প্রান্তে দার্শনিকেরা ধর্ম্মকে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষণভঙ্গুর ও উজ্জ্বলবর্ণের তত্ত্ব-তন্তুজালে আবৃত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ জুলিয়ান্ মহামাতার কাহিনীর অদ্ভুত অসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রচার করি-লেন এবং তাহা বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতসমাজে সমাদরের সহিত গৃহীত হইল। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশেও এরূপ চেষ্টার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখা যাইতেছে।

রোমের এই বহুধাবিভক্ত দেবপূজার সহিত যখন খৃষ্টানধর্ম্মের বিরোধ বাধিল তখন সেই বিরোধে বহু-দেববাদ আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। প্লেটোর অনুবর্ত্তী দর্শনতত্ত্বই তখন সকলের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। এই দর্শন প্রচলিত ধর্ম্মকে কেবলমাত্র যে স্বীকার করিত তাহা নহে তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত, এবং শাস্ত্র-গ্রন্থকেও অপৌ-রুষেয় বলিয়া মান্য করিত। যেহেতু সকলপ্রকার পূজাই পবিত্র এইজন্য সকলগুলিকেই শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদিগকে রূপক বলিয়া গণ্য

করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা হইত। এইরূপে পূর্ব্বদেশ হইতে যে ভাবগুলির আমদানি হইল গ্রীক্-রোমীয় চিত্ত আপন ভাবের সহিত তাহার আপোষ করিয়া লইবার চেষ্টা করাতে একটি সম্মিলিত ধর্ম্মতন্ত্র ধীরে ধীরে রূপ ধারণ করিয়া উঠিতে লাগিল। এইভাবে রোমীয় ধর্ম্মের মৃত-অংশগুলি যখন অপসারিত হইল তখন বিদেশী প্রাচ্যধর্ম্মগুলি তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে নূতন প্রাণ দিল এবং নিজেরাও রূপান্তরিত হইয়া গেল।

তৎকালের খৃষ্টানদের গ্রন্থ হইতে একটা কথা জানা যায় যে যদিচ প্রাচীন প্রথানুসারে নানা উপাধিধারী ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা পুরাতন রোমের ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন তবু তখন দেশের উপর তাঁহাদের প্রকৃত কোনো প্রভাব ছিল না। বিশেষত সম্রাট্ অরেলিয়ান্ যে দিন "অপরাজিত সূর্য্য"-এর পুরোহিতকে তাঁহার সাম্রাজ্যের রক্ষকদলের অন্যতম বলিয়া নিযুক্ত করিলেন সেদিন প্রাচীন ধর্ম্মের পতন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইহাতে দেখা যায় প্রাচ্য ধর্ম্মমতই তৎকালে প্রবল। ইহাই জনসাধারণের ভক্তি অধিকার করিয়া ছিল। খৃষ্টানেরা তখন এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিল।

খৃষ্টানদের আক্রমণে এই বিরোধী ধর্ম্মমতগুলি এক হইয়া উঠিয়া আপনার মধ্য হইতে একটি সুসংলগ্ন বিশ্বতত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তখন দেবতারা এক একটি শক্তিরূপে পরিগণিত হইলেন ও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি যোগ স্থাপিত হইল। এই সম্মিলনের ফলে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ধারণা পরিস্ফুটতর হইতে লাগিল। চতুর্থশতাব্দীর একজন লেখক ম্যাক্সিমস্ বলিয়াছেন—"একমাত্র ঈশ্বর আছেন; তিনি স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ; তাঁহার আদি নাই, জনকজননী নাই; তাঁহার যে শক্তি জগতে বহুধা ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাঁহাকেই আমরা নানা নামে ডাকিয়া থাকি, কারণ তাঁহার যথার্থ নাম আমরা জানি না। তাঁহার নানা অংশকেই নানা সময়ে স্তব করিয়া আমরা সেই একমাত্রেরই উপাসনা করি। তিনি যেমন দেবতাদের, তেমনি মনুষ্যদের সাধারণ পিতা—মনুষ্যগণ সহস্রবিধ উপায়ে সেই দেবতাগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থতায় আপনাদের বহুবিরোধ-সত্ত্বেও সেই এক পিতারই তুষ্টিসাধন করে।"

কিন্তু এই যে অনির্ব্বচনীয় পরমদেবতা যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত তিনি বিশেষভাবে আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যেই আপনাকে ব্যক্ত করেন। ভূলোকের সমস্ত ধীশক্তির প্রবর্ত্তক ও স্বর্লোকের কারণশক্তিরূপী সূর্য্যেই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ।

এ দিকে প্রাচ্যপ্রভাবে রোমে অনেকগুলি অশ্লীল ও বর্ব্বর অনুষ্ঠান প্রচলিত হইল—যেমন মহামাতার সেবকদের রক্তাক্ত নৃত্য ও সীরিয় পুরোহিতদের আপন অঙ্গহানি সাধন। কিন্তু তৎকালে যেমন সকল ধর্ম্মমতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলিতেছিল তেমনি এই সকল অনুষ্ঠানের অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর হইতে ধর্ম্মনৈতিক তাৎপর্য্য বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত কাহিনীগুলিও অতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দ্বারা পবিত্র বেশ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

জর্ম্মান পণ্ডিত রোমের বহুদেববাদের যে পরিণতি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এমনি রেখায় রেখায় আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য ও তাহার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে যে ইহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিণাম।

জীবনে নিয়ত যদি
জাগিত মরণ,
মরণে করিত না ত
জীবন হরণ।
না ফুরাত মরণে সে
জীবনের স্বাদ,
না ঘটিত জীবনের
এত পরমাদ।
ফিরে চাহি আপনার
পরিণাম দেখ্,
জীবনে মরণে মিলি
হয়ে আছি এক।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা।

ধর্ম্মজগতে আমরা সচরাচর দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক নীতিপরায়ণ, অন্য শ্রেণীর ভক্তিপরায়ণ। এক শ্রেণীর লোক কেবলি কাজ করিতেছে এবং কর্ত্তব্যজালকে বিস্তীর্ণ করিয়া আর শেষ করিতে পারিতেছেনা, তাহাদের কাজের আকাঙ্ক্ষা যেন আর মিটিতে চায় না। অন্য শ্রেণীর লোক কাজ করিয়াও কাজে বাঁধা পড়িতেছে না, চাওয়া এবং পাওয়াকে এক করিয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অবিরত চেষ্টা, অন্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি।"

দৃষ্টান্তস্বরূপে একজন ইংরাজ পাদ্রী ও আমাদের দেশীয় একজন যথার্থ ভক্ত, এই দুই জনের চিত্র পাশাপাশি কল্পনা করিতে অনুরোধ করি। পাদ্রী অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই,—যাহারা দরিদ্র তাহাদের শিক্ষার জন্য অন্নবস্ত্রের জন্য সর্ব্বদাই তিনি খাটিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, দুর্নীতি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। দিন রাত্রি খাটুনির মধ্যে তিনি এমনি জড়াইয়া আছেন যে ভগবানের ধ্যানধারণারও সময় তাঁহার অল্পই থাকে। দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ তাঁহার থাকে না।

আমাদের দেশীয় ভক্তের সে সকল বালাই কিছুই নাই। তিনি অল্পই কাজ করেন, কিন্তু কাজ করিতে করিতে রামপ্রসাদ সেনের মত হয়ত আত্মবিস্মৃত হইয়া জমাখরচের হিসাব-খাতায় ভক্তির উচ্ছ্বাসকে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলেন। কাজ তাঁহাকে কোথাও পাইয়া বসে না, তিনি ভগবানের মাধুর্য্যরসে সর্ব্বদাই নিমগ্ন হইয়া আছেন। সকল দৃশ্যে গন্ধে স্বাদে তাঁহারি স্পর্শ পাইয়া পুলকিত হইতেছেন, সকল মানবসম্বন্ধের মধ্যে তাঁহার নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তি জাগিতেছে। তাঁহার পরিতৃপ্ত হৃদয় যেন বলিতেছে,—এই যে তিনি আমার অন্নপানে মা হইয়া আমায় খাওয়াইতেছেন, এই যে তিনি সকল দৃশ্য গন্ধ শব্দ রন্ধ্র করিয়া বাঁশী বাজাইয়া আমার মন হরণ করিতেছেন, এই যে মানুষের সকল কর্ম্মে সকল দুঃখে আঘাতে অপমানে আমার সঙ্গে তাঁহার প্রেমের বিরহ-মিলন-লীলা চলিতেছে। আমার জীবনকে ভিতর হইতে একেবারে অধিকার করিয়া সেই পিতামাতা, সেই স্বামী সেই বন্ধু প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাপ্তির আনন্দে সেই ভক্তের সকল চাওয়ার অন্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আর অভাববোধ নাই।

মোটামুটি এই যে দুই শ্রেণীর সাধকের দুইটি চিত্রের কথা বলা গেল, তাহা আমাদের দেশের ও পশ্চিম দেশের ধর্ম্মসাধনার দুইটি আদর্শ। পশ্চিম দেশের ধর্ম্মসাধনাকে মুখ্যতঃ নীতিপ্রধান বলা যাইতে পারে ও আমাদের ধর্ম্মসাধনাকে মুখ্যতঃ ভক্তিপ্রধান বলা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আধুনিককালে এই দুই দিকের ধর্ম্মসাধনার সামঞ্জস্যের জন্য এদেশে এবং অন্য দেশে উভয় দেশেই একটা চেষ্টার উপক্রম লক্ষিত হইতেছে। ইউরোপ, যে ধর্ম্মনীতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকাকেই চরম লাভ বলিয়া মনে করিয়াছিল, মানুষের শক্তির যে কোনখানে সীমা আছে তাহা স্বীকার করিতেই চাহে নাই,সে এখন চলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইতেছে। সে বলিতেছে—"নীতিপ্রধান জীবনের বিরুদ্ধে এই যে ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ, যে জীবনে কেবল উত্থান আর পতন, কেবলি উঠিয়া পড়া এবং নূতন করিয়া আরম্ভ করা—তাহার অর্থই এই যে, আমাদের চেতনার মধ্যে এমন সব গভীরতর জিনিস আছে যাহা কেবলি অগ্রসর হওয়ারদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না; যাহা স্থিতি চাহে,প্রাপ্তি চাহে—জীবনের ব্যবহারই যাহার কামনার বিষয় নহে, কিন্তু জীবনের আনন্দ।"

এ স্থানটি একজন বিশিষ্ট লেখকের রচনা হইতে অনুবাদ করিলাম, কিন্তু এ কথা আধুনিক কালের সকল মনীষিগণই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্মনৈতিক জীবন যে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণতা ও আনন্দে পৌঁছাইতে পারেনা এমন আভাস নানা লোকের মুখে পাওয়া যাইতেছে।

আবার এদিকে আমাদের দেশে অধুনা যে আন্দোলন সকল জাগিয়াছে তাহা আমাদিগকে উল্টা দিকে আঘাত করিতেছে। তাহা বলিতেছে যে আমাদের মধ্যে ভক্তি আছে, মাধুর্য্য আছে, কিন্তু মানবপ্রেম, মানবসেবা, মঙ্গল কর্ম্মের প্রতি স্থিরনিষ্ঠ অনুরাগ এ সকল জিনিস আমাদের মধ্যে নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মনীতিকে খুব জোর করিয়া ধরিয়া কর্ম্মকে নানা লোকের মধ্যে সফল করিয়া তুলিবার শক্তি আমাদের মধ্যে কোথাও দেখা যাইতেছে না। সকলের সহিত মিলিবার ও মিলাইবার শক্তির অভাবে আমাদের সমাজে ব্যবস্থা ও নিয়ম কর্ম্মকে কঠিন করিয়া গড়িতেছে না। এমন কোন অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানই নাই যাহার মধ্যে সকলের সম্মিলিত চেষ্টার একটি রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ভাবরসসম্ভোগ মাত্র; তাহা কর্ম্মে সফল হয় নাই, তাহা ধর্ম্মনীতিকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া বেশ কঠিন ও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। আমাদের দেশের অনেক লোকের মুখ হইতেই এ সকল কথা আমরা আজকাল শুনিতেছি।

এ কথা বলিতেই হইবে যে নিত্য সত্যকে খণ্ডকালের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দেখা কঠিন। এখনকার কালে হয়ত এ দেশে ধর্ম্মনীতিকে এবং অন্য দেশে আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দকে প্রাধান্য দিতেছে। সুতরাং এ সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের অখণ্ড মূর্ত্তিটি কি তাহা চোখে নাও পড়িতে পারে। কেহ একদিক কেহ অন্য দিক্‌কেই বড় করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু আমাদের পুরাণে যেমন বলে যে প্রলয়ের মধ্যেই নাকি সৃষ্টি নিহিত থাকে, সেইরকম এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঠেলাঠেলির ভিতর হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পূর্ব্ব পশ্চিমের এবং পশ্চিম পূর্ব্বের অঙ্গ পূরণ করিতেছে। পশ্চিম অত্যন্ত বেশি চলিয়াছে তাই

সে থামিতে চায় এবং পূর্ব্বদেশ অত্যন্ত বেশি থামিয়া আছে তাই সে চলিতে চায়, কেবল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম হইতেই যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে—পূর্ব্ব পশ্চিমে মিলিয়া বিশ্বমানব নামক একটি অখণ্ড নূতন বস্তুর জন্মলাভ হইতেছে।

কলম্বস্ যখন তাঁহার নাবিকদলকে লইয়া নব আমেরিকা আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণের এই ভয় হইয়াছিল যে পৃথিবীর একেবারে প্রান্তসীমায় গিয়া পড়িলে পাতালের অতল গর্ত্তে তাহারা পড়িয়া যাইবে, কারণ পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে তখনও তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ইউরোপ বরাবরই পৃথিবীর ন্যায় সত্যকেও গোল করিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ করিয়া না দেখিয়া চ্যাপ্টা করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে সে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন মতে স্বর্গে উড়িবার পাখা গজাইবার চেষ্টায় ছিল। কিছুদূর উড়িতেই যখন সে ধুলায় আছাড় খাইয়া পড়িল, তখন পৃথিবীটাই সত্য হইয়া স্বর্গলোক একেবারেই মিথ্যা হইয়া গেল। তখন হইতে কেবলি পাইব, কেবলি চলিব, কেবলি বাড়িব, এই কথাটাই তাহার শয়ন স্বপনের সাথী হইয়া রহিল।

আমরা জানি যে, সাহিত্যই প্রত্যেক দেশের বা জাতির ভিতরের যথার্থ প্রতিকৃতিকে অঙ্কিত করে। দেশের বা জাতির আশা, আকাঙ্খা বেদনা সমস্তই সাহিত্যের ভিতর দিয়া অত্যন্ত বৃহৎ ও বিশ্বব্যাপক হইয়া দেখা দেয়।

ধর্ম্মনীতিকে অর্থাৎ কেবলি উন্নতিলাভের সাধনার আদর্শকেই ইউরোপ চরম আদর্শ মনে করিয়াছে এবং পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দের সাধনাকে সে গ্রহণ করে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাক্ ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা।

আমার তো মনে হয়, যে ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের ভিতরেও আমরা এই কথাই অনুভব করি। সেখানে আমরা প্রাপ্তির আনন্দের কথা তেমন করিয়া পাইনা, যেমন ক্রমাগত সংগ্রামের দ্বারা কেবলি গতিমুখে ও বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবনকে নীত করিবার কথা পাই। জীবনের মধ্যে পথটাই আসল, গন্তব্যস্থান থাক্ বা নাই থাক্ তাহার খোঁজ লইবার কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ জীবন মানেই অনন্ত বৈচিত্র্য এবং তাহার সকলটারই স্বাদ আমাদিগকে পাইতে হইবে—এই কথাটাই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিগণ একটু বেশি জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন।

আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের ন্যায় বিধিনিষেধ প্রবল গতানুগতিক দেশে জীবনকে কেবল জীবন বলিয়াই বড় করিয়া ধরিবার ও পূজা করিবার তাৎপর্য্য আমরা ঠিক্‌মত না বুঝিতেও পারি। তাহার কারণ ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যে কত বড় করিয়া দেখে তাহা আমরা জানিনা। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু পৃথিবীতে আর কি কিছুই আছে? ইহাকে সংস্কারপাশমুক্ত স্বাধীন, স্ফূর্ত্ত, ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে দেশের ধর্ম্মে রাষ্ট্রে, সমাজে, বিপ্লবের পর বিপ্লব কেবলি তরঙ্গিত হইতেছে। প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আপনাকে আপনি আশ্চর্য্যরূপে উপলব্ধি করিবে, ইহাই সে দেশের মর্ম্মের অভিলাষ, সে দেশের প্রাণের কথা। সেই কারণেই জীবন কেবলি চলিতে থাকিবে, ইহাতে সে দেশের লোক এত আনন্দ বোধ করে—সেই চলাতেই তো জীবনের সৌন্দর্য্য, জীবনের বৈচিত্র্য—নহিলে তাহা একঘেয়ে একরঙা ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

জর্ম্মান মহাকবি গ্যয়টেরচিত ফাউষ্ট নাটকের প্রথম দৃশ্যে, যেখানে ফাউষ্ট আপনার অবরুদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডী ছাড়াইয়া জগতের বাস্তবিকতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আধুনিক জীবনের এই গতিতত্ত্বের সমস্ত ভাবটি গ্যয়টের এই কয়েকটি ছত্রে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে;—

"জীবনের বানে, কর্ম্ম তুফানে
চলি, ফিরি, দুলি, ঘুরি—
রহি আমি সব জুড়ি!
জনম-মরণ রঙ্গ
মহাসাগর তরঙ্গ।
জাল সদা চলে বেড়ে
গেঁথে চলে জীবনেরে
প্রাণময় যে বসন মহেশ্বর পরেন আনন্দে
বুনি তাহা মহাকাল-বয়নের ধ্বনিময় তন্ত্রে!"

কবি গ্যয়টের বিশ্বাস ছিল যে আমাদের জীবনের ভালমন্দ প্রত্যেক অভিজ্ঞতারই মূল্য আছে। অভিব্যক্তির নিয়ম উদ্ভিদতত্ত্বে গ্যয়টেই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, বৃক্ষের মূল, শাখা প্রশাখা, পত্র, ফুল ও ফল একটা হইতে অন্যটা উদ্ভিন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ এ সকল বৈচিত্র্যের মূলে একই জিনিস বিদ্যমান। তেমনি তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে জীবনেরও সকল বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐ ক্রমাগত চলাটাই একটা ঐক্যকে জালের মত গাঁথিয়া তোলে। না চলিলে জীবন একজায়গায় বাঁধা পড়িয়া মিথ্যা হইয়া যায়।

ফাউষ্ট নাট্যে ফাউষ্ট এই বিচিত্র বস্তুর অভিজ্ঞতার রাজ্যকে ত্যাগ করিয়া কেবল পুঁথিগত কল্পনার ছায়া

সমস্ত সত্যকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় ছিল ; এই উপায়ে তাহার মানবপ্রকৃতি আপনার খোরাক পায় নাই। সেই জন্য খুব একটা প্রচণ্ড পাপের মধ্যে, পঙ্কের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া গ্যয়টে তাহার মুক্তির সূচনা করিয়া দিলেন। ঐ নাট্যে তিনি এই কথাটিই বলিলেন যে, চলিতেই হইবে, স্থিতিশীলতার মধ্যে মুক্তি নাই।

গ্যয়টে তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও বহুস্থানে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান হইতে বাস্তব হইতে সুদূরস্থিত একটা অনন্তত্বের বোধ তাঁহার কাছে একেবারে কাল্পনিক ও শূন্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুত এই কারণেই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে স্বর্গকে মর্ত্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সে একটাকে বলে চিরন্তন অন্যটাকে বলে ক্ষণিক। ক্ষণিকের মধ্যে যে চিরন্তন নাই সে চিরন্তনকে মানুষ চায় না, সে চিরন্তন সত্যই নয়। ইতালী হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গ্যয়টে ইতালীর চিত্রশালাসমূহে মধ্যযুগের ভক্তিভাবপূর্ণ খৃষ্টীয় পুরাণের চিত্র সকল দেখিয়া সে গুলিকে "বীভৎস" জিনিস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ তাঁহার দৃষ্টিটা ছিল আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি—জীবনকে তিনি দেখিতেন একটা চলনধর্ম্মী পরিবর্ত্তনশীল জিনিসের মত, যাহার নিত্যগতিই নিত্য আনন্দ জাগাইতেছে।

গ্যয়টেকে যেমন দেখা গেল তেমনি ব্রাউনিং-য়ের মধ্যেও এই গতিতত্ত্বের পরিচয় লাভ করা যায়। আমার তাই বিশ্বাস যে এটা ইউরোপের মজ্জাগত কথা। সেখানে চলাটাতেই লোকে আনন্দ অনুভব করে এবং নিশ্চেষ্টতাকে জড়ত্ব ও মৃত্যু মনে করে। কেবলি সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইব, কেবলি পাইতে থাকিব—ইহাই সেখানকার অন্তরতর বিশ্বাসের কথা।

ব্রাউনিং খৃষ্টধর্ম্মে খুবই আস্থাবান ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের মূলসূত্রটি আমি অন্য এক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছি এইরূপ যে, ভগবান মানুষের মধ্যে তাহার আপন হইয়া নামিয়া আসেন এবং মানুষ তাহার প্রেমের আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা ভগবানের দিকে উন্নীত হয়। সেই সূত্রটির দ্বারাই ব্রাউনিং সমস্ত মানবজীবনের সুখ দুঃখ পাপপুণ্যের বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য ঘোরতর পাপের চিত্র হইতেও তিনি নিরস্ত হন নাই।

"ঈশ্বর জানেন মোরা কতই পতিত !
তবু এত হীন নহি, কভু যে জীবনে
আসিবে না অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত এমন
যখন এ অন্তরের সুচির সম্পদ্
হেরিব উজ্জল করি ; মিথ্যা আবরণ
বিদীর্ণ করিয়া। জানিতে পারিব স্থির
চলিয়াছি সত্য পথে কিম্বা ভুল পথে
বিজয়গৌরবে কিম্বা শূন্য ব্যর্থতায় !"—ক্রিষ্টিনা।

তথাপি প্রেমের এমন দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কোথাও যে একেবারে চরম প্রাপ্তি আছে এ বিশ্বাস ব্রাউনিং-য়েরও নাই। তাঁহার প্রেমের তত্ত্বটি কোন জায়গায় গিয়া বলে নাই, বেদাহমেতং—আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। সে বড় জোর উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের মত বলিয়াছে যে কোন কোন মুহূর্ত্তে আভাস মাত্র পাইয়াছি। যখন প্রেম জাগিয়াছে, তখন পাপের নিবিড় অন্ধকারের রন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্তের আলো আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন বুঝিয়াছি এই যে, এমনি করিয়া জীবনের তরঙ্গে অভিহত হইতে হইতে ক্রমাগত এক এক মুহূর্ত্তে পাইতে থাকিব, যে 'moment made eternity'—যে মুহূর্ত্ত অনন্ত হইয়া উঠিবে।

নুম্ফোলেপটস্ ('Numpholeptos') নামক ব্রাউনিং-য়ের এক প্রেমের কবিতায় ইহার সাক্ষ্য পাই। কবিতাটি এই :—একজন মানুষ এক অপ্সরার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। সে তাহার প্রণয়প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি ছিল, যদি সেই প্রণয়ীটি তাহার একটি দাবী মিটাইতে সমর্থ হয়। দাবীটি এই যে মানবপ্রণয়ীটিকে জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে অথচ অক্ষত অম্লান থাকিতে হইবে, কোন কালিমা তাহাকে কোথাও স্পর্শ করিবে না। এই কল্পিত নারীটি পার্থিব জীবনের সকল পথের মোড়ের মাথায় একেবারে অচঞ্চল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পথগুলি আবেগের নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে, কিন্তু সেই রমণী ধ্রুব শুভ্র নিরঞ্জন আলোকরশ্মির মত স্থির দণ্ডায়মান !

"এ কোন্ মায়ার পথে আমি চলিয়াছি !

* * * *

সকল পথের ঐ মর্ম্মমাঝে তুমি
তোমারি অন্তরতম পূর্ণতা হইতে
বাহিরিছে রশ্মিরাজি নানাবর্ণময় !"

এই নানা বর্ণরঞ্জিত পথের ভিতর দিয়া তাহার প্রণয়ীকে শুভ্র হইয়া তাহার কাছে আসিতে হইবে, এই তাহার দাবী। কিন্তু হায়, সে দাবী মিটাইবার সাধ্য নাই; অভিজ্ঞতার নানা রং লাগিবেই, সুতরাং প্রণয়ও কোন দিন সম্পূর্ণ হইবে না।

এক একটি পথের ভিতর দিয়া যখনই সে রঞ্জিত হইয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন

"তুমি যেন চিনিতে না পার ! অবিশ্বাস !
অবাক হেরিয়া মোর এ বীভৎস রূপ !"

সুতরাং কেবলি নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া

ক্রমাগতই চলিতে হইবে, মুম্‌ফোলেপ্টস্ কবিতাটির ইহাই মর্ম্মকথা।

ব্রাউনিং-য়ের ন্যায় কবি ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যান্ সমস্ত মানুষের সুখ দুঃখ উত্থান পতনকে খুব একটি পূর্ণতার ভাবের মধ্যে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। যে কোন অবস্থায় দারুণ অধঃপতনের যে কোন নিম্নতম সোপানে মানুষ থাকুক্ না কেন, তাহার সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরতর নির্ম্মল ঈশ্বর মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই কবি মানুষকে ডাক দিয়া গাহিয়াছেন :—

"হও না যে কেহ তুমি, আমি জানি স্বপ্ন-পথে ভ্রমিতেছ তুমি!
এই সব কাল্পনিক মিথ্যা যাহা ঘিরি আছে—খসিয়া পড়িবে তাহা নিশ্চয়ই জানি!
এখনি এ মুহূর্ত্তেই তব মুখ, হাসি, বাক্য, গৃহ, ব্যবসায় ব্যবহার, দুঃখকষ্ট, অজ্ঞান ও পাপ কোন্‌খানে যেতেছে মিলায়ে
যে আত্মা তোমার সত্য—সত্য যে শরীর—
পূর্ণ তাহা সম্মুখে আমার!" *

কিন্তু তাঁহারও সমস্ত কবিতার বক্তব্য ঐ যে, কেবলি চলার দ্বারাই আমাদের জীবনের পরিধি বিস্তৃততর হয়। আমাদের কোথাও বিশ্রামের উপায় নাই—কেবলি চলিতে হইবে :—

"চলে এস! থামিতে নারিব মোরা হেথা।
দীর্ঘকাল সঞ্চিত এ মাধুর্য্য-ভাণ্ডার যত প্রিয় হোক্
হোক্ যত আরামের এই ঘর বাড়ি
চলে এস! থামিতে নারিব মোরা হেথা।" †

চলিতেই হইবে, কারণ সকলেই চলিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেহই কোথাও বসিয়া নাই, সুখ দুঃখ আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া দিন রাত্রি মাস বৎসর যুগযুগান্ত মানবযাত্রী চলিয়াছে—

"চলেছে চলেছে তা'রা! আমি জানি তা'রা চলিয়াছে!
শুধু জানিনা কোথায়
কিন্তু জানি চলিয়াছে সকলের চেয়ে মহৎ কল্যাণ পানে!"†

তবেই দেখা গেল যে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে এই চলিবার দিক্‌টা যেমন করিয়া দেখি, থামিবার দিক্‌টা পাইবার কথাটা তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। আমি তাহার কারণ বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইউরোপে এখনো তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই যেমন ধর্ম্মনীতির বোধ। কেবল সম্প্রতি ধর্ম্মনীতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম-শান্তির বিরতির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য ইউরোপীয় চিত্তে একটা আকুপাঁকু চলিয়াছে।

কেয়ার্ড তাঁহার Introduction to the Philosophy of religion-এ এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "আধ্যাত্মিকতা ধর্ম্মনীতির চেয়ে এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম্মনীতির আদর্শ ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া উপলব্ধ হয় কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য একেবারেই 'এই যে এইখানে' এমন প্রত্যক্ষবৎ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে।"

ইউরোপীয়গণ নিজেরা এ কথা কোন কোন জায়গায় স্বীকার করিলেও ভিতরে ভিতরে এই কথাটির প্রতি তেমন আস্থাবান্ নহেন। তাহার প্রমাণ পাই যখন ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন। তাঁহারা ভাবেন যে ভারতবর্ষ যে বলিয়াছে যে, সর্ব্বোচ্চ সত্যকে একেবারে করতলন্যস্ত আমলকবৎ ধরা যায়, তাহাকে "এষঃ" এই বলিয়া চোখে দেখা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাহার মধ্যে আনন্দে ভরপুর হইয়া অষ্টপ্রহর বাস করা যায়; স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা, তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো-ভবতি—সমস্ত শোক, সমস্ত পাপকে দূরে ফেলিয়া আনন্দে একেবারে ওতপ্রোত হইয়া অচঞ্চল হইয়া থাকা যায়—এ সকল কথা অলীক এবং এ রকম শান্তরসাম্পদ সাধনা মানুষকে তামসিকতার দিকেই লইয়া যায়। তাঁহারা ইহাকে Quietism অর্থাৎ উদাসীনতার সাধনা নাম দিয়া ব্যঙ্গ করিয়াও থাকেন। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক পণ্ডিতমূর্খও সেই ব্যঙ্গে যোগ দান করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দেন।

কিন্তু ভারতবর্ষ যদি কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ষোল আনা ঝোঁক দিয়া নৈতিক সাধনাকে একেবারে অবজ্ঞা করিত—যদি দেখিতাম, ভাবরসসম্ভোগ করাই পর্য্যাপ্ত এই কথা সে বলিয়াছে, গুহাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে এ কথা বলে নাই,—এ কথা বলে নাই যে

ন কর্ম্মাণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না
নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি

কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না—তবে এ সকল অপবাদ সহ্য করিতে রাজি ছিলাম। ভারতবর্ষ ধর্ম্মনৈতিক সাধনাকেও স্বীকার করে কিন্তু তাহাকে পথ বলিয়া জানে মাত্র, আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরমানন্দ-লাভই তাহার গন্তব্যস্থান।

সেই জন্য যাহা আর কোথাও এমন জোরের সঙ্গে বলা হয় নাই তাহাই ভারতবর্ষ বলিয়াছে যে পরিবর্ত্তনের নিয়ম, অভিব্যক্তির নিয়ম সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাজ করিলেও একটি জায়গা আছে যেখানে সমাপ্তি—কিন্তু শেষ নহে—অনন্ত পরিপূর্ণতা—সে আত্মায়। সেই খানেই

* "To you" নামক কবিতা হইতে।
† "Song of the open road" নামক কবিতা হইতে।

কেয়ার্ড যাহাকে here and now realisation বলিয়াছেন তাহাই আছে। সেখানে সকল চলা থামিয়াছে, সকল খণ্ডতা মিলিয়াছে, সকল বৈচিত্র্য ঐক্য লাভ করিয়াছে। সে অখণ্ড, অদ্বৈত পরিপূর্ণ আনন্দময় অন্তর-বাহির-পূর্ণ-করা সত্তা।

ইউরোপীয় কাব্যে যেরূপ দেখা গেল, তেমনি যদি আমরা ভারতবর্ষীয় কোন তত্ত্বদর্শী কবির কাব্য আলোচনা করি, তবে কি ইউরোপীয় কবিদের মত সেখানেও দেখিতে পাইব যে, জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন সিঁড়ির ধাপের মত একটা আরেকটার উপরে উঠিয়াছে, কেমন সবটাকে মিলাইয়া একটা চলনশীল ব্যাপ্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? না। এমন করিয়া আপনাকে আপনার গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া জীবনকে কেবলি নানাখানার মধ্যে আমাদের কবিরা ছাড়িয়া দেন্ নাই।

ইউরোপীয় কাব্য খুবই বাস্তবাশ্রিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তাহার অমৃতধারা যে মানুষের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে না তাহা আধুনিক একজন লোকের একটি উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইবে:—"সমস্ত জীবনের সত্তাটা কি একটা অন্তবিহীন ইস্কুলের মত, যাহার খেলিবার প্রাঙ্গণের দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত বিধিনিষেধের ছাপমারা, যাহার উপরের জানালা হইতে মাষ্টাররাও পাহারা দিতেছে? আমাদের কি এই কথা বলিয়াই নিজেদের ভুলাইতে হইবে যে চেষ্টাই পুরস্কার?"

ভারতবর্ষের বড় ধর্ম্মসাহিত্যে এবং কাব্যে প্রাপ্তির কথাই আনন্দে বলিয়াছে, পথের কথা তেমনি করিয়া বলে নাই। অর্থাৎ সে সকল কবিতা objective কিনা, বাহিরের বাস্তব সত্যের উপর দাঁড়াইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। তবু এ কথা বলিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে বিচিত্রতার ছবি নাই বটে কিন্তু বিচিত্রতার স্বাদ আছে। তাহা বিনা মূলের গাছের মত, "সাখা পত্র নহী কছু তাকে, সকল কমল দল গাজৈ"—শাখাপত্র কিছুই তাহার নাই, সর্ব্বত্রই কমলদল বিকশিত। পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দের সেই কমলদলই তাহার মধ্যে একমাত্র দেখিবার বিষয়।

উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতির রচনায়, বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্মনৈতিক এই দুই সাধনার বার্ত্তাই পরিপূর্ণভাবে মিলিয়া আছে।

প্রথমেই উপনিষদের কথা ধরা যাক্।

অধ্যাপক পৌল্ ডয়্সন্ তাঁহার উপনিষদের তত্ত্ব নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে বুদ্ধির মুক্তির দিকে আমাদের ঋষিরা যত দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এমন বাসনার মুক্তির দিকে দেন্ নাই।

কিন্তু তাহার কারণ এই যে, উপনিষদ্ যে কাব্য; তাহাতো অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কিসে মানুষের মুক্তি হইবে, গোড়া হইতেই সেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় নাই। সে একেবারে দেখিয়াছে যে, আনন্দ হইতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জন্ম লাভ করিয়াছে এবং সেই আনন্দে, সেই প্রাণে সমস্তই অহরহ কম্পিত হইতেছে। বিশ্বের সেই আনন্দময় প্রকাশকে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার ভিতরেই উপলব্ধি করা যায়, এই কথা উপনিষদ্ বলিয়াছে। জ্ঞানের মুক্তিই মুক্তি, না বাসনার মুক্তিই মুক্তি, এ সকল প্রশ্নই তাহার মধ্যে নাই। তথাপি ডয়্সন্ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য নয়। কারণ উপনিষদে নানাস্থানে এই ধরণের উক্তিও দেখিতে পাই;—

> নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ
> না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফলকামনাপ্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ধর্ম্মনৈতিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে এ সকল কথা কখনই তাহার ভিতরে স্থান পাইত না। ক্ষেত্র চাষ করিতেই হইবে, আগাছা উপড়াইয়া মাটী হলদ্বারা দীর্ণ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে;—কিন্তু কেবলি হল চালনা করিব, কোথাও থামিব না, একথা এ দেশীয় সাধকেরা বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, এক জায়গায় থামিতেই হইবে। যখন আষাঢ়ের মেদুর শ্যামল মেঘে দশদিক্ আচ্ছন্ন হইবে, তখন ধারাবর্ষণে সমস্ত উপ্তবীজ দেখিতে দেখিতে শ্যামল শস্যের অপূর্ব্ব প্রকাশকে বিকীর্ণ করিয়া দিবে, তখন চেষ্টার আর কোন প্রয়োজন থাকিবেনা। শেষ আছেই, কেবলি চেষ্টা নয়—এই কথাই আমাদের শাস্ত্র সাহিত্যের ভিতরের কথা।

কবীরও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন;—

> "জবলগ মেরী মেরী করে
> তবলগ কাজ একৌ না সরে॥
> জব মেরী মমতা মর্ যায়
> তব লগ প্রভু কাজ সবারে আয়॥
> জ্ঞানকে কারণ করম কমায়
> হোয় জ্ঞান তব করম না সায়॥
> ফল কারণ ফূলৈ বনরায়
> ফল লাগৈ পর ফূল সুখায়॥"

"যতক্ষণ লোক আমার আমার করে—ততক্ষণ একটি

কার্য্যও নিষ্পন্ন হয় না। যখন আমার আমিত্ব মরিয়া যায় তখনি প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্যই কর্ম্ম করা, জ্ঞান হইলে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলের জন্য পুষ্প উদ্‌গত হয় ফল হইলে পুষ্প আপনিই ঝড়িয়া পড়ে।" *

উপরে কবীরের যে শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে তিনি বুঝি কেবল কর্ম্ম কতদূর পর্য্যন্ত এবং প্রাপ্তিরই বা কোথায় আরম্ভ তাহা নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার পরমানন্দময় যোগ ও একাত্মকতার ভাবটি তাঁহার কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে। সেই প্রাপ্তির আনন্দে তিনিও ভরপুর। তিনি বলিতেছেন ;—

"ইস ঘট অন্তর বাগ বগীচে
ইসী মেঁ সিরজনহারা।
ইস ঘট অন্তর সাত সমুন্দর
ইসী মেঁ নৌলখতারা।
ইস ঘট অন্তর পারসমোতী
ইসী মেঁ পরখনহারা—
ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ
ইসী মেঁ ফুটত ফুহারা।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
ইসী মেঁ সাঁঈ হমারা।"

"এই ঘটের মধ্যেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ, ইহারি মধ্যে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই ঘটের মধ্যে সপ্ত সমুদ্র, ইহার মধ্যে নবলক্ষ তারা, এই ঘটের মধ্যেই পরশমণি, ইহারি মধ্যে রত্ন-পরীক্ষক। এই ঘটের মধ্যে অসীম নিনাদিত, ইহারি মধ্যে উৎস উঠিতেছে, কবীর কহেন, শুন ভাই সাধু, ইহারি মধ্যে আমার স্বামী।" *

ইউরোপীয় কবির যে সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি,—"আমি সেই একটি আবির্ভাব অনুভব করিয়াছি, যাহা সমুচ্চ চিন্তার আনন্দে আমায় অধীর করিয়া তুলিতেছে; সে একটি সমস্তের সঙ্গে সমস্তের গভীরতর যোগের পরম চৈতন্য"†—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে সেই সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধিকেও কবীরের এই বাণী অতিক্রম করিয়াছে। এ যেন অন্তঃপুরের দরজার বাহিরের কথা—ভয়ে ভয়ে বাহিরে আমি অনুভব করিয়াছি। কবীরের কবিতা তো তাহা নয়। সে বলিতেছে এই আমারি মধ্যে কুঞ্জনিকুঞ্জ পুষ্পিত, সপ্ত সমুদ্র উদ্বেল, নবলক্ষ তারা প্রকাশিত, আমিই ইহার, আমিই এই। এ একাত্মকতা এ বিশ্ব-যোগ এমন ভাষায় কোন্ ইউরোপীয় কবির মুখে প্রকাশ পাইয়াছে জানি না!

অথচ আশ্চর্য্য এই যে কেবলি আত্মগতভাবের মধ্যে বাঁধা থাকিবার কোন লক্ষণ কবীরের মধ্যে দেখা যায় না। বিশ্বের বস্তুগত বাহ্য সত্তাকেও তিনি তেমনই স্বীকার করেন, যেমন তাঁহার নিজের উপলব্ধিকে। এক রকম করিয়া প্রত্যক্ষ জগৎকে বাদ দিয়া জগতের দার্শনিক ভাবটিকে খুব বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে। কিন্তু কবীর যে কবি, তিনি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দময় জগৎকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইতে কি পারেন? তিনি সীমাকে এবং অসীমকে, ভাবকে এবং রূপকে, বিচিত্রকে এবং এককে গায়ে গায়ে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ ;—

"ঐসালো নহিঁ তৈসালো
মৈঁ কেহি বিধি কথৌ গম্ভীরালো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ
বাহর কহুঁ তো ঝুঠা লো।
বাহর ভীতর সকল নিরন্তর
চিত অচিত দউ পীঠালো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর
বাতন কহা ন জাঈ লো।"

"এমন নহেন তিনি তেমন গো, কেমন করিয়া সেই গম্ভীর কথা বলিব গো। যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন, তবে বিশ্বজগৎ লজ্জায় পড়ে—যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে যে সে কথা মিথ্যা হয় গো। বাহির ভিতর সকল-কেই নিরন্তর করিয়া আছেন—চেতন অচেতন এ দুই তাঁহার পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নহেন তিনি প্রচ্ছন্নও নহেন, তিনি প্রকটও নহেন অগোচরও নহেন। বাক্যে যে সে বলা যায় না গো।"*

এ সকল উক্তি নৈতিকবোধমাত্রের ন্যায় কোন খণ্ডতা-বোধের উক্তি নয়, পরন্তু বিশ্ববোধের উক্তি। এই উক্তিই ভারতবর্ষের, এ কথা আমাদের নিশ্চয় জানিতে হইবে। আমাদের শেষ লক্ষ্য কেবল অন্তহীন শক্তি ও উন্নতি লাভ নহে, আমাদের শেষ লক্ষ্য সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের যোগ—সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমগ্র জীবনের যোগ।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

বাহির ভিতরকে নিরন্তর করিবার সাধনাই সকলের চেয়ে সত্যতম সাধনা এবং বৃহত্তম সাধনা, এই কথা আমাদের দেশেই বলা হইয়াছে।

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের বাক্যাবলী।

† ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা।

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের বাক্যাবলী।

কত যুগ ধরিয়া চৈতন্যময় জীব এই পৃথিবীতে আপনার পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবার জন্ত কত সংগ্রাম করিয়া ক্রমাগত নানা বিশিষ্ট বিশিষ্টতর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অবশেষে মানুষে আসিয়া আত্মচৈতন্য জিনিসটা উদ্ভূত হইয়াছে। এই আত্মচৈতন্যই কি কম সংগ্রাম, কম বিরোধ করিল? ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, আপনার সঙ্গে আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহার, আবার আপনার ভিতরে যে নানা বৃত্তি রহিয়াছে তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কত লড়াই! সে সকল সংগ্রাম পার হইয়া আজ আবার আত্মচৈতন্য ছাড়িয়া বিশ্বচৈতন্যে উঠিবার জন্য মানবের মধ্যে প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বিশ্ববোধ নাম দিয়াছেন। সেই চৈতন্যে উত্তীর্ণ হইলেই সকল সংগ্রামের অবসান, সকল বিরোধের সমাপ্তি।

সেই জন্ত প্রবন্ধারম্ভেই আমি বলিয়াছি যে, আধুনিক যুগে পূর্ব্ব পশ্চিমে মিলিয়া বিশ্বমানব নামক একটি অখণ্ড বস্তুর জন্ম লাভ হইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানে আজকাল এই বিশ্ববোধের কথাই নানা দিক্‌ দিয়া জাগিয়া উঠিতেছে; আবার আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, ধর্ম্মসাধনা সমস্তই এই বিশ্ববোধের বৃহৎ ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য, যে বিশ্বমানবের এই নূতন জন্মলাভের পরম মঙ্গলমুহূর্ত্তে আমরা জীবন ধারণ করিয়া আছি! গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে বনের সমস্ত পুষ্পরাজির নিগূঢ় মর্ম্মকোষে যেমন একটা অননুভূত পুলক কোথা হইতে কাঁপিতে থাকে তেমনি সমস্ত মানুষ এদেশে এবং বিদেশে এই বিশ্ববোধ, এই অখণ্ড প্রাপ্তির আনন্দানুভূতিময় জীবনে সকল খণ্ডতার সংস্কারের বাধা বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া সকল হৃদয়ের শতদলমর্ম্মকোষের মধ্যে তাহার বার্ত্তা কি আজ কম্পিত হইতেছেনা?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।*

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে—কিন্তু এখন মিলিবার বাধাসকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

য়ুরোপের যেসকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেন ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড আপন স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে আইরিশ্‌রা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েল্‌স্‌বাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল। আজ ফ্লেমিশ্‌রা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোট ছোট জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে—তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দূরপরাহত হইয়াছে। রুষিয়া আজ ফিন্‌দিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পিরীয়ালিজ্‌মের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্ত্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলণ্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিঁকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেই খানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে বল এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড় দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না।

---

* চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে রিপন কলেজ হলে, ১২ই কার্ত্তিক পঠিত।

চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎক্ষেপক পদার্থ, তাহা কোনো না কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ কাটিয়া এবং কাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন রক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনি সে বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থ ই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যে সমস্ত পাপ্‌ড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনি ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপ্‌ড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনি ফুল সার্থক হয়। আজ পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড় হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড় হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোট সেও যখনি আপন সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনি সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে—ইহাই প্রাণের ধর্ম্ম। বস্তুত সে ছোট হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড় হইয়া মরিতে চায় না।

ফিন্‌রা যদি কোনোক্রমে রুষ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়—তবে একটি বড় জাতির সামিল হইয়া গিয়া ছোটত্বের সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো একটা নেশনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্ব্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুষের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্যপদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মত অন্যায়। আয়র্লণ্ডকে লইয়াও ইংলণ্ডের সেই সঙ্কট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোট খাট একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনি নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্বোধন উপস্থিত হইল তখনি অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেন না, মূর্চ্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কি? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরব বোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড় করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড় হইয়া উঠিলে তখনি পরস্পরের মিলন, সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণ-ঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্য পরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মত করিয়া তোলা উচিত—কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা কিছু শক্তি যাহা কিছু সৌন্দর্য্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতম প্রান্তবাসী গুজরাট বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচে ঢালা সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালী পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জ্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ঐ বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

অতএব, বাঙ্গালী বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিলন হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্ব্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই যে জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা, বিশেষত্ব বিসর্জ্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু'দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটা সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশতঃ সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কার্য্য উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুসঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশী হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপ চাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুসি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে; কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান

করা কষ্টকর;—মানুষ যখন আপনাকে বড় করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারো সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্য্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথেয় কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্যলাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সীধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক্। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্ন মনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার' পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড় কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসঙ্গতরূপে অবাধে এক-ঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে। বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্ত-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পূবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রাচ্যবিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্ব্বের

মতই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমান-শাস্ত্রঅধ্যয়নে একজন জর্ম্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্ম্ম-বশতঃ। আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখী হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্ত্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভাল করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিকমত পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত আহ্নিক তর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে-বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড় আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসঙ্গত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলি আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জ্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই যে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্য্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বে একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত যিনি যতবড় খুসি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচ-জনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্ব্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্ব্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন—কোনো দেবতার মুখ হস্ত পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারো কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জাবোধ হয় না—শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়।

আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই—কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসঙ্গত।

কেননা কার্য্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায়, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসঙ্গত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্য শাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে—অন্য জায়গায় বড় জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না; আমি পূর্ব্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড় একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষতঃ ততদিন আমরা আমাদের যাহা কিছু সমস্তকেই নির্ব্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভাণ করি, কিন্তু তাহা নির্ব্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনই চিরদিন টিঁকিতে পারে না—এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই—তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্ত্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কি করিয়াছে ও কি করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্ব্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে একথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্ত্তিটা সেই রকম। সে কেবলি যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দুসভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বানিজ্য ছিল, তাহার কর্ম্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মত লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দুসমাজে—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মত একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খৃষ্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজে এক মহাপুরুষ একদা অনার্য্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্ম্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্ব্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না;—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি;—প্রাণের ধর্ম্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম্ম বিকাশের ধর্ম্ম, পরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জ্জনের ধর্ম্ম।

এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কা মাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে ত আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড় করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড় হইবার দিকে যাইবেই

—তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র—কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সঙ্কীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পূরা বিশ্বাস রাখি;—ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভাল, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। সে ছাড়া পাইলে চলিবেই। এই জন্য যে সমাজ অচলতা-কেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্ব্বাগ্রে মানুষের মন জিনিষকেই অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাঁধা নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হোক্ সে মনকে ত বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মত দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব—তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই—তাহা স্থাবর পদার্থ—বর্ত্তমান-কালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্ম্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এই জন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া রাখাই হিন্দুসন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দীশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চারিদিকে বড় বড় দরজা ফুটাইবার উদ্যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবে-চনাবশতই করিতেছেন তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষতঃ যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে—এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। এ কথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোন চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। ক্ষেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য্য পরিবর্ত্তনের কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনী শক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্ম্মই এই তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনও জিনিষকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে—যে জিনিষ বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুকেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করি-তেছে—এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড় সত্য—তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড় কথা নহে—ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্ত্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে আধুনিক শিক্ষায় আমাদের ত মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইবে? যাহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে। ইহা আর কিছু নয়,—অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেই জন্য, আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর এক কালের কথা। আধু-নিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি

তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই, সেইজন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মত প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব,—জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—চিরসঞ্চিত ধূলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধূলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে—এই সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে ত স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারম্বার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্খা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে—যাহা অসঙ্গত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্ম্মকে আঘাত করে—যাহা কারাগারের প্রাচীরের মত, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড় করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলঙ্কার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিব না। আমাদের যে সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে সকল সংস্কার থাকাতে কেবলি আমাদের সকলদিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্ম্মে বাধা,—সেই সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে—নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিষকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন—যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকেই লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব—কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যেসকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনো একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসঙ্গতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে—তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না—তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইঁহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে—বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদান প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না—কেহবা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের—কাহারো বা রথ চলিতে চলিতে পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারো বা বৎসরের পর বৎসর টিঁকিয়া থাকে—কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্য্যন্ত

গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের বড়দিন আসিয়াছে—আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধিনিষেধের আড়ালে ধূপদীপের ঘন ঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না—আজ বিশ্বের আলোকে, আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারি একটি রথনির্ম্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিণাম কি তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে,—সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা এই সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখ। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনো আমাদের যতটা আছে তখনো তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এপর্য্যন্ত তাহার ত কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্ত্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই একমুহূর্ত্তেই আমাদের মনের মত কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মত কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিলনা অতএব আমি ইহাকে ত্যাগ করিব—এই খানটাতে আমার মনের মত হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবী করিয়া থাকি—তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্ব্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারি দুর্দ্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মত করিয়া তুলিব—একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁৎ খুঁৎ করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যে টুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত—তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনি গোসা-ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ-সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এই জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনো প্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রত চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে,

তাহাদের বিস্তার হইবে; বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সঙ্কোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফুর্ত্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই তাহারা সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিরসুখ।

সঙ্কটে পড়িলে আমি
ডাকি হে তোমায়,
সঙ্কট রহে না তাই
ছাড়িয়া আমায়,
সুখ আশা এ জীবনে
তাই হে বিফল,
দুখ সনে চিরদিন
জড়িত মঙ্গল।
সুখ মাঝে আপনায়
না পারি ভুলিতে,
না পারি আমার সুখ
তোমারে সঁপিতে;
ফিরে ফিরে আসা-যাওয়া
ঘটিছে হে তাই,
চিরসুখ মম বুকে
না পাইছে ঠাঁই।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বাহাই ধর্ম্ম।

কিছু দিন ধরিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাবীধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে; তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে পারস্য দেশে কিছুকাল হইতে একটি নূতন ধর্ম্মান্দোলন চলিয়া আসিতেছে। মানুষের মন আর সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। মানবচিত্ত ক্ষুদ্রতার প্রাচীর-বেষ্টনের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়া বিস্তৃতভাবে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; অনেক স্থান হইতেই আমরা তাহার সংবাদ পাইতেছি। পারস্যের এই ধর্ম্মান্দোলনের মূলের কথাটি মানবচিত্তের এই ব্যাকুলতা।

তিনটি ব্যক্তির জীবনের সহিত বাহাই ধর্ম্মান্দোলন বিশেষভাবে যুক্ত। প্রথম—বাব, দ্বিতীয়—বাহাউল্লা, তৃতীয়—আব্দুল বাহা। আমরা একে একে ইঁহাদের কথা বলিতেছি।

পারস্যদেশের সিরাজ নগরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাব (দ্বার) নামে খ্যাত মির্জা আলি মহম্মদ একজন পশম-বিক্রেতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হইয়া তাঁহার মাতুল মির্জা সৈএদ্ আলির দ্বারা পালিত হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের লাবণ্য যেন আর দেহে ধরিত না; তাঁহার নম্রস্বভাব এবং পবিত্র চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে মে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত দূত; জ্ঞানবান ও শক্তিসম্পন্ন এক মহাপুরুষ আসিতেছেন, তাঁহারই জন্য তিনি পথ প্রস্তুত করিতে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি ১৮ জন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার মূলের কথা—একেশ্বরে বিশ্বাস। জীবনে সততা, জীবে দয়া, স্ত্রীপুরুষের অধিকারের সাম্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাজশক্তি এবং প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরোহিতেরা তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং তাঁহাদের উপর প্রবল অত্যাচার আরম্ভ হইল। তিনি আপনাকে প্রচার করিবার দুই বৎসর পরে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে কারারুদ্ধ হইলেন এবং চারি বৎসর পরে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পাইলেন ও টাব্রিজে তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হইল। যাহাতে এই ধর্ম্মান্দোলনের একেবারে মূলোৎপাটন করা যায় তজ্জন্য প্রায় ২০,০০০ বাব জীবন হারাইলেন। কিন্তু বাবের দ্বারা যে সত্যের বীজ উপ্ত হইল তাহাকে নষ্ট করে অতি প্রবল অত্যাচারীরও এত বড় যোগ্যতা নাই।

বাব আপন জীবনে গভীর আধ্যাত্মিকতার একটি অনন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে মানবের কি প্রয়োজন তাহাও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কারারুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এবং বন্দী অবস্থায়ও তিনি শিক্ষা দিতেন এবং গ্রন্থ রচনা করিতেন।

তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে যাঁহারা টিহারণে বন্দী হইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মির্জা হুসেন্ আলি নামে একব্যক্তি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন; টিহারণে সকলে তাঁহাকে "দরিদ্রের পিতা" নাম প্রদান করিয়াছিল, তিনি এতই দয়ালু ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা অতি গভীর ছিল। তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি রাজশক্তি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথমে তিনি বোগ্দাদে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরে টিহারণে কারারুদ্ধ হন। কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়া তিনি সেই প্রদেশের পার্ব্বত্য অংশে গমন করিয়া দুই বৎসর নির্জ্জনে প্রার্থনায় যাপন করেন।

তখনো অত্যাচার শেষ হয় নাই। সেই সময় তিনি অনুগামীগণসহ কনষ্টাণ্টিনোপল্-এ তাড়িত হন। সেই খানে যাইবার পথে তিনি আপন পুত্র আব্বাস্ এফেণ্ডি বা আব্দুল বাহাকে (ঈশ্বরের ভৃত্য) বলিলেন যে বাব যে একজনের অভ্যুদয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই একজন। এই মির্জা হুসেন আলিই—বাহাউল্লা (ঈশ্বরের মহিমা)। ইহার পর ইহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কমিয়া আসিয়াছে। কনষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে তাঁহারা একার তাড়িত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদের ৭০ জনকে প্রথমে ২ টি মাত্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে ক্রমে তাঁহাদের অসম নির্ভীকতা, বাধ্যতা এবং গভীর ধর্ম্মজীবন দেখিয়া শাসন-কর্ত্তাদের মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা দুর্গ হইতে ১৮ মাইলের মধ্যে যথেচ্ছা বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাবীগণের অধিকাংশই বাহা-উল্লার পার্শ্বে আসিয়া বাহাই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাবীধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে এই ইতিহাস আরো বিস্তৃততর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাহাউল্লা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন এবং আপন অনুগামীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল বাহাকে রাখিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর আব্দুল বাহা বাহাই-দিগের নেতা হইয়াছেন।

পূর্ব্বে যাঁহাদের কথা বলিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে আব্দুল বাহা (আব্বাস এফেণ্ডি) সেই তিন জনের আর এক জন। ইনি এখনো জীবিত আছেন; অল্পদিন হইল স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই সম্প্রদায়ের সেবাকার্য্যের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি জানিতেন এবং জানিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেন যে, তাঁহার সম্মুখে একটি অতি বিপদসঙ্কুল জীবন রহিয়াছে। বিপদের চিন্তায় তাঁহার মনে কোনো সঙ্কোচের রেখাপাত হয় নাই। তিনি তাঁহার পিতার অনুগামীদিগের ভার স্কন্ধে করিয়াই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে বিশ্বাস বাহাই-দিগকে বল দান করিত তিনিও সেই বিশ্বাসবলেই বলীয়ান হইয়াছেন। মানবের সহিত মানবের যে স্বর্গীয় মিলনের কথা তিনি প্রচার করিতেছেন তাহাই মানুষের সহিত মানুষের শত বিচ্ছেদ শত দ্বন্দ্বের সমস্ত ক্ষত আরোগ্য করিবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন পরিপূর্ণভাবে সুন্দররূপে তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি নাম লইয়াছেন "ঈশ্বরের ভৃত্য"—জীবনে এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন।

তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিত যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে ৪০ বৎসর বন্দী অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অন্তরের সরলতা, এবং প্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস অগাধ।

তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তিতে মস্তক আপনা আপনি নত হইয়া আসে। তাঁহার মুখে অন্তরের আলো সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া আছে। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ইংলণ্ডের সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। যে ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাহারই আভায় তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত রহিয়াছে—ইহা যে মানবচিত্তকে আকর্ষণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই ঋষির পুণ্যপ্রভায় পাপীর কলুষ নাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি জ্ঞানালোক প্রচারব্রতে ব্রতী আছেন—হস্তে তাঁহার সেই স্বর্গীয় আলোক। তাঁহার অন্তর ঈশ্বরের প্রতি, সমগ্র মানবসমাজের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। অল্পদিন হইল লণ্ডনের সিটি টেম্পল্ ধর্ম্মমন্দিরে তিনি যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন আমরা তাহার ইংরাজি অনুবাদ পাইয়াছি। তিনি বলিয়া-ছিলেন—"সদাশয় বন্ধুগণ, তোমরা ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতেছ—ধন্য সেই পরমেশ্বর। আজ সত্যের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত। সকল দেশ ব্যাপিয়া স্বর্গের উদ্যানের মলয়বায় প্রবাহিত হইতেছে; সকল দেশেই সেই জগৎপিতার রাজ্যের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, পশ্চিম স্বর্গীয় সুগন্ধে পূর্ণ হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই মানবাত্মা তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছে। সকল বিশ্বাসীর হৃদয়েই পবিত্র আত্মার হাওয়া বহি-তেছে। পরমাত্মা অনন্ত জীবন দান করিতেছেন। এই অত্যাশ্চর্য্য যুগে পূর্ব্বদেশ আলোকিত হইয়াছে। মানবের একতাবন্ধনের সমুদ্র আনন্দহিল্লোলে তরঙ্গিত হইতেছে, কারণ মানবের হৃদয় ও মন সত্য যোগে এক হইয়া রহিয়াছে। পরমাত্মার পবিত্র নিশান উড়ি-য়াছে এবং মানব তাহা দেখিতেছে এবং বুঝিতেছে যে এক নূতন দিন আসিতেছে। মানবশক্তির এই এক নূতনতর অভিব্যক্তি। জগতের সকল দিক আজ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে; এই জগৎ আনন্দময় স্বর্গীয় উদ্যানে পরিণত হইবে। মানবসন্তানের মিলনের এবং সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর মধ্যে একতাবন্ধনের সময় আসিয়াছে। পুরাতন অন্ধ সংস্কারগুলি, যেগুলি মানুষকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া তাহাকে প্রকৃতরূপে মানুষ হইতে দিতেছিল না সেগুলি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই জ্ঞানালোকের

যুগে ঈশ্বরের দানই এই জ্ঞান যে, মানবসমাজ এক এবং সমস্ত ধর্ম্মই মূলে এক। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহাশান্তি আসিবে। তখন জগৎকে দেখিয়া মনে হইবে নূতন জগৎ—সকল মানব তাহাতে ভ্রাতার ন্যায় একত্র বাস করিবে। পুরাতন কালে হিংস্র জন্তুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মানুষের মনে যুদ্ধস্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে; এখন আর তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। সমবেত চেষ্টায় মানুষের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। আজকাল শত্রুতা কুসংস্কারের ফল। বাহাউল্লা বলিয়াছেন—'ন্যায়কেই সকলের অধিক ভালো বাসিতে হইবে।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ দেশে ন্যায়ের পতাকা উড়িয়াছে। সকল আত্মাকেই সত্যভবে সমান স্থান দিবার চেষ্টা চলিতেছে। সকল মহান্ চিত্তেরই ইচ্ছা এই। আজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়েরই জন্য এই একই শিক্ষা; অতএব পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পরস্পরকে বুঝিবে ও পরস্পরকে ভক্তি করিবে এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলিত প্রেমিকের মত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিবে। ভগবান এক, মানব সমাজ এক, এবং সকল ধর্ম্মের মূলের কথা এক। এস আমরা তাঁহার উপাসনা করি এবং যে সকল মহাপুরুষ তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করি। সেই অনন্তস্বরূপ তাঁহার পূর্ণ সমৃদ্ধিতে তোমাদের সহিত মিলিত থাকুন এবং প্রত্যেক আত্মা তাহার আপন শক্তি অনুসারে তাঁহা হইতে লাভবান হোক। প্রভু, তাহাই হোক!"

তাঁহার এই কথাগুলি হইতেই বেশ বুঝা যায় কি এক বিশ্বজনীন সত্যজ্যোতিতে তাঁহার অন্তরদেশ আলোকিত। মানবসমাজের এক আধ্যাত্মিক মিলনের সংবাদ তিনি প্রচার করিতেছেন; তিনি আপন অন্তরেও সেই যোগ অনুভব করিতেছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে আর্চডিকন্ উইল্‌বারফোর্স তাঁহার নিকট এই কএকটি কথা প্রেরণ করেন—"আমরা সকলে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একই।" আব্দুল বাহা ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তাঁহাকে বল যে, এই অবগুণ্ঠনটি অতি সূক্ষ্ম এবং ইহা সম্পূর্ণরূপেই দূর হইবে।" এ মহামিলনে কোনো ব্যবধান থাকিবে না; সত্য সত্যই মানবসমাজ এক হইবে এই-ই তাঁহার কথা।

বহুকাল কারারুদ্ধ থাকিয়া এই তিন বৎসর হইল তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল তিনি আপনার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই, কেবল অপরের কথাই ভাবিয়াছেন এবং গভীর আধ্যাত্মিক যোগে কালাতিপাত করিয়াছেন। তিনি এইরূপ স্বার্থশূন্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছেন এবং জীবিত রহিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য কারারুদ্ধ হইয়া তিনি কারাগারকে রাজপ্রাসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ ক্লেশানুভব করিতেছিল কিন্তু তাঁহার আত্মা ক্লিষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাকে তাঁহার অনুগামীরা প্রায়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নহে। অনেককেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে এবং হইতেছে। আব্দুল বাহা দৃঢ়বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন—"আমি কেবল ঈশ্বরের একজন ভৃত্য মাত্র এবং আমাকে ইহার বেশি আর কিছু বলা হয় ইহা আমি আদৌ ইচ্ছা করি না।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতে চান না। তাঁহারই কথা—"বাহাউল্লা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিমূলের কথা। যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি লোকশিক্ষক সত্যপ্রচারক মহাত্মাগণ যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার মূলগত সত্য অনেকেই ভুলিয়াছেন। বাহাউল্লা সেই সমস্তকে নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাহাইগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হন, কারণ তাঁহারা জানেন মানবসমাজ এক। বাহাউল্লা প্রীতিবন্ধন ও একতার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি শুধু কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকটেই তাঁহার কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, সমগ্র জগতের নিকটেই তাঁহার সত্য উপস্থিত করিয়াছেন আমরা সকলে এক মূলের উপর বিভিন্ন শাখা—একই ক্ষেত্রের তৃণদল। কেবল ভুল বোঝার জন্যই মানবসমাজে বিচ্ছেদ ও পার্থক্য প্রবেশ করিয়াছে। সত্য যদি সকলের নিকট উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে সকলেই বুঝিবেন যে, সকলেই এক এবং তখন তাঁহারা বলিবেন—'এই তো, এই সত্যই ত আমরা খুঁজিতেছিলাম।' কারণ সকল সত্য-উপদেষ্টার আসল কথা একই—তাঁহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।"

আব্দুল বাহা যখনই কিছু বলেন, মানবসমাজের আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথাই বলিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এবং তাঁহার ধর্ম্মেরও প্রধান কথা ইহাই। পার্থক্য কি বিচ্ছেদ তিনি স্বীকার করেন না—সকলকে তিনি আপন করিয়া দেখেন—আপনাকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ যদি তাহারই ভ্রাতৃস্থানীয় আর একজন মানুষকে

ভালবাসিতে না পারে সে ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কিরূপে ?"

এবার আমরা এই ধর্ম্মান্দোলনের নেতৃগণের সম্বন্ধে বলিলাম, আগামী বারে বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমদৃষ্টি।

ভারতমাতার ছোট ছোট পুত্রকন্যাগণ, তোমরা জান যে রীতিনীতি পদ্ধতিতে তোমরা সকলে এক নহ। তোমরা কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি। কিন্তু তোমরা কখনও ভুলিও না যে তোমরা সকলেই মানুষ ও একই জন্মভূমির সন্তান।

তোমরা একটি কথা স্মরণ রাখিও। তোমাদের প্রাচীন, দয়াবান, জ্ঞানী সম্রাট অশোক তেইশ শতাব্দী হইল এই কথাটি পাথরের উপর লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"উপাসনা-পদ্ধতির জন্য কেহ কোন মনুষ্যের অনিষ্ট করিবে না"।

সম্রাট প্রজার প্রতি অধিক আর বলিতে পারেন না কেননা রাজার দৃষ্টি বাহ্য কার্য্যের উপর। আর তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘনে দণ্ড রহিয়াছে। কিন্তু তোমাদিগকে যাঁহারা ভালবাসেন, তোমরা সৎপথে চলিলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ আনন্দে ভরিয়া উঠে তাঁহাদের তোমাদিগকে আরও কিছু বলিবার আছে। তাঁহারা বলিবেন, তোমরা সৎপথের পথিক, তোমরা মনুষ্য মাত্রের প্রতি দয়াবান, স্নিগ্ধহৃদয় হও; স্নেহ দৃষ্টিতে লোকের প্রতি দেখ, তাহাদের জাতি ধর্ম্ম প্রভৃতি চোগের আড়াল করিয়া রাখ, তোমাদের অন্তরের স্নেহ, ন্যায়, সৌজন্য হিতকার্য্যে ফুটিয়া উঠুক।

প্রাচীনকালে এ দেশে জ্ঞানী, দয়াবান, স্নেহশীল ব্যক্তিগণ এই মনোবৃত্তিকে বলিতেন, সমদৃষ্টি। সমদর্শী ব্যক্তি কাহারও প্রতি ইতর বিশেষ করেন না। সকলের প্রতি সমান স্নেহ রাখিয়া সকলের হিতচেষ্টা করেন।

আধুনিক উপদেষ্টা পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী সমদৃষ্টি শিখাইবার জন্য বলিয়াছেন, "তোমরা ধর্ম্ম জাতি প্রভৃতির উপর লক্ষ্য না করিয়া পরস্পরকে সৎপথে চলিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করিলে পরমাত্মা সমস্ত অহিত লুপ্ত করিয়া জগতে অখণ্ড মঙ্গল স্থাপনা করিবেন তাহাতে প্রত্যেকেই পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে"।

সমদৃষ্টি শব্দ সংস্কৃত হইলেও যে গুণের এই নাম তাহা কোন বিশেষ ভাষা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না।

মহানুভব সর চার্লস এলেন একজন সমদর্শী পুরুষ। অল্পদিন হইল তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। অনেক দেশীয় লোকে তাঁহাকে চিনিত। এক সময়ে তিনি আলিপুরে জেলার হাকিম ছিলেন। সেই সময়ে কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া স্থানে স্থানে বেড়াইতে হইত। একদিন তিনি দেখিলেন এক গ্রামে পথের ধারে একজন অসহায় স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। তাহার ওলাউঠা রোগ হইয়াছে বলিয়া গ্রামের লোক তাহার নিকট যাইতে চাহে না। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। সর চার্লস তাহার জাতিকুল অনুসন্ধান করিলেন না। তাঁহারই মত একজন মনুষ্য পীড়ায় অসমর্থ ও নিরাশ্রয় দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বহস্তে উঠাইয়া চিকিৎসার জন্য নিজে দূরবর্ত্তী ডাক্তারখানায় লইয়া গেলেন। তিনি এই বিষয় কাহারও নিকট কখনো উল্লেখ করিতেন না। বন্ধুরা করিলে লজ্জিত হইতেন।

কলিকাতার সহরতলী ভবানীপুরে নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামে একটি যুবক ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহাকে কেহ চিনিত না। তাঁহার মৃত্যুতে দেশশুদ্ধ সকলে জানিল যে তিনি কিরূপ হিতব্রত সমদর্শী পুরুষ ছিলেন। কলিকাতার ময়লা নিঃসারণের জন্য রাস্তার নীচে প্রকাণ্ড নল রহিয়াছে। নিয়মমত পরিষ্কার না করিলে নলের ভিতর বিষময় বায়ু জন্মিয়া সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এজন্য মধ্যে মধ্যে নলের ভিতর কুলি নামাইতে হয়। যে গর্ত্ত দিয়া নলে নামে তাহার নাম ম্যানহোল। একদিন দুইজন মুসলমান কুলি ম্যানহোল দিয়া নলের ভিতরে নামে। তখন নলে এত বিষময় বায়ু ছিল যে কুলিদ্বয় তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িল। নফর দেখিবামাত্র তাহাদের জাতি, ধর্ম্ম, অবস্থা বিচার না করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য ম্যানহোল পথে নলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ স্বদেশী, বিদেশী ব্যক্তিগণ চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মরণ-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে খোদিত কথাগুলি এই:—

"যিনি সম্মুখবর্ত্তী ম্যানহোল হইতে দুইজন মুসলমান কুলিকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,

যিনি ইটালির রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সভ্য ছিলেন, পরহিতসাধন যাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল

সেই
স্বর্গীয় নফরচন্দ্র কুণ্ডুর
স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ
এই কীর্ত্তিস্তম্ভ
তাঁহার সদ্গুণের পক্ষপাতী ইউরোপীয় ও দেশীয়
জনসমূহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত হইল।
জন্ম ১০ই চৈত্র ১২৮৭ সাল
মৃত্যু ২৯ শে বৈশাখ ১৩১৪ সাল।"

কাবেরী নদীতে বন্যা। জল যেন পাগল হইয়া ছুটি-

তেছে। পড়িলে জীবনের আশা কিছুমাত্র নাই। এই অবস্থায় একটি নৌকা হইতে একজন কুলি পড়িয়া যায়। হিতব্রত সমদর্শী কাপ্তেন ডস্ তাহাকে উঠাইবার জন্য সেই মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপাইয়া কুলিকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে প্রাণ হারাইলেন। ইঁহার স্মৃতিস্তম্ভ নাই। কিন্তু ভারতমাতার হৃদয় হইতে এই ইংরাজ পুরুষসিংহের স্মৃতি কখনো বিলুপ্ত হইবে না, আশা করা যায়।

বাদসাহ আকবরও এইরূপ একজন পুরুষসিংহ ছিলেন। তিনি জাতি কুল ধর্ম্মকে নগণ্য করিয়া গুণের আদর করিতেন।

যে সৎপথে এত মহাপুরুষের পদাঙ্ক রহিয়াছে, হে বালক বালিকাগণ, সেই পথে চলিতে কি তোমরা বিরত বা সঙ্কুচিত হইবে?

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

(১) নিঃশব্দ গৃহ।

কিছুদিন হইল য়ুট্রেক্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহির হইতে কোনো প্রকার শব্দ প্রবেশ করিতে না পারে এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য কক্ষ প্রস্তুত করা হইয়াছে। কক্ষটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সাড়ে সাত ফুট্ ও এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সর্ব্বোচ্চ স্থানে নির্ম্মিত। বহুকক্ষপরিবেষ্টিত হইলেও ঘরটীতে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে প্রয়োজন হইলে আলো ও বাতাসের কোনো অভাব না ঘটে। দেওয়াল ছাদ ও মেঝে প্রত্যেকটী প্রায় ছয় রকমের বিভিন্ন জিনিষের স্তরে নির্ম্মিত; এবং ছিদ্রগুলি শব্দরোধক পদার্থের দ্বারা পূর্ণ। গৃহাগারে কোনো কোনো ব্যক্তি কানে এক অস্বাভাবিক অনুভূতি বোধ করেন। শব্দ-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান উদ্দেশ্যে এই কক্ষটী প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া যেমন একদিকে বাহিরের শব্দ রোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে আবার আবশ্যক মত বাহির হইতে শব্দ প্রবেশ করাইবার জন্য একটী তামার নল ব্যবহৃত হইয়াছে; যখন প্রয়োজন না হয় তখন সীসা দ্বারা নলের মুখ বন্ধ রাখা হয়।

(২) পাকস্থলীর সহিষ্ণুতা।

উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জ্জনা পাওয়া গিয়াছে সময়ে সময়ে চিকিৎসকদের নিকট একথা শোনা যায়; কিন্তু দীর্ঘকাল নানা প্রকার কঠিন পদার্থ পাকস্থলীতে স্থান পাইতে পারে ইহা কেহ মনে করিতে পারে না। কিছুকাল হইল লণ্ডন ল্যান্সেট্ পত্রিকায় একটী অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে। অতিরিক্ত উত্তেজক দ্রব্য সেবনের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মিমৌরি ষ্টেট্ হাঁসপাতালে ৩৩ বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক প্রায় সাত বৎসর ছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ ব্যতীত পাকস্থলীর কোনো প্রকার ব্যাধির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। অনেক সময় দেখা যাইত স্ত্রীলোকটী আল্‌পিন্, কুলের কাঁটা, পেরেক ইত্যাদি কুড়াইতেছে কিন্তু কেহ তাহাকে ঐ গুলি গলাধঃকরণ করিতে দেখে নাই। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল তাহার পাকস্থলীটি যেন নীচের দিকে একটু বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পাকস্থলীটি কাটিয়া প্রায় আড়াইসের নানাবিধ কঠিন পদার্থ বাহির করিয়াছেন; নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল:—৪৫৩টা পেরেক, ৪২টা স্ক্রু, ১৩৬টা আল্‌পিন্, ১৫৫টা সেফ্‌টি পিন্, ৫২টা কার্পেট লাগাইবার পেরেক, ৬৩টা বোতাম ও ১৪৪৬টা ছোট বড় নানা প্রকার বিভিন্ন পদার্থ। আশ্চর্য্য এই, এতগুলি কঠিন পদার্থ উদরে রাখিয়া সাত বৎসরের মধ্যে পাকস্থলীর কোনো প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মানুষের পাকস্থলী কতটা ভার বহন করিতে পারে, এই ঘটনাটি তাহারই পরিচায়ক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৩) নিরামিষ আহার।

একটা কথা আছে আমিষাশী জীব অপেক্ষা নিরামিষভোজী জীবেরা অধিক কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার আহার তৃণ ও শস্য, কিন্তু তাহারা কিরূপ ভার বহন করিতে পারে, সহিষ্ণুতার সহিত বহুক্ষণব্যাপী কষ্ট সহ্য করিতে পারে তাহা আমরা জানি। আমিষাশী জীব সিংহ ব্যাঘ্র সেরূপ পারে না—অল্পেই তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মানুষের মধ্যেও যাহারা নিরামিষভোজী তাহারা যে আমিষাশীগণ অপেক্ষা অধিক সবলদেহ ও কষ্টসহিষ্ণু হয় তাহা নিম্নলিখিত দুইটি পরীক্ষা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

লণ্ডনের নিরামিষ-আহার-প্রচারিণী সভার সম্পাদিকা কুমারী শ্রীমতী এম্, আই, নিকোল্‌সন্ ১০,০০০ বালক-বালিকাকে কেবলমাত্র নিরামিষ আহার দিয়া ছয় মাস রাখিয়াছিলেন এবং অন্যত্র লণ্ডনের কাউণ্টি কাউন্সিলের অর্থে ১০,০০০ বালক-বালিকাকে আমিষ আহার দিয়া ছয় মাস রাখা হইয়াছিল। ছয় মাসের পর এই উভয় দলকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে নিরামিষ আহার্য্য-প্রাপ্ত বালক-বালিকারাই অপর দল অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবান হইয়াছে এবং তাহাদের দেহের ভার, মাংসপেশির দৃঢ়তা এবং গাত্রবর্ণের শুভ্রতা অধিক হইয়াছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে ব্রুসেল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপিকা চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ কুমারী শ্রীমতী টোটেকো মানবদেহের উপর সুরাসার, ক্যাফীন্‌ প্রভৃতি পদার্থের কার্য্য পরীক্ষা করিবার সময় যে সকল লোকেরা অধিক পরিমাণে য়ুরিক এ্যাসিড্‌ গ্রহণ করে না এরূপ কতকগুলি লোকের উপর পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন। মাংসে য়ুরিক্‌ এ্যাসিড্‌ বহুল পরিমাণে থাকে, কাজেই তাঁহার পরীক্ষার জন্য নিরামিষভোজী লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কতকগুলি সেইরূপ ব্যক্তিকে তাঁহার পরীক্ষাগারে আগমন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আসিলেন। তিনি এর্গোগ্রাফ্‌ নামক মাংসপেশির বল-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে সমাগত নিরামিষভোজী ব্যক্তিগণের শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের শক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া এতদূর আশ্চর্য্য হইলেন যে, তিনি মনে করিলেন এই লোকগুলি বিশেষভাবে শক্তিসম্পন্ন, সাধারণ শ্রেণীর লোক নহেন। এইরূপ মনে করিয়া এ বিষয়ে আরো গভীরভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি নিরামিষভোজীদিগের সমিতির সকলকে তাঁহার পরীক্ষাগারে আহ্বান করিলেন। তার পর যতদূর সম্ভব সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, একজন সাধারণ শ্রেণীর নিরামিষভোজীর বল এবং কষ্টসহিষ্ণুতা একজন সাধারণ আমিষাশীর তিন গুণ। ইহার অল্পকাল পরেই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ফিশার আমেরিকায় এই বিষয়ে পরীক্ষা করেন।

কুমারী টোটেকো পূর্ব্বে আমিষভোজী ছিলেন; এই পরীক্ষার পর তিনি নিজেও আমিষ আহার ত্যাগ করিয়াছেন। এই বিষয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি ফ্রান্সের চিকিৎসক-সমিতির নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মানুষের পক্ষে নিরামিষ আহারই যে প্রশস্ত আজকাল অনেক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞেরই এই মত। নানা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল তথ্য প্রচার করিয়া নিরামিষ-আহার-প্রচারিণী সভা সকলকে আহারের জন্য প্রাণীহত্যা রূপ হিংস্র বৃত্তি ত্যাগ করিয়া যাহা বিজ্ঞানানুমোদিত সেই আহার্য্যই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নানা কথা।

শোক সংবাদ।

(১)

বিগত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি প্রায় দুইমাস ধরিয়া রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, দিন দিন দেহের বল ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অমর আত্মা অনন্ত ধামে গমন করিয়াছে। মহর্ষির প্রিয় শিষ্য তাঁহার শেষ জীবনের সঙ্গী উপনিষদ্‌ভক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের অভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। মহর্ষিদেবের পরলোকগমনের পরে আমরা একে একে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ভক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয়কে হারাইয়াছি। প্রাচীন দলের প্রায় সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। যে সকল ভক্ত সাধু ও পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহর্ষিদেব পরিবেষ্টিত ছিলেন তিনি তাঁহাদের সকলকে ক্রমে ক্রমে আহ্বান করিয়া লইয়া সেই পবিত্র দেবলোকে নব নব উৎসবানন্দ উপভোগের আয়োজন করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট তাঁহারই রচিত। মহর্ষির পত্রাবলী বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকাশিত করেন। গত ২৮এ কার্ত্তিক তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার বালিগঞ্জের ভবনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি দীনদরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করা হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও বন্ধুবর্গের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

(২)

আমাদের সুপরিচিত জ্ঞানী পণ্ডিত বেদান্তশাস্ত্রবিৎ কালিবর বেদান্তবাগীশ আজ কয়েকদিন হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বহুকালের ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তাঁহার রচিত সাংখ্য পাতঞ্জলের বহুল অংশ সর্ব্বপ্রথম তত্ত্ববোধিনীতেই বাহির হয়। মহর্ষিদেব ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রথমাবধি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধও পত্রিকাতে মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী তাঁহার মত অতি অল্প লোকই বর্ত্তমান সময়ে জন্মিয়াছে। বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের জন্য তিনি সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়ের অভাব অনুভব করিতেছি। দয়াময় তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
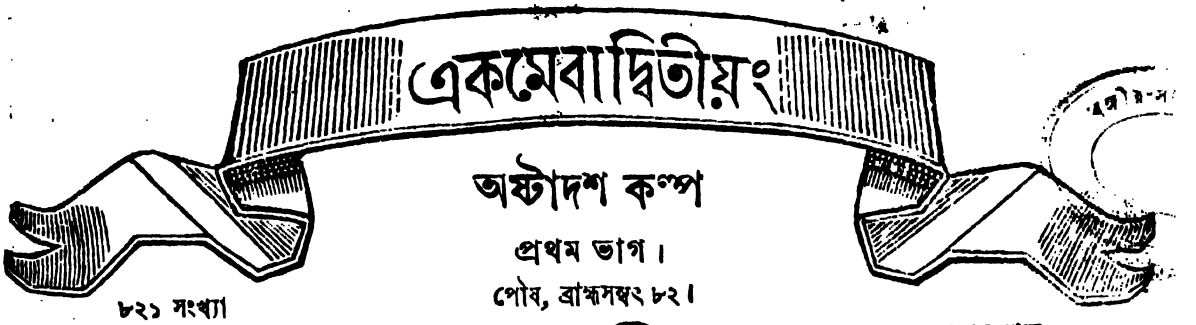
বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

ডাক্তার রিচার্ড দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃষ্টান মিশনরি।

তিনি লিখিতেছেন একবার তিনি কার্য্যবশত হ্যানকিং সহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশ সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনরুদ্ধার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম য়াঙ্ বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অনুচররূপে দীর্ঘকাল য়ুরোপে যাপন করিয়াছেন। কন্‌ফুসিয় শাস্ত্রশিক্ষায় তিনি উচ্চ উপাধিধারী।

ডাক্তার রিচার্ড তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কন্‌ফুসিয় উপাধি লইয়া কি করিয়া বৌদ্ধ হইলেন," তিনি উত্তর করিলেন "আপনি মিশনরি হইয়া আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি ত জানেন কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কন্‌ফুসিয় ধর্ম্মের লক্ষ্য - যাহা সংসারের অতীত তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই।" রিচার্ড সাহেব কহিলেন "যাহা সংসারের অতিবর্ত্তী তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?" তিনি কহিলেন "হাঁ"। পাদ্রি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় তাহা পাওয়া যায়?" বেন্ হুই উত্তর করিলেন "ভক্তিউদ্বোধন' নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই পুস্তক পড়িয়াই কন্‌ফুসিয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি।"

ডাক্তার রিচার্ড এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতেছিলেন—তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ আমি আশ্চর্য্য একটি খৃষ্টান বই পড়িতেছি।"

ডাক্তার রিচার্ড যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত—অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে কেবল চীনভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্ত্তমান আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম জিনিষটা কি সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্ম্মে ধর্ম্মের আর সমস্ত অঙ্গই আছে কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্ম্মে ইহার মন্দিরটি গড়া, কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই, সেখানে নির্ব্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্ব্বাসিত।

আমরা ত বৌদ্ধধর্ম্মকে এই ভাবে দেখি অথচ দেখিতে পাইতেছি বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে খৃষ্টান এমন কিছু লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্ম্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না,—এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কন্‌ফুসিয়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, "হাঁ, চারিত্রনীতির উপদেশে খৃষ্টানধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের মিল আছে একথা সকলেই স্বীকার করে।" কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিষটা মনোরম নহে;—তাহা ঔষধ; তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড় হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে

এবং তাহাকে পরিতৃপ্ত করে তবে জানিব তাহার মর্ম্মটি তাহার ধর্ম্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

ডাক্তার রিচার্ড অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর;—যাহা দার্শনিকতত্ব নহে, যাহা আচার অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে। সেই জিনিষটি কোথা হইতে আসিল?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ আচার্য্যের নাম সোয়েন্ শাকু; ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেঙ্কোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন "আমরা বস্তুমাত্রের সীমাবদ্ধ বিশেষ সত্তা মানিয়া থাকি। সকল বস্তুই দেশে কালে বদ্ধ হইয়া কার্য্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শূন্য নহে, এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে। আমরা বৌদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি, যাহা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা, মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বস্তুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মনুষ্যে নহে, পশু ও জড়বস্তুতেও আদিকারণের দিব্যস্বভাব প্রকাশমান হইতেছে।

"ইহা হইতেই বুঝা যাইবে আমাদের মতে একই বহু এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খুঁজিতে যাওয়া ভ্রম। তাহা আমাদের মধ্যেই অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে—জগতের সমস্ত পদার্থসমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে এই বিষয়রাজ্য অসত্য নহে, ইহার মূল কারণ জ্ঞানস্বরূপ, এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।"

উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্য্যের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈক্য হইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে—এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম বলিব—আর যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিব না এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্ম্মকে ধর্ম্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্ম্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে—তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্ম্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃষ্টানধর্ম্মে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যাল্‌ভিন্‌পন্থীদের অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্ম্মের মূল এক জায়গায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা যদি কেবলমাত্র ক্যাল্‌ভিন্‌পন্থীদের মত হইতে খৃষ্টানধর্ম্মকে বিচার করি তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণতঃ হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্ম্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ, মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্ম্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনরিরা যখন আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করেন তখন দেখিতে পাই তাঁহারা কেবলমাত্র বই পড়িয়া বা সাময়িক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদেশীর ধর্ম্মসম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুক্‌রা জোড়া দিয়া ধর্ম্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা শক্ত—এবং ধরিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া নির্দ্দেশ করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃষ্টানধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, খৃষ্টানের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃষ্টানধর্ম্মের কথা শুনিতে পান—এইজন্য তাহার ভিতরকার সুরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়। যদি কেবল প্রাচীন শাস্ত্র পড়িয়া বচন জোড়া দিয়া তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত বুলাইয়া রূপ নির্ণয় করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত।

অর্থাৎ মোটামুট একটা আকৃতির ধারণা হইত কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্ব্বোচ্চ ধারণা নহে। রূপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে সকল অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ আছে তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্ম্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্ম্মের রসধারায় সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্ম্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাঁহা নিতান্ত মোটা জিনিষ; তাহা আলোকহীন চক্ষুহীন স্পর্শগত অনুভব মাত্র।

এই জন্য এইরূপ শাস্ত্রগড়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আমরা এমন জিনিষ পাই না যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেককাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথার আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই—তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

অথচ এই ধর্ম্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে—শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্ততঃ একথা বুঝা যায় যে বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শঙ্করের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্ম্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্ম্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এক কালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত—এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি হিবার্ট জর্নালে খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে এই দুই ধর্ম্মধারার মূলে আমরা একটি জিনিষ দেখিতে পাই—উভয় স্থানেই সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে।—

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মেই সর্ব্বপ্রথমে কোনো একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহা নহে—তিনি যেন মূর্ত্তিমান অসীম প্রজ্ঞা, অসীম করুণা। তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন—সে তাঁহার কর্ম্মফলের অনিবার্য্য বন্ধন নহে সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছারচিত বন্ধন।

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারিব না। বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবতারবাদ এই ভক্তি-বাদের দিকটাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধু হোনেন জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে হইতে যে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিকসম্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্ম্মের মর্ম্মগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। তিনি বলিয়াছেন, অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত, সুখাবতী নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে কেহ ব্যাকুল-চিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলীসহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই

দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধ যেখানেই মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছে—সেখানে তাঁহার ধারণার সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটি মুখ বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্ম্মে জ্ঞান, সঙ্ঘে কর্ম্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোনো একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্ম্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই—প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎ সত্তাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয়—ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা বিচিত্র রূপরস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে "না" করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিষটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্ম্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

একদিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে বুঝিতেই হইবে শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে, সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে—এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে। একদল তার্কিক এমন ভাবে তর্ক করে যে যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের তাৎপর্য্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না, যখন শুনিতে পাই, প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে। এই প্রেমের ফসল নির্ব্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন "ইতিবুত্তকং" নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন:—

যস্স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা;
তম্ ভাবিতত্তঞ্ঞতরম্ ব্রহ্মভূতম্ তথাগতম্
বুদ্ধম্ বেরভয়াতীতম্ আহু সব্বপহায়িনন্তি।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে তাঁহাকে ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্ব্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়।"

"ব্রহ্মভূত" শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।

মহেশ বাবু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগমূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম্ম নহে। তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না।

বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্বই এই যে একদিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম্ম ধ্যানের ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যখন দীর্ঘকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা তিনি হারাইলেন। কারণ তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধি প্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনই তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্ম্ম বিশুদ্ধ কর্ম্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই—তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত—তাহা দয়ার কর্ম্ম, প্রেমের কর্ম্ম।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ করিবেন তাঁহাকে, কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

এই জন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিঠ্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেই-রূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উর্দ্ধদিকে অধোদিকে চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন—ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে।

এই প্রেমকেই যদি সর্ব্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন? করুণা বল, প্রেম বল, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই।

মহাযান সম্প্রদায়ীরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অথচ যিনি আধুনিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত তাইতারো সুজুকির নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বঘোষের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থগুলি আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইংরেজি Quest পত্রে সম্পাদক মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে, যেমন বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাঙ্কর ভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মগত সত্য সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।

একথা স্পষ্টই মনে হয় ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এতবড় মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও বা পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া সেই ধারা নানা শাখা প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে একস্থানে আভাস দিয়াছি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সৃষ্ট করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুকে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্যপদার্থ, তাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ধর্ম্মের যেমন মতই হোক না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হোক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দ্দেশ করেন নাই। এই জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তীদের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরম পুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অশ্বত্থ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মন্দিরকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে ভাঙিয়া চুরিয়া নানাখানা করিয়া ফেলে—কেননা যেখানে তাহার খাদ্য যেমন করিয়া হোক, সেখানে তাহাকে শিকড় পাঠাইতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম একদা দেবতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই ধর্ম্মে ভক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল—কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই এই কারণে সে বাঁকিয়া চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিত্য-আশ্রয়ের মধ্যে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুক্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই

বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষে যে সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব সে সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে এই কথার খুব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খুসি করিতে পারিলেই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি দ্বারা মানুষ সহজেই সদ্গতি লাভ করিবে এই প্রকার তখন বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য, সাধু কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তির পথ সুগম হয়। মুক্তি যথার্থ সাধনার দ্বারাই সাধ্য এখানে অল্পমাত্রও ফাঁকি চলেনা।

কিন্তু মানুষ জানে আত্মশক্তিই পর্য্যাপ্ত নহে। শুধু চোখ দিয়া আমরা দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলেনা। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক আর একটা দিক আছে নির্ভরের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে ইহার একটাকেই একান্ত করিয়া দিলে এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব উপস্থিত হয় যে উল্টা দিকটা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে যত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন আসিল যেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভরের আর সীমা রহিল না। হোনেন বলিয়াছেন বড় বড় ভারি পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায় তেমনি পর্ব্বতাকার পাপের বোঝা সত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্ম মৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পষ্টই বলেন, "কখনো মনে করিয়োনা আমরা স্বকর্ম্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতাতেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তিপ্রভাবে পরমগতি লাভ করে।

এই যে কথা উঠিল বুদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমাদিগকে ত্রাণ করিতে পারে—এইখানেই মানবগুরুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য মানবকে এখানে যে ভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, সর্ব্বত্রই গুরুবাদের সেই বিশেষত্ব; গুরুর মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় যাহা মানুষের শক্তি নহে।

সুফিধর্ম্মেও গুরুবাদের এইরূপ প্রবলতা দেখা যায়। অথচ বিশুদ্ধ মুসলমানধর্ম্ম এই প্রকার গুরুবাদের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, এসিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুফিধর্ম্মের এই গুরুবাদ, পুনশ্চ, আমাদের দেশেই বাউল ও কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া গুরুবাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবর্ত্তিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছেনা। মানুষের মন একবার যখন এই অদ্ভুত কল্পনায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

নাম জপ করা এবং নামাবলী আবৃত্তিও আমরা মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনেন বলিয়াছেন যে কেহ সর্ব্বান্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই পুণ্য-জীবন লাভে বঞ্চিত হইবে না। যে কোনো প্রাণী বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ইহাও হোনেনের উপদেশ। বস্তুতঃ বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই কিন্তু তাঁহার নাম আছে। মানুষের অভাবে মানুষের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কি?

বৌদ্ধধর্ম্মে একদিন মুক্তির পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল—সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধধর্ম্ম করুণাকে আদর করিয়াছে কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মানুষ উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম স্মরণে ও উচ্চারণেই মুক্তি হইতে পারে এই আশ্বাস দিয়া মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এতদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে পূরণ করিতে করিতে, যেখানে ত্রুটি আছে, সংশোধন করিতে করিতে ধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মানুষের উপায় নাই। এই জন্যই কোনো বড় ধর্ম্মকে কোনো এককালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। একদিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার আত্মসামঞ্জস্য উদ্ধার করে কিন্তু আই বলিয়া সেই দিকেই, সে হেলিয়া থাকিতে পারে না—প্রত্যাগমকে

আশ্রয় করিবার জন্যই তাহার চেষ্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকাডুবি।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে কি তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সমগ্রতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না একথাকে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না—এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে একথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্ম্মেরই গম্যস্থান যেখানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।*

(আবহমান)

ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়ার কথাটির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার প্রথম উপক্রমে সত্বগুণের দুইটি অবয়ব প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—(১) সত্তার প্রকাশ এবং (২) সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। তাহার পরে সত্বগুণের আর-একটি অবয়ব সহসা আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত হইল—(৩) সত্তা'র আত্মসমর্থনী শক্তি, সংক্ষেপে—আত্মশক্তি। ঐ তিনটি সত্বাঙ্গের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ সহযোগিতা-সম্বন্ধ—বিগত প্রবন্ধাংশে আমি তাহার ঈষৎ আভাস মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলাম;—বলিয়াছিলাম কেবল এইমাত্র যে,

> আনন্দ সত্বগুণের হৃদয়;
> প্রকাশ সত্বগুণের বামহস্ত;
> আত্মশক্তি সত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত।

এইস্বল্প ইঙ্গিতটুকুর মধ্যে মনোনিবেশপূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আত্মসত্তা'র প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা একটা-শুধু মনোবৃত্তির অ্যাক্‌লার কার্য্য নহে;—চলন-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই পদের পরিচালনা সমান-আবশ্যক, সন্তরণ-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই হস্তের পরিচালনা সমান-আবশ্যক, আত্মসত্তার প্রকাশের পক্ষে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি এই দুই বৃত্তির উভয়েরই পরিচালনা সমান আবশ্যক। আবার, চলন-কালে যেমন দুই পদ স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে; আত্মসত্তার- প্রকাশকালে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি উভয়ে মিলিয়া স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে। ভূতপূর্ব্ব বিষয়ের স্মরণ কিরূপে বর্ত্তমান বিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার গোটাদুই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যখন সাত রঙ্ এক সঙ্গে মিশিয়া কিরূপে সাদা রঙ্ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ছাত্রবর্গের প্রত্যক্ষগোচরে আনিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সেই অভিপ্রেত কার্য্যটি নিষ্পাদন করেন এইরূপ সুকৌশলে:—
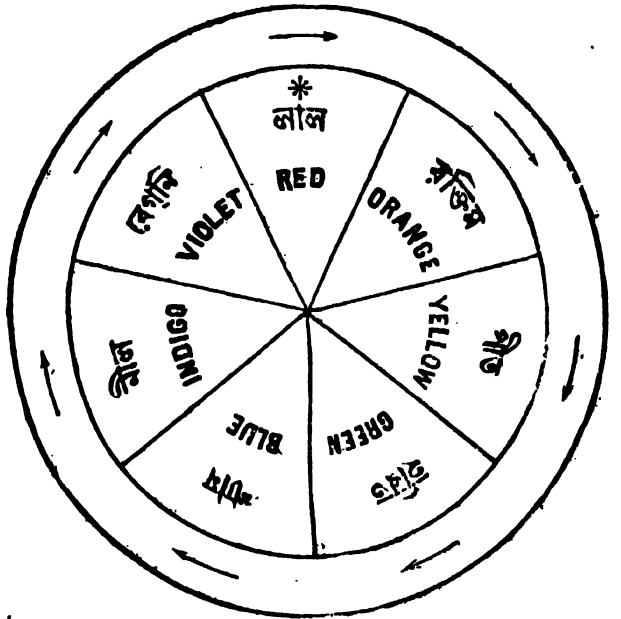
অধ্যাপক চূড়ামণি একটি চক্রফলক'কে সাতরঙের সাতটি কেন্দ্রোত্থপুচ্ছাকৃতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যন্ত্রযোগে দ্রুতবেগে ঘুরাইতে থাকেন, আর, তাহারই গুণে সাতরঙ এক সঙ্গে মিশিয়া ছাত্রবর্গের চক্ষের সম্মুখে সাদা রঙে পরিণত হয় (ক্ষেত্র দেখ)। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে প্রথমে:ছিল ঘূর্ণায়মান চক্রটা'র বেগ্‌নি খণ্ড, তাহার পরে আসিল নীল খণ্ড, তাহার পরে শ্যাম খণ্ড, তাহার পরে হরিত খণ্ড, তাহার পরে পীত খণ্ড, তাহার পরে রক্তিম খণ্ড। এইরূপে ঐ তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে ছয় রঙের ছয় খণ্ড একে একে আসিয়া ওখান-হইতে ঘুরিয়া গেল যেম্নি-মাত্র, তৎক্ষণাৎ অম্নি লাল-খণ্ডটি ঐ স্থান অধিকার করিল। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানে লাল-খণ্ডটি যখন উপস্থিত, তখন দর্শক ঐ স্থানটিতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছে শুদ্ধ কেবল লালরঙ, তা ছাড়া আর কোনো রঙ নহে; কিন্তু, হইলে কি হয়—

[নীলমণি এবং শ্যামচাঁদ দুই নামই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-পরিচায়ক; তা'ছাড়া কালিদাস একস্থানে আকাশের বিশেষণ দিয়াছেন অসি-শ্যাম অর্থাৎ তলোয়ারের মতো শ্যামবর্ণ। আকাশের বর্ণ ইংরাজি ভাষায় blue। আকাশের বর্ণকে শ্যাম বলাও যাইতে পারে, নীল বলাও যাইতে পারে; কিন্তু indigo'কে নীল ভিন্ন শ্যাম বলা যাইতে পারে না।]

* শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধ-পাঠ সভায় পঠিত।

আর-ছয়টা রঙের সব-ক'টাই দর্শকের স্মরণের খিড়্‌কি দ্বার দিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া লালরঙের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া গেল। লাল, তাই, এক্ষণে আর লাল নাই—লাল এক্ষণে সবার'ই সমক্ষে সাদা। চূড়াস্থানের এ যেমন দেখা গেল—সব স্থানেরই ঐ দশা; ঘূর্ণায়মান চক্রফলকটা'র ব্যাপ্তিস্থানের প্রত্যেক বিভাগেই সব-ক'টা রঙ স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে প্রতিমুহূর্ত্তে একসঙ্গে জড়ো হইয়া সাদা রঙে পরিণত হইতেছে। এরূপ স্থলে স্মরণ স্মরণ-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির পদে আরূঢ় হয়। এটা চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত;—ইহারই জুড়ি ধাঁচার আর-একটি দৃষ্টান্ত আছে—সেটা শ্রৌত দৃষ্টান্ত; সেটাও দেখা উচিত। সেটা এই:—

তুমি যখন মুখে উচ্চারণ করিতেছ "শ্রী" এই একটিমাত্র শব্দ, তখন তোমার শ্রবণগোচরে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছে শ্, তাহার পরে র্, শেষে উপস্থিত হইল ঈ। ঈ যখন তোমার শ্রবণে উপস্থিত, তখন শ্ এবং র্ উভয়েই তোমার স্মরণের খিড়্‌কি-দ্বার দিয়া চুপি চুপি সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঈ'র সঙ্গে দিব্য অবলীলা-ক্রমে মিশিয়া গিয়াছে; আর সেই গতিকে তুমি ঈ শুনিবামাত্রই তাহার পরিবর্ত্তে "শ্রী" শুনিতেছ। এই দৃষ্টান্তের পরিষ্কার আলোকে এটা এখন বেস্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনে সাক্ষাৎ উপলব্ধিরও যেমন, স্মরণেরও তেমনি, দুয়েরই কার্য্যকারিতা সমান।

একটি বিষয় কিন্তু এখনো বুঝিতে বাকি আছে—সেটা হ'চ্চে এই যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণের সংযোগ ঘটে কিরূপে? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এই যে, সংযোগ ঘটে আত্মশক্তির বলে। আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনের অর্থই হ'চ্চে আত্মসমর্থন—তাহা আত্মসমর্থনী শক্তিরই কার্য্য। যখন আমরা চলিতে আরম্ভ করি তখন স্বভাবতই আমাদের দুই পা একযোগে কার্য্য করে দেখিয়া আমাদের মনে হইতে পারে যে দুই পা'য়ের চলনের মধ্যে যোগ রক্ষা করিবার জন্য চলনকর্ত্তার কোনো-প্রকার শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের মনে হয় বটে ঐরূপ; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বিনা শক্তিতে কোনো কার্য্যই সম্ভবে না। এমন কি, সমস্ত দিন আমরা যে, ঘাড় উঁচা করিয়া বসি দাঁড়াই এবং চলাফেরা করি, এই সহজ কার্য্যটিতেও আমাদের শক্তি খাটে কম না। তার সাক্ষী—একঘেয়ে পুরাতন কথার অজস্র ধারা শুনিতে শুনিতে সভার মাঝখানে যখন কোনো শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণ হয়, তখন তাঁহার গ্রীবোন্নামনী শক্তির উদ্যম শিথিল হওয়া গতিকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘাড় ঢুলিয়া পড়ে। ইহাতেই অ্যাক-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণ জোড়া দিয়া প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা বিনা-শক্তিতে সম্ভাবনীয় নহে;—তাহা আত্মশক্তিরই কার্য্য তাহাতে আর ভুল নাই। তবে এটা সত্য যে, প্রথম উদ্যমে আত্মশক্তি দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষে আপনাকে ধরা দ্যায় না। প্রথম উদ্যমে, সন্ধিসূত্র যেমন দ্রবীভূত শর্করারাশির মধ্যে ঢাকা থাকিয়া চারিদিক্ হইতে নিঃশব্দে পরমাণু সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র স্ফাটিক ব্যূহ (মিছ্‌রি) নির্ম্মাণ করে, আত্মশক্তি তেমনি প্রকৃতি-গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া বর্ত্তমানমুখী সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভূতমুখী স্মৃতি এই দুই বিভিন্নমুখী মনোবৃত্তিকে এক সূত্রে বাঁধিয়া সেই জোড়া-মনোবৃত্তি'কে আত্মসত্তা'র উদ্দ্যোতন-কার্য্যে সমভাবে নিয়োজিত করে। প্রথম উদ্যমে, এইরূপ, আত্মশক্তি প্রকৃতি-গর্ভে তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অলক্ষিতভাবে কার্য্য করে। দ্বিতীয় উদ্যমে, আত্মশক্তি আত্মসত্তা'র প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে অভ্যুত্থান করিয়া আত্মসত্তা'র নৈবেদ্যের ডালা হইতে রজস্তমোগুণের আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া দ্রষ্টাপুরুষের আনন্দ-বর্দ্ধন করে।

আত্মশক্তির দুই উদ্যমের কথা এ যাবৎ আমি বলিতেছি—এ কথা আমি কোথা হইতে পাইলাম? বেদ হইতে—না কোরাণ হইতে—না বাইবেল্ হইতে? তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, আদিম শাস্ত্র বেদও নহে, কোরাণও নহে, বাইবেলও নহে।

আদিম শাস্ত্র আবার কোন শাস্ত্র?
তাহা জানো না?—
সে যে মহাশাস্ত্র!
তাহার নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের পুরাণ-কাহিনী যথাবিহিত স্পষ্টাক্ষরে আনুপূর্ব্বিক লেখা রহিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের অভিনব কাহিনী সেইরূপই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া মানবমণ্ডলীর বংশ পরম্পরার মুদ্রাযন্ত্র হইতে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়া মান্ধাতার আমল হইতে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে এবং আরো যে কত যুগযুগান্তর চলিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই দুই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা কার্য্য আমাদের দেশের পুরাকালের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা সাধ্যমতে এক দফা করিয়া চুকিয়াছেন এখন আবার—পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সেই পুরাতন, অথচ নিত্য-নূতন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কার্য্যের অনুষ্ঠানে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জীবদিগের অজ্ঞাতসারে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তলে তলে কার্য্য করিয়া—জীবেরা যাহাতে যথাকালে মনুষ্যত্বের ব্রহ্ম ডাঙায় তমোগুণের মৃত্তিকার উপরে দুই পায়ের ভর দিয়া এবং সত্ত্বগুণের মুক্ত আকাশে মাথা উঁচা করিয়া গৌরবের

সহিত দাঁড়াইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, আত্মশক্তি কিরূপ সুকৌশলে রজোগুণের শানিত অস্ত্র দিয়া রজস্তমোগুণের বাধা অল্পে অল্পে অপসারণ করে—কাঁটা দিয়া কাঁটা উন্মোচন করে—আত্মশক্তির এই প্রথম উদ্যমের ব্যাপারটি প্রথম অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়; আর মনুষ্যের জ্ঞানগোচরে আত্মশক্তি কিরূপে রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্যায়—আত্মশক্তির এই দ্বিতীয় উদ্যমের ব্যাপারটি দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়। দুই অধ্যায় এক সঙ্গে মিলিয়া সমস্বরে এই একটি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান আমাদের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রথম উদ্যমে, জীবের আত্মশক্তি পরমাত্মার হস্তে বিধৃত থাকে; দ্বিতীয় উদ্যমে তাহা জীবাত্মার হস্তে বিধিমতে সমর্পিত হয়। এই কথাটির মর্ম্মের ভিতরে একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে, গোড়ায় আমরা এই যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম—"এক" যদি হয় সমস্তই, তবে "অনেক" আসিবেই বা কোথা হইতে, বসিতে স্থান পাইবেই বা কোথায়—এই দুরূহ প্রশ্নটির মীমাংসার পথ অনেকটা দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একটুপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মসত্তার প্রকাশ-সংঘটনে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুয়েরই কার্য্যকারিত সমান; এটাও দেখিয়াছি যে, স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধিরই সামিল হইয়া যায়, আর, তাহা যখন হয় তখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের মধ্যেই মূলেই কোনো প্রভেদ থাকে না। আমরা যখন সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন শ্রূয়মান গীতের নানা স্বরাঙ্গ এক-এক মুহূর্ত্তে এক-একটি করিয়া আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয়, আর যে-সুরটি যে-মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয় সেই-সুরটিই কেবল আমরা সেই মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি। কিন্তু হইলে কি হয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধির যে-একটি কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে—যাহার নাম স্মৃতি—সাক্ষাৎ উপলব্ধির সেই সহবৃত্তিটি ভূতকাল হইতে নানা সুর যোটপাট করিয়া আনিয়া সমস্ত দলবল সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, আর, সেই গতিকে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা গানই শ্রবণ করি, তা বই কোনো মুহূর্ত্তে আমরা যূথভ্রষ্ট একটি মাত্র সুর শ্রবণ করি না। সঙ্গীত শ্রবণের ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই এই :—

গায়ক চূড়ামণি আত্মশক্তির প্রভাবে শ্রোতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের উপরে একযোগে কার্য্য করিয়া শ্রোতার জ্ঞানগোচরে বিশেষ কোনো একটি রাগের বা রাগিনীর রূপ প্রকাশ করেন, আর, সেই প্রকাশের মধ্য দিয়াই শ্রোতা গীয়মান স্বরলহরীর মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রথম উদ্যমে শ্রোতা অজ্ঞাতসারে আত্মশক্তি খাটাইয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গানটি মুগ্ধভাবে শ্রবণ করেন; দ্বিতীয় উদ্যমে, সজ্ঞানভাবে অর্থাৎ বুদ্ধি-পূর্ব্বক আত্মশক্তি খাটাইয়া সেই গানটি সাধ্যানুসারে পুনরাবৃত্তি করেন। পুনরাবৃত্তি করেন কেন? না যেহেতু সে গানটি তাঁহার বড্ড ভাল লাগিয়াছে—গানের রসাস্বাদন-জনিত আনন্দই পুনরাবৃত্তি কার্য্যটির প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। আনন্দকে পুনরাবৃত্তি কার্য্যের নিয়ামক বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু পুনরাবৃত্তি কার্য্যের কোনোস্থান যদি খাপছাড়া হয়, তবে সাধকের তৎক্ষণাৎ আনন্দের ব্যাঘাত হয়, আর তাহাতেই সাধক বুঝিতে পারেন যে, "এ জায়গাটা ঠিক্ হইতেছে না"। সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটি ঠিক্-মাফিক হইতেছে না, তখন তিনি গায়কের নিকটে গমন করিয়া সাধের গানটি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করেন; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহার অন্তরের আনন্দের সহিত পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটির সুর মিলিয়া যায়, তখন তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। বলিলাম "শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন";—এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুইই যেহেতু সমান আবশ্যক, এই জন্য সঙ্গীত-শিক্ষার পক্ষে শ্রবণ এবং মনন দুইই সমান আবশ্যক; আবার, আত্মশক্তি খাটাইয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি'র সহিত স্মরণের যোগ-বন্ধন করা যেহেতু প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে আবশ্যক—এই জন্য নিদিধ্যাসন দ্বারা শ্রবণ এবং মননকে একসূত্রে বাঁধিয়া একীভূত করা সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে আবশ্যক। গানের সম্বন্ধে এতগুলা কথা এ যাহা বলিলাম—এ সমস্তই কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র তাহা বুঝতেই পারা যাইতেছে। প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য তাহা এই :—

এটা আমরা এখন বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মশক্তির কার্য্যকারিতায় সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ একসঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইলে তবেই দ্রষ্টা পুরুষের অন্তঃকরণের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিৎপ্রকাশের অভ্যুদয় হয়। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু বোঝা উচিত যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধিই মূল—স্মরণ তাহার একপ্রকার লেজুড়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ধ্বনি—স্মরণ প্রতিধ্বনি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্রষ্টা পুরুষের

অন্তঃকরণে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি কোথা হইতে আইসে? এটা যখন স্থির যে, তাহা দ্রষ্টাপুরুষের নিজের শক্তি হইতে আসে না, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমাত্মার ঐশী শক্তিই তাহার একমাত্র প্রেরয়িতা। যদি সূর্য্য হইতে আলোক না আসিত তবে জীব-চক্ষু চক্ষুই হইত না ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস যদি বলেন যে, "আমি শুদ্ধ কেবল আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছি" তবে মোটামুটি-ভাবে তাঁহার মুখে সে কথা শোভা পাইতে পারে—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাঁহার ঐ কথাটির ভিতরে একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে দর্শকের চক্ষে উহার অপ্রামাণিকতা ঢাকা থাকিতে পারে না। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নানা ঋতুর নানা সৌন্দর্য্য যাহা তিনি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; তাহার পরে তিনি আত্মশক্তির বলে সেই স্মরণায়ত্ত ব্যাপারগুলির মধ্যে যথাভিরুচি যোগাযোগ ঘটাইয়া ঋতুসংহার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কালিদাসের কবিতার গোড়ার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির ব্যাপারটি যদি গণনার মধ্য হইতে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার এ কথা খুবই ঠিক্ যে, তিনি আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ও-কথাটি সত্য হইতে পারে না এই জন্য—যেহেতু, গোড়া'র সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপরে তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে। "তাঁহার নিজের হস্ত মূলেই ছিল না" না বলিয়া—বলিলাম "তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান দৃষ্টান্তস্থলে যাহাকে বলা হইতেছে গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি তাহা অপেক্ষাকৃত গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও তাহা আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমের সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে। আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনকর্ত্তা স্বয়ং পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু সাক্ষাৎ উপলব্ধি স্মরণের গোড়া'র প্রতিষ্ঠাভূমি, সুতরাং তাহার সংঘটনে স্মরণের কোনো প্রকার কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। একটি সদ্যোজাত শিশুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে দিবালোক কিছুকাল ধরিয়া কার্য্য করিলে, তবে তাহা তাহার স্মরণে মুদ্রিত হয়; স্মরণে মুদ্রিত হইলে, আত্মশক্তি তলে তলে কার্য্য করিয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে শিশুর জ্ঞানগোচরে দৃশ্যবস্তুসকলের নৈবেদ্যের ডালা অনাবৃত করে। সদ্যোজাত শিশুর স্মরণে দিবালোক রীতিমত মুদ্রিত হওয়া যেহেতু সময় সাপেক্ষ, এইজন্য সদ্যোজাত শিশু প্রথমে যখন আলোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করে, তখন তাহার সহিত স্মরণ মিশ্রিত থাকেনা বলিয়া তাহা তাহার জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে আসে না; আর, তাহা যখন তাহার জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে গোড়া'র সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনে তাহার নিজের কোনো হস্ত ছিল না। অতএব এটা স্থির যে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরমাত্মার ঐশীশক্তির বলেই মনুষ্যের অন্তঃকরণে জাগিয়া ওঠে। মনে কর একজন সঙ্গীতের ওস্তাদ সঙ্গীতরসে এমনি মাতোয়ারা যে, লোকে তাহার নাম দিয়াছে গীতানন্দ সরস্বতী; এখন দ্রষ্টব্য এই যে, গীতানন্দ স্বামী যেমন আপনার গীতানন্দ শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের কর্ণে গীতসুধা বর্ষণ করেন—আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দ জীবাত্মার অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সাত্ত্বিক প্রকাশ প্রেরণ করেন। উপনিষদে তাই উক্ত হইয়াছে "রসো বৈ সঃ" রস তিনি নিশ্চয়ই "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" রস'কেই লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। "এষহ্যেবানন্দয়াতি": পরমাত্মাই আনন্দ জাগাইয়া তোলেন। এ কথা গুলি কবির কল্পনামাত্র নহে—উহা ধ্রুব সত্য। সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণে (অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণে) ঐশীশক্তির বলে সাত্ত্বিক প্রকাশ যাহা উদ্বোধিত হয়, তাহা বাস্তবিকই আনন্দের মূল উৎস। তার সাক্ষী—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু সকল জীবেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময় অন্নপানে আনন্দ হয়, কিন্তু জীব-রাজ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্যেরই সাত্ত্বিক প্রকাশে বা জ্ঞানে আনন্দ হয়। কচি বালক কেমন অবলীলাক্রমে মাতৃভাষা শিখিয়া ফ্যালে ইহা সকলেরই দ্যাখা কথা। দুই এক বৎসরের বালক মাতৃমুখোচ্চারিত কথা শুধু কেবল কানে শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—পরন্তু তাহার ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। ক্ষুধাকালে মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া সে যেমন আনন্দ লাভ করে—মাতৃবাক্যের ভাবসুধা পান করিয়া সে সেইরূপই বা ততোধিক আনন্দ লাভ করে। পরমাত্মার ঐশীশক্তি হইতে যেমন সূর্য্যালোক আসিয়া নির্জীব জগৎকে সজীব করিয়া তোলে—অন্ধ জগৎকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া তোলে—অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়া তোলে, তেমনি, সেই সঙ্গে সাত্ত্বিক প্রকাশ (অর্থাৎ গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি) অবতীর্ণ হইয়া আবালবৃদ্ধ মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিমল আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্যায়। ঈশ্বর-প্রেরিত সত্ত্বগুণ শুধু যে কেবল জ্ঞান এবং আনন্দের গোড়া'র সূত্র তাহা নহে—তাহা ধর্ম্মেরও গোড়ার সূত্র। কচি বালকেরা তাহাদের মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী এবং পার্শ্ববর্ত্তী আর আর লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

আপনার সত্তার নবোদিত প্রকাশের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাঁহাদের সবাইকার সত্তার রসাস্বাদন করে, আর তাহাতেই তাহাদের আনন্দ হয়; তার সাক্ষী তাহারা ধাত্রীর বা মাতাপিতার বা ভ্রাতাভগ্নীর আদর-বাণী শুনিলে কেমন সুমধুর হাস্য করে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাদের অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের নিকটে সকলেই আত্ম-তুল্য—অথচ তাহারা গীতাশাস্ত্রের বা বাইবেলের এক ছত্রও পাঠ করে নাই। এইরূপ সমদর্শিতা এবং সমব্যথিতাই ধর্ম্মের গোড়া'র কথা। এখন দেখিতে হইবে এই যে, গীতানন্দ সরস্বতীর কণ্ঠ-নিঃসৃত গান যেমন নিখুঁত, শিক্ষার্থী সাধকের কণ্ঠ-নিঃসৃত গান সেরূপ নিখুঁত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা নানা প্রকার বাধায় জড়িত। শিক্ষার্থী সাধককে কিছুদিন ধরিয়া গান সাধিতে হইবে—তাল মান সুর ঠিক মতে হৃদয়ঙ্গম করিয় তাহা কণ্ঠ দিয়া বাহির করিতে হইবে—এইরূপ আর আর নানাবিধ কার্য্য হাতে-কলমে করিতে হইবে যাহা সহজে হইবার নহে। শিক্ষার্থী ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যার তীর্থ-যাত্রী;—কাজেই, গন্তব্য পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইবে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা সমষ্টি সৎ সুতরাং তাঁহার সত্তা সত্বগুণের নিদান, আর তাঁহার শক্তিরূপী সেই আদিম এবং সনাতন সত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত নহে বলিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন তত্বজ্ঞানশাস্ত্রে তাহা শুদ্ধ সত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই ত্রিগুণাত্মক; অথবা যাহা একই কথা—ব্যষ্টিসত্তার অন্তর্নিগূঢ় সত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত। এই জন্য প্রথম উদ্যমে সাধক সহজভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া পরমাত্মার হস্ত হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন, দ্বিতীয় উদ্যমে পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ সেই সত্বগুণের আশপাশের বাধা আত্মপ্রভাবের বলে অতিক্রম করিয়া তাহার আগমনের পথ পরিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের ফল সেই যে অযাচিত সাত্বিক আনন্দ যাহা পরমাত্মার প্রসাদে শিশুর অন্তঃকরণেও যেমন আর সরল হৃদয় সাধু-যুবার অন্তঃকরণেও তেমনি, টাট্‌কা-টাটুকি আকাশ হইতে নিপতিত হয়, তাহাই সাধকের আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের নিয়ামক। পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ গোড়া'র সেই সাত্বিক আনন্দই সাধককে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে। সে আনন্দ বিষয়সুখের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন আনন্দ নহে—পরন্তু তাহা জ্ঞানগর্ভ সুবিমল আনন্দ; আর, সেইজন্য উপনিষদে তাহা প্রজ্ঞানঘন বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—উক্ত হইয়াছে

"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ"
আনন্দময় কোশস্থ জীব প্রজ্ঞানঘন আনন্দভুক্ চেতোমুখ।

এই সাত্বিক আনন্দের সঙ্গে যাহার সুর মেলে তাহাই মঙ্গল কার্য্য, আর, তাহার সঙ্গে যাহার সুর মেলে না তাহাই অমঙ্গল কার্য্য। দেবপ্রসাদলব্ধ সাত্বিক আনন্দই সাধকের আত্মপ্রসাদের মূল উৎস, আর, তাহারই আর এক নাম অন্তরাত্মা। পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও বলে conscience is the voice of god অন্তরাত্মার বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। এ বিষয়টি আর একটু বিশদরূপে বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক। আগামী বারে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবীর।*

(সমালোচনা)

প্রাচ্যদেশীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরোপের ধারণা এই যে, প্রাচ্যদেশীয়গণ বাস্তব পৃথিবীটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য কল্পনাকে আর সত্যাশ্রয়ী করিতে পারে নাই, তাহাকে একেবারে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত অনির্দ্দেশ্যতার স্বপ্নরাজ্যে ছুটাইয়া দিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় সকল সাহিত্যই আলাদীনের প্রদীপের মত অসম্ভব পুরীর সন্ধান-নিরত, তাহাতে কেবল রূপ আর রূপকের ছড়াছড়ি। রূপগুলা অবাস্তব বলিয়াই তাহারা সহজেই আধ্যাত্মিক রূপক হইয়া উঠিতে পারে।

তা সত্য। আমরা মিস্‌টিক্যাল্‌ইষ্ট। আমাদের দেশে কারখানার কলের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হইয়া উঠে না, অষ্টপ্রহর কাজ অন্তহীন প্রবাহে শকটশ্বসিত ধূলি-পটলে আকাশব্যাপী দৃষ্টিকে মোহাকুল করিয়া দেয় না। আমরা বাস্তবপরায়ণ নহি। আমরা নিরাবরণ চোখে জগৎটাকে এক রকম করিয়া দেখিয়া থাকি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তোমরা যেটাকে দেখ সেটা আবরণের মধ্য দিয়াই দেখ। সৌন্দর্য্যই বল, প্রেমই বল, মঙ্গলই বল, সমস্তই তোমাদের ঐ কর্ম্মপাকের জটিল-তার ভিতরে জড়াইয়া আছে। সেই জটগুলাকে তোমরা মনের চারিদিকে ঘন করিয়া লইয়া তার পর পৃথিবীটাকে দেখ। সমস্ত জিনিসের উপরেই তাই তোমাদিগকে ভাবের রং ফেলিতে হয়, এমন একটু বিশেষত্ব ও মহিমা অর্পণ করিতে হয় যাহা সে জিনিসে স্বভাবতই নাই। তোমরা আইডিয়ালাইজ্ করিয়া থাক, বাস্তবের উপরে কেবলি ভাবের রং চড়াও; আমরা জানি সমস্তই মায়া

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের গ্রন্থাবলী

ছায়া, সুতরাং আমরা যাহা দেখি তাহা একেবারে অনাবৃতভাবে এবং অব্যবহিতভাবে। তাহা একই কালে রূপ এবং অপরূপ উভয়ই!

ইউরোপে কবিতার মধ্যে বাস্তবকে কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সুন্দর করিয়া দেখিবার একটা প্রয়াস আছে। আকাশের নীলিমাকে সুন্দর বলিয়া উপভোগ করিতে গেলে ইউরোপীয় কবিকে তাহার সঙ্গে হৃদয়ের রংকে প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হয়, বলিতে হয়—
"Come then complete in completion, o comer
Pant through this blueness, perfect the summer!"

এস, এস ওগো চির-অপূর্ণতা চির পূর্ণতায় এস হে পথিক
এই নীলিমার মাঝে তোমার নিশ্বাস বসন্তেরে পূর্ণ ক'রে দিক্!

প্রাচ্য কবির এ রকমই নয়। তার সাক্ষী হাফিজের এই ছত্রটি:—"হে সাকি, দাও আমার করতলে মদের পেয়ালা দাও, আমি যেন উপরকার এই নীলবাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি!" কি প্রভেদ! একজনের দৃষ্টি আবরণের ভিতর হইতে, অন্যের দৃষ্টি আবরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া! আমরা আধুনিক কালে পশ্চিম দেশে মেটরলিঙ্ক, ওয়াল্ট হুইটম্যান্ প্রভৃতি এমন কবির কাব্য পাঠ করিয়াছি যাঁহারা কোন আবরণকে মানেন না, সমস্ত জিনিসের উপর হইতে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারের আবর্জ্জনারাশি ঝেঁটাইয়া যাহারা তাহার বিশুদ্ধ নগ্নমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহারা বলেন, সকলের অন্তরস্থিত আত্মার পক্ষে কোন বাহিরের সংস্কারের প্রয়োজনমাত্র নাই, কারণ সংস্কার তাহার পূর্ণ প্রকাশকেই অবরুদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। একবার সব সরাইয়া পর্দ্দা তুলিয়া যদি ভিতরের খবর লওয়া যায়, তবে সে কি অভূতপূর্ব্ব কি অনির্ব্বচনীয় রূপ সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে! কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কবি হাফিজের মত এমনতর সাহসের কথা বলেন নাই "অবগুণ্ঠনের নীচের রহস্যের কথা মাতাল বদমায়েসদের কাছে জিজ্ঞাসা কর—এ রহস্য সম্ভ্রান্ত সভ্যলোকেরা জানে না। * *" তা তো বটেই। সম্ভ্রান্ত সভ্য মানেই সংস্কারাশ্রয়ী ভদ্রলোক। "অন্ধকার রাত্রি, তরঙ্গের ভয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণা—যাহারা তীরে আছে, সেই ভারহীন যাত্রীরা আমাদের অবস্থা কিরূপে জানিবে?" যে অনেক উত্থানপতনের ভিতর দিয়া অনেক চুবানি খাইয়া অনেকবার ভাঙিয়া অনেকবার নূতন করিয়া গড়িয়া কিছু না পাইয়াছে, সে ছাড়া সত্যকে আর কে জানিবে? এমনতর নিরাবরণ মুক্তি, ইহা হাফিজের কাব্যে যেমন দেখিয়াছি এমন অন্যত্র দেখি নাই। ইউরোপীয় কবির নিরাবরণতা অনেক সময় বীভৎস নির্লজ্জতা, সে সংস্কারবন্ধহীন মুক্তদৃষ্টি নন। মেটারলিঙ্ক, হুইটম্যানে সে নির্লজ্জতার পরিচয় যে নাই তাহা বলিতে পারি না। মায়াকে মায়া জানে বলিয়াই আবরণকে ছিঁড়িয়া ফেলা প্রাচ্যজাতীয়ের পক্ষে এত সহজ, নহিলে যতই ইচ্ছা করুক, সত্যকে আর জানা যাইত না, মায়াই নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত ও মন ভুলাইত।

কিন্তু হাফিজ প্রভৃতির কবিতায় যাহা আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমরা পারস্য দেশেরই একটা বিশেষ সম্পদ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম। তাহার কারণ, আমাদের দেশে ঠিক এই ধরণের কবিতা আমরা পাই নাই। বিগ্রহের সাহায্যে ধ্যান ধারণা করিবার নিমিত্ত আমাদের দেশে বিগ্রহ দেখি সত্যের স্থান জুড়িয়া বসে। তাহার ভিতরে এমন কোন আভাস বা ইঙ্গিত থাকে না, যাহাতে বুঝাইয়া দেয় যে সে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। আমি কোন পূজা-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাহিত্যেই দেখি ভাবের চেয়ে ভাবের নির্দ্দেশ বাংলা দেশে বড় হইয়াছে। ভাবের স্বাধীনতা নাই, ভাবের শুভ্র কিরণকে আবৃত করিয়া বিগ্রহের কুহেলি দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেমন ধর বৈষ্ণব কবিতা। ইহা অনায়াসেই হাফিজ্ প্রভৃতির কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারিত, কিন্তু ইহা বিগ্রহের রূপেই আপাদমস্তক এমনি বাঁধা, যে রূপের মধ্যে অপরূপকে আর দেখাই যায় না। সেই বৃন্দাবন, অভিসার, ইত্যাদি ব্যাপার—যাহা একটা কাহিনী মাত্র—তাহা চিত্তের উপর ভারের মত চাপিয়া থাকে। রূপক যদি একান্তই রূপ হয়, তবে রস তাহাতে বাধা পায়। রূপটা কিছুই নয়, সে অপরূপকেই প্রকাশ করিবার একটা ছলমাত্র, উপকরণ মাত্র—রূপকজাতীয় কবিতার মধ্যে এই ভাবটা থাকা চাই। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় সেই ভাবটারই অত্যন্ত অভাব।

পশ্চিমদেশীয় সাধক কবীর, দাদূ প্রভৃতির কবিতাবলীর সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম না। আমরা নিরাশ হইয়া ভাবিতেছিলাম, যে পারস্য সাহিত্য এক হিসাবে আমাদের চেয়ে জিতিয়া আছে, এমন কি আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যও বা। ভারতবর্ষ যে এতবড় অদ্বৈতকে চাহিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহার বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করিল, যুগে যুগে মানব ইতিহাসের ঘটনালীলার মধ্যে শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হইবার লীলা দেখিল, হায়, হায়, ভারতবর্ষের সাহিত্যে সে বার্ত্তার কোথাও কোন চেহারা ফুটিল না! কোথায় সেই একের বাণী, অনন্তের বাণী, মুক্তির বাণী! সকল রূপ, সকল রস, সকল অনুভূতি, সকল বোধের খণ্ডতার মধ্যে অনন্তের নিবিড় আনন্দের জোয়ারের প্লাবনের জয়ধ্বনি কোথাও কি বাজিল না! ইউরোপীয় চেতনায় এ জিনিস নাই। সেখানকার সাহিত্যেও তাই ইহা খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনাই যে এই দিকে! সে তো অনন্তকে ভাবমাত্র বলিয়া অগম্য বলিয়া দূরে রাখে না, সে তাহাকে সকল সত্যের সত্য জানিয়া ব্যবহার করে। সকল মানব-সম্বন্ধের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার আবির্ভাব, পথে আবির্ভাব, ঘাটে আবির্ভাব,—বাঁশী যে কোথায় বাজে না তাহাতো জানি না। অনন্তের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ রূপান্তরিত ও আনন্দঘন করিবার সাধনাই ভারতের চিরদিনের সাধনা!

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন বাবুর কৃপায় আমরা এমন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিলাম যাহা এই ভারতবর্ষের নিত্যসাধনারই ভিতর হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। যাহা তত্ত্বে জানিতাম, তাহাকে রসের মধ্য দিয়া পাইলাম। তত্ত্বে জানিয়া কি তৃপ্তি আছে! সে কি রকম জানা। সে ফলের শাঁস বাদ্ দিয়া তাহার বীজকে জানা। আমরা চাই বীজকে ফলের ভিতর দিয়া পাইব। তত্ত্বকে বেদান্তে জানিব, যোগশাস্ত্রে জানিব কিন্তু জীবনের রসে আপন বলিয়া মধুর বলিয়া সত্য বলিয়া পাইব না, এ যে অসহ্য! তেমন করিয়া তত্ত্ব কোথাও ধরা দেন্ নাই বলিয়াই সমস্ত বিশ্ব ভারতবর্ষকে মায়াবাদী ও বিশ্ববিমুখ সন্ন্যাসী বলিয়া দূর হইতে গড় করিয়াছে! তাহারা ভারতবর্ষকে শ্মশানচারী ভস্মবিভূতিমাখা তালবেতালপরিবৃত শিবের মতই দেখিয়াছে, মনে করিয়াছে যে বৈরাগ্যই বুঝি তাহার প্রাণ, ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই, সৌন্দর্য্য নাই, বেদনা নাই, যৌবন নাই,—কিন্তু বিশ্বসুন্দরী লোকহৃদয়মোহিনী অনন্তযৌবনা গৌরীকে তাহারা দেখে নাই,—ভারতবর্ষের সাধনায় বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি ঐশ্বর্য্য যে অভেদাঙ্গ হইয়া আছে তাহার পরিচয় এম্নি করিয়াই চাপা রহিল! কবি কালিদাস তাহার আভাস দিয়াছেন, কিন্তু গীতে উৎসারিত হইয়া নানা কণ্ঠ হইতে এ বার্ত্তা না বাহির হইলে ইহার সত্যতা কে বুঝিবে?

> ছক্যা অবধূত মস্তান মাতা রহৈ
> জ্ঞান বৈরাগ্য সুধি লিয়া পুরা।
> শ্বাস উশ্বাসকা প্রেম প্যালা পিয়া
> গগন গরজৈ তঁহা বজৈ তূরা।

বৈরাগী তৃপ্ত হইয়া মত্ত হইয়া রহিয়াছে, (এতদিনে) তাহার জ্ঞান বৈরাগ্যকে সে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করিয়া লইল, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রেমপাত্র সে পান করিয়া লইল; গগন যেখানে নিনাদিত, বাজিতেছে সেখানে তূরী'—কবীরের কাব্যে ভারতবর্ষের জ্ঞানবৈরাগ্য পরিপূর্ণ প্রেমের আনন্দে জীবনের আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখা দিল!

কিন্তু মুক্তার মনোহারিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ডুবারীর পরিশ্রম ও কৃতিত্বের কথাটাও ভুলিবার নয়। কবীরের রত্নরাজি যিনি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে বিচিত্র বাজে আবর্জ্জনাস্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যিনি এমন পাকা জহুরী, কোন্‌টা সাচ্চা কোন্‌টা ঝুটা যিনি এমন সুন্দররূপে তাহা জানেন, তিনি শুধুই যে কেবল অনুবাদ দিয়া,—তাঁহার অন্তরের প্রজ্ঞার দীপশিখায় কবিকেই দেখাইয়া নিজে অন্ধকারের আড়ালে থাকিবেন—তাহা হইলে চলিবে না। শুধু প্রদীপার্চনা নয়, ভক্তের কাছে কিছু মাঙ্গলিক শ্রবণ করিতেও আমরা অভিলাষী রহিলাম।

কবীরকে পাইয়া আমরা বুঝিয়াছি যে পারস্যে হাফিজ প্রভৃতির ভিতরে মুক্তি ও ভক্তির যেমন এক আশ্চর্য্য সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল, মুসলমানের আগমনে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই জিনিসই ভারতবর্ষে আসিয়া নূতনতর এবং পূর্ণতর রূপ ধারণ করিয়াছে। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু সেই যুগে ভাবের খুব একটা বড় জায়গায় মিলিয়াছে।

বঙ্গীয় পাঠকের কাছে এখন এ কথাটা অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কারণ, এখন আমরা মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর ভাবের মিল খুঁজিয়াই পাই না। আমরা যদি কলারপাতার খাই সোজাদিকে, মুসলমান খায় উল্টাদিকে। ইদ্ উপলক্ষ্যে গোহত্যা লইয়া দুই পক্ষে খুনাখুনিই চলে।

তা ছাড়া আমাদের হিন্দুধর্ম্ম বিগ্রহকে সর্ব্বত্র স্বীকার করে, মুসলমান বিগ্রহ সহ্য করিতে পারে না। কোন মূর্ত্তি, কোন চিহ্ন, কোন রূপক তাহার মস্তিষ্কের কোন গোপন কোণেও স্থান পায় না। গ্রীক্ ধী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভার মত তাহার মাথাটা যেন লোহার, সে কেবলি কঠিন, নিরলঙ্কার নিটোল একেশ্বরবাদ ভিন্ন আর কোন জিনিস তাহার মধ্যে নাই। সুতরাং এক সময়ে হিন্দু মুসলমানে ভাবের ক্ষেত্রে বড় একটা মিল হইয়াছিল বলিলে আমাদের কথাটাকে নিতান্তই একটা কাল্পনিক উচ্ছ্বাসমাত্র মনে হওয়া পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক।

অথচ মহম্মদ যিনি মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি যদিচ প্রতিমার বিরোধী ছিলেন, তথাপি একদিকে তাঁহার চিত্ত যথেষ্ট ভাবুক ছিল। এক আছেন মাত্র,' এই কথাই তাঁহার একমাত্র কথা নহে, কিন্তু সেই একেকে তিনি বিচিত্র ভাবসৌন্দর্য্যের স্বপ্নের মধ্যে দেখিতেন, যেজন্য ক্ষণে ক্ষণে তিনি মূর্চ্ছাহত হইতেন, আনন্দে আপনাকে আর ধারণ করিতে পারিতেন না। মহম্মদের সময়েই আরবে 'হনিফ্' নামক এক ভাবুক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের দ্বারাই তিনি প্রথমে প্রবুদ্ধ হন, কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন।

তার পর যখন ইসলামধর্ম্ম দিগ্বিজয়ে বাহির হইল এবং বোগ্দাদে খলিফদিগের রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন

হইতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও নিওপ্লেটনিক ধর্ম্মমতের সংঘর্ষে মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। খলিফ মমুনের সময়ে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে অনেক লোকেরই আস্থার অভাব দেখা গেল। কোরাণের ধর্ম্ম কি না Revelation অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের কাছে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম, তাই একদল লোকে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল, ধর্ম্মের ভিত্তি Reason-এর উপর অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়ের উপর। কেবল লড়াই, বিলাসিতা, ধর্ম্মের কৃত্রিমতা এবং এই অবিশ্বাস—এই সমস্ত ব্যাপার মানুষকে ভিতরে ভিতরে এমনি শুষ্ক করিয়া আনিল যে ইহার প্রতিক্রিয়া না হইলেই নয়। তাই এই শতাব্দীর কাছাকাছি আমরা সুফীধর্ম্মের ভক্তিবাদের প্রথম সূচনার পরিচয় পাই। সেই ভক্তিস্রোত আত্মজ্ঞানকে এবং ঈশ্বর-প্রেরণাকে এমন করিয়া মিলাইল, বিশ্বভুবনের মধ্যে বিশ্বপতিকে এমন একান্ত আপনার এমন পরম প্রিয়রূপে স্বামীরূপে দেখিল, যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কবীরের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে হাফিজ প্রভৃতি কবি এই সুফীভক্তির উচ্ছ্বাসকে কাব্যের অপরূপ প্রকাশে মুক্ত করিয়া দিলেন। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইল একটি বাগান, বহিল সেখানে প্রেমের দক্ষিণ বায়ু, তাহার অব্যক্ত মর্ম্মকথা বুলবুলের কাকলীতে গীত হইয়া ফিরিল, আনন্দমদিরায় রঞ্জিত আত্মা আপনার প্রেমের মধ্যে আপনার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইল।

কবীরের প্রসঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের এই অংশটুকুর আলোচনার এইজন্য প্রয়োজন যে, আমাদের জানা উচিত যে, মুসলমান আগমনে কেবল যে হিন্দুমন্দিরের দেবদেবী ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে, এই ভক্তিবাদ এবং তাহার সাহিত্যের সঙ্গেও ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই সঙ্গে সাধারণ মুসলমান-ধর্ম্মের গোঁড়ামি, প্রবল জেদ, প্রতিমার প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞা, এ সমস্তই ছিল। তখন পৌরাণিক যুগ। ভারতবর্ষে তখন দেবদেবীর ছড়াছড়ি। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে অনার্য্য দেবতাগুলি আর্য্য সভায় স্থান পাইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেককেই বড় ভাবের দ্বারা শোধিত সংস্কৃত করিয়া প্রত্যেককেই প্রত্যেকের চেয়ে বড় করিয়া তুলিবার জন্য লড়াই চলিতেছে। মন্ত্র তন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ধর্ম্মকে আকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সময়ে হঠাৎ একেশ্বরবাদের ধ্বজা উড়াইয়া আসিল মুসলমান। সে এক দানব বিশেষ, না মানে গঙ্গাস্নান, না মানে পূজা অর্চ্চনা, না মানে ছাপ-তিলক! সে তিরিশ কোটি উড়াইয়া দিয়া বলিল একমাত্র ঈশ্বর আছেন, আর দ্বিতীয় নাই।

এই একেশ্বরবাদের কথাতো ভারতবর্ষে নূতন নহে, সুতরাং এই সময়ে মুসলমানের আঘাতে ভারতবর্ষের চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, মুসলমান যে ধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে তাহা আমাদেরি জিনিষ, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের বিরোধ নাই। কিন্তু মুসলমান যে এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছে, তাহা যে নিরাকার ও রূপরসবর্জ্জিত, তাহা নহে,—সকল আকারকে সকল রসকে পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রকাশ। কিছুই তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই; তিনি সকল ঘট পূর্ণ করিয়াও সকলকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নানাস্থানে যে ধর্ম্মের আন্দোলন জাগিল তাহার মর্ম্মগত কথা ইহাই। বাংলায়, পঞ্জাবে, উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণে, চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদূ, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই ভাবের প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া দিলেন, হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাহাদের দলের মধ্যে সমান স্থান লাভ করিল।

তবে বাংলায় যে ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল তাহার সঙ্গে অন্যান্য স্থানের আন্দোলনের একটুখানি পার্থক্য আছে। আমার মনে হয় মুসলমান প্রভাব বাংলা দেশে তেমন কাজ করে নাই, যেমন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে করিয়াছে। কবীর তো নিজেই মুসলমান ছিলেন, বাবানানক মুসলমান শাস্ত্র সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। মুসলমানের যে নিরাবরণতার কথা প্রবন্ধের আরম্ভে উল্লেখ করিয়াছি, সুফী ভক্তিবাদেও যাহা বিকৃত হয় নাই, কিন্তু সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া রূপের মধ্যে অপরূপের আবির্ভাবকে দেখিবার জন্য সাধনা করিয়াছে, সেই নিরাবরণ মুক্তি, সেই একের সুস্পষ্ট বাণী বাংলা দেশের ভক্তিধর্ম্মকে স্পর্শ করে নাই।

বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের পিছনে সেই নিরাবরণতার কাঠিন্য না থাকাতে তাহা ভক্তিকে বিশ্বপ্রকৃতিতে, মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় বিস্তারিত না করিয়া আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হইবার চেষ্টা পাইয়াছে। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,—কিছুই আপনাকে আপনি খাইয়া বাঁচিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে তাহাদের প্রসারিত করিয়া না দিলে তাহারা মাদকতা হইয়া বসে। কেবলি রাধিকা সাজিয়া, কখনো বিরহ, কখনো মিলন, কখনো মান, কখনো অভিমানের কাল্পনিক লীলায় হৃদয়-বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া যে সাধনা, তাহার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান, বিশ্বমানবের বিপুল ইতিহাসের বিচিত্র সৃজনলীলার কোন যোগ থাকে না। বৈষ্ণব-কাব্যে তাই মাধুর্য্যের উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, কিন্তু সে মাধুর্য্যের মধ্যে কোন বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। সে অশান্ত, চির-অপরিতৃপ্ত—তাহার শেষ কথা এই:—

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।

পারস্য সাহিত্যের কথা আরম্ভেই বলিয়াছি। তাহাও আবেগে উদ্বেল, কিন্তু তাহার ভিতরের চেষ্টাই একটি

নিরাবরণতা, সত্যের মধ্যে একটি অনায়াস মুক্তি। হাফিজের কথা বলিয়াছি, তাঁহার সমস্ত কবিতাই এই-ভাবে পরিপূর্ণ। এ কথা কোন্ ইউরোপীয় কবি প্রণয়-সঙ্গীতে লিখিয়াছে যে দরবেশের মধ্যে যথার্থ বৈরাগ্য নাই, যথার্থ বৈরাগ্য প্রেমিকের; প্রিয়ার চোখের চাহনি হইতে কবি এমন সম্পদ লাভ করিতেছেন যাহা তাঁহাকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিতেছে? হাফিজের কবিতার কেবল মদ আর সাকীর ছড়াছড়ি, কিন্তু সে আনন্দের রূপক মাত্র—শুধু তাই নয়, তাহার মধ্যে একটা প্রথার প্রতি বিদ্রোহও আছে এই, যে বাজে মৌখিক আচারগত ধর্ম্মের প্রতি কবির একটা আন্তরিক সুতীব্র বিদ্বেষ রহিয়াছে। সেই জন্য যাহা রীতি-বিরুদ্ধ, যাহা নীতির সংস্কারানুযায়ী নহে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন!

যাক্ সে কথা। কবীরের মধ্যে আমরা এই জায়গায় পারস্য সাহিত্যের এই ভাবটির সঙ্গেই একটা মিল পাই। তাহা বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মত কেবলি মাধুর্য্যের ব্যক্তি নহে, তাহার মধ্যে মুক্তি ও ভক্তি এই দুই আসিয়া মিলিয়াছে। প্রেম আর বৈরাগ্য এক হইয়াছে। খুব সম্ভব কবীর যেমন হিন্দু বেদান্ত প্রভৃতির বার্ত্তা অবগত ছিলেন, রামানন্দকে গুরু করিবার জন্য দ্রাবিড়ের ভক্তিধর্ম্মের সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি মুসলমান হইবার জন্য বোধ হয় মুসলমান সাধনার এই সকল গভীর তত্ত্বও তাঁহার অগোচর ছিল না। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সভ্যতারই প্রাণরসে চিত্তকে রসাইয়া লইয়া জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

কবীরের দোঁহাবলীকে ক্ষিতিমোহন বাবু যে সকল ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা শ্রেণীবিভাগ নয়, তাহা কবীরের এক একটা দিক্‌কে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায় মাত্র। তাঁহার ভাগ মোটামুট পাঁচটি, কবীর পরখ্, কবীর উপদেশ, কবীর সাধনা, কবীর তত্ত্ব ও কবীর প্রেম। কবীর পরখ, উপদেশ ও সাধনাকে আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিব না, কারণ এই তিনের মধ্যেই সাধনারই সংবাদ রহিয়াছে। কবীর তত্ত্ব ও কবীর প্রেমের স্বতন্ত্র ভাগের সার্থকতা আছে।

কবি হাফিজের ন্যায় কবীর ধর্ম্মের সমস্ত সংস্কারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া, আচার হইতে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বারম্বার প্রকাশ করিতেছেন।

> কোই রহীম্ কোই রাম বখানৈ
> কোই কহে আদেস।
> নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল
> ঢূঁর ফিরে চহুঁ দেস।

কেহ বলেন রাম আমার উপাস্য, কেহ বলেন রহীম্, কেহ বলেন প্রত্যাদেশ, এইরূপে সকলেই নানা ভেক ধারণ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন।

> অরে ইন্ দুহু্ রাহ ন পাঈ।
> হিঁ নদ্বকী হিঁ দরাঈ দেখী
> তুর্ক ন কী তুরকাঈ।

হায় রে এই উভয়ই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিঁদুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী।

আমাদের সমাজ এখন এই আচারের বন্ধনে এমনি আপাদমস্তক জড়িত যে হঠাৎ এ সকল ক্রিয়াকর্ম্মে বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই শুনিলেই আমরা আঁতকাইয়া উঠি এবং জিজ্ঞাসা করি, তবে কিসের উপর আমরা ভর করিব? স্বাধীনতা বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, যে আপনিই আপনার নিয়ম, আপনিই আপনার জগৎ, অথচ যাহা উচ্ছৃঙ্খল নহে, যাহা আপনাকে লাভের দ্বারাই বিশ্বকে লাভ করে এবং সকলকে লাভ করে, সে কথাটা আমাদের চেতনার মধ্যেই নাই। প্রকৃত সাধনা যে সেই আপনার ভিতরকার আপনকে লাভ করা কবীর সে কথা বলিয়াছেন:—

> সাধো, সো জন উতরে পারা
> জিন মনতে আপা ডারা॥

যে জন মন হইতে আপনাকে দূর করিয়াছে, সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ মনের দাসত্ব যে করে না, সংস্কারকে যে কাটাইয়া উঠিয়াছে, যে একেবারেই সব জিনিসের সত্যকে দেখিতে পায়, কোন আবরণের ভিতর হইতে দেখে না, তাহার কাছে যোগ, বৈরাগ্য, কোনটাই শেষ কথা নহে, যে সমস্ত পন্থার ভিতর দিয়া গিয়া মনের সমস্ত অভ্যাসের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনার আপনিকে লাভ করিয়াছে—সেইই যথার্থ ভাবে মুক্ত। কবীর একেবারে স্বাধীনতার মূলে গিয়া ঘা দিয়াছেন।

"হে ভাই, যখন আমি ভুলিয়াছিলাম, তখন সেই আমার সদ্‌গুরুই আমাকে পথ দেখাইয়াছেন। আমি তখন ক্রিয়াকর্ম্ম আচার ছাড়িলাম, তীর্থে তীর্থে স্নান ছাড়িলাম। * * সেই দিন হইতে আমি না জানি দণ্ডবৎ প্রণাম, না বাজাই ঘণ্টা, না আমি সিংহাসনে কোন মূর্ত্তি স্থাপন করি, না আমি পুষ্পের দ্বারা কোন প্রতিমা অর্চ্চনা করি।"

"যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত পরিচয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত কিছুই পাও নাই। তীর্থ, ব্রত, জপ, তপ, সংযম এ সকল কর্ম্মেই ভুলিয়া থাকিও না।"

আমাদের দেশে কোন দল বিশেষে সাকার নিরাকার উপাসনার সমন্বয় সম্বন্ধে একটু বিশেষ গৌরবের দাবী দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমন্বয় ব্রহ্মকেও মানে আবার

বেটু মনসার পূজাতেও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহা তর্ক করিয়া বলে যে ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী তখন তাঁহাকে যাহাতে খুসী তাহাতেই ভজনা করা যায়। কিন্তু আসলে ভজনা হয় না সর্ব্বব্যাপী দেবতাকে, ক্ষুদ্র দেবতাই সমস্ত পূজা আহরণ করিয়া থাকেন। নিজের লোভ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষুদ্র ভয়ের দ্বারা সেই দেবতা তৈরি; অথচ তাঁহাকে বড় নাম দিয়া ফাঁপাইয়া তুলিবার জন্য কতই আয়োজন! এমতাবস্থার সমন্বয়টা যে কিরূপ হয় তাহাই জিজ্ঞাস্য। যাহা সকলের বড়, যাহা দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহার মধ্যে সমস্তের পরম পরিণতি চরম অবসান সেই পরিপূর্ণতম সত্যের সঙ্গে নিজের কল্পনারচিত প্রবৃত্তির মোহময় অসত্যের সঙ্গে সমন্বয়টা হইবে কোন্ জায়গায়?

আধুনিক সাকার নিরাকার উপাসনার সমন্বয়ীগণকে একবার কবীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি। কবীর যে সকল সীমার মধ্যে অসীমকে দেখিয়াছেন, সে কোন মনঃকল্পিত মূর্ত্তিবিশেষের মধ্যে দেখা নয়। সে অসীমকে শূন্য বলিয়া না জানিয়া তাঁহাকে সব জায়গায় স্বীকার করা, সর্ব্বঘটে দর্শন করা, সকল জীবনের ভাব ও অনুভূতি রাশির মধ্যে গূঢ়রূপে উপলব্ধি করা। আর এ সাধনার প্রধান অন্তরায়ই বাহ্যিকতা। মনে রাখিতে হইবে যে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানাদির অসারতা প্রতিপাদন করাই কবীরের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা বাহ্য পূজারীতি ত্যাগ করিয়া আত্মার মধ্যেই নিখিল সত্যকে ধ্যান ও উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই কথা বলে, তাহারাও যে সব সময়ে যে ব্যক্তি বাহ্য পূজায় ডুবিয়া আছে তাহা অপেক্ষা উন্নততর হয় তাহা নহে। তাহারা হয়ত মান ও ছাপা-তিলকের পরিবর্ত্তে কথা ও মতকে সাজাইয়া রাখিয়াছে, এবং দিনের পর দিন সেই শুষ্ক আন্তরিকতাপূর্ণ বৃথা সাধনায় কালাতিপাত করিতেছে।

কবীর তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

অবধূ মায়া তজী ন জাই

মায়া কেমন করিয়া ত্যাগ করা যায় বলতো ভাই?

মনবৈরাগী মায়াত্যাগী

শব্দমে সুরত সমাই

মন বৈরাগ্য বশতঃ মায়াকে ত্যাগ করিল অথচ শাস্ত্রকে আঁকড়াইয়া রহিল।

আধুনিককালে আমাদের অনেকের দেবতা কি সেই শাস্ত্রের দেবতা বাক্যের দেবতা নন্?

কিন্তু সবই যদি সংস্কার, সবই যদি মায়া, তবে সব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে স্বাধীন হইলাম মনে করা তাহা কি আত্মঘাতের নামান্তর হয় না? কবীর কি সেই রকমের শান্তিআকাঙ্ক্ষী? আর তাহাই কি শ্রেয়? আমি গোড়াতেই বলিয়াছি যে কবীরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। মায়াবাদ বলিতে আমাদের মনে যে বিভীষিকার উদয় হয়, কবীরের মায়াবাদ সে জাতীয় নহে। তিনি ব্রহ্মকেও এক জায়গায় মায়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া একদিকে সমস্ত অতিক্রম করিয়া তিনি বিশুদ্ধ নির্গুণ সত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন জ্ঞানযোগে, এবং অন্যদিকে সমস্তকে পরিপূর্ণ প্রেম দৃষ্টিতে ভাবিয়া ভগবানকে স্বামী বলিয়া প্রিয়তম বলিয়া অনুভব করিয়াছেন ভক্তিযোগে,—এই দুই বিভিন্ন সাধনাকে তিনি কি করিয়া মিলাইয়াছেন তাহা এবারে আলোচনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িবে। বারান্তরে সে আলোচনায় হাত দেওয়া যাইবে।*

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কৃষি-উন্নতির দৃষ্টান্ত।

ডবলিন্ সহরের রাস্তা দিয়া কয়েকজন বিদেশী পরিব্রাজককে গাড়ীতে লইয়া যাইতে যাইতে অন্য একটি শকটে দুইটি ভদ্রলোককে দেখিয়া গাড়োয়ান আরোহীদের সম্বোধন করিয়া বলিল "জান, ঐ দুজন লোক কে? স্যার হোরেস্ প্লান্কেট ও এন্টনি ম্যাক্‌ডোনেল্—ওঁরা আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্য-দেবতা"। প্লান্কেট আইরিশ কৃষক ও শ্রমজীবিদের জন্য যাহা করিয়াছেন, গত প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। যে স্বদেশ-প্রেমিকতা মানুষের চিত্তকে মঙ্গলকর্ম্মে উদ্বোধিত করে, যাহার বাণী সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে এক উদার কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া লয়, আইরিশ কৃষকের উন্নতিকল্পে স্যার প্লান্কেটের অশ্রান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ তাহারই দৃষ্টান্ত। আয়র্ল্যাণ্ডে নামজাদা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নাম সংবাদপত্রের বক্তৃতা-সভার বিবরণীতেই ছাপান থাকে কিন্তু স্যার ম্যাক্‌ডোনেলের নাম দেশের চিত্তপটে চির-মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

প্লান্কেট আয়র্ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাই রাজনৈতিক সংস্কারকদের ন্যায় তিনি পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিয়া, বক্তৃতায় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ও সংবাদপত্রে ইংরেজ শাসনের কুফল প্রচার করিয়া আয়র্ল্যাণ্ডকে মুক্তিরপথে স্বাধীনতার সোপানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকারের মূল কোনো একটি কারণে নিহিত আছে তাহা নহে; আমরা ইংরাজের অধীন বলিয়া আমাদের দেশে রোমীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় নানাপ্রকার জাল

* বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধ-পাঠ সভায় পঠিত।

জঞ্জালে সাধারণ লোকগুলিকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া কিম্বা অপর কোনো একটি কারণবশতঃ আইরিশ কৃষক ও শ্রমজীবিদের এমন দুর্গতি হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে না। তিনি বলেন বহু শতাব্দীর আবর্জ্জনা ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত হইয়া আজ আয়র্লাণ্ডকে এমন দুর্গতিভারগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য্য এই আইরিশের ন্যায় একটা বলিষ্ঠ জাতি বংশপরম্পরাক্রমে তাহাদের জাতীয় সমস্যাগুলির মীমাংসার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। এবং অম্লান বদনে স্বীকার করিল যে আয়র্ল্যাণ্ড বিপথে চলিয়াছে—তাহার আর উদ্ধার নাই।

কিন্তু সমস্যা কঠিন ও জটিল বলিয়া এমন করিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া অত্যন্ত কাপুরুষের লক্ষণ। স্যার প্ল্যান্‌কেট বুঝিতে পারিলেন, আইরিশ দীর্ঘকাল নিপীড়িত হইয়া জীবনকে অত্যন্ত হাল্কা করিয়া দেখিতেছে—এই জন্য তিনি সমগ্র চেষ্টা দিয়া জাতীয় উদ্দীপনার সূত্রপাত আরম্ভ করিলেন। যাহাতে দেশের জনসাধারণের মেরুদণ্ডে বলসঞ্চার হয়, যাহাতে ইহারা শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের অবস্থা সম্যক্‌ ধারণা করিতে পারে, প্ল্যান্‌কেট কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এই ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন নৈতিক সাহস; আত্মপ্রত্যয়, শক্তি লাভের জন্য ব্যাকুলতা ও কর্ম্মোৎসাহের অভাবেই ত আয়র্ল্যাণ্ডে দারিদ্র্য রাজত্ব করিতে পারিতেছে। ইহার জন্যই য়ুরোপে বাণিজ্য-বিপ্লব উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড যেমন করিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল, আইরিশগণ তাহা পারিলেন না। বাণিজ্য-চতুর জনবুল্‌ সুযোগ পাইয়া আয়র্লাণ্ডের দেশীয় কারখানাগুলির দরজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং ক্রমশঃই আয়র্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু যখন জীবিকা-নির্ব্বাহের একটি পথ বন্ধ হয়, জঠর-জ্বালার তাড়নায় তখন অপর একটি পন্থা মানুষ খুঁজিয়া লয়। বাণিজ্যশালার দরজা বন্ধ হইতেই আইরিশগণ জমিদারদের নিকট হইতে ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল—আয়র্ল্যাণ্ডে কৃষি-কর্ম্মের ধূম পড়িয়া গেল। কৃষিক্ষেত্রে নামিয়াই আইরিশ বুঝিতে পারিল সুধু চাষ করিয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর ফসল হইবে কৃষিকর্ম্ম এত সহজ নহে; এখানেও নানা-প্রকার বাধা-বিঘ্ন বিরোধ আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রকে জটিল করিয়া তুলিল; কার্য্যত যে সকল অসুবিধা ঘটিতে লাগিল তাহা ঠেলিয়া কৃষিউন্নতির চেষ্টা করা সম্ভব হইলেও বাহির হইতে ইংলণ্ড আয়র্ল্যাণ্ডের জমির উপর এমন কর ধার্য্য করিলেন যে, যে-কোনো দেশে এইরূপ করভার কৃষি-উদ্যমকে পিষিয়া ফেলিতে পারিত। আয়র্ল্যাণ্ডে এই কর-ধার্য্য হওয়াতে কৃষি-উন্নতি ও পল্লী-সমাজ-গঠনকার্য্য আরো কঠিন হইয়া উঠিল। একবার ভাবিয়া দেখুন, যে দেশে অন্তত ৮০ বিঘা জমি না হইলে একটী কৃষিপরিবার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না সেই দেশে চল্লিশ হইতে তিন বিঘা পর্য্যন্ত ছোট ছোট খণ্ড জমির সংখ্যা পাঁচ লক্ষ এবং ইহার এক একটি খণ্ডে একটি বা বহু পরিবার জীবিকায় জন্য নির্ভর করে। অনেকস্থলেই জমির উর্ব্বরতাশক্তি অত্যন্ত অল্প; সার প্রয়োগ করিয়া জমিকে প্রস্তুত করিবার অর্থও ইহাদের নাই। যাহারা সমুদ্রের কাছে বাস করে তাহারা মৎস্য, কাঁকড়া শামুক ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে; যেখানে এই প্রকার কোনো ব্যবসা সম্ভবপর নহে, সে সকল স্থান প্রতিদিনই জনশূন্য হইয়া পড়ে কেন না সহ্য করিতে না পারিয়া, দারিদ্র্যক্লিষ্ট আইরিশগণ দলে দলে কেহ স্ত্রী পুত্র লইয়া কেহ একাকী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করে। নিউইয়র্কে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ইহাদের কিছু-কাল একটী দ্বীপে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নিঃস্ব আইরিশগণ প্রথম যখন নিউইয়র্কে পৌঁছে, তখন তাহাদের লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, সে যে বিদেশে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে তাহার চাহনিতে, কথাবার্ত্তায় ও কাজকর্ম্মে তাহা বুঝা যায়। কোনো-প্রকারে কুলিমজুরের কাজ করিয়া সে জীবিকা অর্জ্জন করে। এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই আর এক দৃশ্য—তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে এখন সোজা হইয়া চলে; বেশভূষা কথাবার্ত্তা ও চাল-চলনে সে এখন কাহারো অপেক্ষা হীন নহে; এরূপ হইবার কারণ কি? আমার মনে হয়, আয়র্লাণ্ডে ইহারা এমন একটা হীনাবস্থায় চাপা থাকে যে কোনো মতেই তাহাদের জীবন সেখানে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারেনা; সেখানে চারিদিক হইতেই সে যেন কেবল এই বাণীই শুনিয়াছে যে, দুর্গতি ভিন্ন বিধাতা আর কোনো বর তাহাকে দান করেন নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কথা শুনিতে শুনিতে সে যথার্থই বিশ্বাস করে যে সে অত্যন্ত দীনহীন; তাই ক্রমশই তাহার ভিতরের শক্তি লোপ পাইতে থাকে। কিন্তু সে আমেরিকায় পৌঁছিতেই সেখানকার প্রকৃতি তাহাকে বলে যে সে মানুষ,—কাহারো চেয়ে সে হীন নয়; ধন, ঐশ্বর্য্য, সহায় সম্পদ সমস্তই মানুষই অর্জ্জন করিয়াছে, সেও করিতে পারে। বিশ্বসংসারে সে যে সামান্য নহে, তার ভিতরে যে সমস্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা সে এই প্রথম শুনিয়া থাকে। প্রকৃতির

এই উদ্বোধনে তাহার বুকে সাহস হইলে সে মানুষ হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়।

যাহাতে স্বদেশে থাকিয়া আইরিশ এ বাণী শুনিতে পারে মিঃ প্ল্যানকেট্ সেই উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ যাহাতে সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে সে জন্য তিনি আইরিশ পল্লীগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন; কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, গত প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে কোনো সংস্কারকার্য্যই বেশি দিন টিঁকিতে পারে না। শিক্ষা-প্রভাবে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে। ইহা না হইলে কোনো চেষ্টাই সার্থক হইতে পারে না। স্যার প্ল্যান্‌কেট্ এই জন্যই প্রধান কৃষি-সমিতির (Central Agricultural Society) সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। সহজ সরল ভাষায় কৃষিতত্ত্ব কৃষকদের নিকট ব্যাখ্যা কবিবার নিমিত্ত তিনি আয়র্লাণ্ডে কৃষিবিদগণকে ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন। ইহাতে সুধু শিক্ষার কাজ হইত তাহা নহে, যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা ভদ্র, যাঁহারা সংসারে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, অশিক্ষিত সামান্য আইরিশ কৃষক হইয়াও তাঁহাদের সঙ্গ পাইতেছে, ইহাতে আইরিশগণ সমস্ত জগতের সঙ্গে যে তাহাদের একটা যোগ আছে তাহা অনুভব করিয়া উৎসাহিত হইত।

কৃষিশিল্প বিস্তারের জন্য স্যার প্ল্যান্‌কেট ও তাঁহার সহযোগী বন্ধুগণ যাহা করিয়াছেন তাহা অনুকরনীয়। আইরিশ শিক্ষকদল হইতে কতকগুলি শিক্ষককে কৃষিবিত্তা শিখাইয়া আয়র্লাণ্ডের স্থানে স্থানে ইস্কুল স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং শিক্ষকগণ Royal College of Science এ তিন বৎসর কৃষি অধ্যয়ন করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা করা হইল। অবস্থাপন্ন কৃষকগণের জন্যে স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং যাহারা ইস্কুলের বেতনাদি দিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ডেনমার্কে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কৃষকদিগকে কৃষি-পরীক্ষার ফলাফল জানাইবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়, আয়র্লাণ্ডেও তাহা প্রচলিত হইয়াছে। একদল শিক্ষক প্রচারকের ন্যায় স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া গ্রামস্থ কৃষকদের নিকট বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রে পরিচালিত পরীক্ষাদির ফলাফল বিস্তৃতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সুধু বক্তৃতা নহে, এই শিক্ষকদলকে চাষীদের জমিতে গিয়া কে কি ভুল করিতেছে, কাহার কি করা উচিত ইত্যাদি যত্নের সহিত বলিয়া দিতে হয়। ইহা দ্বারা কৃষিকর্ম্মে কি প্রকার উন্নতি হওয়া সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সর্ব্বপ্রধান কৃষি-সমিতি আয়র্ল্যাণ্ডের উন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন, পূর্ব্বে তাহা স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সমিতির সমস্ত কার্য্যপ্রণালী ও ব্যবস্থা এবং ইহার চেষ্টায় কৃষি ও শিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি হইবে, সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, আয়র্ল্যাণ্ডের পতিত জমিগুলিতে শস্যাদি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে; যে দেশের কৃষকেরা জমিকে উর্ব্বরা রাখিবার জন্য সার ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা ছয় বৎসরে প্রায় বিশ হাজার টন্ অর্থাৎ ৫৪০,০০০ হাজার মন আয়র্ল্যাণ্ডের তৈরী সার ব্যবহার করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতেও প্রচুর পরিমাণে সার আমদানী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হইতে উন্নত বংশের গরু ঘোড়া আনিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের গরু ও ঘোড়ার যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে। কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সমিতির উদ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রদর্শনী খুলিয়া উৎকৃষ্ট ঘোড়া বা গরু বা শুকরের জন্য কৃষককে অর্থ পুরস্কার করা হয়; এক বৎসরেরর মধ্যে সমিতি হইতে ১২ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ১৮০,০০০ টাকা কেবলমাত্র ষাঁড়ের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পুস্তিকা বিতরণ করিয়া, সরল ভাষায় প্রাণীরক্ষা ও প্রতিপালনের প্রণালী বুঝাইয়া দিয়া, কালেজে ইস্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তু লইয়া পরীক্ষা করিয়া নানাভাবে সমিতি দেশের গৃহপালিত জন্তুর উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, দুধের ব্যবসা অতি অল্পকাল মধ্যে আয়র্ল্যাণ্ডে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; এখন বিদেশী মাখম, চিজের (cheese) উপর ইহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় না।

চতুর্থতঃ, ছোট খাট নানা ব্যবসার পথ খোলা হইয়াছে। ফল-রক্ষণ, জ্যাম, মারম্যালেড্, চাটনি ইত্যাদি তৈরি করা প্রভৃতি লাভজনক ব্যবসা এই সমিতিই উদ্যোগ করিয়া গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিয়াছে; এই সকল কাজ সাধারণ আইরিশ কৃষক ও শ্রমজীবিদের স্ত্রী ও কন্যারা করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, তামাক ও তিসি এই দুইটি শস্য আয়র্ল্যাণ্ডে জন্মিতে পারে কিনা কয়েক বৎসর অবধি তাহা সমিতির কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই ইহাই আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষিক্ষেত্রে স্থান পাইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

নিউইয়র্কে আইরিশ পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া এবং আয়র্ল্যাণ্ড সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক সময় মনে হইয়াছে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে আয়র্ল্যাণ্ডের যথেষ্ট মিল আছে। বহুস্থলে সত্যই ইহা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আইরিশদের মধ্যে দুইটি বিশেষত্ব আছে; প্রথম—সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার; দ্বিতীয়—Commercial patriotism অর্থাৎ আমরা আইরিশ আয়র্ল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত আর কোনো দ্রব্য ব্যবহার করিবনা এই সঙ্কল্প।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আয়র্ল্যাণ্ডে স্যার প্ল্যান্‌কেট্ যে এতবড় কাজ সম্পন্ন করিতে পারিলেন, কোথা হইতে ইহার ব্যয়ের সংস্থান হইল? স্যার প্ল্যান্‌কেটের অবস্থা ভাল ছিল; তিনি তাঁহার সমস্তই এ কার্য্যে দান করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও যদি পল্লীগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হয়, এবং যাহাদের রুধির-শোষণে আমরা "ভদ্রলোক" হইতে পারিয়াছি, তাহাদের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগকে মুক্ত হস্তে কৃষি-উন্নতির জন্য দান করিতেই হইবে। আর যদি সহজে আমরা দান না করি, তাহা হইলে আশা করি এমন একদিন আসিবে যে দিন ভারতবর্ষের শ্রমজীবী ও নিম্নশ্রেণীয়গণ ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য দাবী করিয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় অন্যায়ের প্রতিকার-চেষ্টা করিতে পারিবে। আমরা আজকাল বিদেশীয়ের বিরুদ্ধে অভিমান করিয়া বয়কট করিতে শিখিয়াছি কিন্তু বস্তুত যদি অভিমান করিবার যথার্থ পাত্র কোথাও থাকে সে আমাদের স্বদেশীয় ভদ্রমণ্ডলী। ইহারা পদে পদেই ধন-মান-খ্যাতি-বিদ্যা হইতে দেশের নিম্নতন শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে নিরুদ্যম ও অপমানে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ ইচ্ছা-পূর্ব্বক ভদ্রমণ্ডলী যদি ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার না করেন তবে যেন তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নিজের দেশের সম্বন্ধে ভূরি পরিমাণে পাপের ভার বহন করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে অভিমান পোষণ ও প্রকাশ করিবার নির্লজ্জতা আমাদের যত শীঘ্র ঘোচে ততই মঙ্গল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অহং ও স্বয়ং।

আমার অহং তুমিই স্বয়ং
করতে পার লয়,
আর কাহারো যোগে আমার
অহং যাবার নয়।
যেথায় যখন বসি আমি
যেথায় বাঁধি ঘর,
অহং আমার সাথের সাথী
নিত্য অনুচর।
যখন হাসি যখন কাঁদি
যখন যাহা চাই,
সবার মাঝে অহং বাজে
শুন্‌তে আমি পাই।
মনের মধ্যে যদি আমি
ভাবি কিছুক্ষণ
সেথাও দেখি অহং পেতে
রয়েছে আসন।
অহংটিরে এড়াই এমন সাধ্য
আমার নাই
এই কথাটি সবার উপর
সত্য জেন ভাই।
জানুক আমায় সবাই, আমি
নইকো তপস্বী,
বৃথা কথায় যেমন আমি
না হই যশস্বী।
অহং আমায় আগাগোড়া
অহং আমার মন,
বৃথা সকল জারিজুরি
বৃথাই আস্ফালন।
অহং যোগে বাঁধা আমার
আছে চারিপাশ
আপন জোরে কাটব এরে
নাইকো এমন আশ্।
নাইকো এমন বীর্য্য যাহে
করব' অহং জয়
তুমি যদি সদয় হয়ে
না হও স্বয়ংময়।
আমি অহং ভেদের বাঁধন
মরণ করি সার,
তুমি স্বয়ং লওহে আমায়
অভেদ-পরপার।

১৬ই কার্ত্তিক। শ্রীহেমলতা দেবী।

বাহাই ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, সকল মানবই যে এক, মানব-সমাজের এই ঐক্যানুভূতিই বাহাই ধর্ম্মের মূল কথা। পারস্যদেশীয় এই নবধর্ম্মান্দোলনের নেতৃগণের প্রধান চেষ্টা মানবসমাজে যে অনৈক্য, যে দ্বন্দ্ব বিরোধ সকল অবিরত চলিতেছে, মানব-চিত্তকে সত্যভাবে সত্য উপলব্ধিতে জাগ্রত করিয়া এই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করা। বাহাইগণ আপনাদিগকে "আলোকের প্রেমিক" (Lovers of Light) বলিয়াছেন। মানবের সত্য স্বরূপটি যে কি তাহা জানিয়া সেই সত্যালোক লাভ করিয়া এবং এই সত্যকে ভালোবাসিয়া তাঁহারা "আলোকের প্রেমিক" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। বাহা-উল্লা একস্থানে বাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

হে মানব সন্তানগণ, তোমরা কি জান কেন তোমা-দিগকে একই মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে? তাহা এই জন্য যে একজন আর একজনের উপর কোনো প্রধান্যের দাবী করিবে না। সর্ব্বদা মনে রাখিয়ো, কি ভাবে তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ।

যেহেতু আমরা একই পদার্থে সৃষ্ট হইয়াছি, আমা-দিগকে এক-আত্মা হইতে হইবে। আমাদিগকে আমা-দের জীবনে সকল কর্ম্মে একতার আদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে।—বাহাউল্লা বলিয়াছেন—তুমিই আমার আলো—ঈশ্বরের সত্যালোক আমাদের মধ্যেই প্রক-টিত। এই আলোকই বাহাইগণ অনুসন্ধান করেন এবং ইহাকেই তাঁহারা অনুসরণ করেন।

আব্দুল বাহা একস্থানে বলিয়াছেন—যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় হইতে চান তাঁহারা সকলে একত্র হৌন, এবং পরস্পরকে ভালোবাসুন। সমস্ত মানবকে তাঁহারা ভালোবাসুন এবং পরস্পরের জন্যে প্রয়োজন হইলে জীবন দান করিতেও প্রস্তুত হৌন। ইহাই বাহা'র পথ, ইহাই বাহা'র ধর্ম্ম, ইহাই তাঁহার নিয়ম এবং যাঁহার মধ্যে এই সকলের কিছুই নাই তাঁহার মধ্যে বাহা'রও কিছুই নাই।"

বাহাই আন্দোলন এইরূপে আপনাকে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ঐক্য আনয়ন করিবার উপায়স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ইহার এই দাবী সহজে লোপ করা যায় না। শত শত আত্মত্যাগী ব্যক্তি এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নির্য্যাতকের কঠিন হস্তে অবলীলাক্রমে জীবন দান করিয়াছেন। অন্তরে তাঁহারা যে এক বিশ্বতোমুখ প্রেম অনুভব করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই হয় না। এ প্রেম কি সহজ! ইহা মহান্—সেইজন্য কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম সকল দেশেই বাহাইগণ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছেন।

বাহাইগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরের এই একত্ব হইতে তাঁহাদের সকল ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হইয়াছে। এই একটি সত্যকে তাঁহারা এরূপভাবে অন্তরের সহিত একান্ত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন যে কোথাও আর তাঁহারা বিচ্ছেদ দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহাদের চোখে বিশ্বের যা কিছু সমস্তই এক নিয়মাধীন —এক। বিশ্বরাজ্যের রাজা এক—তাঁহার প্রজাগণও এক—কোথাও আর পার্থক্যের লেশমাত্র নাই!

কিন্তু এই ঐক্যানুভূতিই যে বাহাইদিগের চরম লক্ষ্য তাহা নহে। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা—ইঁহাদের সমস্ত শিক্ষার আসল দিক্‌টি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আছে। তাঁহারা চান—সত্যধর্ম্ম; তাঁহারা চান সমগ্র মানবসমাজের সহিত ঐক্য রক্ষা করিয়া সকল মানবকে ভ্রাতার ন্যায় অনুভব করিয়া ধর্ম্ম-জীবন, সত্যজীবন যাপন করিতে। বাহাউল্লা এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ধর্ম্ম মানবের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে পৃথিবীর সকল মানবের মধ্যে ঐক্যসূত্র দৃঢ় হইবে বলিয়াই। কিন্তু এমনি আমা-দের দুর্ভাগ্য যে আমরা ধর্ম্মকেই বিচ্ছেদের কারণ করিয়া তুলিয়াছি—ধর্ম্ম লইয়া আমরা কত বিরোধ রচনা করি-য়াছি! এটি বাহাউল্লারই কথা—"সত্যধর্ম্ম এবং সত্য-ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি, ঐক্যালোক পরিপূর্ণভাবে উজ্জ্বল করার প্রধান কারণস্বরূপ। ইহাই জগতের উন্নতির কারণ, জাতির উন্নতির কারণ, মানব-সমাজে শান্তির কারণ। কোনো ধর্ম্মকে সরাইয়া রাখিয়ো না বা তাহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়োনা। প্রত্যেক মানুষ আপন আপন শক্তিঅনুসারে ঈশ্বরের মহত্ব উপলব্ধি করে।"

বাহাউল্লাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—তিনি পৃথিবীতে একটি কোনো নূতন নৈতিক উপদেশ প্রচার করিবার জন্য আসেন নাই, কারণ, সত্যমিথ্যা স্থির করিয়া লইবার শিক্ষা সকলেই পাইয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জগতের সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে এবং সকল লোককে এক করা।

আজকালকার দিনে, যখন জাতিতে জাতিতে বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে—এক জাতির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আর এক জাতি না করিতেছে এমন নির্দ্দয় কর্ম্ম নাই—এই বিদ্বেষধর্ম্মীগণের যুগে বাহাউল্লার প্রদত্ত শিক্ষা মরুভূমিতে বারিবর্ষণে ন্যায় তৃপ্তিপ্রদ।

বাহাইগণ সমগ্র জগৎকে এক প্রেমরাজ্যে পরিণত

দেখিতে চান এবং এই সাধনাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

আব্দুল বাহা একস্থানে বলিয়াছেন—সেই অদৃশ্য পুরুষের অক্ষয় আলোক জগতে যে প্রকাশ পায় সে কেবল মানবাত্মার শিক্ষার জন্য, যাহা কিছু আছে সমস্তেরই উন্নতির জন্য, যাহাতে পার্থিব বস্তুতে রত মানবসন্তান ঈশ্বরের ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, মোহান্ধকারাচ্ছন্ন জীব জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়, অশিক্ষিত মূঢ় স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা লাভ করে তাহারই জন্য—অজ্ঞান জ্ঞাননির্ঝরের অমৃত পান করিতে পাইবে বলিয়া, বর্ব্বর তাহার হিংসাপ্রবণতা ত্যাগ করিবে বলিয়া, নির্দ্দয় সহিষ্ণু হইবে বলিয়া এবং অকরুণ পরমশান্তি লাভের পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া।

শিক্ষাদান সম্বন্ধে বাহাউল্লা যে উপদেশ সকল প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও বিশেষত্ব আছে। তিনি বলিয়াছেন—সকল জ্ঞান ঈশ্বরের, অতএব তোমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা করিতেই হইবে। তিনি স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেক সন্তানকেই যতদূর সম্ভব সুশিক্ষা প্রদান করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাব স্ত্রীপুরুষের সাম্য প্রচার করিতেন, বাহাউল্লাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। জীবিকা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—কেহই যেন ভিক্ষাবৃত্তি না করে ; যে অবস্থার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক না সকলেই যেন কোনো না কোনো ব্যবসায়, শিল্প কিম্বা অর্থকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং এরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে যাহা তাহার পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এরূপে কার্য্য করিলে বর্ত্তমান কালের কত অসুবিধা যে দূরীভূত হয় তাহা একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যে সকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমরা ঈশ্বরের করুণায় শক্তিলাভ করিয়াছি আমরা আপনাদের সেই সকল প্রয়োজন আপনারাই মোচন করিয়া লইব এবং জনহিতার্থে শক্তি নিয়োগ করিয়া পরমপিতার দানের সার্থকতা সম্পাদন করিব ইহাই স্বাভাবিক। এইটি হইলেই মানবসমাজের অনেক বিশৃঙ্খলতা দূর হইয়া যায়। বাহাউল্লার এই উপদেশটি বর্ত্তমান যুগের বড়ই উপযোগী।

পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই ধর্ম্মবিশ্বাসে মিথ্যা সকল আনীত হইয়াছে। তিনি এই শ্রেণীর লোকদিগকে স্বীকার করেন নাই। স্ত্রী হোক পুরুষ হোক কেহই যেন সমাজ হইতে দূরে গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া না থাকে তিনি এইরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কারণ সেরূপ জীবনে মানব অবশিষ্ট মানবগণের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে পারেন না। সম্ভব হইলে সকলকেই বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন বিবাহিত জীবনই শ্রেষ্ঠ। সকল প্রকারের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ তিনি নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নিষেধটি তিনি বার বার নানা প্রকারে বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার শিক্ষা ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা।

তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"জগতের একটি অতি কঠিন ব্যাধিই হইতেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইহার অগ্নি সকল জাতির মধ্যেই জ্বলিতেছে, একমাত্র স্বর্গের বারীধারা, ঈশ্বরের বাণী ভিন্ন আর কিছুই ইহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। এইজন্য যাঁহারা ঈশ্বরের পথে গমন করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঐক্য এবং যোগবন্ধনের পতাকাস্বরূপ হওয়া।"

বাহাউল্লা যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাকে সারা পৃথিবীতে প্রচারিত করিবার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রেমিক ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন,—"প্রেমই সেই চুম্বকশক্তি যাহাতে অন্তর এবং আত্মা আকৃষ্ট হয় ; ঐশী শক্তির প্রকাশ অন্তরে অন্তরে আত্মায় আত্মায় এই প্রেমের ধারা প্রবাহিত করিবার জন্যই। আমরা তাঁহার ভৃত্য ; আমাদিগকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া, আমাদের জীবন দিয়া এই বিশ্বপ্রেমকে জগতে প্রচারিত করিতে হইবে, জগৎকে এই প্রেমালোকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রকৃত যাহা মনুষ্যত্ব তাহারই সুপ্রভাতের শুকতারার উদয়ের জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। প্রেমই মূল পদার্থ। এই-ই সত্য—অসামঞ্জস্য, রূঢ়তা, কঠোরতা এবং ঘৃণাই অসত্য। এই প্রেমকেই সাধন করিতে হইবে;—এ ধর্ম্ম কর্ম্মের ধর্ম্ম, শুধু বাক্যের ধর্ম্ম নহে।

"আমরা জগতের কল্যাণ কামনা করি এবং সকল জাতির সুখ প্রার্থনা করি। আমরা তাহাই চাই যাহাতে সকল জাতির বিশ্বাস এক হয় এবং সকল মানুষ ভ্রাতার ন্যায় বাস করে। আমরা তাহাই চাই যাহাতে মানবসন্তানের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন দৃঢ় হয়, ধর্ম্মমতের পার্থক্য দূর হয়, জাতি সকলের মধ্যে ভেদ না থাকে, সকল মানুষ পরস্পরের প্রতি আত্মীয়ভাবাপন্ন হইয়া এক পরিবারস্থের ন্যায় বাস করে। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এইটুকু বলিয়াই যেন মানুষ গৌরব বোধ না করে। এই বলিয়া সকলে গৌরব বোধ করুন যে তাঁহারা মানবজাতিকে ভালোবাসেন।"

এই মহাপ্রেমিক মহাত্মার সকল শিক্ষারই প্রবর্ত্তক প্রেম এবং উদ্দেশ্য জগতের হিতসাধন। এই যে একটি সত্য ইঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইঁহাদের সকল

কর্ম্ম ইহারই পথে চলিতেছে। প্রেম প্রচার করিয়া জগৎকে তাঁহারা একটি প্রেমরাজ্যরূপে দেখিতে চান ইহাই তাঁহাদের অন্তরের মহান্ আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহবুবীধর্ম্ম।

মুসলমান ধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তখন যে কোরাণপ্রতিপাদিত মহম্মদের খাঁটি ধর্ম্মই ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল তাহা নহে। মুসলমান দেশে তাহার পূর্ব্বেই নানা সম্প্রদায় ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই গুলিও সেই সঙ্গেই ভারতে প্রবেশ লাভ করিল। আরবের মরু-বায়ু হইতে মুসলমান ধর্ম্ম যখন সরস ইরাণের উর্ব্বর ভাবপ্রবণ ভূমিতে পদার্পণ করিল তখন ইরাণবাসীর বিচিত্র চিন্তার সঙ্গে মিশিয়া সেই এক কঠিন ঋজু ধর্ম্মমত নানা ভাবে ও নানা রঙ্গে বিচিত্র হইয়া উঠিল। সাধারণ ধর্ম্মও এইরূপ কত বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হইল, তাহার তলে তলে আবার নানারূপ নিগূঢ় ভাব লইয়া নানা উপসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। তার সব গুলি যে পবিত্রতার হিসাবে বিশুদ্ধ ও ভাবের হিসাবে গভীর তাহা নহে। অনেক সম্প্রদায় অবশ্য খুব গভীর ধর্ম্মভাবে ও কঠোর সাধনায় আপনাদিগকে ধন্য করিয়া তুলিল কিন্তু ভাবপ্রবণ হৃদয়ের নানা দুর্ব্বলতা কতকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্গে নানা ভাবে বেমালুম মিশিয়া যাইতে লাগিল।

ভালমন্দ এই সব সম্প্রদায় যে কেবল মূল ইস্লামধর্ম্মকে মানিয়া লইয়াই গঠিত হইয়াছিল তাহা নহে। কতক কতক মত ও সম্প্রদায় মূল ইস্লামধর্ম্মের প্রতিবাদের মতই গড়িয়া উঠিল। আরবের সেই অপেক্ষাকৃত রসহীন নৈতিক ও নিরাপদ ধর্ম্মকে লইয়া ইরাণের ভাবপ্রবণ চিত্ত পরিপূর্ণই হইল না তাই নানাবিধ ভাবের সম্প্রদায় গঠিত হইল। ইস্লামধর্ম্মের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘোষণা করিল—"প্রকৃত প্রেম অগ্নি-উপাসকেরা জানে, তাহাদের মন্দিরে আমি দীক্ষা লইব।" "মূর্ত্তি-পূজকেরা সেই নিগূঢ় প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়াছেন, শুষ্ক তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার কোন্ তত্ত্ব জানেন?" "যথার্থ সংযম তো সুরাসেবীদের পায়ের তলার প্রাঙ্গণ, পেয়ালা আমার সংযমের গুরু, এ সব গুরুর কাছে মিথ্যা বাগ্‌জাল শুনিয়া ফল কি?" "তরুণীর গণ্ডস্থলকে নিন্দা করিব কোন্ সাহসে? আমার প্রেয়সীর দীপ্ত কপোলে যে চুম্বন করিয়াছে তাহার ওষ্ঠে অগ্নিমুদ্রা চিরকাল লাগিয়া থাকিবে, সে জ্বালা এ জন্মে মুছিবার নহে; এই তো ধর্ম্মের যথার্থ দীক্ষা।" "বৈরাগ্যের জন্য আমি বৈরাগী হই নাই, যে অবধি সেই নয়নের দিকে আমার নজর পড়িয়াছে, সেই অবধি আমার সব সুখ ও আরাম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সাধ করিয়া বৈরাগ্য করা, সে কি আমি পারি?" "কাবার মন্দিরে যাঁহার দেখা পাইলাম না বাজারে তাঁহার দেখা মিলিল। আমি কহিলাম হে বন্ধু এখানে লুকাইয়া আছ কেন?' তিনি কহিলেন 'ওরে মূঢ় ধর্ম্মব্যবসায়ী; পাথরের মন্দির ফুটা করিয়া দরজা গড়িতে জান, আর মানুষের মন্দিরের মধ্যে যাইবার দ্বার তোমার নাই?' আমি হার মানিলাম।"

এই প্রকার এক মুগ ইস্লামধর্ম্মের নানা রূপান্তর ও প্রতিবাদী উপধর্ম্মসমূহ দেখিয়া একজন সাধক বলিয়াছেন, "এক দরিয়ার জল নানা ঘরের নানা রসে নানা সরবৎ ও সরাপ হইয়া গেল।"

এইরূপে এক ইরানেই অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। ভারতে অনেক পরিমাণে সেই সব মতামত এবং শাখা ও সম্প্রদায় আসিয়া পড়িল। তা ছাড়া এই ভারতের উর্ব্বর রসপ্রধান ভূমিতে আসিয়াও যে কত নব নব ভাব ও মতের উৎপত্তি হইল তাহা বলা সুকঠিন। ভারতের গভীর বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত মিশিয়া মুসলমান সুফিধর্ম্মের যেমন অনেক ভাল ফল হইল তেমনি মাঝে মাঝে কুফলও ঘটিল। বেদান্তবাদের সঙ্গে মিশিয়া 'মতাজঙ্গী' প্রভৃতি নানা জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এবং রস-পন্থী বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিয়া আউলিয়া মরুমিয়া প্রভৃতি সরস ও গভীর সাধকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

মহবুবী সম্প্রদায়টি যে কোথাকার তাহা বলা সুকঠিন। তবে কবীরের সময় ইহা ভারতে বিদ্যমান ছিল। ইহাদের আচার ব্যবহার ছিল, কতকটা দূষিত কর্ত্তাভজাদের মত। ঈশ্বরকে ইহারা প্রিয়তম বা 'মহবুব' বলিত। ইহাদের মধ্যে গুরু ঈশ্বরের স্থান লইয়াছিলেন, কাজেই গুরুও মহবুব। এবং এই সূত্রে মনুষ্যের যত নীচ প্রবৃত্তি সবগুলি আপনাদিগকে চরিতার্থ করিয়া লইল। ইহারা গুরুকে স্বামী বলিয়া যে সব কুৎসিতাচারে প্রবৃত্ত হইল তাহা ধর্ম্মার্থির পক্ষে বিষবৎ কিন্তু ধর্ম্মের নামেই তাহা চলিতে লাগিল। আজও আমাদের দেশে এইরূপ কত উপধর্ম্ম যে আছে তাহা গণনা করিয়া বলা অসম্ভব। আবার এই এক আশ্চর্য্য যে বহুতর শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য লোক এই সব আচারের ও এতাদৃশ গুরুর প্রশংসা করিবার যথেষ্ট ভাষা খুঁজিয়া পান না।

এই মহবুবীধর্ম্ম প্রসঙ্গে মহাত্মা কবীরের একটি আলোচনা নীচে দিলাম।

ধর্ম্মদাস আসিয়া কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সাধু, আপনি কি জানেন যে মহবুবী সম্প্রদায় কতদূর জঘন্য আচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নানাবিধ বীভৎস আচার ধর্ম্মের নামে তাহারা চালাইতেছে।" কবীর বলিলেন

"জানি।" "আপনি তাহাতে বিস্মিত হন নাই?" "না।" "এ কিরূপ কথা?"

কবীর বলিলেন যে কোন বিষয় হইতে তাহার দেয়টুকু আদায় করিবার পরেও তাহাকে যদি আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে সেই বিষয়েই বিকার সমস্ত সংসারকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। এই যে অন্ন, ইহারও যেটুকু কৃত্য, তাহা সম্পন্ন করিয়া সে আর ভদ্র নহে। ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য। প্রতিদিন যাহা বিকাশিত হইয়া উঠে তাহাতেই যথার্থ ধর্ম্মকে লাভ করিবে। যদি তুমি প্রতি দিনের উৎপদ্যমান ধর্ম্মকে গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন সঞ্চয়ের দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখ তবে প্রাচীন সঞ্চয়ের বিকারকে গ্রহণ করিতে তুমি বাধ্য।

"এই রূপেই ধর্ম্ম বিকৃত হয় অথচ সেই বিকৃত ধর্ম্মকে আমরা গ্রহণ করি। করি কেন? না ধর্ম্মের জন্য আমাদের যে ক্ষুধা তাহা সত্য ক্ষুধা। এই বিকারকে গ্রহণ করিয়া আমরা মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করিতে হইলেও এই বিকারকে গ্রাস না করিয়া পারিব না। কারণ ক্ষুধা অন্ন চায়।

ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোক ক্ষুধার তাড়নায় মৃৎপিণ্ড আহার করিতে বাধ্য হয়, যদিও তাহাতে তাহার কোন পুষ্টি নাই, অভক্ষ্য ভোজন করিতে বাধ্য হয়, যদিও তাহাতে তাহার ধ্রুব মৃত্যু। মৃত্যুর দ্বারা জীবন ক্ষুধার যথার্থ ঘোষণা করিয়া যায়। মরণের দ্বারা সে বলে "হে ক্ষুধা, তুমি আছ। তুমি সত্য, তুমি জাজ্বল্যমান তুমি নিশ্চয় আছ। মৃত্যু দ্বারা আমি ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিয়া গেলাম।" মৃত্যু এইরূপেই ক্ষুধার সত্য সত্তাকে ঘোষণা করিয়া যায়। মৃত্যুও যে ঘোষণা করিতে পারে তাহাতে বিস্মিত হইও না; একবার আমি মরুভূমির পথে এক সাধুর সাধনধাম দেখিতে গিয়াছিলাম। রাত্রিতে আমরা পথ হারাইলাম। অনেক দুর ব্যর্থ পর্য্যটনের পর 'হাদী' (পথপ্রদর্শক) বলিল "মহাশয় এখন রাত্রি, বৃথা ঘুরিয়া এখন কোন ফল নাই, যথার্থ পথ হইতে ক্রমশই দূরে যাইতেছি, অতএব এখানেই অপেক্ষা করি; প্রভাতে পথ দেখা যাইবে। প্রভাত হইল, পথ কোথায়? চলিতেছি আর চলিতেছি, হঠাৎ 'হাদী' চিৎকার করিয়া বলিল মিলিয়াছে, মিলিয়াছে। "কি মিলিয়াছে?" "পথ মিলিয়াছে।" "কেমন করিয়া বুঝিয়াছ যে পথ মিলিয়াছে?" হাদী বলিল যে, মহাশয় উষ্ট্রের কঙ্কালরাজি দেখা গিয়াছে।" আমি ভাবিলাম, "এ কি আশ্চর্য্য! জীবন্ত হাদী যেখানে পথ দেখাইতে অসমর্থ সেখানে মৃত 'হাদী' দেখাইল পথ! ভূতকালের মৃত্যু বর্ত্তমান জীবন্তের কাছে ভবিষ্যতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল! হে সত্য তুমি আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য তোমার নির্দ্দেশবিধি!"

উষ্ট্রদল যে চলিয়াছিল তাহাদের সম্বল যখন ফুরাইল তখন তাহারা সেই সত্য পথের পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিল। উহারা মৃত্যুদ্বারা ঘোষণা করিল "হে 'রাহ' (পথ) তুমি সত্য, আমার সম্বল অল্প আমি তাই শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মৃত্যু দ্বারা অনন্ত ভবিষ্যতের জীবনের কাছে ঘোষণা রাখিয়া গেলাম— "পথ এই, এই পথ, অন্য পথ নাই। দুঃখের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও এই পথ, ক্ষতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও এই পথ, মৃত্যু দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও এই পথ, অন্যপথ নাই, অন্য পথ নাই; জীবন দান করিয়া অনন্তের চিহ্নহীন বুকের উপর এই চিৎকার রাখিয়া গেলাম।"

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

ভারত সন্তান।

অন্তর মাঝে যত বাঁকা আছে
করেছে যে তারে সোজা,
চিন্তার মাঝে যত আঁকা আছে
ফেলেছে যে তার বোঝা,
শূন্য হইতে পূর্ণ আসিয়া
করেছে যাহাতে বাস,
আগু পাছু আর বাধা নাহি যার
মুক্ত চিন্তাকাশ,
শ্রেয়ের সাধনা, শ্রেয় আরাধনা
জাগিছে যাহার প্রাণে,
উন্মুখ হয়ে ভারত তাকায়ে
রয়েছে তাহার পানে।
সুখ দুখ যারে পরশিতে নারে
ভয়ের নাহিক লেশ,
সারা ধরণীর রাজা হয়ে বীর
ধরে যে ফকির বেশ,
হেলায় তুচ্ছ করে যে রাজ্য,
বীর্য্য যাহার দানে,
উন্মুখ হয়ে ভারত তাকায়ে
রয়েছে তাহার পানে।
কিবা জাতি নাম কোথা তার ধাম
নাহিক তাহাতে কাজ,
হেন সন্তানে আপনার জেনে
বরিবে ভারত আজ।
দেখাবে ভারত, চরম লক্ষ্য
রেখেছে মোক্ষ পানে,
জগৎপূজ্য তাহার কার্য্য
জগৎবাসী তা জানে।

২২শে আশ্বিন। শ্রীহেমলতা দেবী।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

এই মাস হইতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংবাদ ও সেখানকার ছাত্রগণের রচনা-প্রকাশের জন্য আমরা "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নাম দিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রক্ষা করিব।—সম্পাদক।

আশ্রম কথা।

পূজাবকাশের পর গত ১৫ই কার্ত্তিক আশ্রম খুলিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। এবার প্রায় ১৭৫টি ছাত্র হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ সীমান্তে শালতরুশ্রেণীর দুই ধারে আশ্রমের কুটীরগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। কুটীরগুলি প্রশস্ত লম্বা ঘর, মেজে বাঁধান, উপরে খড়ের কিম্বা টালির ছাদ। প্রায় প্রত্যেকটিতেই ২০।২৫টি করিয়া বিদ্যার্থী বাস করে। দুই সারি খাট এবং প্রতি খাটের নিকটে দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন পুস্তক রাখিবার একটি তাক, ইহা ভিন্ন অন্য কোন আসবাববাহুল্য কোন কুটীরেই নাই। প্রায় প্রত্যেক শয়নস্থানেরই উভয় দিকে লম্বা জানালা ও দরজা আছে। উত্তর দক্ষিণ খোলা, কোন কোন কুটীরে পূবপশ্চিমও খোলা। আলো, বাতাস অপর্য্যাপ্ত।

দ্বিপ্রহরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম ও রাত্রে শয়নের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে বিদ্যার্থীগণ কুটীরে বড় একটা থাকেন না। আশ্রমে চারিদিকে বড় বড় ছায়াময় গাছ—আম, জাম, বকুল, মহুল, নিম, পেয়ারা, শেফালি ও দেবদারুবীথিকা—ছেলেরা নিজের হাতে সেই সকল বৃক্ষনিম্নে বেদিকা রচনা করিয়াছে। বর্ষাকাল এবং উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্ন ব্যতীত অন্য সকল সময়েই সেই তরুচ্ছায়াতলে ক্লাস বসে। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য, স্নান, উপাসনা, প্রাতরাশ ও মন্ত্রোচ্চারণের পরেই ক্লাস বসে, প্রায় ৭॥০টার সময়; দ্বিপ্রহরে আহারের পর কিছুকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় ক্লাস বসে এবং বৈকালের জলযোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্লাস চলিতে থাকে। সুতরাং কুটীরে বাস অপেক্ষা প্রকৃতির সহবাস ছাত্রদিগের অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

প্রভাতে অপরাহ্নে বালকগণ এই কুটীরগুলি নিজের হাতে ঝাঁট দেয়, ও নিজ নিজ স্থান পরিপাটীরূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জিনিসপত্রের কোন বাহুল্য না থাকায়, ঘরগুলি সুন্দর ঝরঝরে দেখায়। প্রত্যেক কুটীরেই বালকদিগের ভার গ্রহণ করিয়া একজন অধ্যাপক থাকেন।

ছাত্র বাড়িয়া যাওয়াতে কর্ম্মের সুবিধার জন্য ছাত্রগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—আদ্য, মধ্য এবং শিশু। ইহাদের স্বতন্ত্র আবাসস্থান। যাহারা উচ্চশ্রেণীতে পড়ে এবং বয়সও যাহাদের তের চৌদ্দের বেশী, তাহারা আদ্যবিভাগের অন্তর্গত। তার নীচের বয়সের ছেলেরা মধ্যবিভাগে এবং শিশুরা শিশুবিভাগে থাকে। বিভাগের পরিচালনার জন্য অধ্যাপকগণ প্রতি বিভাগেই এক বৎসরের মত এক একজন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কুটীরে কুটীরে যে অধ্যাপকগণ থাকেন, তাঁহারা ইঁহাদিগের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিয়া ইঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

সমস্ত আশ্রমের একজন অধ্যক্ষ প্রতি বৎসরে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। আশ্রমসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে। তাঁহার সঙ্গে পঞ্চজন সভ্যবিশিষ্ট একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে। এই সভার সভ্যগণও প্রতি বৎসরে নির্ব্বাচিত হইবেন।

প্রতি কুটীরের ছাত্রগণ নিজেদের চালনার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজন নায়ক নির্ব্বাচন করে এবং সর্ব্ববিষয়েই তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে। এই নায়কের সঙ্গে দুই তিনটি করিয়া সহকারী থাকে—তাহারাও নির্ব্বাচিত হয়। বিচারের ভার নায়কের হাতে। তবে গুরুতর কোন অপরাধ কোন ছাত্রের ঘটিলে ইহারা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে তাহা জানায় এবং তিনিই তখন তাহার বিধান করিয়া দেন্। কথায় কথায় নালিশ এবং ছোটখাট কলহ এ বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যে বিরল। তাহারা সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং—একসঙ্গে চলে, একসঙ্গে বলে—কেহ কাহাকেও কোন বিষয়ে অতিক্রম করিয়া চলে না। পব্লিক-ওপিনিয়নের দ্বারা ছাত্রদের ত্রুটি অনায় ক্রমে ক্রমে সংশোধিত হইয়া আসে, তাহার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা বা বিধানের আবশ্যক করে না। বাস্তবিক ছাত্রদের সাহচর্য্য, সৌহার্দ্দ ও ভ্রাতৃভাব খুবই দেখিবার বিষয়।

এখানে যে সকল অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন অধ্যয়নে বা জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত আছেন। কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুশীলন করিতেছেন। নিয়ত তাঁহাদের সহবাসলাভ করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ছাত্রদের চিত্তকে নানা প্রকারে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া ছাত্রগণের মধ্যেও সকল বিষয়েই উৎসাহ আপনা আপনি জাগিয়া উঠে। ছাত্রেরা হাতে লিখিয়া

মাসে মাসে কাগজ বাহির করে, কবিতা লেখে, ছবি আঁকে সভা সমিতি করে এবং বড় বড় বিষয়েও অনেক সময় আলোচনা করিয়া থাকে;—অবশ্য বিষয়ের গাম্ভীর্য্যের অনুরূপ তাহাদের আলোচনা হওয়া সম্ভবপর নহে;—তথাপি এরূপ চেষ্টা এ বিদ্যালয়ে পরিহাসের দ্বারা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বড় জিনিষ সম্বন্ধে অধিকারী অনধিকারী ভেদ করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে আলো-জল-অন্ন-বাতাসের ন্যায় বড় সত্যকেও শিশু আপনারি ক্ষুদ্র শক্তিঅনুসারে আপনার করিয়া লয়,—এক রকম স্বপ্নের ভাবে অস্পষ্টভাবে সে তাহাকে বোঝে, যাহা উত্তরকালে তাহার মনের পরিণতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে।

সন্ধ্যাবেলার বিশ্রামকালে বয়স্ক পরীক্ষার্থী বালক ব্যতীত আর সকলকেই অধ্যাপকগণ পালাক্রমে একত্র করিয়া নানারকম গল্প বলিয়া থাকেন। ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কিছুই বাদ যায় না। স্কট, ভিক্টরহ্যুগো ডিকেন্‌স প্রভৃতির উপন্যাস ও বলা হয়। সঙ্গীত হয়, আবৃত্তি ও অভিনয় হয়। ছাত্রেরা নিজেরা হেঁয়ালীনাট্য বানাইয়া কখনও কখনও স্বরচিত নাট্য অভিনয় করিয়া থাকে।

বুধবার এবং বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে বালকদিগকে লইয়া উপাসনা হয়। পূজনীয় আশ্রমগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি অনুপস্থিত থাকিলে অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। বৎসরে প্রায় অধিকাংশ সময়ই তিনি আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন।

এইবার পড়াশুনা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইংরাজী বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায়শিক্ষা দেওয়া হয়; অতিরিক্ত কেবল বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যে ছাত্র যে বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে ঐ বিষয়ে তদনুরূপ বর্গে ভর্ত্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিষয়েই ১০।১২ টি করিয়া বর্গ আছে। ইংরাজী ভাষা প্রথমে মুখে মুখে কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরে অল্পে অল্পে ছোট ছোট বাক্য রচনা করাইয়া ক্রমে জটিল বাক্য রচনা করাইতে শিখানো হয়, এবং সুখপাঠ্য গদ্য-পদ্য-সম্বলিত পুস্তক পড়ানো হয়। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি যাহাতে বাড়ে এরূপ পুস্তক পড়ানো হয় এবং যাহা তাহারা বুঝে তাহা কতটা স্বাধীন ভাবে নিজে লিখিতে পারে তাহাও দেখা হয়। উপরের শ্রেণীতে বাংলা ভাষা ছাত্রগণ ব্যাকরণের নিয়মে শিক্ষা করে। ইতিহাস নীচের ক্লাস হইতেই মুখে গল্পের মত বলা হয় এবং ছেলেদের দ্বারা বলানো হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের ও ইউরোপীয় দেশ সমূহের ঐতিহাসিক গল্প বলা হইয়া থাকে। ভূগোল, বৃত্তান্ত এবং বিজ্ঞান এই উভয়দিক্ হইতেই পড়ানো হয়। বিজ্ঞানও প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ হইতে সুরু করিয়া ক্রমে ল্যাবরেটরিতে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ণ পড়ানো হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিটি মন্দ নয়। পুস্তকালয়ও সুবৃহৎ। প্রতি বিষয়েই মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। ড্রয়িংও এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

শান্তিনিকেতনে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। বালকগণ নিরামিষ খাইয়া থাকে বলিয়া এখানে একটি গো-মহিষ-শালা আছে। অনেকগুলি গো-মহিষ আছে, দুইটি বৃষ আছে। গো-মহিষ বৎসগুলি ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। আশ্রমে তাহারা সমস্ত দিন চরিয়া বেড়ায়। কিয়ৎ পরিমান দুধ হইতে প্রত্যহ মাখম তুলিয়া ঘি করা হয় এবং তাহা পাতে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যহ দুই মনের উপর দুধ হয়। আমেরিকা-প্রত্যাগত কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই গো-শালার অধ্যক্ষ। এই গোপালনবিদ্যাই তিনি বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

মোটের উপর ছেলেরা এখানে আনন্দে থাকে। ঋতুতে ঋতুতে তাহাদের উৎসব হয়, তাহারা সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা ঋতুর সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে। তাহারা বাহিরে পড়ে,—তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের সঙ্গে গায়ে গায়ে মিশিয়া থাকে। গানে, গল্পে, পড়ায় খেলায়ধূলায় আমোদেপ্রমোদে, তাহাদের আনন্দে দিন কাটে। তাহাদের এই আনন্দই আশ্রমের সকলের চেয়ে বড় লাভ।

বিফলতা।

ওগো বিশ্বভূপ,
আমি কেমনে নেহারি এ নয়নে তব
নয়ন-মোহন রূপ?
রুদ্ধ আমার সব গৃহ দ্বার
অন্ধ বন্ধ এযে কারাগার!
যেদিকে নেহারি সকলি আঁধার;
হৃদয় অন্ধকূপ!

আমি কেমনে করিব পান
যে অমৃত তুমি আকাশে বাতাসে
নিত্য করিছ দান?

অসার রসনা হারায়েছে স্বাদ,
যাহা করে পান সবি বিস্বাদ,
অন্তরে বাহিরে চলিছে বিবাদ
জীবন ক্লান্ত ম্লান!

আমি কেমনে গাহিব গান?
বাক্‌হারা আজি কণ্ঠ আমার
ক্লিষ্ট এ দেহ প্রাণ!
জয়গান তব গগন ভরিয়া,
উঠেছে ভক্ত-কণ্ঠ চিরিয়া,
আমি হেথা আজি জীবনে মরিয়া
রয়েছি নীরব ম্লান!

আমি কেমনে শুনিব কথা?
বধির! বধির! কর্ণকুহর,
চারিদিকে নীরবতা।
উষার বাতাস করে যায় কত,
'জাগো জাগো জাগো যারা আছ মৃত,'
(তবু) অলস শয়নে আছি হে নিয়ত,
শুধু লয়ে বিফলতা!

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

জৈন সম্প্রদায় ও তাহাদের মন্দির।

ভারতবর্ষে অনেক রকম ধর্ম্ম আছে। তাহাদের মধ্যে জৈন ধর্ম্ম একটি। জৈন শব্দ 'জিন' হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ 'জেতা'। এই শব্দ কেবল ২৪ জন জৈন মহাপুরুষের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়—তাঁহাদিগকে 'তীর্থঙ্কর' বলে। কারণ, নির্ব্বাণ যাইবার জন্য জন্মজন্মান্তরের সাগর তাঁহারা পার করান। এই মতটা অনেক পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের সদৃশ। হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধ এবং জৈন এই উভয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। জৈনধর্ম্ম সম্ভবতঃ কিছু আগেকার।

পৃথিবীর যে একজন মহান্ স্রষ্টা আছেন তাঁহার অস্তিত্ব জৈনগণ একেবারেই অস্বীকার করে। এবং কয়েকজন উপদেষ্টাকেই তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বর্ণ, দৈর্ঘ্য ও পরমায়ু দেখিয়াই তাহারা ২৪ জন জিনকে পৃথক করিয়া লয়। প্রথম জিন ঋষভ, ৫০০ পোল লম্বা এবং তিনি ৮৪,০০,০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জিনের বয়স ৭২,০০,০০০ বৎসর এবং তিনি ৪৫০ পোল লম্বা ছিলেন। এইরূপে পরবর্ত্তী জিনগণের বয়স ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। অবশিষ্ট দুইটি জিন পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর মানুষের মতই পরমায়ু এবং আকার লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া অনেকেরি ধারণা।

মহাবীরের জীবন এবং জন্মবৃত্তান্ত বুদ্ধদেবেরই জীবন ও জন্মবৃত্তান্তের মত। মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ কাণ্ড-গ্রামের প্রধান ছিলেন; তাঁহার মাতা ত্রিশালা, বৈশালীর রাজা কেতকের ভগিনী ছিলেন। মহাবীরের জন্মদিনের রাত্রে নাকি স্বর্গীয় দেবগণ নীচে নামিতে ও উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং এক অপরূপ দিব্যজ্যোতিতে পৃথিবী একেবারে আলোকিত করিয়া ফেলিলেন। এই সকল দেবতাগণের সঙ্গমে বিষম সমারোহ উপস্থিত হইল। মহাবীর ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতেই রহিলেন। এবং সোনা রূপা ইত্যাদি সমস্ত দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। পরে গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। তিনি পাঁচ মুঠায় তাঁহার মাথার সব চুল উঠাইয়া ফেলিলেন। এক বৎসর তিনি কাপড়ের ব্যবহার ছাড়িয়া জঙ্গলে উলঙ্গাবস্থায় ঘুরিতে লাগিলেন। বারো বৎসর পরে মহাবীর রীতিমত একজন জিন হইয়া উঠিলেন। তিনি ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেব গভীর চিন্তার ভিতর দিয়া 'বুদ্ধ' এবং মহাবীর শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনার ভিতর দিয়া 'জিন' হইতে পারিয়াছিলেন।

জৈনগণ দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, যেখানে লজ্জা সেইখানেই পাপ প্রবেশ করিয়াছে। পৃথিবীতে পাপ না থাকিলে লজ্জাও থাকিত না। সুতরাং তাহারা অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা প্রচার করিল যে কাপড় ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই পাপ হইতেও মুক্ত হইতে পারা যায় এবং যে সন্ন্যাসী পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হইবে। ইহাদের নাম 'দিগম্বর সম্প্রদায়'।

কালক্রমে উক্ত মতটিকে খণ্ডন করিবার জন্য পরে একটি সম্প্রদায় দাঁড়াইল—এই সম্প্রদায়ের নাম 'শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়'। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই বিচ্ছেদ ঘটে—ইহা অনেকেরই ধারণা। উলঙ্গ জিনগণের প্রতি-মূর্ত্তি সংরক্ষণে তাহাদের ঘোরতর আপত্তি—সুতরাং শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায় মূর্ত্তিগুলির কিয়দংশে একখণ্ড বস্ত্র জড়াইয়া দিত। শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায় তাহাদের স্ত্রীগণকে সন্ন্যাসিনী হইতে অনুমতি দেয়—পক্ষান্তরে, দিগম্বর-সম্প্রদায় স্পষ্ট করিয়া এইরূপ অনুমতি দেয় না। আজকাল দিগম্বরগণ বিচিত্র রঙের বস্ত্র পরিধান করে, কেবল আহারের সময় বস্ত্র ব্যবহার করে না।

জৈনগণ যতী (সন্ন্যাসী) ও শ্রাবক (গৃহস্থ) এই দুই ভাগে বিভক্ত। যতীকে সংযমের জীবন যাপন করিতে হইবে; এবং যাহাতে কোন কীট পতঙ্গ তাহার মুখে আসিয়া উড়িয়া না পড়িতে পারে সেইজন্ত একটি পাতলা

আচ্ছাদন দ্বারা তাহার মুখটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। যে স্থানে সে বসিবে সে স্থানটিকে উত্তমরূপে ঝাঁট দিবার জন্য তাহাকে একটি সম্মার্জ্জনী বহন করিয়া লইতে হইবে এবং প্রত্যেক সজীব প্রাণীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু সে ইচ্ছা করিলেই সমস্ত পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করিতে পারিবে।

শ্রাবককে ধর্ম্ম ও নৈতিক কর্ম্ম তো পালন করিতে হইবেই—তা'ছাড়াও তাহাকে মহাপুরুষদের পূজা করিতে হইবে এবং তাহাদের ধার্ম্মিক ভ্রাতাগণের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। উদারতা, ভদ্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অনুশোচনা (প্রায়শ্চিত্ত) এই চারিটি পুণ্য-কর্ম্মও তাহাকে পালন করিতে হইবে। বৎসরের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুষ্প আঘ্রাণ, লবণ, কাঁচা ফল, গাছের শিকড়, মধু ও দ্রাক্ষা ভক্ষণ এবং তামাক সেবন হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে হইবে। যে জল তিনবার পরিস্রুত করা হইয়াছে তাহাই পান করিতে হইবে এবং তরল পদার্থ অনাচ্ছাদিত রাখিবে না, কারণ কীট পতঙ্গ জলে পড়িয়া যদি প্রাণ হারায় তবে উহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে। যেখানে জৈন মহাপুরুষগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে সেই মন্দির পর্য্যন্ত তাহাকে তিনবার করিয়া প্রতিদিন হাঁটিতে হইবে। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করিয়া ফলফুল মূর্ত্তিকে উপহার দিতে হইবে—ইহাও তাহার দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত। জৈনমন্দিরের পাঠক একজন যতী। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কদাচিৎ-ই আছে—কারণ জৈনদের নিজের কোন পুরোহিত নাই। জৈন মহাপুরুষদের চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য কোনও স্তূপ নাই। প্রত্যেকের যে পৃথক পৃথক আত্মা তাহা তাহারা বিশ্বাস করে—পক্ষান্তরে, বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করে। জৈনদের মতে কাষ্ঠে, মৃত্তিকায়, পাথরে, জলবিন্দুতে, অগ্নিকণায় সকল স্থানেই আত্মা আছে।

ন্যায়-বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান ও যথার্থ আচরণ—ইহাই জৈনদের 'ত্রি-রত্ন'—কিন্তু বৌদ্ধদিগের—বুদ্ধ, সঙ্ঘ এবং ধর্ম্ম এই তিনটি 'ত্রি-রত্ন।' পঞ্চম জৈনের উপদেশ এই যে—"পার্থিব বিষয়ে কোন প্রকার আসক্তি রাখিবে না।"

জৈনদের উপাসনার মন্ত্র বৌদ্ধদিগের মন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "অর্হত, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং সমস্ত সাধুগণকে পূজা কর"—ইহা জৈনদের উপাসনার মন্ত্র।

সার মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ সাহেব ভাবেন যে জৈনধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের স্রোতের মুখে পড়িয়া ক্রমেই ভাসিয়া যাইতেছে কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জৈনধর্ম্মকে চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ইহাকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিতেছে। রাজপুতানা এবং পশ্চিম ভারতে গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জৈনদের লোকসংখ্যা ১৩,৩৪,১৪৮ জন ছিল কিন্তু কয়েক বৎসরেই ৮২,৪৯০ লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে দেখা যায়।

এতক্ষণ কেবল জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—এখন কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান জৈন-মন্দিরের উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কলিকাতা হইতে প্রায় ২০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পার্শ্বনাথ পর্ব্বত অবস্থিত। ইহাই বাংলা-দেশে পবিত্র জৈন পর্ব্বত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। জৈনগণ বলে যে তাহাদের ২৪ জনের তীর্থঙ্কর মধ্যে ১০ জন এই পবিত্র পর্ব্বতে নির্ব্বান প্রাপ্ত হন্। এই জন্যই ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বের নামানুসারে এই পর্ব্বতের নাম পার্শ্বনাথ রাখা হইয়াছে। কথিত আছে যে ১৯ জন তীর্থঙ্করকে এখানে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। এই সকল মন্দির হয় খুব আধুনিক নতুবা জীর্ণ মন্দিরগুলি পুনরায় সংস্কার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভারি চমৎকার। বিশেষতঃ সাদা মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি ছোট মন্দির দেখিতে খুব সুন্দর! ইহার নির্ম্মাণ-কল্পে ৮০,০০০ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

গোয়ালিয়রে আরেকটি 'শ্যামবাহু' নামে মন্দির আছে। কথিত আছে যে এই মন্দিরটি ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্মনাভের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। ইহা ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়—এরূপ অনেকেই অনুমান করেন। এখন আর ইহার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই—কেবল একটি ক্রুশাকৃতি খোলা বারান্দাই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বারান্দা ১০০ ফুট লম্বা ও উহার পার্শ্ব বাহুসহ ৬৩ ফুট চওড়া। অবশিষ্টটির কেবলমাত্র ভিত্তিটাই রহিয়াছে। ত্রিতল বারান্দাটি মোটের উপর উত্তমরূপেই সংরক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ইহার ছাদটি অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গেছে। উপরিভাগে মনুষ্যাকৃতি, নানা জন্তুর প্রতিকৃতি, পুষ্প এবং নানাপ্রকার সুন্দর রেখাচিত্র খোদাই করা আছে। মধ্য কক্ষটির আয়তন প্রায় ৩০ বর্গ ফুট। চারিটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ ইহার পিরামিড্-আকৃতি ছাদটাকে বহন করিয়া রহিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে সজ্জিত।

'আবু' নামে রাজপুতনাতে একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। ভারতবর্ষে যত জৈন মন্দির আছে তন্মধ্যে আবুর মন্দিরগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে দেউলওয়ারা নামে একটি স্থান—সেখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৫ টি মাত্র জৈনদিগের ধর্ম্মমন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্রিতল মন্দির—শুনা যায় তাহা নাকি ঋষভকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ মন্দিরটির প্রধান প্রধান জায়গায় চারিটি

প্রবেশ-দ্বার (Gate) আছে। মন্দিরটির ভিতরে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহার চারিটি মুখ—সেই জন্ম তাহাকে 'চৌমুখ' বলা হইয়া থাকে। এই চৌমুখের পশ্চিমপার্শ্বে আবুর আরো দুইটি সুন্দর মন্দির আছে। আবার ইহার উত্তরদিকেই আর একটি মন্দির আছে। উভয় মন্দিরই শ্বেত প্রস্তরে খচিত। এই প্রকার নানাস্থানে বড় বড় মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

পালিতামা ষ্টেটের প্রধান সহর পালিতামা কাঠিবাড়ের উপদ্বীপের উপর অবস্থিত। ইহা শক্রঞ্জয় পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে স্থাপিত—এবং কথিত আছে যে অপর চারিটি পবিত্র জৈন পর্ব্বত অপেক্ষা নাকি ইহাই পবিত্রতম।

শক্রঞ্জয় পর্ব্বত সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফুট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের উপর যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে কয়েকজন যতী দৈনিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সমাধা করিয়া রাত্রিতে ঐ মন্দিরেই শয়ন করেন। ঐ মন্দিরটি সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য জনকতক লোক নিযুক্ত আছে।

তীর্থযাত্রী প্রত্যুষেই সেই মন্দিরে যাইবে এবং দেবতাকে পূজা উপহার দেওয়া হইলেই নীচে চলিয়া আসিবে, সে কথনো সেখানে রন্ধন কিংবা ভোজন করিতে পারিবে না। এবং সেই পবিত্র পর্ব্বতের উপর কেহ শয়নও করিতে পাইবে না, কারণ উহা কেবলমাত্র স্বর্গীয় দেবতাগণেরই জন্য নির্ম্মিত এবং উহা তাঁহাদেরই নগর।

ইহা ভিন্ন বহু আধুনিক মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যায়।

শক্রঞ্জয়ের পরই গিরিনর কাঠিবাড়ের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। জাগরা সহর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে। ঐ পর্ব্বতটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩,৫০০ ফুট্ উপরে উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য জৈন বাস করিত। তাহাদের তীর্থঙ্করের অনেক প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি মাল্রাজ্ মিউজিয়মে রক্ষা করা হইয়াছে।

মহীশূরের কাছেই 'শ্রাবণ-বেল-গোলা' নামক একটি স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর জৈন মন্দির আছে। এবং পর্ব্বতের উপরে ৬০ ফুট্ উচ্চ এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। উহা বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটিই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

চৈত্র ১৩১৪। শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

অষ্টাদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।
৮২২ সংখ্যা
১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ভারত-বিধাতা।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খ্রীষ্টানী—
পূরব, পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথী, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি,
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে,
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরি ভালে,
গাহে বিহঙ্গম পুণ্যসমীরণ নব জীবনরস ঢালে,
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয়, জয়, জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।

এখন আমরা এটা বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রথম উদ্যমে মনুষ্যের আত্মশক্তি ঐশী শক্তির গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া অলক্ষিতভাবে তাহার অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণ (অর্থাৎ সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ) জাগাইয়া তোলে, এবং দ্বিতীয় উদ্যমে সত্তার প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে গাত্রোত্থান করিয়া জাগ্রৎভাবে রজস্তমোগুণের বাধাপনয়ন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আর তাহাতে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়, সেই পরিমাণে তাহার সম্মুখে সত্ত্বগুণের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়, অথবা, যাহা একই কথা—দেবপ্রসাদের আগমন-দ্বার উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয় উদ্যমে আত্মশক্তি তিন তিন ধাপে পদনিক্ষেপ করিয়া সাধন-সোপানে অগ্রসর হয়। প্রথম ধাপ হ'চ্চে সংকল্প-বন্ধন, দ্বিতীয় ধাপ মনোযোগ, তৃতীয় ধাপ উদ্যম বা অধ্যবসায়। উদ্যম কি? না কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নের যোগ বা প্রাণের যোগ। এইজন্য উদ্যম এবং অধ্যবসায়কে (অর্থাৎ কোমর বাঁধিয়া লাগা'কে) বলা যাইতে পারে প্রাণযোগ বা কর্ম্মযোগ। মনো-

যোগ কি? না জ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞানের যোগ। এই জন্য মনোযোগ'কে বলা যাইতে পারে জ্ঞানযোগ। সংকল্প-বন্ধন কি? না লক্ষ্য বিষয়েতে প্রীতি ভক্তি এবং নিষ্ঠার যোগ। যদি একজন টোলের ভট্টাচার্য্য এবং মারোআরি বণিক্ উভয়েই একহাজার টাকার পুঁজির উপরে ভর করিয়া একই সময়ে বস্ত্রের দোকাণ খোলেন, তবে খুব সম্ভব যে, বছর-খানেকের মধ্যেই মারোআরি বণিকের একহাজার টাকা দুহাজর হইয়া উঠিবে; পক্ষান্তরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একহাজার টাকা অ্যাকের পিঠের তিনটি মাত্র শূন্যে পর্য্যবসিত হইবে। এরূপ একযাত্রায়-পৃথক্‌ফলের কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে, ভট্টাচার্য্যের মনের ষোলোআনা টান সরস্বতীর প্রতি—কেবল পেটের দায়ে তিনি লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে, মারোআরি বণিকের মনের ষোলো-আনা টান লক্ষ্মীর প্রতি; আর, সেই জন্য তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে লক্ষ্মীর সেবায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দোঁহার মধ্যে কে সাঁচা সোণা কে ঝুঁটা সোণা, দেবী কি আর তাহা বোঝেন না? খুবই যে তিনি তাহা বোঝেন তাহা ফলেন পরি-চীয়তে। লক্ষ্য-সাধনে যাঁহার সংকল্পবন্ধন সত্যসত্যই হয়, তাঁহার সেই সংকল্পের বন্ধন-সূত্র হ'চ্চে লক্ষ্য বিষয়ের প্রতি মনের টান বা প্রীতি-ভক্তি। এমন কি—যদি ভোজন-কার্য্যও অভক্তির সহিত অনুষ্ঠান করা যায়, তবে উদরে যে দেবতা-এক আছেন তিনি নিবেদিত অন্ন কণ্ঠনলীর দ্বার দিয়া দূরে বিসর্জ্জন করেন। লক্ষ্য-সাধনের গোড়ার কথা যখন সংকল্প-বন্ধন; সংকল্প-বন্ধনের গোড়ার কথা যখন লক্ষ্য বিষয়েতে প্রীতি-ভক্তি বা অনুরাগ; আর, অনুরাগের গোড়ার কথা যখন লক্ষ্য-বিষয়েতে আনন্দের আস্বাদ-প্রাপ্তি; তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ গোড়া'র সাত্ত্বিক আনন্দই মনুষ্যের মঙ্গল-কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক। আত্মশক্তির সাধনীয় লক্ষ্য বা সংকল্প-বিষয়টা হ'চ্চে সংক্ষেপে—অন্তঃকরণের গোড়া'র সেই যে সাত্ত্বিক আনন্দ যাহা আত্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গের সঙ্গী—সেই গোড়ার আনন্দকে রজস্তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইতে না দেওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রজস্তমোগুণের বাধা কোথা হইতে আইসে? ইহার উত্তর এই যে, সবই যেখান হইতে আসে, রজস্তমোগুণের বাধাও সেই-খান হইতে আসে;—ঐশীশক্তি হইতে আসে। বেদান্তের মতে ঐশীশক্তি দুই প্রকার—আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তি সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, এবং বিক্ষেপ-শক্তি প্রকৃত সত্যের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার কৃত্রিম সত্যের অবতারণা করে। বেদান্তের আবরণ-শক্তি এবং সাংখ্যের তমোগুণ, তথৈব, বেদান্তের বিক্ষেপ-শক্তি এবং সাংখ্যের রজোগুণ, নামেই কেবল বিভিন্ন—ফলে একই। আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি কিরূপে একযোগে কার্য্য করে, তাহার একটি বৈদান্তিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

এক্ষণকার কালের এই যে একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য—যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্যটি পূর্ব্বতন কালে ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় দুই এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মা ব্যতীত অপরাপর জ্যোতির্বিৎগণের নিকটে অপ্রকাশ ছিল। সত্যের এইরূপ অপ্রকাশের নাম আবরণ। আবার, ঐ সকল সাধারণ-শ্রেণীর জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এটা যেমন জানিতেন না, তেমনি, জানিতেন তাঁহারা এই যে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই সত্যটি ঢাকিয়া রাখা আবরণ-শক্তির কার্য্য; আর, প্রকৃত সত্যের পরিবর্ত্তে "সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে" এই অসত্যটিকে সত্যরূপে দাঁড় করানো বিক্ষেপশক্তির কার্য্য। আর একটি দৃষ্টান্ত এই:—

নিদ্রাকালে বাহিরের কোনো কিছুই আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না। বাহিরের বাড়ি ঘর ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ থাকে। যখন কিন্তু নিদ্রার তিমিরাবরণের আশপাশের ফাঁকের মধ্য দিয়া একটু আধটু চেতনার স্ফুলিঙ্গ সহসা বিনির্গত হয়, তখন "আমি বাহিরের কোনো বস্তুই দেখিতেছি না—শুনিতেছি না" এই সত্যকথাটিকে সে কিছুতেই মনে স্থান দিতে চাহে না; তাহার পরিবর্ত্তে সে "এটা দেখিতেছি—ওটা দেখিতেছি—সেটা দেখিতেছি" এইরূপ করিয়া নানাপ্রকার কৃত্রিম বাড়ি ঘর, লোক জন জীবজন্তু দিয়া আপনার অজ্ঞানের খাঁক্তি পূরণ করিতে থাকে—দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে থাকে। নিদ্রাকালে "আমি কিছুই দেখিতেছি না—শুনিতেছি না" এই রূপ যে অজ্ঞান ইহাই আবরণ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক; আর, তৎকালে "আমি এটা দেখিতেছি—ওটা দেখিতেছি—সেটা দেখিতেছি" এইরূপ যে কৃত্রিম ধাঁচার জ্ঞান ইহাই বিক্ষেপশক্তির প্রভাবের পরিচায়ক। ফল কথা এই যে জীবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলিয়া একদিকে যেমন তাহার নিকটে প্রকৃত সত্য অন্ধকারে আবৃত থাকে, আর একদিকে সেই অল্পজ্ঞ জীব "এটা জানিতেছি—ওটা জানিতেছি—সেটা জানিতেছি" এইরূপ করিয়া নানা প্রকার ভুল জ্ঞান দিয়া আপনার অজ্ঞানের খাঁক্তি পূরণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার না জানা ব্যাপারটি আবরণ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক, শেষোক্ত প্রকার অসত্যকে সত্য করিয়া সাজানো ব্যাপারটি বিক্ষেপ-

শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক। আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তিদ্বারা জ্ঞানের এই যে সীমাবন্ধন—সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃত সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে খণ্ড খণ্ড এক এক দিক্‌ঘ্যাঁসা একএকভাবের কৃত্রিম সত্য দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞানের ক্ষোভ-নিবারণ—এইরূপ যে সীমাবন্ধন, ইহাই জীবসৃষ্টির গোড়ার কথা। কেননা, জীব যদি অল্পজ্ঞ না হয়, তবে জীব জীবই হয় না।

পূর্ব্বে আমি বারম্বার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, সমষ্টি-সত্তার বাহিরে দ্বিতীয় কোনো সত্তা হইতেই পারে না, সুতরাং পরমাত্মার সত্তা মূলেই রজস্তমোগুণ-দ্বারা বাধাক্রান্ত নহে। তিনি স্বপ্রকাশ এবং পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশেরও প্রতিঘাত নাই—আনন্দেরও প্রতিঘাত নাই। সুতরাং আপনার প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অপসারণ করিবার জন্য শক্তি খাটাইবার কোনো প্রয়োজনই তাঁহার নাই। তাঁহার অপরাজিত মহতী শক্তি এই যে প্রভূত জগৎকার্য্যে নিরবচ্ছেদে খাটিতেছে—খাটিতেছে তবে তাহা কিসের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর যাহা সম্ভবে তাহা এই যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার আনন্দের ভাগী করিবার জন্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবাত্মা তো সেদিনকার জীব; তাহার জন্য অনাদি ঐশীশক্তি অবিশ্রাম জগৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইবে —ইহা কি সম্ভবে? ইহার উত্তর এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মার পর নহে; জীবাত্মা পরমাত্মার আপনারই জীবাত্মা। একদিকে জীব যেমন ঈশ্বরেরই জীব, আর একদিকে ঈশ্বর তেমনি জীবেরই ঈশ্বর। যদি জীব একেবারেই না থাকে তবে জগদীশ্বর কাহার ঈশ্বর? জগদ্‌গুরু কাহার গুরু? জগৎপিতা কাহার পিতা? আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে, জীবেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ শুধু যে কেবল আজিকের সম্বন্ধ তাহা নহে; তাহা অনাদি কালের সম্বন্ধ। আর, সেই জন্য, বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবেশ্বরের বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন নাম-গুলি এপিঠ-ওপিঠভাবে একসঙ্গে জোড়া লাগানো আছে, তার সাক্ষী নর-নারায়ণ, বিশ্ব-বৈশ্বানর, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর ইত্যাদি। ফলকথা এই যে, আকাশেরও যেমন, কালেরও তেমনি, সত্তারও তেমনি, দুই পিঠ। এক পিঠে সবই ভিন্ন ভিন্ন, এবং আর এক পিঠে সবই অ্যাকে সমাহিত। আকাশের এ-পিঠে—এক জায়গায় জল, এক জায়গায় স্থল, এক জায়গায় বায়ুমণ্ডল, এক জায়গায় ঈথর্ নামক জ্যোতির্ম্ম পদার্থ; পক্ষান্তরে, আকাশের ওপিঠে কোনোপ্রকার ঢিবিঢাবা নাই; আকাশের ওপিঠ সুমার্জ্জিত পেশল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এবং আগাগোড়া লপেট্; তাহা একেবারেই অখণ্ড; আকাশের ওপিঠে সমস্ত আকাশ অ্যাক আকাশ। কালসূত্রের তেমনি এপিঠে মোটা মোটা ছেদ-গ্রন্থি রহিয়াছে। তা'র সাক্ষী:—আমাদের দেশে প্রথমে ছিল স্বরাজ্য; তাহার পরে আসিল মুসলমান রাজ্য; তাহার পরে আসিল এক্ষণকার এই ইংরাজ্য। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভাবগতি কত-না বিভিন্ন। বেদের আমলে আমাদের দেশ ঋষিপ্রধান ছিল; মনুর আমলে ব্রাহ্মণপ্রধান ছিল; ব্যাসের আমলে ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল; শ্রীমন্ত সদাগরদিগের প্রাদুর্ভাবকালে বৈশ্যপ্রধান ছিল; এবং সম্প্রতি শূদ্রপ্রধান বা দাসত্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে কালসূত্রের ওপিঠে ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের মধ্যে মূলেই ব্যবধান নাই। কালের ওপিঠে সমস্ত কাল অ্যাক চির-বর্ত্তমানকাল। ভূত বিষয়ের স্মরণ এবং বর্ত্তমানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি একযোগে মিলিয়া কিরূপে একীভূত হইয়া যায়, তাহা বিগত প্রবন্ধাংশে দেখা হইয়াছে। কালের ওপিঠে তেমনি ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান একযোগে মিলিয়া চির-বর্ত্তমানে কেন্দ্রীভূত। পাশ্চাত্য দেশের অগস্ত্য ঋষি (St. Augustine) তাই কালের ওপিঠের নাম দিয়াছিলেন Eternal Now। তেমনি আবার দেশকালের এপিঠে আত্মসত্তা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে, তথৈব, একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণবৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন; পক্ষান্তরে দেশকালের ওপিঠে সমস্ত গুণবৈচিত্র্য গুণসাম্যে কেন্দ্রীভূত—সকল সত্তাই এক অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড সত্তা। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমুদ্রের তরঙ্গিত উপরিস্তর এবং নিস্তরঙ্গ গভীর অন্তস্তর, এই দুই পিঠ এক সঙ্গে ধরিয়া যেমন এক সমুদ্র, দেশকাল-সত্তার দুই পিঠ এক সঙ্গে ধরিয়া তেমনি এক সত্য। সত্যের দুই পিঠের মধ্যে প্রতিযোগিতাও যেমন, সামঞ্জস্যও তেমনি, দুইই সমান বলবৎ:—প্রতিযোগিতা ছায়াতপের ন্যায় প্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ, সামঞ্জস্য দৈহিক ধাতুসাম্য এবং মানসিক গুণসাম্যের ন্যায়, এক কথায়—স্বাস্থ্যের ন্যায়, আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিভাগেই সাধারণতঃ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এপিঠ সমস্ত বৈচিত্র্য-সমভিব্যাহারে একবার ওপিঠে বিলীন হইতেছে—যেমন নিদ্রাবস্থায়; আবার, যথাসময়ে সমস্ত বৈচিত্র্য-সমভিব্যাহারে এপিঠে আবির্ভূত হইতেছে—যেমন জাগরিতাবস্থায়। দুই পিঠের মধ্যে এইরূপ শক্তির ক্রীড়া অনবরত চলিতেছে, আর তাহাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সজীব রহিয়াছে। এই যে এক মহাশক্তি নিখিল দিগ্‌দিগন্তর এবং যুগযুগান্তর জুড়িয়া অনবরত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে:—দিন হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে দিনে; শুক্লপক্ষ হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে শুক্লপক্ষে; উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে, দক্ষিণায়ণ হইতে উত্তরায়ণে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অনবরত দোলায়মান হইতেছে—

এ মহাশক্তির সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি জীবগণের আনন্দ-সম্পাদন উঁহার উদ্দেশ্য না হয়। উপনিষদে তাই আছে—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "এষহ্যেবানন্দয়াতি" ইহার অর্থ এই যে, কে বা শরীর-চেষ্টা করিত কে বা জীবিত থাকিত—আকাশে যদি এই আনন্দ না থাকিত অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন; ইনিই জীবগণকে আনন্দায়মান করেন। জলস্থলআকাশ এবং বিচিত্র জীবজন্তু এবং ওষধিবনস্পতির মধ্যস্থলে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসানুভূতিজনিত আনন্দ লইয়া পৃথিবীবক্ষে মনুষ্য জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তো আর ভুল নাই! কে তাহাকে জাগাইয়া তুলিল—কেনই বা জাগাইয়া তুলিল? ইহার উত্তর উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে:—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" ইহার অর্থ এই যে, আনন্দ হইতে নিশ্চয়ই ভূতগণ জন্মিতেছে, আনন্দের গুণেই বাঁচিয়া থাকিতেছে, এবং আনন্দে গিয়াই সমাহিত হইতেছে। উপনিষদে আরো আছে এই যে, "রসো বৈ সঃ" ইহার অর্থ এই যে, তিনি রসই; "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" রস পাইয়াই জীব আনন্দিত হয়। অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি-সত্তা নীরস সত্তা নহে—তাহা ভরপুর আনন্দময় আত্মসত্তা, তাহা রসের অগাধ নিধি। চারিটি বিষয় এখানে পরে পরে দ্রষ্টব্য:—

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমষ্টি-সত্তার সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহা সমস্ত জ্ঞানের মূলাধার, সেই চিরবর্ত্তমান সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে অখণ্ড সত্তার রসানুভূতি এবং তজ্জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রেমসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, নিখিল জগতের সমষ্টিসত্তার সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং তজ্জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ, তাহাই প্রতি মনুষ্যের অন্তঃকরণের গোড়াঘ্যাঁসা আত্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং তজ্জনিত আনন্দ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তরতম সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আনন্দ, আর, তাহার ভিতরে প্রথম-উদ্যমের আত্মশক্তি যাহা চাপা দেওয়া রহিয়াছে—তিনই যিনি একাধারে, তিনিই মনুষ্যের অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামী সাক্ষী পুরুষ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মাই মনুষ্যের অন্তরস্থিত পরমাত্মা; আর, সেই অন্তরাত্মার কথা শুনিয়া কার্য্য করা'র নামই পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করা।

এইরকমে জ্যোতিষ্মান্ প্রাণবান্ এবং সারবান্ কার্য্যের সাধন-পথে সাধক বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া প্রাণপণ-যত্নে অগ্রসর হইতে থাকিলে, কাচপোকা'র সংস্পর্শে আর্স্লা যেমন কাচপোকার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সাধক তেমনি পরমাত্মার প্রসাদামৃতের সংস্পর্শগুণে জাগ্রত জ্ঞানময় প্রেমময় এবং তেজোময় আত্মা হইয়া ওঠেন; আর, তখন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যেরূপ হইতে বলিতেছে—সাধক সেইরূপ নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব যে কিরূপ ভাব—স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমরা তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি এইরূপ:—

পরমাত্মার অনিরুদ্ধ এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্তা রজস্তমোগুণদ্বারা একটুও বাধা-যুক্ত নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—অথচ আপনার কোনো প্রকার বাধা-বিঘ্ন অপনয়ন করিবার উদ্দেশে শক্তি খাটাইবার স্বল্পমাত্রও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বরূপে অবিচলিত রহিয়াছেন; আর, তাঁহার প্রভাব-স্বরূপা মহতী শক্তির কণামাত্র বলে প্রতিমুহূর্ত্তে নিখিল জগতের প্রভূত কার্য্যকলাপ যথাবিহিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের আপনাদের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই এইরূপ যে, আমরা যখন শুদ্ধ কেবল স্বার্থসাধনের উদ্দেশে কার্য্য করি, তখন আমাদের হাতের কার্য্য ভাল হয় না এইজন্য—যেহেতু আমাদের মন ক্রিয়মান কার্য্যের ফলাফল-চিন্তার দোলায় ক্রমাগতই দোদুল্যমান হইতে থাকে, আর সেই গতিকে সংকল্পিত কার্য্যটি পথের মাঝখানে খেই হারাইয়া ভণ্ডুল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, সাধু মহাপুরুষেরা যখন জগতের মঙ্গলকে আপনার মঙ্গল এবং আপনার প্রকৃত মঙ্গল'কে জগতের মঙ্গল জানিয়া আত্মপর-নির্ব্বিশেষে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হ'ন, তখন তাঁহার কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। পদ্মপত্র যেমন তরঙ্গদোলায় সহস্র দোদুল্যমান হইলেও জলে একটুও লিপ্ত হয় না, সাধু মহাপুরুষেরা তেমনি সহস্র কর্ম্মধন্ধায় ব্যাপৃত হইলেও কর্ম্মের ফলাফল-চিন্তায় বিভ্রান্ত হ'ন না; কেননা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমাত্মার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস অটল; আর, সেইজন্য তাঁহারই পদতলে তাঁহারা আপনাদের করণীয়, ক্রিয়মান এবং কৃত সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। বলিলাম যে, "সাধু মহাপুরুষেরা যখন (লোকহিতকার্য্যে) ব্যাপৃত হ'ন"—কিন্তু লোকহিতকর কার্য্য বলে কাহাকে? কেহ যদি মনে করেন যে লোকহিতকর কার্য্য রাজার কার্য্য, তা বই, তাহা চাসা'র কার্য্য নহে, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া সেখান হইতে যদি নগর-গ্রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে রাজার প্রাসাদ এবং চাসার কুটীরের মধ্যে বড়ছোটো'র প্রভেদ যতকিছু আছে সমস্তই দর্শকের দৃষ্টি-ক্ষেত্র হইতে অন্তর্ধান করে;—তেমনি এখন আমি যে জায়গার কথা বলিতেছি, সে জায়গায় দাঁড়াইয়া দেখিলে

রাজার বিস্তীর্ণ রাজ্য এবং চাসার চাসের ভূমিটুকুর মধ্যে বড়ছোটো'র প্রভেদ যাহা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। রাজা যেমন আপনার রাজ্যটুকুর সীমার মধ্যেই রাজা, তা বই, তাহার সীমার বাহিরে তিনি রাজা নহেন, চাসাও তেমনি আপনার ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রটুকুর সীমার মধ্যে এক-প্রকার ছোটোখাটো রাজা—যদিচ তাহার সীমার বাহিরে সে চাসা বই আর কিছুই নহে। চাসা যদি আপনার মুষ্টিমেয় রাজ্যটুকুর রাজকার্য্য যথাবিহিতরূপে সুনির্ব্বাহ করে, আর, রাজা যদি আসমুদ্র পৃথিবীর রাজকার্য্য মূঢ়ের ন্যায় দিক্‌বিদিক্‌শূন্যভাবে নির্ব্বাহ করেন, তবে চাসাই আপনার ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুর প্রকৃত রাজা—রাজা কেবল নামেই রাজা। রাজাই হো'ন্ আর চাসাই হো'ন্ যিনি যে অবস্থায় থাকুন্ না কেন, সেই অবস্থাই তাঁহার ঈশ্বর-দত্ত রাজ্য। তিনি যদি ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছার উপরে বিশ্বস্তচিত্তে নির্ভর করিয়া সেই অবস্থার রাজা হ'ন—তিনি যদি কাহারো প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিয়া কাহারো মনে আঘাত না দিয়া, বৈধ প্রণালীতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন, অন্তরের সহিত আত্মীয় স্বজন এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করেন এবং সাধ্যমতে তাঁহাদের উপকার-সাধন করেন, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট লোকহিতকর কার্য্য। ফল কথা এই যে, কার্য্যাড়ম্বর স্বতন্ত্র এবং কার্য্য স্বতন্ত্র। কেমন ব্যস্ততাবিহীন প্রশান্তভাবে সূর্য্যচন্দ্র উদয়াস্তগিরির শিখর আরোহণ করেন; অরণ্যের বনস্পতি কেমন নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সন্ধ্যা না হইতে হইতেই পক্ষীগণকে আপনার সুনিভৃত শাখাপ্রশাখা এবং কোটরের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়া মাতার ন্যায় তাহাদিগকে কুশলে রক্ষা করেন, তাহার পরে সন্ধ্যা দেখা-দিবামাত্র আকাশের দীপমালা কেমন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে থাকে। তাহার পরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী রাত্রি কেমন অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া বিনা কোনো কথাবার্ত্তায় লোকের অসাক্ষাতে আপনার নিত্যকৃত্য মঙ্গলকার্য্যের ব্রত উদ্‌যাপন করেন। প্রকৃতিমাতার সকল কার্য্যই সৌন্দর্য্যময়; তাঁহার কোনো কার্য্যই বেতালা বা বেসুরা নহে। তাঁহার ত্রিগুণাত্মক কার্য্যের ভিতরে নিস্ত্রৈগুণ্যভাব চাপা দেওয়া রহিয়াছে, আর, তাহাই সূক্ষ্মভাবে দশদিকে ফুটিয়া বাহির হইয়া ভাবুক কবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ যাত্রা বলিলাম, এইটিই হ'চ্চে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতরের কথা। যে সাধক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হ'ন, তাঁহার কার্য্যের মধ্য হইতেও ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য প্রশান্ত নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব সূক্ষ্ম-রূপে ফুটিয়া বাহির হয়—যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই তাহা দেখিতে পা'ন, দেখিতে পাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হ'ন। সাধক প্রথম উদ্যমেই কিছু আর নিস্ত্রৈগুণ্য পদ-বীতে আরূঢ় হ'ন না—তাঁহাকে পূর্ব্বের পূর্ব্বের সোপান মাড়াইয়া পরের পরের সোপানে পদনিক্ষেপ করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রতিযোগিতা প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী, এবং সামঞ্জস্য আনন্দের সঙ্গের সঙ্গী। কিন্তু আগে প্রকাশ—পরে আনন্দ। প্রতিযোগিতা প্রকাশের প্রদীপ উস্কাইয়া দ্যায়, সামঞ্জস্য আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করে। প্রকাশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য সাধককে প্রথমে আত্মশক্তি খাটাইয়া রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিতে হয়; পরমাত্মাকে সহায় করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মাতিতে হয়। খাঁটি সোণাকে ব্যবহার-কার্য্যে খাটাইতে হইলে তাহার সঙ্গে যেমন কতক পরি-মাণে তাঁবা মেশানো আবশ্যক হয়, তেমনি সত্ত্বগুণপ্রধান আত্মশক্তিকে রিপুসংগ্রামে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য তাহার সঙ্গে কতক পরিমাণে রজোগুণের তীব্রতা এবং কঠোরতা মেশানো প্রথম প্রথম সাধকের পক্ষে আবশ্যক হয়; কাঁটা দিয়া কাঁটা খোঁচাইয়া বাহির করা আবশ্যক হয়। কেননা, মনুষ্যের আত্মশক্তি যদিচ সত্ত্বগুণপ্রধান, কিন্তু তথাপি তাহা ত্রিগুণাত্মক, তা বই, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ নহে। বেদান্তশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র উভয়েই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র ঐশীশক্তিই কেবল পরম পরিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ—অর্থাৎ মূলেই তাহা রজ-স্তমোগুণদ্বারা বাধাগ্রস্ত নহে। প্রথম সোপানে সাধক রিপুগণের উপরে জয়লাভ করিয়া দ্বিতীয় সোপানে যখন বিশেষমতে পরমাত্মার ভাবের ভাবুক হ'ন, আর, সেই সময়ে যখন পরমাত্মার প্রসাদামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং জ্বালাযন্ত্রণা ঘুচাইয়া দ্যায়, তখনই তিনি নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। কথাটা যাহা বলিলে শ্রোতৃবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন তাহা এই:—একজন ওস্তাদ গায়কের যতক্ষণ না শ্রোতা যোটে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আপনিই আপনার শ্রোতা; কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে তাঁহার গান কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে চাহে না। বিজন উপদ্বীপবাসী রবিনসন্ ক্রুসো যদি শেক্সপিয়রের ন্যায় হ্যাম্‌লেট্ ম্যাগ্-বেথ্ প্রভৃতি মহানাট্যের রচনাকার্য্যে পারদর্শী হইতেন, তবে শ্রোতার অভাবে তিনি দুঃখে মারা যাইতেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আবার, শ্রোতৃমণ্ডলী যদি গানের ভাবগ্রাহী হ'ন, অর্থাৎ সমজ্‌দার হ'ন, তবে তো কথাই নাই; তাহা হইলে গায়কের হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়া তাঁহার মধুর কণ্ঠ হইতে অমৃতের ধারা উৎসারিত হইতে থাকে। কিন্তু সমজ্‌দার বলে কাহাকে? শেক্সপিয়রের সমজ্‌দার হইতে হইলে কতক

পরিমাণে শেক্সপিয়র হওয়া চাই; কালিদাসের সমজদার হইতে হইলে কতক পরিমাণে কালিদাস হওয়া চাই। সম্‌জদার হওয়া কাষ্ঠপাষাণের কর্ম্ম নহে। তবেই হইতেছে যে, ওস্তাদ্ গায়ক অ্যাক্‌লাই যে কেবল গায়ক তাহা নহে; তাঁহার রসগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহারই দ্বিতীয় তিনি। রাজা যেমন সমস্ত প্রজাবর্গ লইয়া রাজা; ওস্তাদ্ গায়ক তেমনি সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী লইয়া ওস্তাদ্ গায়ক। গায়কের কণ্ঠকুহর এবং কর্ণকুহর যেমন পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে বাঁধা, গায়কের হৃদয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় তেমনিই চমৎকার যোগসূত্রে বাঁধা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রোতাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও এরূপ নহেন যিনি সহস্র চেষ্টা করিলেও ওস্তাদ্ গায়কের মতো ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুমধুর গীত কণ্ঠ হইতে নিঃসারণ করিতে পারেন। তবে যদি তাঁহাদের মধ্যে গান শিখিবার জন্য যাঁহার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তিনি কিছুদিন ধরিয়া গলা সাধেন এবং তাহার পরে গায়কের সঙ্গে একযোগে সমস্বরে গান করেন, তাহা হইলে গায়কের গুণে তাঁহার কণ্ঠের গীত ক্রমে গায়কের মতো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া ওঠা অসম্ভব নহে। পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে সাধকের আত্মশক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে কাঁটাখোঁচা অপনীত হইয়া গিয়া কেমন তিনি আড়ম্বর-শূন্য সহজশোভনভাবে জ্ঞানের সহিত প্রেমের সহিত এবং নিষ্ঠার সহিত অন্তরাত্মার প্রদর্শিত পথে চলিয়া আনন্দনিকেতনের দ্বার সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিতে পা'ন, উপরি উক্ত উপমাটির আলোকে আমরা তাহা কতকটা বুঝিতে পারিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন'কে মহা একটা সংকটাপন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন; তাহা যেমন-তেমন সংকটাপন্ন কার্য্য নহে—তাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; অথচ বলিতেছেন "নিস্ত্রৈগুণ্য হও" অর্থাৎ অন্তরস্থিত সত্বগুণকে রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত হইতে দিও না, কোনো কিছু দ্বারা বিচলিত হইও না—অব্যাকুলিত এবং অনাসক্ত চিত্তে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও।" ব্যাপারটি অত্যন্ত দুরূহ। সামান্য লোক কেহ নহেন—অর্জ্জুন! ঐ দুরূহ ব্যাপারটির উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকেও সাত পাঁচ ভাবিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, অর্জ্জুনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না—শেষে তখন তিনি সার কথাটি অর্জ্জুনকে শুনাইলেন; সে কথা এই যে, আমাকে তুমি কায়মনোবাক্যে আশ্রয় কর—আমাতে কর্ম্ম সমর্পন কর, তাহা হইলে তুমি সহজে সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু এ কথাটি তিনি সকলের শেষে অর্জ্জুনের নিকটে খুলিয়াছিলেন। আপাততঃ এখন তিনি অর্জ্জুনকে কঠোর কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছেন। নিস্ত্রৈগুণ্য যে, কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া এতটা সময় যাহা ক্ষেপিত হইল—আশা করি তাহা নিষ্ফল হয় নাই। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব সংক্ষেপে এইরূপ:—পরমাত্মার সত্তা রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত নহে; পরন্তু জীবাত্মার সত্তা রজস্তমোগুণে জড়িত। তবেই হইতেছে যে, নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব পরমাত্মারই স্বরূপ-ভাব, তা বই, তাহা জীবাত্মার স্বভাবসিদ্ধ ভাব নহে। কাজেই শুদ্ধ কেবল আত্মপ্রভাবের বলে জীবাত্মা নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হইতে পারেন না। তবে কি? না সাধক যখন অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির সহিত পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহাতে পরমাত্মার গুণ ধরে, তখন, পরমাত্মা যেমন স্বরূপে অবিচলিত থাকিয়া নিখিল জগতের মঙ্গলের জন্য যথাযথমাত্রা শক্তি প্রেরণা করিতে ক্ষান্ত থাকেন না, ভক্ত সাধক তেমনি জল-নির্লিপ্ত অম্বুজ পত্রের ন্যায় কর্ম্মের ফলাফলে নির্লিপ্ত থাকিয়া যথা-বিহিত কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নের ত্রুটি করেন না। স্পর্শমণির প্রভাবগুণে লৌহ যেমন স্বর্ণ হয়, পরমাত্মার প্রভাবগুণে তেমনি ত্রিগুণাত্মক সাধক নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। ত্রিগুণের ব্যাখ্যা-কার্য্য হইয়া চুকিল; আগামী বারে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের যে স্থানটিতে থামিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছিল, সেইখানটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্মুখ-পথে বিধিমতে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আবরণ।*

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

হে পূষণ, হে জগতের পোষক, তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্য-ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণশূন্য কর।

আমরা ভিতরের দিকে চাহিলেই একটা কথা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আমরা আবরণের মধ্যে বাস করিতেছি। সেই সঙ্গে আর একটি কথাও বুঝি যে আবরণের বাহিরে একটি সত্যলোক অমৃতলোক আছে, যে লোকের দিকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত পূজা নিত্য-বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এই আবরণটা কিসের? আমার 'আমি' এই চেতনাটার একটা অন্ধকারময় বেষ্টন। আমি জ্ঞান অর্জ্জন করি, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি, দেশের কাজ করি, যাই করি—আমার সেই সমস্ত কৃতকর্ম্ম 'আমি' নামক একটি চেতনায় বিধৃত হইয়া বিপুলাকৃতি

* ৭ই পৌষের উৎসবে প্রভাতে মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশ।

হইয়া নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে আমাকেই ঘিরিয়া রাখে—কি হইতে ? না এই সমস্ত হইতে, এই প্রাণে আনন্দে অহরহ কম্পমান সজীব বিশ্বলোক হইতে। এই বিশ্বই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং, এই বিশ্বই আনন্দরূপম্ অমৃতম্—অথচ ইহা আমার সুদূরে, আমার আয়ত্তের অতীত—ইহার যথার্থ স্বরূপ আমি জানিতে পারিতেছি না।

তাই প্রত্যেক যুগেই মানুষের সাধনা বিশেষ বিশেষ পথ অবলম্বন করিয়া এই আবরণ ভেদ করিতে চাহিয়াছে। আরণ্যক ঋষি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, এখনকার মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সে যোগ নাই। তখন তাঁহারা ভূমিকর্ষণ করিতেন, অরণ্য তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে, অগ্নি তাঁহাদের নিত্য সঙ্গী—অগ্নিই যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক, হোতা—আকাশ গ্রহতারকা চন্দ্রসূর্য্য সমস্তই তাঁহাদের একমাত্র দেখিবার, জানিবার, এবং ভোগ করিবার জিনিস ছিল। তখন সমাজসভ্যতার বড় বড় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রচালনার ব্যাপার তেমন জটিল হইয়া উঠিয়া এই বিশ্বপ্রকৃতির কোল হইতে তাঁহাদিগকে ছিন্ন করিয়া লয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাছে তখন এই ছিল—এষঃ—এই আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল, ওষধিবনস্পতি—এষহ্যেবানন্দয়াতি—ইহাই তাঁহাদিগের চিত্তকে আনন্দিত করিয়া ছিল। কারণ ইহার সঙ্গে তখন তো শুধু ব্যবহারের সম্বন্ধ ছিল না, ইহারা যে দেবতা ছিল—ইহারা যে সত্য ছিল, আনন্দ ছিল—ইহাদের বাড়া আর কিছুই তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন নাই ? কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা অন্য চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশ আনন্দ না হইত ? এষহ্যেবানন্দয়াতি—ইহাই আনন্দ দিতেছে।

যাহা এত সহজ, যাহার সঙ্গে যোগ এত নিবিড়—তাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ঋষি ক্রন্দন করিয়াছেন। বলিয়াছেন, সত্যস্যাপিহিতং মুখং—সত্যের মুখ আবৃত—অপাবৃণু—আবরণ খোলো। যাহা চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ আয়ত্তগম্য হইয়া আছে, তাহা যে নাই—এই কথাটা কখন্ জানি ? না, যখন ভিতরের দিক্ হইতে দেখি, অর্থাৎ আত্মার দিক্ হইতে দেখি। ভিতরের দিকে আসিলেই দেখি যে সেখানে যাহাকে আমার আপনার আপনি বলিতেছি সে যে কোথায় তাহাই জানি না, তাহার কোন স্থির স্বরূপকে দেখিতেছি না। যে পাঁচ ইন্দ্রিয় বিষয়রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সেই ইন্দ্রিয়গুলিই কি আমার আপনি, আমার আত্মা ? না, কারণ তাহাদের যেটুকু অধিকার সেটুকু ক্ষণিকের মত—তাহাদের কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের উপর তো নিয়ামক এবং প্রবর্ত্তক মন আছে তবে কি মনই আমাদের আত্মা ? না, মনও নানা প্রবৃত্তির দ্বারা চঞ্চল, সে ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভু হইলেও নানা সংস্কারের পাশ, নানা প্রবৃত্তির মোহবন্ধন হইতে মুক্ত নয়—তাহার মধ্যেও স্থির প্রতিষ্ঠা নাই ? তবে কি বিজ্ঞানময় যে বুদ্ধি তাহাই আমাদের আত্মা ? যে বুদ্ধি আমাদের নিত্যানিত বিবেক জাগাইয়া দেয়, যে সংস্কারকে সংশয়কে মোহকে অপসারিত করে—সেই বুদ্ধিই কি তবে আত্মা ? কিন্তু না, সে বুদ্ধিতেও আমাদের অভয় প্রতিষ্ঠা নাই ; কারণ সে বুদ্ধিও অহংবোধ—'আমি' এই বোধ হইতে মুক্ত নহে। তখন দেখি যে তাহার উপরস্থ হচ্চেন সেই পরমাত্মা, যিনি প্রজ্ঞানঘন আনন্দঘন—যিনি দ্বন্দ্বরহিত, যিনি আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাকে জানিলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সমস্ত বাঁধন কাটিয়া যায়, ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যোগ অবারিত হইয়া যায়।

আমাদের ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ আত্মাকে এই রকম করিয়া সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সকলের চেয়ে বড় বলিয়া জানিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখার বাধা কি তাহাও তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন। ভিতর হইতে যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সেই আত্মার হাতে আপন আপন রাশ না ছাড়িয়া দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা বাহিরে খুবই পাইতেছি, তাহাকেও পাই না। ইন্দ্রিয়ের আবরণ, মনের সংস্কারের আবরণ, বুদ্ধির অহঙ্কারের আবরণ, আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে, এই আবরণের মধ্যে থাকিয়া আমরা বিশ্বকে যেটুকু পাইতেছি সেটুকু ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া, তাহা আসে যায় মিলায়, কিন্তু যদি আমরা এই আবরণকে একবার ভেদ করিয়া জানি যে একটি নিশ্চিল স্থির পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার ভূমি আমাদেরি মধ্যে রহিয়াছে, যেখানে একবার কোন গতিকে উঠিতে পারিলে, ঊর্দ্ধ অধ সমস্তই পূর্ণ, কোথাও কোনো ফাঁক নাই—যেখানে আনন্দের আর কোন বাধা নাই বিরাম নাই, তবে সেই স্থির প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমাদের চিত্ত স্বভাবতই ব্যাকুল হয়। সেই ব্যাকুলতার একটি বাণী ঐ ঋষিবাক্যটি—আমি কেবল চোখে সূর্য্যকে দেখিতেছি, বিশ্বকে দেখিতেছি, তাহার অন্তরস্থিত সত্যকে দেখিতেছি না—হে পূষণ অপাবৃণু—আবরণ খোলা—সত্যধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর দৃষ্টিকে আবরণোন্মুক্ত কর।

উপনিষদের যুগে যেমন এই বিশ্বপ্রকৃতির পথ দিয়া মানুষ তাহার অন্তরস্থিত সত্যকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, আধুনিক যুগে পশ্চিমে এবং পূর্ব্বদেশেও অধুনা আর এক পথ দিয়া আমরা সত্যের এই আবরণ উন্মোচন করিবার সাধনায় ব্যাপৃত রহিয়াছি। সে মনুষ্যত্বের পথ। আধুনিক কালের ঋষিদেরও এই বাণী :—

হে বিশ্বমানব দেবতা, তোমার ইতিহাসের উত্থান পতন ভাঙাগড়ার বিচিত্র লীলার দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যধর্মানুষ্ঠায়ীর দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণ-শূন্য কর।

আমরা বিশ্বমানুষের মধ্যে আত্মাকে দেখিব। এখানেও সেই ইন্দ্রিয়ের আবরণ, সংস্কারের আবরণ, বুদ্ধির আবরণ সেই আত্মাকে দেখিবার দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয় যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আনন্দে ওতপ্রোত দেখেনা, সে যেমন দেখে নানা রূপ নানা রস নানা গন্ধ নানা বিচিত্রতা তেমনি একটা স্থূল দৃষ্টি আমাদের আছে যাহা সমস্ত মানুষকে মানুষের ইতিহাসকে নানা করিয়া দেখিতেছে—যাহা দেখে কেবল বিরোধ যুদ্ধ রক্তপাত, স্বার্থের হানাহানি, মানুষে মানুষে সহস্র ভেদ-বিভেদ। মনের নানা সংস্কার যেমন প্রকৃতিতে যাহাকে যাহা জানে তাহার সম্বন্ধে নূতন কিছুই দেখিতে পায়না—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও নানা বুদ্ধির দ্বারা যে বস্তুর যে পরিচয় তাহার গোচর হইয়াছে তাহার সেই পরিচয়ই যেমন সে অকাট্য অক্ষয় বলিয়া ধরিয়া রাখে—ঠিক মানুষ সম্বন্ধেও সেই সংস্কারের অবিকল সেই একই কাজ। মানুষ এক সময়ে যে প্রথা গড়িয়াছে যে বিশেষ আচারকে সে সমাজে স্থান দিয়াছে, তাহাকেই অভ্রান্ত জানিয়া আঁকড়িয়া থাকে—সেই সংস্কারের আবরণ ভেদ করিয়া মানুষকে, মানুষের সমাজকে বড় করিয়া দেখিতে পারেনা, দেখিতে চায় না। সে তার কুলক্রমাগত সংস্কারকেই সত্য জানিয়া ইতিহাসের বৃহৎ প্রকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া কালের বিরাট প্রবাহকে বাধা দিয়া ক্রমাগত গণ্ডীর মধ্যে গণ্ডী রচিয়া আপনাকে অভ্যাসের দাস করিয়া তোলে। তখনি বড় বড় বিপ্লব হয়, তখনি ঝড় ওঠে। এমনি করিয়া ক্রমাগত সংস্কার জমে, এবং এক একটা প্রলয়ের ব্যাপারে সব ভাঙিয়া চুড়িয়া যায়। এ যেমন, তেমনি আবার বুদ্ধির আবরণও মানুষের আত্মাকে দেখিবার পক্ষে অন্তরায়। জগতে যখনি দেখা গিয়াছে বড় বড় ধর্ম্ম উঠিয়া মানুষকে সংস্কারছিন্ন করিয়া বড় করিয়া দেখিবার জন্য আয়োজন করিয়াছে,—যখন সত্য যে কি তাহা জানা গিয়াছে, সংস্কার যে সত্য নয়, আচার যে সত্য নয়—বাহিরের স্তূপীকৃত জঞ্জাল যে সত্য নয়—এ কথা নিঃসংশয়ে বোঝা গিয়াছে—তখনও আশ্চর্য্য এই যে, সেই ধর্ম্ম সেই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে গিয়া আপনার পায়ে আপনি বেড়ি পরিয়া বসিয়াছে। তখন আমাদের দল, আমাদের দেশ, এই 'আমরা'-বোধটা নিখিল সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া সকল দ্বার রোধ করিয়া উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই আমরা-বোধের আবার বড় বড় নাম আছে; ইহারই এক নাম পেট্রীয়টীজ্‌ম্‌ ও ন্যাশন্যালেটি, অন্য নাম সম্প্র ও চর্চ্চ, এবং আর এক নাম কুল ও জাতি, এবং এ জিনিসগুলি সবই ধর্ম্মের সামিল, তাহাও—ভুলিলে চলিবে না। এই আমরা-বোধ-মূলক ধর্ম্ম স্পেনে ও রোমে ইনকুইজিসনে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধর্ম্মের নামে হত্যা করিয়াছে, এবং অধুনা কামানে বন্দুকে গুলিগোলায় সজ্জিত হইয়া জগৎময় বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে।

কত জাতি যে ইহার পায়ে বলি পড়িল, কত দুঃসহ দুঃখ পীড়া বেদনা যে মানবের মধ্যে ইহারই জন্য ক্রমাগত জমিয়া জমিয়া কি প্রচণ্ড ভারের মত মানুষের চিত্তকে নিষ্পেষিত দলিত করিয়া ফেলিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখ। যেমন চর্চ্চ, তেমনি জাতি, তেমনি নেশন—সমস্তের মধ্যে সেই আমরা-বোধের উগ্র প্রকাশ এবং সমস্তেরই তলায় তলায় যুগ হইতে যুগে যে নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা একবার কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!

কিন্তু তথাপি জানিতে হইবে যে এখানেও ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির আবরণকে ভেদ করিবার জন্যই মানুষের সাধনা জাগ্রত হইয়া আছে। সে ক্রন্দন করিতেছে, সত্যস্যাপিহিতং মুখং—অপাবৃণু অপাবৃণু—সত্যের মুখ যে ঢাকা রহিল, খোল আবরণ, ঘোচাও আবরণ। সেই সাধনা যদি বা সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে দেখা নাও যায়, তথাপি সেই সাধনায় বর্ত্তমান যুগের ঋষিরা লাগিয়া আছেন। দেখিতেই হইবে মানুষের মধ্যে সেই আত্মাকে, যিনি আমার মধ্যে পূর্ণ হইয়া আছেন—আমার ভিতর দিয়া সেই আত্মাকে উদ্বোধিত করিলেই সকলের যিনি আত্মা তিনি প্রকাশমান হইবেন।

আজ ৭ই পৌষের উৎসব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই দিন ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার মন্ত্র ছিল—ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং—সমস্তকে ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেখা। আবরণের দ্বারা নয়। তিনি এই দীক্ষার দিন এবং এই উদার মন্ত্র আমাদের জন্য রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ বাঁধিয়াছিলেন, অথচ তাহার মধ্যে অহংবোধের উগ্রতা, দলের উত্তেজনাকে কোন দিন প্রশ্রয় দেন নাই। ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হইলেও তিনি কৌশলে তাহার বাহ্য চেহারাটাকে পাকা করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। কর্ম্মে অকৃতার্থ হইয়াও তিনি সত্য সাধনার দ্বারা সেই ক্ষণিক অকৃতার্থতাকে চিরদিনের মত সার্থক করিয়া গিয়াছেন। কারণ তিনি কর্ম্মের বাঁধন মানেন নাই—তাঁহার আত্মা যেখানে সঞ্চার করিত সে সেই আত্মার স্থির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেখানে কোন দ্বন্দ্ববিরোধ নাই কোন সংশয়ের দোলাদুলি নাই। যে সকল আবরণ সত্যের মুখ ঢাকিয়া রাখে, তাহাদের দূর করাই তাঁহার সাধনার প্রধান লক্ষ্যের

বিষয় ছিল—তিনি জানিতেন সেইখানেই সত্য মুক্তি—আবরণ দূর না করিয়া যাহা গড়, তাহা আজ গড়, কাল ভাঙিবে—সমস্ত মনুষ্যের ইতিহাসই যে সেই কথায় সাক্ষ্য দিতেছে।

আজ এই কথাটি নিশ্চিত জানিয়া আমরা সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করি এবং যে সাধনা তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গেছেন তাহাতেই নূতন উৎসাহের সঙ্গে প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের কাছে আজ আমাদের একটিমাত্র প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন সংস্কারের জড় আবরণের মধ্যে বাস না করি এবং আমরা যেন আমরা বোধের দ্বারা এ অশ্রমকে ঘিরিয়া না রাখি। আমাদের সাধনা আবরণ ভাঙিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, জানি,—কিন্তু ইহাও জানি, যে তাঁর করুণা আছে। তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধি মনকে তাঁহার সেই করুণার দ্বারা আত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত করুন—আমাদের দয়া করুন। আমাদের এই কঠিন আবরণগুলা যে কবে যাইবে তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তাহার জন্য বৃথা অধৈর্য্যে আমাদের লাভ নাই। আমরা যেন এই একটি কথা জানি, যে তিনি দয়া করিবেনই—যদি তাঁর কৃপা আমরা অন্তরের মধ্যে সত্যসত্যই চাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মশিক্ষা।

বালকবালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এ তর্ক আজকাল খৃষ্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধকরি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্ম্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সঙ্কট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে ধর্ম্ম জিনিষটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

শস্তা জিনিষ পৃথিবীতে অনেক আছে তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল্যবান জিনিষ কি করিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে;—সে জানে উপার্জ্জনের বড় রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড় রাস্তা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনী করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মত সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতায় বলিয়াছেন আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কি? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি কিছুই নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন ধর্ম্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড় বড় ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনি মানুষ বলে আমার নিঃশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনি বুঝিতে হইবে ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্ম্মের বোধ, যে কারণেই হৌক, উজ্জল হয় তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্ম্মের জন্য সকলের চেয়ে বড় ত্যাগ করিতে থাকে—তখন ধর্ম্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারিদিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে—তখন দেশের ধর্ম্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে—তখন ধর্ম্ম যে কত বড় জিনিষ তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনো প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্ম্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্ম্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক না কেন ধর্ম্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কি

নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না—বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন কি, আমাদের ধর্ম্মসমাজসম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর ব্যস্ততাময় উত্তেজনা-পরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মত—সেখানে অগভীর ধর্ম্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত এক পাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে; তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রার সরলতা নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্ব্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্ম্মকে যদি আমাদের জীবনের এককোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্ম্মশিক্ষা কি করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি তবে সেই উদ্বেগ অত্যন্ত সহজে কি উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু, বর্ত্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্ম্মাচার্য্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে দেশের সর্ব্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্ম্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না;—তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সঙ্কীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্ম্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারিদিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্ম্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদ-সাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্ম্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে, পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্ব্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাসসম্বন্ধেই সে ধর্ম্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয় নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে;—উভয়ের একঅন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ দেবতার শিলমোহরের স্বাক্ষর আছে এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে আর ধর্ম্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেঁকে না এবং এ অবস্থায় ধর্ম্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া বাঁধিয়া পুড়াইয়া একঘরে করিয়া বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্ম্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্ম্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে

অভিন্ন প্রতিপাদন্ করিবার চেষ্টা সুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্ত্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্ম্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্যদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্ম্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভাল কি মন্দ সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কেননা বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনো-প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক্ করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনি আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম্মাচার্য্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনি তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমত ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন্ তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সত্য-সত্যই বরাহবিশেষ নহে তাহা ভূকম্পশক্তির রূপকমাত্র এ কথা বলাও যা আর ধর্ম্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনো প্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সঙ্গতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্ম্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এই জন্য এ দেশে হিন্দুবিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নূতন যে সকল উদ্যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্ম্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কি করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সহিত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই; যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপ বাঁধা ধর্ম্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে বালকদিগকে কি শিখাইব কেমন করিয়া শিখাইব তাহা লইয়া বেশি কিছু ভাবিতে হয় না, তাহাদের বুদ্ধিবিচারকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, না করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কি দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে, তাহাকে আকর্ষণ করিব কি উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টি বর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই তেমনি কেবলমাত্র ধর্ম্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্ব্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া মন জিনিষটা কতকটা জলের মত, তাহাকে কেবল একদিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলি আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলেদের মন যে আল্‌গা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এই প্রকার অনির্দ্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দ্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরকার এই অনির্দ্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত, কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত; ইহার মধ্যে শঙ্করের প্রভাব কতটা, কতটা কাণ্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মত ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা

উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে, উহা ধর্ম্ম ই নহে উহা একটা ফিলজফি মাত্র; ইঁহারা সেই কলঙ্ককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্ম্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্ম্মবিদ্যালয়ের টেক্স্‌টবুককমিটির সঙ্কলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুৎ করিয়া বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনিই কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়। এই রহস্যকে যদি অনির্দ্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষ—ইহার জীবধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেল। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবনউৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী—তাহার রূপ প্রবহমান রূপ—তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে,—নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে,—কিন্তু সে সকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে—কোনো স্পর্দ্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতন্ত্র এই ধর্ম্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কি? তাহা একটা মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবেনা; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোট করিয়া আপনার সুবিধার মত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্ব্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয়—ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে—আর একদল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনই চিরদিন চলে না। যখন চারিদিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে, অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারিনা। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করেনা, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। এদেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল; মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল; মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম; বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মত যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম

এবং কেবলি মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানৎ ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শক্তকল্পিত সংসারে কোনো-মতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্ম্মে দৌর্ব্বল্য, ব্যবহারে সঙ্কোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা এক-মুহূর্ত্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, এই জড়তা, এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দ-হীন সর্ব্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখি-লের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতি-রুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই!

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্ব্ব-ত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখি-য়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলি আপনাকে বড় করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়কে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়-ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতি-হাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধ-কেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্ম্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্য্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড় করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়া-ছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোন মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপ-নার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড় করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্য্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতত্ত্ব বা পূজা-পদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা, এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি—ইহাই মানুষের সত্যধর্ম্ম।

ধর্ম্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলো-চনার পূর্ব্বে আমরা কাহাকে ধর্ম্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা নহে। অতএব ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমা-দিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অন্যান্য সাম্প্র-দায়িক ধর্ম্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কি? সোনার চেয়ে যে ধূলা সহজ!

যাহা হউক এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম্ম তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা পয়সার মত হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে তাহার এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মত স্কুলকমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না; ইন্‌স্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরি-মাণ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্ব্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিষ করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ এটা কোনো মতেই পঠন পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়া-ছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে

বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতং, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি, তাঁহারা বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্ম্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করা যাইতে পারে এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। একদিকে যেমন একদল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ কর, পাপকে দমন কর, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্বোধিত করিয়া তোল, অপরদিকে তেমনি আর এক দল বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহবা বলেন, যজ্ঞ কর, কেহবা বলেন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্ত্তিকে ধ্যান কর, এমন কি, কেহ বা বলেন মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুতবেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাক।

এমনি করিয়া যখনি চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনি প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখনি মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়, তখনি মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায় অন্যকে ভোলায়, সম্ভবঅসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ যাঁহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিষ, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর এক জিনিষ।

মনে কর আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনাদুঃখে হজম করিতে পার তবে আমি হয়ত সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্ম্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়। আসলে আমি যে এতৎসত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; এমন কি, যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনো দিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।

শুনা যায় কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্ম্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয় ত একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি কি করিয়া এমন ভাল কবিতা লেখেন তবে তিনি আর কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ঐ পচা আপেলটাকেই হয় ত উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড় কবি হউন না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চ্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কথা নাই। এরূপস্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি, তুমি কবিতাই লিখিতে পার তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কি জান তবে তাঁহাকে কবিত্ব হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত স্বাভাবিক প্রতিভাবশতই যাহারা কোনো একটা জিনিষ পায় পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশী বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে; এমন কি, তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্ব্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময়ে নিজেরাও বুঝেন না, এবং কখনো বা মনে করেন এখন আমার পক্ষে এই সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে আমরা সার্থকতালাভ করিয়াছি; তাহারা অহঙ্কৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না, কারণ,

তাহাদের কাছে এই সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে সকল জিনিষের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্ম্মবোধ জিনিষটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি তবে প্রথম হইতেই বালক বালিকাদের মনকে ধর্ম্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে ; অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড় হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে ত কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্ত্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকল প্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন তবে সেইখানেই ছেলে মেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন ? এ সব দুর্লভ জিনিষ ত আবশ্যক বুঝিয়া ফরমাস দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে ; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যাহা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনি বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্ম্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র একটা যথার্থ আশ্রয় যথার্থভাবে পাইতেছে না তখনি সে জিনিষটা যে কেমনতর হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্ম্মল সৌন্দর্য্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্ম্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতং বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন ? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্ম্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালবাসেন তাঁহারা বলিবেন এটা ত এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের Monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।

অন্য কোনো এককালে যে জিনিষটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্ব্বরদের ধনুর্ব্বাণ যতই মনোহর হউক্ তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদিবা অনাদৃত হয় কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা ত আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উল্টা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনো সেকালেরই মত সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুইপক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্ব্বে একদিন ধর্ম্মসাধন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও, অনেকটা সেই পূর্ব্ব আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্ত্তব্য নহে তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো

অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সঙ্গত বলিতে পারি না।

অথচ আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিব গ্রহণ করি যাহার সঙ্গতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্ত্তমানকালীন তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্ত্তমান তাহা যে আমার বর্ত্তমান নহে সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এইজন্যই যদি বলা যায় আমরা যথাসম্ভব গির্জ্জার মত একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে আমরা বর্ত্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি—অথচ গির্জ্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি—"না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্‌ন্‌ নহে।" মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে আধুনিকতা নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলা বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই-খানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়াছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্র-মের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর একদিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষ-ধের মত কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোন অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনো নিযুক্ত আছে তাহা এখান-কার সর্ব্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্ত্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড় সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে যতদিন পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলাম আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব আমরাই তাহাদের উপকার করিব ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনও যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেন না এখনো ভিতরের জিনিষটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে; আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি; এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন; এখানে গুরু শিষ্য সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছি তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনো আমাদের যাহা কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই—যেখানেই আমরা মনে করি আমরা দিব অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা সেইখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না, সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্ম্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্ম্মশিক্ষা কখনই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্ম্মও সেই প্রকারের জিনিষ, তাহা আলোর মত; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্ম্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে,—যেখানে মানুষের ধর্ম্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্ম্মই ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্ম্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্ম্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিষটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোন একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানবসমাজের উচ্চতম-ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল, সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মত সমস্ত সমাজের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে তবে পূর্ব্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্ম্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্ব্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব সেই আশ্রমের যে আহ্বান তাহা সেই শান্তম্‌শিবমদ্বৈতম্‌ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল-শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্ম্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না—তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা জানিতেও পারিব না;—কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ; এই ভূমার আহ্বানের একেবারে মাঝখানেই যে আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে; সেই একাগ্র ধ্বনি যে তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে; সে যে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোন বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে একটা সৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে সহরে জনতার অভাব নাই কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা একহিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মত। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক একটি রবিন্সন ক্রুসোর মত আপনার প্রাইভেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড় জনময় নির্জ্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু একশো দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জ্জনবাস বলা চলে না। এই যে একশো দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে; ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম আর ইচ্ছা না হইল ত আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম এমনটি হইবার জো নাই; এই একশো দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে;

ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধাঅসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া সৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্ব্বল সাধনা?

আমার সেই বন্ধু হয় ত বলিবেন, নির্জ্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও—কিন্তু সংসারে যেখানে চারিদিকেই ভালমন্দর তরঙ্গ কেবলি উঠা-পড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপী আতর একটা নবাবী জিনিষ।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্ব্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতর মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য—যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মত মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। সয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মত ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না—সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মত মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং-পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্ত্তি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না—কারণ ভালমন্দ সেখানে একপ্রকার আপোস করিয়া মিলিয়ামিশিয়াই থাকে—এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কি? বন্ধুরা বলিবেন যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয় এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মত মাঝারি রকমেরই মানুষ হন তবে সেই প্রকার স্থানই যে বালকবালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই,—কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে—কারণ আমার মত লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে একথা আমি বারম্বার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটা সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই, যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ—তাহা বাসনার দিকে নয় সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদিবা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে; সে আপনাকে যদিবা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলি ছাড়াইতে চাহিতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই তাহার পরিচয় নয় সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের উর্দ্ধে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্ব্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু কেনই বা বড় কথাটাকে গোপন করিব? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি অসঙ্কোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে যে ভাবটি ভরিয়া উঠে তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ, শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি—তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সঙ্গতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা ত ঘন মেঘের কালিমালিপ্ত আকাশের নীচে জন্মগ্রহণ করি নাই,—শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে ত রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্য্যোদয় যে ভক্তির পূজাঞ্জলির মত আকাশে উঠে এবং সূর্য্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মত দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কি উদার নদীর ধারা, কি

নির্জ্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মত স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মত তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্তবায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে; আমাদের দেশে এ সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য;—পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল—তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না? এত বড় সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে? আমরাই ত জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্ব্বানুভূ, ধর্ম্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি আছে যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্ম্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে—আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে—সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। না হয় আজ যেকালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্ম্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন? না হয়, আমরা কয়জন এই সহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পাথরের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড় মনে করিতেছি কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্ব্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম; কারণ আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম্ম কোনো প্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য-প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্ম্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্ম্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে; কোনো সঙ্কীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চ্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে; যেখানে সঙ্কীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্ব্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে; যেখানে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসঙ্গীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবল মাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে,—তাহারা নানা প্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্ত্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটবড় বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত

হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লজ্জৎ-ই-জান্‌।

(ফার্সী হইতে)

রঙে রঙ আজি মিলাও মিলাও,
সঙ্গে বসিয়া যাও;
আত্মার জ্যোতি দেখিবে সে যদি
চাও চোখে চোখে চাও!
মাতালের মাঝে কামনা-পেয়ালা
নিঃশেষে কর পান।
জনমের মত শোক লজ্জার
হ'য়ে যাক্ অবসান!
বাহু পসারিয়া থাক গো আকাশে
মিলিবে আলিঙ্গন,
দু' আঁখি মুদিলে যে আঁখি খুলিবে
ভুবনে সে অতুলন!
মাটির নকল ভেঙে ফেলে দাও
আসল দেখিবে যদি,
কাঞ্চন-পণে তুমি কেন একা
লবে হে পণ্য রঁদি?
অসি বল্লমে কেন দাও হাত
তুচ্ছ রুটির তরে?
ছুঁয়োনা আকিম আজ রজনীতে
বন্ধু আসিবে ঘরে!
সতত সদয় সাকী আমাদের
জোর জবরিতে নাই,
সভ্যের মাঝে চক্র করেছে,
তবু সবে পায় ঠাঁই।
সাকীর চক্রে আয় সবে আয়
শোন্ ঘূর্ণার গান,
একটি পরাণ দান করি নে রে
শত গুণ প্রতিদান!
'অমুক আমার অমুক নিয়েছে'
নিক্ সে,—ছেড়ে দে দাবী,
অমুকের অমুকত্ব কোথায়?—
তাই আগে দ্যাখ্ ভাবি'!
সকল ভাবনা ত্যজি' ভাব তারে
ভাবনায় যেই মূলে,
অন্যের কথা ভাবিবি কি তুই,
আত্মার কথা ভুলে?

এই সংসার—ইহা বিধাতার,—
এ নহেক পিঞ্জর;
ত্যজ সংশয়,—নিশ্চয় আছে
এ ধাঁধার উত্তর।
ছাড় বাচালতা ধর মৌনতা
গাবে যদি মহাগান,
জাহান-জানের মায়া ছাড়, দেখা
দিবে জাহানের জান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুফী আশ্রম।

খানকার (আশ্রমের) লোকেরা দুই দলে বিভক্ত। (১) পরিব্রাজক। (২) আশ্রমবাসী।

কোনো খানকায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলে সুফী অপরাহ্নের পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবেন। কোন কারণে যদি অপরাহ্ন আসিয়া পড়ে তবে মস্‌জিদে অথবা নিভৃত স্থানে অবতরণ করিবেন। পরদিন সূর্য্যোদয়ে খানকায় গমন করিলে তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য হইবে দুইটি ঈশ্বরস্তব পাঠ করিয়া আশ্রমকে অভিবাদন, দ্বিতীয় শান্তিকামনা, তৃতীয় আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণের করগ্রহণ ও তাঁহাদের সহিত আলিঙ্গন।

এই সকল আগন্তুকেরা আশ্রমবাসীদের জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য বা অন্য কোন উপহার সঙ্গে লইয়া আসিবেন ইহাই বিধি। বাক্যালাপে তাঁহারা অহমিকা প্রকাশ করিবেন না। প্রশ্ন করিবার না থাকিলে তাঁহারা কোনো কথা কহিবেন না।

ভ্রমণজনিত বিক্ষেপ হইতে অন্তঃকরণকে স্বাভাবিক সুস্থ দশায় আনিয়া শেখদের সহিত আলাপের উপযুক্ত অবস্থা লাভের জন্য তাঁহারা প্রথম তিন দিন কাল মৃতের সৎকার বা জীবিতের সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো কার্য্যোপলক্ষে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও যাতায়াত করিবেন না।

খানকা হইতে বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইলে তাঁহারা আশ্রমবাসীদিগকে তাহা জানাইবেন। তিনদিন অতিবাহিত হইবার পরও যদি তাঁহারা আশ্রমে থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে কোনো একটি সেবার ভার গ্রহণ করিতে চাহিবেন যাহাতে সেখানে থাকার অধিকার লাভ করিতে পারেন। যদি তাঁহাদের সময় ঈশ্বরসাধনায় নিযুক্ত হয় তবে সেবাভার গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

আশ্রমবাসীরা এই সকল পরিব্রাজকগণকে স্বাগত

সম্ভাষণের দ্বারা অভিবাদন করিবেন ও শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং প্রসন্ন মুখশ্রী লইয়া ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন।

আশ্রমের সেবকেরা মিষ্টবাক্যে ও প্রফুল্লমুখে কিঞ্চিৎ আহার্য্য নিবেদন করিয়া ইহাদের নিকট উপস্থিত থাকিবে।

সুফীদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনভ্যস্ত কোন পথিক যদি খানকায় উপস্থিত হয় তবে আশ্রমবাসীরা তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না এবং তাহাকে আশ্রমে প্রবেশ করিতেও নিষেধ করিবেন না কারণ অনেক ধার্ম্মিক এবং সাধু ব্যক্তিও সুফী সম্প্রদায়ের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অবজ্ঞার দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট ঘটিতে পারে কারণ ইহাতে অন্তঃকরণ উত্যক্ত হইলে তাহার ফল সংসারের ও ধর্ম্মের পক্ষে ক্ষতিকর। মনুষ্যের প্রতি সদয় ব্যবহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিষ্টাচার। মন্দ স্বভাব হইতেই অসৎ ব্যবহার ঘটিয়া থাকে।

আশ্রমে বাস করিবার অযোগ্য কোন ব্যক্তি যদি খানকায় উপস্থিত হয় তবে আশ্রমবাসীরা তাহাকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট বাক্যে ও সদয়ভাবে সেখান হইতে বিদায় করিবেন।

অন্তরের অনুরাগবশতঃ যাহারা খানকায় নূতন আসিয়া যোগ দেয় তাহারাই সেখানকার সেবকপদ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে আহল্‌-ই-খিদমৎ বলা হয়।

এইরূপ সেবাকার্য্যের দ্বারা তাহারা আশ্রমস্থ কর্ম্মী ও সাধকদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে ও তাঁহাদের দয়াদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে; এই উপায়েই তাঁহাদের সহিত তাহারা অন্তরঙ্গতার যোগ্য হয় এবং বিচ্ছেদ ও দূরত্বের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারে।

তাহারা এইরূপে সাধুসহবাসের যোগ্যতা লাভ করে ও তাহার উপকারসকল গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় ও সুফী-সাধুদের সঙ্গ, বাক্য, কর্ম্ম ও বিনয়ের কল্যাণগুণে তাঁহাদের সহিত একটি সম্বন্ধমর্য্যাদা লাভ করে। ইহার পরে তাহারা খিদ্‌মৎ বা সেবাকার্য্যের যোগ্য হয়।

বৃদ্ধদের পক্ষে "খিলবৎ" অর্থাৎ নির্জ্জন সাধনায় সময় অতিবাহিত করাই শ্রেয়। যুবকদের পক্ষে এই নির্জ্জন সাধনা অপেক্ষা সাধকসঙ্গতের সহবৎ (সঙ্গ) উপকারী, কারণ এই উপায়ে জ্ঞানপাশে তাহাদের কামনা সকল সংযত হইতে পারে।

আবু ইয়াকুব-ই-সুশী এইরূপ বলিয়াছেন।

খানকার লোকের দুই কাজ—সাধনভজন ও সেবা, এবং সংসার ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা।

যখন কোনো ব্যক্তি বাহিরের আচরণ ও অন্তরের পবিত্র ইচ্ছা দ্বারা সুফীদের সহিত আত্মীয়সম্বন্ধ লাভ করে তখনই সে সেবাকার্য্যের যোগ্য হয়। এই উভয় পথের কোনো পথ দিয়াই যে ব্যক্তি এই সম্বন্ধ লাভ না করিয়াছে সেবাব্রত গ্রহণ তাহার উপযুক্ত নয় এবং সদয় ব্যবহার ছাড়া তাহার সহিত অন্য সম্বন্ধ রাখা শ্রেয় নহে। খানকার লোকেরা অন্তরে বাহিরে পরস্পর মিলন রক্ষা করিয়া চলিবেন। আহারকালে তাঁহারা সকলে একই চাদরে বসিয়া ভোজন করিবেন যাহাতে বাহিরেও তাঁহাদের কোনো বিচ্ছেদ না থাকে, এবং যাহাতে বাহিরের এই মিলনের কল্যাণ তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে ও এইরূপে তাঁহারা প্রেমে ও পুণ্যে পরস্পরের সহিত একত্র জীবন যাপন করিয়া সর্ব্বপ্রকার ছল কপটতার প্রভাব হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত রাখিতে পারেন।

যদি একজনের নিকট হইতে কোনো কলুষ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিবেন এবং উভয়ের মধ্যে কোনো মিথ্যাচারের সংস্রব রাখিবেন না।

যে সম্প্রদায়ের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে কৃত্রিমতাই যাহার আশ্রয় তাহা জগতে নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

যদি বাহিরে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব দেখাইয়া অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করেন তবে তাঁহাদের মঙ্গলের আশা দুরপরাহত এবং তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ইঁহারা অন্তরে বাহিরে সকলের সঙ্গে মিলিয়া চলিবেন ও পরস্পর সমতা রক্ষা করিবেন এবং কাহারও সম্বন্ধে কোনো প্রকার পাপ পোষণ করিবেন না। যে সকল প্রবঞ্চনা ও পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা সংসারাসক্তির পথেই টানিয়া লয় সুফী ও ফকিরের চিত্তে তাহার স্থান কোথায়? ইঁহারা এই সকল প্রবৃত্তি ও সংসারকে পরিহার করিয়াছেন বলিয়াই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ভ্রমণান্তে মণ্ডলীর মধ্যে ফিরিয়া আসিবার কালে যেমন ভোজ্য উপহার লইয়া আসিতে হয় তেমনি কৃতাপরাধ ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনার পর সকলকে ভোজ্য নিবেদন করিবেন। পাপী ব্যক্তি পাপবশতই আশ্রমের সমাহিত ও প্রতিষ্ঠিত সাধুমণ্ডলীর বাহিরে বিক্ষিপ্ত হন, তখন তিনি বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের পথেই চলিতে থাকেন। সুতরাং ক্ষমালাভের দ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে পুনরাবর্ত্তনকালে তিনি ভোজ্য উপহার দিবেন ইহাই বিধি ইহাকেই সুফীরা ঘরামৎ (জরিমানা) বলেন।

খানকার কোন ব্যক্তিকে যদি কামনাদ্বারা আক্রান্ত দেখা যায় তবে তাহার সেই মোহান্ধকারকে তাঁহারা অন্তরের পুণ্যজ্যোতির দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

অনিষ্টকারী ও অনিষ্টকারিত উভয়কেই অপরাধী বলিয়া গণ্য করা যায় কারণ অনিষ্টকারিত যদি অনিষ্ট-

কারীর কামনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বাধা দিতেন তবে তাঁহার অন্তঃকরণের পুণ্যজ্যোতির দ্বারা তাহার কামনার অন্ধকার দূরীভূত হইত।

তিনিই প্রকৃত সূফী যিনি অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন ও আপনার মধ্যে কোন প্রকার মলিনতাকে স্থান না দেন।

ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা যেন এই অবস্থা লাভের অধিকারী হইতে পারি।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

১। মানুষের অঙ্গসৌষ্ঠবে ত্রুটি।

আমরা মনে করি আমাদের দেহের বাঁ-দিক ও ডান দিকের মধ্যে বেশ সৌষাম্য আছে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ভাস্কর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিঃ এব্রাহিম লিঙ্কণের মূর্ত্তি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, লিঙ্কণের মুখের একটা দিক অপর দিক অপেক্ষা লম্বা। পূর্ণাবয়ব মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমায় এমন ত্রুটি থাকিতে পারে এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে রাজি হন না। সম্প্রতি ফরাসি দেশে কসুমস্ নামক একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা উঠিয়াছে। লেখকের মতে মাথা ও মুখে সম্পূর্ণ সুষমার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। দেহের দুই দিকে এই যে স্বাভাবিক একটু অনৈক্য আছে, বিখ্যাত শিল্পীগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। মাইলোর সুবিখ্যাত ভিনাস্ মূর্ত্তির মুখের বাঁ দিকটা ডান দিক অপেক্ষা অধিক সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এবং ডান চক্ষুটা বাঁ চক্ষু অপেক্ষা নীচে আছে।

বা কান ও ডান কানের আকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রায়ই একটা অপরটা হইতে ছোট বড় হয়। তের বৎসরের একশত বালক-বালিকার মধ্যে ৮৯ জনের বাঁ কান ডান কান অপেক্ষা লম্বা, এবং ২৩ বৎসরের একশত যুবক যুবতীর মধ্যে ৭৯ জনের ডান কান লম্বা। দেখা গিয়াছে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্য ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন মানুষের কান পাঁচ মিলিমিটারের অর্থাৎ এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি ছোট বড় হইলে তাহা মানসিক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক।

২। বিমানারোহীর পর্ব্বত-পীড়া।

পর্ব্বতারোহীগণ যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন সমুদ্র পীড়ার ন্যায় অসুস্থতা অনুভব করেন বলিয়া শোনা যায়। কেহ কেহ কয়েক হাজার ফুট্ উঠিতেই ইহা অনুভব করেন। ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতেও যদি পর্ব্বতারোহী পীড়া অনুভব করেন, তবে পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে ছয় সাত হাজার ফুট্ উঠিতে বিমানারোহী যে অদ্ভুত পীড়া অনুভব করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সম্প্রতি লণ্ডনে প্রকাশিত ল্যান্‌সেট্ পত্রিকা এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। লেখক বলেন পর্ব্বতে যাত্রীকে আস্তে আস্তে উঠিতে হয় সেই জন্য সমতলক্ষেত্রের বায়বীয় চাপ (Atmospheric Pressure) হইতে উপরের বায়বীয় ক্ষেত্রে অবস্থান্তর অকস্মাৎ সংঘটিত হয় না, কিন্তু ব্যোমযানারোহীকে এই বিভিন্ন বায়বীয় ক্ষেত্রে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িতে হয়। ফরাসী অধ্যাপক মিঃ মৌলিনিয়র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন চার পাঁচ হাজার ফুট্ ঊর্দ্ধে উঠিয়া নামিয়া আসিলে আরোহীর রক্তের উপর বাতাসের চাপ যথেষ্ট বাড়ে। আরোহীর হাত পা নীলবর্ণ হইয়া উঠে, চক্ষু রক্তাভ হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, মস্তিষ্কের উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং কখন কখন নিদ্রাবেশ অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা অল্প উচ্চে উঠিয়া নামিয়া আসেন তাঁহাদের এরূপ হয় না। উপরে উঠিবার সময় যতটা পথ কুড়ি পঁচিশ মিনিটে অতিক্রম করা হয় নামিবার কালে অল্প সময়ের মধ্যে তাহা উত্তীর্ণ করার জন্য এই অসামঞ্জস্য ঘটে। অধ্যাপক বলেন অতি অল্প সময় মধ্যে বায়বিক চাপের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন আমাদের শারীর যন্ত্রকে বিকল করিয়া দিতে পারে।

৩। নূতন আলু।

বিগত দুই তিন বৎসর মধ্যে ফরাসিদেশে নূতন এক প্রকার আলুর চাষের অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত উরুগোএ (Uraguay) প্রদেশে ইহার জন্মস্থান; ফরাসিদেশের আবহাওয়ায় এবং কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণের যত্ন-চেষ্টায় ইহা এমন পরিণতি লাভ করিয়াছে যে ইহা হইতে উৎপন্ন বহুবিধ বিভিন্ন প্রকারের আলু ফরাসিদেশে স্থায়িত্ব লাভ করিবে এমত আশা করা যাইতে পারে। একটিমাত্র মূল জাতি হইতে এই বিভিন্ন প্রকারের আলুর সৃষ্টি হইয়াছে; বর্ণে, আকৃতিতে, ওজনে, ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফরাসিদেশের কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই লইয়া যে নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছেন, উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণ ইহার ফলাফলের জন্য উৎসুকচিত্তে বসিয়া আছেন। তাঁহারা মনে করেন ইহাদ্বারা আলুর জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যাইবে।

৪। কৃষিক্ষেত্রে তাড়িত শক্তি।

কিছুকাল ধরিয়া য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকেরা কৃষিকর্ম্মেও

তাড়িত শক্তিকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাড়ন্ত উদ্ভিদের উপরস্থ বায়ুকে তাড়িতপূর্ণকরার চেষ্টা সম্প্রতি সফল হইয়াছে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উদ্ভিদের উপরস্থ বায়ুমণ্ডলে তাড়িত শক্তি বিদ্যমান আছে এবং উদ্ভিদ অল্লাধিক পরিমাণে তাহা গ্রহণও করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টা—এই তাড়িত শক্তিকে কৃত্রিম কোনো উপায়ে বৃদ্ধি করিয়া উদ্ভিদকে জাগাইয়া তোলা। সুইডেনে প্রফেসার লেম্‌ষ্ট্রম্ ও ফরাসিদেশে মিঃ বারথেলয় এই বিষয়টি লইয়া বহুকাল পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করেন নাই, কিন্তু সম্প্রতি ইঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ইংলণ্ডে ঈভস্‌হ্যামের নিকটবর্ত্তী একটী কৃষিক্ষেত্রে দুইজন বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া ফল পাইয়াছেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে কৃষিক্ষেত্র বিশ্বজগতে একটী বিচিত্র বিরাট পরীক্ষাগার হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাধনার ধন।

সকল প্রকাশ আপনায় যিনি
রেখেছেন করি জড়;
যাঁহার অধিক ছোট নাহি কিছু,
নাহিক যাঁহার বড়।
কুঁড়িটি ফুটলে আপনায় যিনি
আনন্দে হন ভোর;
তৃণ সনে যাঁর বাঁধা আছে প্রাণে
অক্ষয় প্রেম-ডোর।
সুদূর হইতে আসন যাঁহার
মানবের দুখে টলে,
প্রসারিত যাঁর অবাধ বক্ষ
শূন্যে জলে স্থলে।
সবার আঘাত দিন রাত যাঁর
আপনার বুকে বাজে,
ব্যাকুল হইয়া হৃদয় আমার
তাঁহারেই শুধু খোঁজে।

শ্রীহেমন্তবালা দেবী।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম-কথা।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিন। বৎসরে বৎসরে সেইদিনে শান্তিনিকেতনে উৎসব হয় ও মেলা বসে। নানাস্থান হইতে লোক সমাগম হয়, বাজার বসে, যাত্রাগান হয় এবং রাত্রে উপাসনান্তে বাজি পোড়ানো হইয়া থাকে। সেই দিনটি সকলের আনন্দের দিন।

বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব এবং নূতন বৎসরের কার্য্যারম্ভ সেই একই দিনে পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপক সকলকেই সেই দিনটি স্মরণ করাইয়া দেয় যে তাঁহারা এখানে কেবল ইস্কুলে পড়েন এবং পড়ান তাই নয়, তাঁহারা মহর্ষির সাধনাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কর্ম্ম একটি বৃহৎ জীবনের সাধনার অন্তর্গত।

সকলেই জানেন মহর্ষিকে কোন্ মন্ত্র প্রথমে জাগ্রত করিয়াছিল? সে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি— ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এই শ্লোকটি বহন করিয়া একদা একটি ছিন্ন পত্র তাঁহার কাছে উড়িয়া আসিয়াছিল। কোন্ সময়ে? যখন বেদনায় তিনি মধ্যাহ্নের রবিরশ্মিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছিলেন। এই মন্ত্রেই তিনি নিবোধিত হইলেন।

আশ্রমের জন্য তিনি তাঁহার এই মন্ত্রটি জীবনের ভিতর হইতে সত্য এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, কাজ, কর্ম্ম, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিয়া দেখিবার মন্ত্র।

এবারকার উৎসব হইয়া গেল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক প্রাতে এবং সন্ধ্যায় উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন। আশ্রম-বালকগণ সঙ্গীত করিয়াছিল।

বাহির হইতে স্ত্রীপুরুষ অনেকেই উৎসবের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় কুড়িজন আশ্রমের পুরাতন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

প্রভাতে উপাসনার পরে মন্দিরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে আশ্রমবালকদিগকে তিনি কিছু উপদেশ দেন।

৭ই পৌষে বিদ্যালয়সম্বন্ধে নানা কথায় আলোচনা

হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবের জন্ত ৮ই পৌষের দিনটি স্থির করা হইয়াছিল। পুরাতন ছাত্র এবং অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়ের হিতৈষী বন্ধুগণ সে দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পুরাতন ছাত্র অনেকেই আসিয়াছিলেন, পুরাতন অধ্যাপক কেবল দুইজনমাত্র উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রভাতে সকলে সপ্তপর্ণদ্রুমতলে সমবেত হইলেন। আধুনিক ছাত্রগণ ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগকে পুষ্পচন্দনের দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। সকলে মিলিয়া বেদগান করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন একটি প্রার্থনা করেন। আশ্রমের অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রাচীনতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়সম্বন্ধে কিছু বলার পরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী আশ্রমের আদর্শ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করেন। তাহা "ব্রহ্ম বিদ্যালয়" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার পরে আশ্রম-সঙ্গীত গান করা এবং সকলে মিলিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বালকগণ ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরে সঙ্গীত ও অভিনয় করিয়াছিল।

৭ই পৌষের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নূতন বৎসরের জন্ত প্রত্যেক বিষয়ে নূতন পাঠ্য পুস্তকসকল স্থির করা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা ১৮৬ জন।

শ্রী—

বৌদ্ধ ভারতে ইৎ-সিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

৬৭০ খৃষ্টাব্দে ইৎ-সিং (Itsing) নামক জনৈক চীনদেশীয় ভ্রমণকারী কয়েকজন বন্ধুসহ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন, কুড়ি দিন অনবরত জলযাত্রার পর তাঁহারা সুমাত্রা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। সুমাত্রা দ্বীপ হইতে তাঁহারা মলয় দ্বীপে ও নিকোবর দ্বীপে পদার্পণ করিয়া পূর্ব্বভারতের তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি বা তমলুক্ নামক স্থানে পৌছান। তমলুক্ হইতে তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রাবস্তী, কুশীনগর, বৈশালী ও বারাণসী উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে ডাকাতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত; বৈদেশিক পরিব্রাজক্ ইৎসিংকেও দুইবার দস্যুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ইৎ-সিং বৌদ্ধগণের আচারপদ্ধতি এবং বৌদ্ধ মঠ ও বিহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বিহারে শ্রমণগণের ভদ্র আচরণ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"গুরুজন বা বুদ্ধের পবিত্র মূর্ত্তির নিকট যাইবার সময় প্রত্যেক শ্রমণকে খড়ম বা চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে যাইতে হইত, এই সময় উষ্ণীষ বা অন্য কোন প্রকার শিরোভূষণ ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পীড়িতাবস্থায় সময়ে সময়ে শ্রমণগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন। পূজ্য ব্যক্তির অনুমতি লইয়াও অনেকে পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিতেন। আমরা ঋতু-অনুসারে গাত্রবস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিতাম কিন্তু গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে খুব কড়াকড়িভাবে 'বিনয়পিটকের' নিয়মানুসারে চলিতে হইত। কোন পুরোহিত জুতা বা খড়ম লইয়া মন্দিরে প্রবেশ বা স্তূপাদি প্রদক্ষিণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকস্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়াছিল।"

বৌদ্ধ পুরোহিত ও শ্রমণগণ কিরূপভাবে উপবেশন করিয়া আহারাদি করিতেন সে সম্বন্ধে পরিব্রাজক্ ইৎসিং সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র চৌকিতে উপবেশন করিয়া বৌদ্ধগণ কেমন করিয়া আহার গ্রহণ করিতেন তাহা আমরা আলোচনা করিব। ইৎসিং বলেন, "আহারের পূর্ব্বে বৌদ্ধ শ্রমণ ও পুরোহিতগণ ভাল করিয়া হস্তপদ ধৌত করিয়া স্বতন্ত্র ছোট ছোট বেতের কাজ করা চৌকিতে উপবেশন করিতেন। চৌকিগুলি মাটী হইতে সাত ইঞ্চির অধিক উঁচু হইত না। পায়াগুলি কতকটা গোলাকার ধরণের ছিল। চৌকিগুলি তেমন ভারিও ছিলনা।

"শ্রমণগণ মাটিতে পা রাখিয়া তাঁহাদের সম্মুখের উচ্চতর চৌকিতে খাদ্যদ্রব্যাদিপূর্ণ পাত্রাদি স্থাপিত করিতেন। গোময়দ্বারা আহারস্থান পবিত্র করিয়া সেখানে এক হাত অন্তর দূরে দূরে চৌকি ও টেবিলগুলি সজ্জিত করা হইত। আমি আহারস্থানে কখনো পা গুটাইয়া বা "আসন পিঁড়ি" হইয়া কাহাকেও বসিতে দেখি নাই। চেয়ারগুলি আটআঙ্গুল * (বুদ্ধের) বিস্তৃত ছিল। আহারের সময় উচ্ছিষ্ট খাদ্যাদি ছড়াইয়া পরিধেয় অপরিষ্কৃত হইবে এই আশঙ্কায় তখনকার দিনে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া পা গুটাইয়া ভোজনের প্রথা ছিল না। আহারের পর অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্বিতীয় বারের ব্যবহারের আশা ত্যাগ করিয়া ফেলিয়া দিবার নিয়ম ছিল এবং প্রত্যেকবার নূতন খাদ্য টেবিলে পরিবেষণ করা হইত। কিন্তু চীনরাজ্যে প্রথমবারের

* বুদ্ধের অঙ্গুল সাধারণ অঙ্গুলের প্রায় তিনগুণ। চীন দেশের মাপ্ কাঠিতে মাপিলে প্রত্যেক চেয়ারের বিস্তৃতি প্রায় দেড় ফুট হইবে।

পরিবেষণ করা খাদ্য অবশিষ্ট থাকিলে তাহা দ্বিতীয়বারের জন্ত রক্ষিত হওয়া কোনই দোষের বিষয় হইত না। উদ্ভিজ্জ ব্যঞ্জন, ঝোল, ফল কিংবা মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি প্রথমবার ব্যবহারের পরও দুই একদিন রাখিতে কোনো বাধা ছিল না।

"জল রাখিবার জন্ত টব, চৌবাচ্ছা কিংবা বৃহৎ মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইত। আহারান্তে শ্রমণগণ স্ব স্ব জলপাত্র লইয়া নিকটবর্ত্তী জলাধার হইতে জল ডুবাইয়া লইতেন। পরে একত্র মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিতেন। ইহার পর প্রত্যেক শ্রমণ দাঁতন ব্যবহার করিতেন। প্রত্যূষে ও আহারান্তে শ্রমণগণ প্রত্যহ দাঁতন ব্যবহার করিতেন। দাঁতন ব্যবহারের পর তাঁহারা বেশন (Pea-flour) দ্বারা পুনর্ব্বার উত্তমরূপে দন্তমার্জ্জন করিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাতে একটু খাদ্যের টুকরা আটকাইয়া থাকিত ততক্ষণ এই রূপ বেশমদ্বারা দন্তমার্জ্জন চলিত। দন্তমার্জ্জন বা মুখ প্রক্ষালনকালে কোন শ্রমণ মুখস্থিত জল গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে শ্রমণকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। জলপাত্রটিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইত। হস্ত ধৌত করিবার কালে বামহস্তস্থিত জলপাত্র কোন ক্রমে কোন শ্রমণের দক্ষিণ হস্তে ঠেকিলে ঐ জলপাত্র উচ্ছিষ্টান্নযুক্ত বলিয়া অপবিত্র হইত। সুতরাং শ্রমণকে তাহা বেশন, শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময়দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইত।

"আহারকালে বৌদ্ধ শ্রমণগণ কোন একটি বিষয় লইয়া গল্প করিতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহাদের নিকট আহারের সময় নিরানন্দময় বা দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইত না।"

ইহার পর পরিব্রাজক ইৎসিং বৌদ্ধগণের জীবে দয়া ও কীট পতঙ্গাদির প্রতি গভীর করুণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কীট এমন কি জীবাণু সংহারের পাপের ভয়ে বৌদ্ধগণ পানীয় জল এত পরিষ্কৃত রাখিতেন যে, তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইৎসিং লিখিতেছেন :—

"পানের নিমিত্ত পবিত্র বা পরিষ্কৃত জল, সাধারণ কর্ম্মের জন্ত ব্যবহার্য্য জল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখা হইত। পানীয় জলের পাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হইত; পানীয় জলের পাত্র স্থানান্তরিত করিতে হইলে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহা স্পর্শ করিতে হইত। পরিষ্কার জলে মুখ ও হস্তপদাদি ধৌত না করিয়া কোনো শ্রমণই কোনো প্রকার আহার বা মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন না। মুখ বা হস্ত ধৌত না করিয়া ভোক্তা যদি পার্শ্ববর্ত্তী অপর কোন ভোজননিরত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেন তবে তাঁহাকে অবিলম্বে আহারনিরত হইয়া হস্ত ও মুখ ধৌত করিতে হইত।

"সে সময় সকল ভিক্ষুকই একত্র হস্তপদ ধৌত করিয়া আহার করিতে যাইতেন এবং একত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চেয়ারে বসিয়া আহার সমাপনান্তে সকলে একত্র হস্তপদাদি এবং ভোজনপাত্র ধৌত করিতেন। আহার সমাপনান্তে উচ্ছিষ্ট খাদ্যাদি পশুপক্ষিদিগকে দেওয়া হইত। ধনী দরিদ্র সকলেই এই প্রথা মানিয়া চলিতেন।

"ভিক্ষুদিগের আহার ব্যাপারের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকিতেন। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিলেও যদি ভিক্ষুগণের রন্ধন শেষ না হয় তবে যাহা রন্ধন করা হইয়াছে তাহাই ভিক্ষুগণ নিজেরাই ভাগ করিয়া লইতেন। এই ভাগের সময় পরিবেষণ ও উপবেশনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রক্ষা করা হইত না।

"আমি দেখিয়াছি দ্বিপ্রহরই শ্রমণগণের আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। আহার্য্য দ্রব্য পরিষ্কৃত পরিধেয়ধারী পুরোহিত বা ভিক্ষুণীদিগের দ্বারা পরিবেষিত হইত।"

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

জড়ের অস্তিত্ব।

সকলেই জানেন যে পৃথিবীতে দুই জাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা মনঃপদার্থ, আর একটা জড়পদার্থ। এই দুয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে আমরা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দি। কিন্তু আজ কাল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। এবং জড় পদার্থের সত্যই কোন অস্তিত্ব আছে কিনা সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজে আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে Houllevigue তাঁর Evolution of Sciences নামক গ্রন্থে Does matter exist নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষকেই বস্তু বলিয়া থাকি। সুতরাং এই বস্তুর অস্তিত্বে অস্বীকার করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকেই অবিশ্বাস করিতে হয়। লেখক বলেন যে আমাদের ইন্দ্রিয় সব সময়েই বিশ্বাসের যোগ্য নয়—তাহারা যে অনেক সময় ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেয় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের উপর চরম বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে বস্তু সমূহের এমন কতকগুলি গুণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহা একান্তই তাহার স্বধর্ম্মগত।

বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুমাত্রেই কতকগুলি গুণ আরোপ

করিয়া থাকেন যেমন নিশ্ছিদ্রতা, গুরুত্ব, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি। প্রথমে দেখা আবশ্যক, নিশ্ছিদ্রতা বস্তুমাত্রেরই একটি গুণ বলিতে আমরা কি বুঝি। ইহার অর্থ এই যে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশগুলির মধ্যে কোন ছিদ্র বা ফাঁক নাই। অতএব ঠিক একই সময়ে দুইটি বস্তু একই স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্‌। সকলেই জানেন বাতাস প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুইটি বাষ্পের সংমিশ্রনে গঠিত। আমরা এমন কোন স্থান কল্পনা করিতে পারি না—সেই স্থানটি যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন—যেখানে বাতাস আছে অথচ এই উভয় প্রকারের বাষ্প একত্র নাই। সুতরাং নিশ্ছিদ্রতা নামক গুণটি বৈজ্ঞানিকদের কষ্টকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত, গুরুত্ব বস্তুর একটি বিশেষ গুণ। আমরা জানি প্রত্যেক বস্তুরই স্বল্পাধিক ওজন আছে এবং তাহা স্থির করিবারও অনেক উপায় আমাদের জানা আছে। এখন ইহার মূলগত কারণটি কি তাহা দেখা যাক্‌। এই বিশ্ব সংসারে প্রত্যেক বস্তুই অন্য একটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণী শক্তি বস্তু দুইটির আয়তন ও তাহাদের মধ্যে দূরত্বের উপর নির্ভর করে। পৃথিবী নিজের পৃষ্ঠাস্থিত কোন বস্তুর উপর যে আকর্ষণ প্রয়োগ করে তাহারই নাম সেই বস্তুটির ওজন। মনে করুন পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রে কোন একটি বস্তুকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তখন চারিদিক হইতেই তাহার উপর সমান জোরের সহিত টান পড়িতেছে। অতএব সেই বস্তুটি কেন্দ্রে স্থির হইয়া থাকিবে এবং মোটের উপর তাহার উপর কোন আকর্ষণ থাকিবে না। তখন তাহার কোন ওজনও থাকিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গুরুত্ব কোনো বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম নয়—উহা অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে সুতরাং গুরুত্ব গুণকে বস্তুর সংজ্ঞাজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না।

নিশ্চেষ্টতা বস্তুর আর একটি বিশেষ গুণ—বস্তুমাত্রই আপনা আপনি চলিতে আরম্ভ করিতে কিম্বা চলন্ত অবস্থায় থামিতে পারে না। আমরা অত্যন্ত স্থূল দৃষ্টিতে দেখি বলিয়াই বস্তুকে নিশ্চেষ্ট বলিয়া থাকি। ধরুন, যেমন একটুক্‌রো পাথর। এই পাথরটি যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য কিন্তু Quartz নামে এক প্রকার পাথর আছে—তাহার মধ্যে কতকগুলি বায়ুর কণা অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই বায়ুর কণাগুলি পাথরটির সৃষ্টির কাল হইতে ইহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অনবরত নড়িতেছে এবং ভবিষ্যতেও নড়িতে থাকিবে। সকলেই জানেন যে উত্তপ্ত অবস্থায় পদার্থের পরমাণুগুলি ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতেছে এবং সেইজন্যই উহারা তাপ বিকিরণ করিতে পারে। আমরা যাহাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলি সে অবস্থায়ও পদার্থ একেবারে উত্তাপবিহীন হয় না—অতএব তাহার পরমাণুগুলি কিছু না কিছু চঞ্চল অবস্থায় থাকে। সুতরাং নিশ্চেষ্টতা বলিয়া বস্তুর কোন গুণ থাকিতেই পারে না। এইরূপে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত স্থূল সংস্কারের উপর স্থাপিত এবং একটু বিচারপূর্ব্বক দেখিলেই বস্তুর অস্তিত্বও অস্বীকার না করিয়া থাকিবার যো নাই।

তবে আমাদের চোখের সাম্‌নে আমরা যা দেখিতেছি সে সব কি? বিজ্ঞান এই প্রশ্নটির উত্তর যে না দিয়াছে তা নয় আমরা ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। তবে মোটের উপর বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবী একটি মূল শক্তি হইতে উদ্ভূত। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের দার্শনিকগণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ একটি ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া সেই একই সত্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কিছুদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শনির কথা।

আমরা চাঁদকে সব সময়েই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, কারণ ইহা পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে। কিন্তু শনি গ্রহকে দেখিবার তত সুবিধা নাই কারণ তাহা দূরতম গ্রহের মধ্যে একটি। সেইজন্য শনিকে দেখিতে হইলে সময় বাছিতে হইবে,—যখন ইহা পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি আসে। পৃথিবী যখন ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য এবং শনির মধ্যে আসিয়া পড়ে তখনই আমরা এই গ্রহটিকে বেশ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাই।

শনি পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে কিন্তু যেপথে শনি ঘোরে তাহা পৃথিবীর পথ অপেক্ষা অনেক বড় সেইজন্য সূর্য্যের চারিপার্শ্বে একবার ঘুরিয়া আসিতে এই গ্রহটির ২০।০ বৎসর সময় লাগে। তবেই বুঝিতে পার পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি রাস্তা শনিকে চলিতে হয়। শনির নিজের কোন আলো নাই, তবুও আমরা যে ইহাকে অত উজ্জ্বল দেখি তাহার কারণ সূর্য্যের আলো উহার উপর আসিয়া পড়ে এবং সেই আলো ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে আঘাত করে তাই আমরা উহাকে অত উজ্জ্বল দেখি।

এই গ্রহটি এত বড় যে, যদি উহাকে ছয় শত ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে প্রতি অংশ আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা ঢের বড় হইবে।

এই ভীষণাকার গ্রহটি পৃথিবীর ন্যায় নিজের অক্ষরেখার (axis) উপর ঘোরে এবং প্রত্যেকবার ঘুরিয়া আসিতে ইহার ১৯ ঘণ্টা ১৪ মিনিট সময় লাগে। ইহা হইতে তোমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পার যে ইহা কি প্রচণ্ড বেগে শূন্যের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। এই বেগের জন্য শনির বিষুবরেখাশ্রিত প্রদেশগুলি (Equatorial regions) পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ফুলিয়া উঠিয়াছে। শনির এইরূপ ডিম্বের ন্যায় আকৃতি একটি সামান্য দূরবীক্ষণেও স্পষ্ট দেখা যায়।

এখান হইতে শনির রং অনেকটা হল্‌দে দেখায় এবং ইহার মধ্যে এক একটা করিয়া দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই রং এবং দাগ নিশ্চয় গ্রহের নিজের নহে। যাহা দেখি তাহা ইহার চারিপার্শ্বস্থিত বাষ্পাবরণের রং।

আমরা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে কি করিয়া পণ্ডিতেরা শনির ওজনও বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। শনি পৃথিবী হইতে কত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আছে, তবু হিসাব করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে শনি যদিও পৃথিবী হইতে আকারে অনেক বড় তথাপি ইহার ওজন পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক কম। ইহাকে যদি একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে গ্রহটি ভাসিয়া উঠিবে কারণ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে গ্রহটি হাল্কা।

তোমাদের মধ্যে বোধ করি সকলে একটি ভাল দূরবীক্ষণযন্ত্রের ভিতর দিয়া শনিকে দেখ নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া উহাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া ইহাকে দেখিলে প্রথমেই ইহার চারি পার্শ্বে একটি বেড়ির মত জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বলে শনির বেড়ি। ইহা কিন্তু গ্রহটির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তোমরা যদি শনির ছবিটি দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে বেড়িটি যেন তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম দুই ভাগের মধ্যে একটি কাল দাগ রহিয়াছে। তোমাদের এটা মনে হইতে পারে যে বেড়িটি বুঝি একটি নিরেট ধাতুনির্ম্মিত জিনিষ। কিন্তু তা নয়। পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে উহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা দিয়া তৈয়ারি এবং প্রত্যেকটিই গ্রহের চারি পাশে স্বতন্ত্রভাবে চন্দ্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি অসংখ্য এবং এত কাছাকাছি স্থাপিত যে উহাকে একটি অখণ্ড আলোকরেখার ন্যায় বোধ হয়। এমন কি খুব ভাল দূরবীণেও ঐ ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে দেখা যায় না।

এ ভিন্ন শনির আর দশটি বড় বড় চাঁদ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অতি সামান্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায়।

১৩১৪, চৈত্র। শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ।

পক্ষীর সমবেত চেষ্টা।

সমুদ্রতীরে একপ্রকার পক্ষী দেখা যায়, ইহাদের নাম টার্ণষ্টোন্। ইহারা সুদীর্ঘ চঞ্চুর সাহায্যে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড উল্টাইয়া স্থানান্তরিত করিয়া তাহার তলদেশের কীটসকল ভক্ষণ করে, সেইজন্য ইহাদিগকে এই নামটি দেওয়া হইয়াছে। চঞ্চুর দ্বারা যদি কোনো প্রস্তরখণ্ডকে উল্টাইয়া ফেলা সম্ভব না হয় তখন ইহারা বুক দিয়া ঠেলিয়া কার্য্য হাসিল করে,—যদি কখনো এ কাজ একটি পক্ষীর শক্তির অতীত হয় তবে সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে।

একবার দুইটি পক্ষীকে তাহাদের ছয়গুণ আয়তনের একটি মৃত মৎস্যকে উল্টাইবার কার্য্যে ব্যাপৃত দেখা গিয়াছিল। প্রথমে তাহারা চঞ্চুদ্বারা চেষ্টা করিল, পরে বুক লাগাইয়াও যখন হইল না তখন তাহারা মৎস্যটির তলদেশ হইতে বালি সরাইয়া লইতে আরম্ভ করিল এবং তাহা হইবার পর আবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন তাহারা কৃতকার্য্য হইল না তখন তাহারা আবার বালী সরাইতে লাগিল। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও কোনো ফললাভ করিতে পারিল না কিন্তু তবু তাহাদের চেষ্টা ও উৎসাহ কিছুমাত্র কমিল না। এমন সময় আর একটি পাখী আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তৃতীয় পাখীটি আসায় প্রথম দুটি যেন হৃষ্ট হইয়া তাহাকে সাহায্যে গ্রহণ করিল এবং তিনটিতে কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। ইহাদের প্রথম চেষ্টা সফল হইল না—কিন্তু সমবেত চেষ্টায় মাছটিকে খানিকটা তুলিতে সক্ষম হইল। ইহাতে আরো উৎসাহিত হইয়া নীচু হইয়া বুক দিয়া ঠেলিয়া মাছটিকে উল্টাইয়া দিল।

মানবেতর জীবের মধ্যে এরূপ সমবেত চেষ্টার দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যায় না।

শ্রী—

লাজ।

কতনা দিন কতনা দোষে
হয়েছি আমি দোষী,
নিয়ত তুমি দেখেছ তাহা,
হৃদয়মাঝে বসি;
আপন স্নেহে ডেকেছ সবে
ডেকেছ কি আদরে,
তবুও প্রভু করেছি হেলা
গভীর মোহভরে।
তোমার বীণাতারে যে ধ্বনি,
নিয়তকাল বাজে,
সে ঝঙ্কার পশেনা মোর
নীরস চিত্তমাঝে।
ডাকের পরে দিয়েছ ডাক
নিদ্রা নাহি ছুটে,
মোহের চির আবরণ যে,
তবুও নাহি টুটে।
তোমা হ'তে সে বিমুখ হয়ে
কাটাল বৃথা কাজে,
তাই ত আজি সমুখে তব
যেতে সে মরে লাজে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার দত্ত।

দ্ব্যশীতিতম সাম্বৎসরিক
ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দ্ব্যশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সম্পাদক।
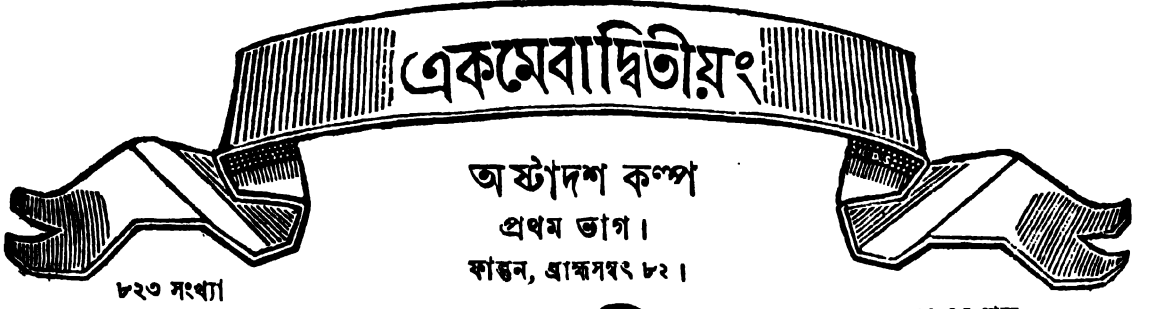
অষ্টাদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।
৮২৩ সংখ্যা
১৮৩৩ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

পিতার বোধ।*

যা প্রাণের জিনিষ তাকে প্রথার জিনিষ করে তোলার যে কত বড় লোকসান সে কথা ত প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে ত ফাঁকি দিয়ে সারিনে; অন্নজলকে ত সত্যকারই অন্নজলের মত ব্যবহার করে থাকি; কেবল আমার ভিতরকার এই যে মানুষটি, ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতিপ্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না—সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি, তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড় এই জন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের, এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাৎ হচ্চে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই না কেন সে সেটা পায়—আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেই জন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্"—শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেন না, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে, একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে আর একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যে শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুদ্ধ টাকাই দিই তাহলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনই সম্পূর্ণ দান নয়—সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে কিন্তু সে দান ধর্ম্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা ত নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করচি—সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করচি—সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি দান যখনি বন্ধ হয়ে যাবে তখনি প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এই রকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখ্‌তে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারচি ততই দান করচি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাক্‌বে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান ত আমাদের চল্‌চেই কিন্তু কি দান করচি

---

* মাঘোৎসবে প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে ত আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিষ কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা কিছু পাচ্চি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করচি? সে ত সমস্তই দেখচি বাইরেই এসে জমচে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে ত এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু নিজেকে এই যে আমরা দান করচি, এই যে আমার চেষ্টা, এই যে আমার সমস্তই,—এ কি পূর্ণদান হচ্চে, শ্রদ্ধার দান হচ্চে, ধর্ম্মের দান হচ্চে? এতে করে আমরা বাড়াচ্চি কিন্তু বড় হতে পারচি কি? এতে করে আমরা সুখ পাচ্চি কিন্তু আনন্দ পাচ্চিনে; এতে করে ত আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারচে না। মানুষ বল্লে যতখানি বোঝায় ততখানি ত ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌চে না।

কেন এমন হচ্চে? কেননা এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আন্‌চি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করচি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা, সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা—সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাইদিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলচি।

নিজেকে যে লোক কেবলি ধন মান জোগাচ্চে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলি অবিশ্বাস করচে—সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলি অপমান করচে; তাকে সে কিছুই দিচ্চে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করচে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্চে কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্চে না—এবং শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌ এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করচে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে ত আমরা বিনাশ করতে পারিনে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে দিচ্চি তার দুর্গতি ত কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে ত আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে ত আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দ্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন ত বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন ত বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারিনে; আর অকস্মাৎ বজ্রের মত মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্ম্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক ত কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারিনে। যখন একদিকে ভার চাপ্‌তে চাপ্‌তে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্যসামন্ত কাকে ডাকব, যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মত বেঁচে গেলে?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্‌ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন্‌ ভরসা দিয়ে এলুম? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড় লণ্ঠন খাটিয়ে দিলুম কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধূলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠ্‌ল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কি বলে তাকে আশ্বাস দিলুম?

তার সেই মর্ম্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমোদের বড়ই ব্যাঘাত করতে লাগ্‌ল, আমাদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে তাকে বলে এসেছি, ভয় নেই তোমার, "আমি আছি।" মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড় অভয় মন্ত্র যে, "আমি আছি।" নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্য্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মত গেঁথে ফেলে তার হাতে দিয়ে বলেছি, এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বারবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলি একমনে জপ করতে থাক আমি, আমি, আমি! আমি সত্য, আমি বড়, আমি প্রিয়।

তাই নিয়ে সে জপ্‌চে বটে, আমি, আমি, আমি, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জলপড়া আর কিছুতেই থাম্‌চে না। তার ভিতরকার এ কোন্‌ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্চে, না, না, না, নয়, নয়, নয়। কোন্‌ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাসকরা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুল্‌চে—ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হলরে—সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রিবেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল—মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকন্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্চে চিরদিনের সেই সত্য বাণী, পিতা নোঽসি—পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ পিতা, তুমি আছ—আমাদের পিতা তুমি আছ—এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর ওটা কি ভয়ানক মিথ্যা—ঐ যে "আমি আছি।" কৈ আছ, তুমি আছ কোথায়? তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলাকে আশ্রয় করে বল্‌চ "আমি আছি।" যে বুদ্‌বুদটি যখনি ফেটে যাচ্চে তাতে তখনি তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, সংসারের দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগ্‌চে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্চে। তুমি আছ কিসের উপরে? তুমি কে? অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বল্‌চে, "চাই" তখন তুমি অহঙ্কার করে তাকে গিয়ে বল্‌চ, আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুসি থাক। এ তোমার কেমন দান! তোমার প্রকাণ্ড বোঝা বইবে কে? এ যে বিষম ভার! এ যে কেবলি বস্তুর পরে বস্তু, কেবলি ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ! এ ত তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলি অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও! তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে যেতে থাক্! যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন? এই সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাক্‌বে, সে সময় তার কোথায়? এই জন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি? তবে কি ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপ্‌চ—"আমি আছি!"

পিতা নোঽসি—পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। "সত্যং" এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন—সে কথাটির মানেই হচ্চে এই যে, পিতানোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু তুমি আছ এই বোধটিকেত সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে! তুমি আছ—এ ত শুধু একটা মন্ত্র নয়—তুমি আছ, এটা ত শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। "তুমি আছ" এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম—কেনই বা কিছু দিনের জন্য নানা জিনিষ আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম—শেষ কালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল?

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমি-কেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতি-দিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্য্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে অস্থি-মজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড় দুঃখ দেয় তবু তাকে অনামনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুল্‌তে ইচ্ছা করলেও ভুল্‌তে পারিনে!

সেই জন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি—পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক্; আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্ব্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক্, আমার সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শ-চেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক্, পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক্! পিতা নো বোধি—আমার জীব-নের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক্—আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক্! আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক্, নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে—আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে—প্রসারিত হতে থাক্ প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি, পিতা নো বোধি, কিন্তু একবারও মনেও আনিনি কত বড় চাওয়া চাচ্চি—মনেও আনিনি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড় সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের ক্ষালন, কত সংস্কারের আবরণ-মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন—জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে, নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে

ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে? সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্য্যে আনন্দে নির্ম্মলতার ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে—সেইত আমার পিতা, সর্ব্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি—এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ম্ময় সুরসপ্তকের বিশ্বসঙ্গীত; পিতা তুমি আছ এই মন্ত্রই কত অসংখ্য-রূপ ধরে লোকলোকান্তরে সমস্ত জীবকে কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণ-পরিপূর্ণ করে রয়েছে—অসীম চেতন-জগতের মধ্যে নিয়ত উদ্বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ—যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করচ;—যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোট হয়ে নত হয়ে আসচ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড় করে তুলে নিচ্চ—সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য করে আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্চে আমার অন্তরাত্মা—তবু সেই জায়গায় আমি কেবলি তার কাছে এনে দিচ্চি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারচি নে, তার কাছে আমার নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না, অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি; আমার সমস্ত অস্ত্র সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেই জন্যেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা—পিতা নো বোধি—পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও! এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে, আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব;—আমি ত আর কারো নই, আর কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটিমাত্র সত্য; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা কিছু আছে, এ সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়;—এই জল-স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসার-লীলা, এ সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরচে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা পিতা বলে সাড়া দিয়ে উঠুক্। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক্—আমারদিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে। তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠ্‌ল—তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্চে—কিন্তু তোমার এই এত বড় আকাশভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্চিনে, গ্রহণ করতেই পারচিনে—কিসের জন্যে? ঐ এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বল্‌চে, আমি! একবার একটুখানি থাম্! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বল্‌তে দে, একবার সন্তান-জন্মের চরম ডাকটা ডাক্‌তে দে—পিতা নোঽসি! পিতা পিতা, পিতা,—তুমি, তুমি, তুমি, কেবল এই কথাটা,—অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল—আছ, আছ, আছ। 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক্ সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জান্‌চ; তেমনি করে সন্তানকেও জান্‌তে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক্—তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেচ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ কর।

নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি! এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্ব্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্ব্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুন্‌তে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্ম্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে—নমোনমঃ। লোকে লোকান্তরে, নমোনমঃ। সুমধুর সুগম্ভীর নমোনমঃ। তখন দেখ্‌তে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ম্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য্য সুন্দর সামঞ্জস্য—যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছুমাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করচে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্চে—এই ত সেই নমস্কারের সঙ্গীত—ঊর্দ্ধে অধোতে দিকে দিগন্তরে নমোনমঃ। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, যে যখন আর পৃথক্ থাক্‌তে পারে না—তখন সে চিরকালের মত ধন্য হয়—তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম আমি রক্ষা পেলুম—তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে—কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রহিল না।

পিতা, নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা—এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি! সমস্ত যাত্রার অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথ-যাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক—হে পিতা তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন

শেষ করে দিতে পারি। এই যে আমার বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতি ক্ষুদ্র এই মানুষটা—এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাৎ থাক্‌ব, সকলের চেয়ে আমি বড় হব—এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি—যত জিনিষ বাড়ে ততই সে বাড়ে, নিজের মধ্যে সে শূন্য, সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই এইজন্য বাইরে ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিষপত্র নিয়েই যাকে বড় হতে হয় সে ত সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না;—জিনিষপত্র ত জ্ঞান নয়, প্রেম নয়—সকলকে দান করার দ্বারাই ত সে আরো বাড়ে না, ভাগ করার দ্বারাই ত সে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠে না—তার থেকে যা যায় তা যায়, সে ত আরো দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না—তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই—এই জন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড় হয়, সকলের থেকে তফাৎ হয়েই সে বড় হয়;—আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে; এইজন্যে যতই সে বড় হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে ততই চারিদিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে—এবং তার সমস্ত সুখই অহঙ্কারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি ত দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি—সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ, নমস্কারের দ্বারা, বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েছে—নমস্কারের দ্বারা তার আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোট বড় সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে—যেখানে দরিদ্রকে ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না—সেই ত সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই ত সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা, সেই তোমার অনন্ত-প্রসারিত পাদপীঠ—আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্ব্বজন-ভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবেনা, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটিই যে স্থানের একমাত্র সত্য দলিল সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যায় তখনি সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনি সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক্ করে ফেলে—তখনি সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনি সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্ম্মই হচ্চে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা—সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়—তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক্ হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নীচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অম্‌নি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না—নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্ব্বজনের নিম্নক্ষেত্রে, সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনি জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনি মিলনের স্রোত চারদিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সঙ্গীতে দশদিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনি আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্ম্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে সমর্পণ করতে চাচ্চে। এই তার যথার্থ ধর্ম্ম। সে অহঙ্কারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্চে,—পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্ম্মটিকে যে পর্য্যন্ত সে না পাচ্চে সেই পর্য্যন্তই তার যত কিছু দুঃখ, যত কিছু অপমান। এই জন্যেই সে প্রতিদিন জোড় হাত করে বল্‌চে, নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি ত সহজ কথা নয়; এ ত কেবল অভ্যস্ত ভাবে মাথা নীচু করা নয়! পিতানোঽসি—তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, এই কথাটিকে ত সহজে বল্‌তে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলচি তখন মনে ভয় হয়—মনে করি, সন্তানের নমস্কার বুঝি এ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না, মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না! কেমন করেই বা পাবে? শুষ্ক যে সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব্ব করে, ক্ষুদ্র যে সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই

উদ্ধত হয়ে ওঠে! স্বাতন্ত্র্যের সঙ্কীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলি মনে করে আমি আমার আত্মাকেই খর্ব্ব করলুম। সে যে নমস্কার করতে চাচ্চেই না। তার এমনি দুর্দ্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনো সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চনীচের দ্বারা আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি, সেখানে সর্ব্বলোকপিতা যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করবার ত জায়গাই পাইনে—তোমাকে সত্যকার নমস্কার করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়—কিন্তু তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত অপরিচিত, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, তোমারই নামে একত্র সমবেত হই, সেখানেও যে মুহূর্ত্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করচি, পিতানোঽসি, তুমি আমাদের সকলের পিতা, তুমিই আছ, তুমিই সত্য—সেই মুহূর্ত্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করচি, বিদ্যা বিচার করচি, সম্প্রদায় বিচার করচি—যখনি বলচি নমস্তেঽস্তু তখনি নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করচি, সকলের পিতা বলে যে অসঙ্কুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করচি! সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়; সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই; এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে—কিন্তু এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর স্পর্দ্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারি সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না!

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব? কিন্তু কেন? তার প্রয়োজন কি আছে! তোমাকে নমস্কার ত আমার টাকা নয় কড়ি নয়, ঘর নয় বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি ত তার থলির মধ্যে কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায়—কিন্তু সে যদি দলের দিকে সমাজের দিকে অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কি আছে?

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই যে আমার ভিতরের মানুষ—সে যে নিত্য মানুষ—সে ত সংসারের মানুষ নয়, সে ত সমাজের কাছ থেকে ছোট বড় কোনো উপাধি গ্রহণ করে' সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা—তাহলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে—সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে;—আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজ সংসারের সঙ্কীর্ণ জালের মধ্যে নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই সে ডাকচে, তার পিতাকে, সে ডাকচে নিখিল মানুষের পিতাকে—সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়, এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক; এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক;—এই একটি মাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে,—এই পিতানোঽসি। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহঙ্কার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সঙ্গীতকে একমুহূর্ত্তেই বেসুরা করা হবে—তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং হে পরমাত্মন্ তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম প্রার্থনা—যেন নত হই নত হই, নত হই! সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক্, সত্য হোক্—অহং শান্ত হোক্, অহঙ্কার ক্ষয় হোক্, ভেদবুদ্ধি দূর হোক্, পিতার বোধ পূর্ণ হোক্, এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক্! নমস্তেঽস্তু।

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
ঘনশ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক্ পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক্ নীরব পারাবারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী,—তেমনি সারাদিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে—
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈচিত্র্যের সমস্যা।*

প্রাচীন কালের মানুষের মধ্যে একটি অখণ্ডতার ভাব দেখা যায়, অর্থাৎ তাহার বুদ্ধি, হৃদয়, সংস্কার, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সমস্তই অবিরোধে একযোগে মিলিয়া আছে। পূর্ব্বকালের মনুষ্যের মধ্যে বিশ্লেষ করিয়া কিছু দেখিবার বা পাইবার কোন প্রবৃত্তিই লক্ষ্য করা যায় না। তাহার রসসৃষ্টিও তাহার চিৎসত্তারই ন্যায় অখণ্ড, তাহার মধ্যেও বিচিত্র বিরোধের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। ইউরোপীয় আধুনিক নাট্যসাহিত্যের ভিতরকার তত্ত্বই হইতেছে দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্ব কোন বাহিরের ঘটনার সঙ্গে মানবহৃদয়ের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব নহে, পরন্তু একেবারে অন্তরতর মানসিক দ্বন্দ্ব, যাহা আপনার সঙ্গে এবং আপনার চতুর্দ্দিকের অবস্থার সঙ্গে ও ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর একটা বিপ্লবের ও অঘটনের সৃষ্টি করিয়া বসে। মানুষকে সেই ভীষণ আত্মবিরোধের হানাহানির মাঝখানে দেখানোই সে দেশের ড্রামাটিক্ আর্টের চূড়ান্ত। প্রাচীন সাহিত্যেও যে জীবননাট্যের দ্বন্দ্ববিরোধের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রকটিত হয় না, তাহা নহে। মহাভারতের প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই ঘোরতর দ্বন্দ্বের আয়োজন। একদিকে আত্মীয়তার বন্ধন সমাজবন্ধন অন্যদিকে ধর্ম্মরক্ষা ও আত্মসম্মান রক্ষা, এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে প্রত্যেকটি চরিত্র পড়িয়া কি প্রচণ্ড প্রবল সংঘাতকে জাগাইয়াছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে সমগ্রতার কোথাও ব্যাঘাত ঘটে নাই। যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন কেহই আপনাকে লইয়া আপনি ভাবিতে বসে নাই এবং মানসদ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে আপনার সঙ্গে আপনি যুঝিতেও প্রবৃত্ত হয় নাই। সমস্ত আকাশ যেমন দূষিত বায়ুতে ভরা থাকিলেও তাহা অনুভূত হয় না, কারণ তাহা আকাশ, তাহা বদ্ধ ঘর নহে, ঠিক্ সেই রকম মহাভারতের বড় ক্ষেত্রে বড় দৃশ্যপটের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে এবং দ্বন্দ্ব মিলাইয়াছে,—তাহার তীব্র, উগ্র, দগ্ধবেগে টানাছেঁড়ার ছবি একান্ত হইয়া প্রকাশ পায় নাই।

আশা করি অনেক উদাহরণ না দিলেও পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন আমি প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে যে অখণ্ডতার ভাবের কথাটি বলিতেছি, তাহার তাৎপর্য্যটা কি। শেক্স্পীয়রের হ্যামলেট এবং মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র একই চরিত্রের উদাহরণ, অর্থাৎ উভয়েরই মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব অত্যন্ত প্রবল। উভয়েরি মধ্যে কেবলি দ্বিধা, সংকল্পকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া কাজে খাটাইবার অক্ষমতা। উভয়েরি মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উত্তেজিত হৃদয়াবেগ এই দুয়ের প্রবল সংগ্রাম। কিন্তু একজন সমস্ত মহাভারতের অখণ্ড প্রবাহের অন্তর্গত, সুতরাং তাহার আপনাকে লইয়াই আপনার ভাবিবার যথেষ্ট অবকাশ নাই, অন্যজন সকলকে ছাড়াইয়া একা আপনি প্রকাশ, তাই তাহার আত্মবিরোধের যত গোলযোগ সমস্তই ব্যাপ্তির অভাবে আবর্ত্তের মত পাক খাইয়াছে। আমার মনে হয় যে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি আধুনিক। পূর্ব্বকালের মানুষের কোন জটিলতা ছিল না, সে বিশ্বপ্রকৃতির মত পাপ পুণ্য দ্বন্দ্ব সংঘাত সমস্তকে লইয়াই বিরাজমান, তাহার জীবন,—তাহার পরিবার, সমাজ, ধর্ম্ম সমস্তের মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত। সেই জন্য তাহার রাষ্ট্রে ও সমাজেও একমুখীন ভাব, তাহাতেও নানা বিরোধ জড়ো হয় নাই। ইংরাজিতে যাহাকে বলে Organic প্রাচীন কালের মানুষ সম্বন্ধে অনেকটা সেই কথাটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এখনকার কালের মানুষ এক মানুষ নহে, সে নানা মানুষের সমষ্টি। তাহার বুদ্ধি-মানুষ যাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থির করে, হৃদয়-মানুষ তাহাকে মানিতে চায় না; হৃদয়-মানুষ যাহাকে প্রিয় বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া আনে, সংস্কার-মানুষ তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়, মানুষের ধর্ম্ম এক, কর্ম্ম অন্য, জ্ঞান এক, বোধ অন্য—এমনি করিয়া নানা মানুষ একই মানুষের মধ্যে স্থান পাইয়া সেই মানুষের অখণ্ড সত্তাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। গ্রীক্ পুরাণে গল্প আছে, যে মহাকায় সাপের দাঁত হইতে অসংখ্য মহাবল দৈত্য জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন পরস্পরকে পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, তখন রাজপুত্র তাহাদিগকে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্যে লাগাইয়া দিলে তাহারা মারামারি হইতে ক্ষান্ত হইল। আধুনিক মানুষ সেই রকম একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছে, কিন্তু তাহার সকল কল্পনাই এখন স্বপ্নের গোধূলিরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, কোনটাই পরিস্ফুট আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সে এক রকম আবছায়াভাবে এই কথা বুঝিতেছে এবং বলিতেছে যে আপনার মধ্যেই আপনার এই নানা দ্বন্দ্বের সমাধান নাই, কিন্তু বিশ্ব-মনুষ্যত্বের মধ্যে আছে। বিশ্ব-মনুষ্যত্ব মানে মনুষ্যের সমষ্টিসত্তা, কিন্তু সেটা যে কি বস্তু তাহা জানা দরকার। এটা সত্য যে ইতিহাসে ক্রমশঃ উদ্ভিদ্যমান মনুষ্যের এক একটা বড় রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হইতেছে এবং এটাও সত্য যে সেই সকল রূপকে আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেছি না—কিন্তু নানা দিক্ দিয়া তাহাদিগকে মিলিত করিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বের একটা মোটভাব সম্বলিয়া লইতেছি—সেই মোট ভাবটিকেই আমি মনুষ্যের সমষ্টিসত্তা বা বাহা

* বোলপুর শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ-পাঠ সভায় পঠিত।

একই কথা, বিশ্ব-মনুষ্যত্ব বলিতেছি। অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতিতে যেমন নানা বিরুদ্ধ শক্তির সামঞ্জস্যে তবেই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনি এখানেও মনুষ্যত্বের নানা রূপ মিলিয়া একটা সমগ্র জিনিসকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু এ সকল কথার নাম পোয়েটিক্যাল্ আইডিয়া-লিজ্‌ম্—অর্থাৎ কবি-সুলভ ভাবুকতা। ইহা এত দূরের জিনিস যে ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও ক্ষতি নাই। তথাপি "তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে।"

কিন্তু তাও কৈ? এদেশে এবং অন্যদেশে তর্কের পরিহাসের মাত্রাটাই তো দেখিতে পাই অধিক। ইংলণ্ডে ব্রাড্‌লি এবং জোন্‌স্ এবং জর্ম্মানিতে অয়কেন আইডিয়া-লিজম্ কোনমতে আজও আঁকড়াইয়া আছেন, আর কোথাও তাহার স্থান নাই। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে হিউ-ম্যানিজম্ নামক এক তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই তত্ত্বের যাঁহারা পোষক তাঁহারা বলেন অন্তহীন বৈচিত্র্যই আছে; বৈচিত্র্যের মূলে এক কোথাও নাই। অবশ্য সীমা-হীন অনেক অর্থে অনেকের সমষ্টি নহে, কারণ ইঁহাদের মতে অনেকের প্রত্যেক রূপটিই স্বতন্ত্র এবং নূতন। তার মানে ইঁহারা বৈচিত্র্যের প্রত্যেক রূপকেই অখণ্ড অদ্বৈত-পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতেছেন, ইঁহাদের কাছে সেই দেখাই চরম দেখা। এইজন্য ইঁহারা ঈশ্বরকেও সীমাবদ্ধ বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইঁহাদের যুক্তি এই যে আমরা যে বলি, বৈচিত্র্যের মধ্যে এক আছে, এ কথাটা একটা কাল্পনিক উক্তি মাত্র। তার কারণ সকল বৈচিত্র্য আমাদের চেতনার এলাকায় একই সময়ে হাজির থাকে না। আমাদের চৈতন্য তরঙ্গমালার মত একটা অন্যটাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকে, যাহা অতিক্রান্ত হয় তাহা অচেতনতার চিরনিদ্রার রাজ্যে লুকাইয়া থাকে, যাহা ভাসিয়া উঠে তাহা সেই মুহূর্ত্তের জিনিস মাত্র। সুতরাং আমাদের চেতনার হিসাবে অনেক আছে, এক নাই অর্থাৎ অনেকের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক আছে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক মানুষের মধ্যে সমস্তই বিরুদ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই আধুনিক যুগে এমনতর ভয়ঙ্কর বহুত্ববাদ দর্শনে স্থান পাইয়াছে। মানুষ ভাবিয়া পায় না, তার অগণ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে তার আসল মানুষ, তার আপনার আপ্পিটি আছে কোন্‌খানে? তবু এ কথা সমস্ত বাদবিবাদের গোলমালের উপরে বলিতেই হইবে যে, সেই আপনার আপ্পিই যদি না থাকিল কোনখানে, তবে বৈচিত্র্য লইয়া আমার লাভ কি? তবে চুলায় যাক্ বৈচিত্র্য। চেতনা যদি নানাখানার চেতনাই হয়, তবে চেতনার মধ্যে অখণ্ডতার জন্য বেদনা জাগিবে কোথা হইতে? সেও কি একটা সংস্কারমাত্র? না। কখনই না। কারণ আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে আমার বুদ্ধি, হৃদয়, জ্ঞান, সংস্কার, কর্ম্ম, প্রবৃত্তি, সমস্তই ঐ অখণ্ডতার জন্য লালায়িত। সুতরাং যাহা শেষ, যাহা চরম পরিণাম, তাহা চেতনার মধ্যে বীজভাবে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে, চেতনাতত্ত্বের পণ্ডিত তাহাকে খুঁজিয়া পান আর নাই পান!

বিজ্ঞানের সাধনায় যে দিন মানুষ বাহির হইয়াছিল, সে দিনও সে মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষাটিই পোষণ করিয়াছিল, যে আমি সবের মধ্যে একক দেখিব—আমি নানা দেখিব না। কিন্তু হায়, বিজ্ঞানের রাস্তায় সে ঐক্যদৃষ্টি কোথায় গেল ফাঁসিয়া, কোথা হইতে আসিল ভয়ঙ্কর বহুত্ব। উদ্ভিদতত্ত্বের কেতাব খোল, কেবল ন্যাচারল্ অর্ডার, নামের সমষ্টি—শ্রেণীবিভাগ। "এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে" সে বার্ত্তা কোথায়? তাহাদের কোন রহস্যই যেন নাই, যা কিছু আছে সে কেবল প্রাকৃতিক পাত্রনির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। ভূ-তত্ত্বে কেবল পৃথিবীর স্তরপর্য্যায় উদ্ঘাটিত, কোন্ যুগে কোন্ স্তর ছিল তাহারি সংবাদ, কিন্তু যে জীবনধারা বিচিত্র স্রোতে সেই স্তরে স্তরে বহিয়া গিয়াছে,

"হে বসুন্ধ, জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তব মৃত্তিকার সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লিখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন"—

কে ইহার ইতিহাস ভূ-তত্ত্বের মধ্যে কোথায়? গ্র্যানিট্ আর আলুভিয়ম্ স্তর দেখিয়া আমার লাভ কি, কিন্তু জীবপর্য্যায় যে এই স্তরপর্য্যায়ের সঙ্গে কিরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গাঁথা, তাহাই তো জানিবার আসল বিষয়! পক্ষি-তত্ত্বের কেতাবেও সেই একই রকম নীরস কঙ্কাল আর পাখার বৈচিত্র্য, ওজন আর পরিমাপ পড়িয়া হয়রাণ্ হইতে হয়। কিন্তু সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পক্ষীজীবনের যোগের কোন নিগূঢ় আভাস যদি কোথাও পাওয়া যায়! বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্যের কথা, যোগের কথা কুত্রাপি নাই—আছে কেবল, শ্রেণীবিভাগ, নাম ও সংজ্ঞা, ও বিশিষ্ট নিয়মের নীরস আলোচনা! এ কী রকম? না দেহীকে বাদ দিয়া দেহের ব্যাপক আলোচনা, যন্ত্রীকে বাদ দিয়া যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা! সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে একটা আশ্চর্য্য অখণ্ড পদার্থ সে কথাটা এক রকম বিস্মৃত হইবার জন্য বিজ্ঞানপরীক্ষাতেই মানুষের আত্মার আনন্দের দিক্ হইতে বিজ্ঞানালোচনা করে না,

বরং সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে পরিহাস করিয়া থাকে।

হায়, হায়, এ কথা আজ কে বলিবে যে মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয়, কিন্তু প্রকৃতির কোলের সন্তান।

"আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে!"

এ কথা কে বলিবে যে, মানুষই গাছপালায় আছে, পশুপক্ষীতে আছে, অগ্নি-জল-বায়ুতে আছে, তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র বিশ্বের বিচিত্র স্পন্দনমালার সঙ্গে বাঁধা এবং বীণার তারের মত বেদনায় বেদনায় অহরহ বাজিতেছে! বৈজ্ঞানিক জগতে কেবল এক ফেক্‌নারের (Fechner) মধ্যে এই বিশ্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উইলিয়ম্ জেম্‌স্ তাঁহার Pluralistic Universe বহুময় পৃথিবী নামক গ্রন্থে আমাদের নিকটে এই আশ্চর্য্য কবি-বৈজ্ঞানিকটিকে উপস্থিত করিয়াছেন। সুতরাং ফেক্‌নারের রচনার একটি স্থান অনুবাদ করিয়া শোনাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"একদা বসন্ত প্রভাতে বাহির হইলাম। প্রান্তর কি সবুজ, পাখী গান করিতেছে, শিশির ঘাসের উপর জ্বলিতেছে, দু' একটি লোক কচিৎ দেখা দিতেছে। সমস্তই রূপান্তরিত করিয়া দেখাইবার মত একটি অলোক আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। পৃথিবীর সেই একটুখানি অংশমাত্র, তাহার অনন্ত জীবনের সেই একটি মুহূর্ত্তমাত্র, কিন্তু আমার দৃষ্টি যখন তাহাকে নিবিড় নিবিড়তররূপে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, তখন তাহার সুন্দর ভাবটি যে মনকে অধিকার করিল মাত্র, তাহা নহে, আমার মনে হইল সত্য, এ যেন সত্য! পৃথিবীটি যেন একটি দেবনারী, ফুলের মত নবীন, সুন্দর, পরিপূর্ণ; অম্বরপথে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে, অথচ আপনাতে সে আপনি বিভোর; তাহার সজীব সুন্দর মুখখানি স্বর্গের দিকে সে তুলিয়া আছে! আমিও যেন তাহার সঙ্গে সেই স্বর্গে চলিয়াছি! আমার মনে হইল মানুষ এই সজীবতা হইতে হইতে কেমন করিয়া এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে, এমন অদ্ভুত মত সৃজন করিয়াছে যাহাতে এই পৃথিবীকে সে মাটির ঢেলা বলিয়া মনে করিতেও পারে, এবং শূন্যে কল্পলোকে স্বর্গ এবং স্বর্গীয় দেবদেবীদিগকে অন্বেষণ করিয়া মরিতে পারে! কিন্তু আমার এ সকল অভিজ্ঞতা কাল্পনিক বলিয়াই লোকে উড়াইয়া দিবে।"

তা নিশ্চয়ই দিবে। তাই বলিতেছিলাম যে, যে বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল, মানুষের চৈতন্যকে তাহার আকাশ, পৃথিবীর জীবকুলে, অগ্নিজল বায়ুর বিচিত্র শক্তিতে বেদনায় বাজাইয়া তাহাকে বলিবে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহারই, তাহারই আত্মার আনন্দময় সঞ্চরণক্ষেত্র, সেই বিজ্ঞানই সে উদ্দেশ্যের ভয়ঙ্কর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেবল বিজ্ঞান কেন, সকল বিষয়েই আমরা এই অখণ্ডতার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আমাদের জ্ঞানে, বোধে, সংস্কারে, আচরণে, সবসুদ্ধ এমন একটা অস্বাস্থ্যকর গোলযোগ চলিতেছে। উপনিষদের পঞ্চকোষের কথা পাঠকমাত্রেই আশা করি জ্ঞাত আছেন। আমি যে অখণ্ডতার কথা বলিতেছি, তাহার উদাহরণ ঠিক ঐ! অন্নময় কোষে যখন থাকি তখন অন্নেরই মধ্যে ব্রহ্মকে দেখি, কারণ অন্ন ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব। প্রাণময় কোষে আসিলে দেখা যায় যে, অন্ন তাহার অপেক্ষা স্থূল, প্রাণই ব্রহ্ম, কারণ প্রাণ ভিন্ন কিছুই নাই, প্রাণের জন্যই অন্নপান সমস্তই। মনোময় কোষে আসিলে দেখা যায় যে প্রাণ মন অপেক্ষা স্থূল সত্য, মন ভিন্ন প্রাণের কোন আধার নাই, মনই সমস্তকে ধারণ করিয়া আছে, প্রাণকে সম্ভাবিত করিতেছে। বিজ্ঞানময় কোষে যাত্রা করিলে দেখি যে মন আবার নানা সংস্কারজালে জড়িত, জ্ঞান ভিন্ন তাহার বিক্ষিপ্ততা কোথাও ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়ে না, সুতরাং জ্ঞানই ব্রহ্ম। কিন্তু জ্ঞান আবার আনন্দময় কোষে গিয়া তবে অন্তর-বাহির পূর্ণকরা অখণ্ডতায় সমাপ্ত হয়, তখন আর কোথাও দ্বন্দ্বসংশয় থাকে না, সমস্তই পরিপূর্ণ।

অন্ন যে প্রাণের অন্তর্গত, অর্থাৎ যাহা জড় তাহার মধ্যেও যে প্রাণের ধর্ম্ম কাজ করিতেছে, একথা আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রমাণ করিবার দিকে চলিয়াছে। এমন কি প্রাণও যে মনের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং জড়ধর্ম্মী বিষয়মাত্রে মনোধর্ম্মের যে পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে—অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্তি যে জীবমাত্রের একচেটিয়া জিনিস নহে, ইহাও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনোময় কোষ হইতে বিজ্ঞানময় কোষে যাত্রা, অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত নানা ব্যাপারকে বিজ্ঞানের এলাকায় উত্তীর্ণ করিয়া দিবার আয়োজন বহুকাল হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রভৃতি নব বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলিই তাহার প্রমাণ। মানবসমাজে প্রথা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ভিতরে কি সকল কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাসূত্র পাওয়া যায়, যাহা আকস্মিক বলিয়া ঠেকে তাহাও যে নানা কারণপরম্পরার যোগে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল কারণের ঐক্য যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, সোসিয়লজি অথবা সমাজবিজ্ঞানশাস্ত্র পড়িলেই সে পরিচয় আমরা

পাই। যাহাই হউক বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে আসাই শেষ কথা। আজকাল তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে যে সকল বিরোধ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কেবল বিজ্ঞানময় দৃষ্টিতে ও আলোচনার দ্বারা শান্ত করিবার কোন উপায় নাই। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে বুদ্ধির সূক্ষ্ম ভাগ বিভাগ এবং কারণ অনুসন্ধানই পর্য্যাপ্ত নয়, যেখানে যে অবস্থায় মানুষ এখন আছে, সেই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক—মানুষ সম্পূর্ণ নূতন মানুষ না হইলে যেখানে ভেদ-বিভেদ দূর করিবার আর কোন উপায় নাই। তার মানে বিজ্ঞানের ভেদ-বিভেদকে আনন্দের অখণ্ডতার মধ্যে লুপ্ত করিয়া মানুষকে তাহার অতীত বিজ্ঞানবুদ্ধির উপরের অবস্থায় তোলা দরকার। এ কথাটা সবাই বলেনা, কিন্তু ইউরোপে দু-একজনের মুখে কথাটা যেন গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন আমার মনে হয়।

বিজ্ঞানের কাজই এই অন্নে প্রাণে মনে আনন্দে যোগাযোগ নিরূপণ করিয়া দেওয়া—চক্রের মধ্যে চক্র রচনা করা, অথচ আমি আক্ষেপ করিয়াছি যে এই দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সে এই সীধা রাস্তায় চলিবে বলিয়া ধূমধাম সহকারে বাহির হয়, হঠাৎ যে কোন গলি ঘুঁজির মধ্যে সে পথভ্রষ্ট হইয়া কোন্ শাখাপথে চলিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। সেই কারণেই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের উপরে যে তত্ত্বজ্ঞান আপনার বাসা বাঁধিবে—সেও বিজ্ঞানেরই পথানুসরণ করিয়া এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে কাল্পনিক বলিয়া উপহাস করিয়া ঐ অন্তহীন শাখাপ্রশাখার পথেই দৌড় মারিতেছে। নহিলে কি আধুনিক তত্ত্বজ্ঞান এমন ছেলেমানুষের মত কথা বলে যে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কোন অন্তর্নিগূঢ় যোগ নাই, ঐক্য কথাটা একটা কল্পনার কথা—আছে কেবল স্বতন্ত্র অন্তহীন অসংখ্য প্রত্যেক? তাহার কারণ সে যাহা বলে তাহা এই যে, চেতনা চলমান—চেতনা প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করিয়াই দেখে; সে সোণার তরীর মত একবার যে একটি স্বতন্ত্র সীমারূপের কূলে ভিড়িয়াছে, তাহাকে অপূর্ব্ব নূতনত্বে মণ্ডিত করিয়া যখন বিদায় লয়, তখন তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা—সে যে গতিশীল। সে যাহা দেখে তাহাকে অপূর্ব্ব নূতন করিয়াই দেখে কিন্তু ঢেউয়ের মত পিছনে ফেলিয়া নূতন নূতন তরঙ্গ জাগাইয়া অগ্রসর হইয়াই সে চলিয়া যায়। অবশ্য একটা সংস্কারের সমতল স্থিতি তাহার পিছনে থাকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা কিছু আর চেতনা নয়। সেই জন্যই বার্গসঁ প্রভৃতি আধুনিক তাত্ত্বিকগণ বলিতে সুরু করিয়াছেন যে অদ্বৈত আছেন বলা মানে স্থিতির কথা বলা—কিন্তু অদ্বৈত যদি তোমার চেতনায় থাকেন, তবে সেই চেতনা যখন নিত্য গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল তখন তুমি "অদ্বৈত আছেন" এ কথা কি করিয়া বল? সে তো একটা সংস্কারের কথামাত্র।

আমার বিশ্বাস বিজ্ঞান ক্রমেই মূলের দিক্ ছাড়িয়া শাখার দিকে বেশি করিয়া মনোযোগ দেওয়ার জন্য তত্ত্বজ্ঞানে এমনতর একটা বহুত্ববাদ স্থান পাইতেছে। বিজ্ঞান হইতে আনন্দে যাত্রা তাই শেষ যাত্রা। আধুনিক মানুষকে সেই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। নহিলে আর তো কোনখানে বৈচিত্র্যের সমস্যার সমাধান দেখি না।

পৃথিবীতে বোধ হয় এক জায়গায় যে ভাবের তরঙ্গ জাগে অন্য জায়গাতেও তাহার স্পন্দন চলিতে থাকে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সাধনা নাই—তত্ত্বজ্ঞানও আমাদের বহু পুরাতন এবং তাহা এমনি পাকা ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে যে সেখানে ঘড়ি ঘড়ি নূতন মতের সমাবেশ ঘটা সম্ভব নয়। তথাপি এই বৈচিত্র্যবাদ্ এক রকম করিয়া আমাদিগকেও পাইয়া বসিয়াছে। আধুনিক কালের মানুষের যে ব্যাধি—যাহার কথা আমি প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি সে ব্যাধি আমাদিগকেও গুরুতররূপে আক্রমণ করিয়াছে। অখণ্ডতার জীবনকে হারাইয়া আমরাও খণ্ডতার মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হইয়া বেড়াইতেছি।

কেমন করিয়া যেন উইলিয়ম জেম্‌স্ শীলার প্রভৃতির ন্যায় আমাদেরও মধ্যে অদ্বৈতবাদ আর থই পাইতেছে না—বহুত্ববাদই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হইয়া দাঁড়াইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ রামমোহন রায় যে অদ্বৈতবাদকে হিন্দুর বেদান্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, যাহার পর হইতে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ সমস্তই সেই বৃহৎ ভাবকে আশ্রয় করিয়া ক্রমাগত নব নব বিকাশের পথে এ দেশে চলিয়াছে, কোথাও কোথাও দেখি যে সেই ঐক্যের বড় আদর্শটার এই সকল ফল নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করিয়া এমন কথা বলা হয়, যে এক নিরাকার অনন্ত ঈশ্বর আছেন এ একটা শূন্য ভাব মাত্র, পৌত্তলিকতা সেই ভাবটিকে রূপের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ করিয়া পাইবার একটা উপায় স্থির করিয়াছে। সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি এইজন্যই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছে—ধর্ম্ম যে শূন্য একটা অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট্ বস্তুবিচ্ছিন্ন পদার্থ নহে, সে যে মানুষের সবটাকে আত্মসাৎ করিয়া মানুষের সব অংশের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া লয়, ইহাই ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনার মুখ্য কথা। সেইজন্যই না শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যে যেরূপে আমার ভজনা করে, তাহাকে

সেই রূপেই আমি দর্শন দিয়া থাকি ইত্যাদি। তার মানে যেটা বুদ্ধিগত আইডিয়া মাত্র সেটা জীবনের সত্য যখন হয় তখন সে প্রত্যক্ষ না হইলে চলেনা—আইডিয়াকে তো লোকে ভক্তি করিতে পারেনা—ভক্তি করে প্রত্যক্ষ মানুষকে, প্রত্যক্ষ রূপকে—সুতরাং ভাব এবং রূপকে এমনি কাগজের এপিট্ ওপিটের মত করিয়া লওয়া হইয়াছে যে জ্ঞানে যাহা বুঝি, প্রতিমাতে তাহাকেই দেখি এবং সম্ভোগ করি। এই গেল অদ্বৈতবাদ হইতে বহুত্ববাদে আসিয়া পড়ার কথা। এ কথাটি আমাদের দেশময় ছাইয়া আছে দেখা যায়।

শুধু তাই নয়। আমি যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যে এই সব কথা আমাদের চিন্তাকে, কল্পনাকে, অনুভূতিকে খুব গুরুতর রকম অধিকার করিয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ এবং এইরূপ কত লোকেই যে এই অদ্বৈতবাদকে বহুত্ববাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রতিমাপূজার সার্থকতা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। ক্রমাগতই শিল্পসাহিত্যে ধর্ম্মে সর্ব্ববিষয়ে এই দিকে স্রোত চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়—যে অনন্তকে ভাবমাত্রে ধরিয়া রাখিলে উপলব্ধির সম্পূর্ণতা হয় না—রূপের মধ্য দিয়া তাহাকে পাইলেই তাহাকে পুরা পাওয়া যায়। কথাটা এমনি যুক্তিতর্কের পোষাক পরিয়া আসে যে বাহির হইতে তাহাকে দিব্য শোনায়। সত্য তো আর সুদূর পদার্থ নন্, তিনি নানা বিগ্রহে সর্ব্বত্র প্রকাশমান। সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত মনুষ্য, সমস্ত সংসার সেই সত্যের বিগ্রহ—সেই জন্যই সকল সম্বন্ধের মধ্যে এমন একটা অনন্তের রসবোধ আছে—আমরা যেন ক্ষুদ্র জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে একটা অসীমবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের আভাস পাই। সত্যকে এইরূপে আমরা যে জানি মাত্র তা নয়, ব্যবহার করি। সেইজন্য সত্যকে মূর্ত্তি দিয়া রূপ দিয়া আমরা পূজা করিয়াও রূপের সীমায় মধ্যে ধরা দিই না—কারণ আমাদের আর্ট এই কথা প্রচার করে যে, মূর্ত্তি হচ্ছে ভাবের বিগ্রহ। সে ভাবকে ধরিয়া রাখিবার একটা কৌশল—একটা ইঙ্গিত—সে সব সত্য নয়। অন্য কোন দেশেই আর্ট এমন করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত হয় নাই, কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে। ভারতবর্ষে সত্য শুধু জানার নন্, শুধু সংসারে নানা সম্বন্ধে ভোগ করিবার নন্, সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে নিবিড়ভাবে অনুভূত হইবার সামগ্রী। তিনি কি না সত্য, তাই মানুষের সবদিক্ দিয়া তাঁহাকে সত্য করা দরকার। আমি কি বলিব,—এ বোধ হয় আমাদের দেশের একটা অন্তরতম আকাঙ্ক্ষার কথা। সবাই বলে, বৈষ্ণব হোক্, শাক্ত হোক্ যে হোক্, সকলেরি বিশ্বাস যে অনন্ত ভগবান ঐ রূপে দেখা দেন্—তিনি চোখে দেখিবার, কাণে শুনিবার, শরীর দিয়া স্পর্শ করিবার জিনিস। বাউলের গানেও এই কথার নানা আভাস আছে।

এই তো গেল নানা মূর্ত্তির মধ্যে ভগবানকে পূজা করিবার তত্ত্বের মোট কথাটা। কিন্তু এ সমস্ত কথার মধ্যে একটা কূটতর্ক এবং সেই সঙ্গে একটা জিনিসের সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধধর্ম্মী অন্য জিনিসের খিচুড়ি পাকানোর একটা গলদ্ কাহারো চক্ষে বড় পড়েনা। শিল্পসাধনাকে আর আধ্যাত্মিক সাধনাকে এক করিয়া ফেলিবার কোন কারণ আমি তো খুঁজিয়া পাই না—অথচ যাঁহারা পৌত্তলিকতাকে যুক্তির দিক হইতে দাঁড় করান, তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্রই ঐ খানে। শিল্পী ভাবকে রূপ দেয়, তাহাতেই তাহার আনন্দ—কারণ অনির্দ্দিষ্টকে নির্দ্দিষ্ট রূপে আনিতে পারিলে তাহার সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার কি তাহাই লক্ষ্য? আধ্যাত্মিক সাধককে যে সকল রূপরসকে অনন্তের মধ্যে বিলীন করিয়া, ক্রমাগত তাহাদের বন্ধনকে শিথিল করিয়া দিতে হয়—সুতরাং তাঁহার সাধনা তো শিল্পরচনার সাধনার মতো নয়। এই কারণেই যথার্থ সাধকের কাছে বাহিরের বিগ্রহের পূজাঅর্চ্চনার চেয়ে অন্তরের মধ্যে বিশুদ্ধ ভাবকে পাইবার চেষ্টা বেশি প্রয়োজনীয়; জগতের সকল মহাপুরুষ তাই বাহিরের দিক্ দিয়া কোন ক্রিয়াকর্ম্ম করিলে আধ্যাত্মিক জীবনলাভের পক্ষে কোন সহায়তা হইতে পারে, এ কথা মূলেই স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু হইয়া আপনার মধ্যে আপনার আত্মাকে দেখিতে হইবে। বিষয়ের আকর্ষণপাশ হইতে, নাম ও রূপের বহুত্বের বিভ্রান্তি হইতে আত্মাকে বিযুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে, যখন সেই বিরতির সেই বিযুক্তভাবের সাধনা স্বাভাবিক হইয়া আসিবে, তখনই ভিতর হইতে এই একটি প্রত্যয় হইবে যে বাহিরের চঞ্চল রূপ রস যে সমস্তই অপরূপের ইঙ্গিত মাত্র! তখনই তো বিষয়বন্ধন ঘুচিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দময় হইয়া উঠিবে। কিন্তু বাহ্যবিষয়ের দিক্ হইতে সুরু করিয়া ভিতরের এই বিযুক্তভাব কি ঘটানো চলে? সকল মহাপুরুষ, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই কথা বলিয়াছেন যে ভিতর হইতে পরিশুদ্ধ হইলেই তবেই বাহিরের সঙ্গে বিযুক্তভাব ঘটে; তখনই জলে পদ্মপত্রের মত যথার্থ ভাবুক সকল বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকেন অথচ কিছুতেই লিপ্ত হইতে চাহেন না।

সুতরাং প্রতিমাপূজার দ্বারা কি কখনও ভিতরের পরিশুদ্ধি হয়?

অবশ্য আমাকে এখানে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে যে শিল্পের সাধনাও কোন কোন সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয় সত্য। আমাদের দেশে অন্ততঃ তাহা কোন কোন কালে হইয়াছে। তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যই সকল আকারের মধ্যে আকারাতীতের ছায়া ফেলে—সে আকারকে কোন স্থায়ী সীমার বেষ্টনের মধ্যে বাঁধা দিতে চায়না। আমরা যখন ইমারতের সৌন্দর্য্য দেখি, তখন তাহা কি? না, পাথরের মধ্যে ইমারতকার এমন একটা গতি ও ভঙ্গী সঞ্চার করিয়াছে, যাহাতে তাহার মধ্যে একটা বৈচিত্র্যলীলা ঘটিয়াছে, সে অংশের সঙ্গে অংশকে মিলাইয়া সুসঙ্গতিময় একটি সৌষ্টব হইয়া উঠিয়াছে। কঠিন পাথরে সেই গতিলীলাটি ছিল না। লম্বা কাণ, কুব্জ পৃষ্ঠ এই জন্য অসুন্দর, কারণ সে গতির লীলাকে ব্যাঘাত করে, এক জায়গায় স্তূপ হইয়া দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। একরূপ হইতে অন্য রূপে, এক আকার হইতে অন্য আকারে ক্রমাগত প্রবাহিত করিয়া দিবার উপায়ই সৌন্দর্য্য। সুতরাং শিল্পীর সাধনাতে কখনো কখনো ভাব যেমন "রূপের মাঝারে অঙ্গ" পাইতে চায়, রূপ তেমনি "ভাবের মাঝারে ছাড়া" পাইতে চায়।

আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে এক সময়ে ভক্তি যখন নানাভঙ্গিমাময় রূপে লীলায়িত হইয়াছিল, তখন অনেক প্রতিমাশিল্প আমাদের দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং ভক্তির অনেক উচ্ছ্বাস তাহাদের মধ্যে আকার পাইয়াছে। কিন্তু তাহাকে আমরা যেন শিল্পের তরফ হইতেই দেখি এবং আলোচনা করি, যেমন কোন কোন ইংরাজ এখন ভারতবর্ষীয় শিল্প লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কোন কলারসজ্ঞ যদি প্রতিমাশিল্পকে আধ্যাত্মিক সাধনার সহায় মনে করেন, তবে তিনি তাহাকে প্রাণে মারিবেন নিশ্চয়।

তবে বৈচিত্র্যের সমস্যার মীমাংসা কোথায়? ইউরোপে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যে বহুবাদ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মীমাংসা নাই, এদেশের আধুনিক প্রতিমাশ্রয়ী জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যের ধর্ম্মের মধ্যেও কোন সমাধান পাই না। এই দুই দিক্ দিয়াই বৈচিত্র্য কেবল বিভ্রান্তির দিকে লইয়া চলে, সমস্যা তাই সমস্যাই থাকিয়া যায়। সুতরাং আর কোন্ রাস্তা আছে যাহার মধ্য দিয়া গেলে আমরা অখণ্ড হই—আর আমাদের ভিতর কার দ্বন্দ্বগুলা আমাদিগকে দশ দিকে টানাহেঁচড়া করিয়া তুমুল সোরগোল বাধাইয়া দিবে না?

আমি তো প্রবন্ধের আরম্ভেই বলিয়াছি যে পোয়েটিক্যাল আইডিয়া লিজম্ বল আর যাই বল—একটিমাত্র রাস্তা আছে, সে বড় রাস্তা—সে রাস্তায় যুগ হইতে যুগান্তর পর্য্যন্ত সমস্ত মানবযাত্রী চলিয়াছে। সে কোনো সূক্ষ্মতত্ত্বের রাস্তা নয়, কোন সূক্ষ্মভক্তির রাস্তাও নয়। সে রাস্তায় জাতির সঙ্গে জাতি, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম, তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্ব, আর্টের সঙ্গে আর্ট মিলিতে চলিয়াছে—বৈচিত্র্যবিভীষিকাময় রাত্রির অন্ধকারের প্রান্তসীমায় ধ্বজমালাশোভিত সেই মহামানব-পথের স্বর্ণতোরণে যে দুএকজন সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষ আধুনিক শতাব্দীতে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাদেরি আহ্বানকে অন্য সমস্ত কথা ঠেলিয়া মানিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আজ দুএকজন লোকে সে পথ দেখিতে পাইতেছেন জানি, তথাপি সেই পথই পথ এই বিশ্বাসে আমাদের বিশিষ্টতার বক্র কুটিল গলিঘুঁজি অতিক্রম করিতেই হইবে।

সুতরাং বৈচিত্র্যের সমস্যার খুব সরল সমাধান এক জায়গায় আছে। সে ঐ কথা বলা, যে সব যেখানে সেই খানেই চল—অর্থাৎ সেখানে সকল বৈচিত্র্য থাকিলেও সমস্যা নাই, সমস্তই সরল ও সীধা। অখণ্ডতার জীবন ভয়ানক সরল, কিন্তু সেই কারণেই তাহাকে লাভ করা এমন কঠিন। ঠিক যেমন বিশ্বপ্রকৃতি—তাহা অত্যন্ত সহজ, কারণ তাহার মধ্যে যে নানাশক্তির খেলা আছে তাহাতো চোখেই পড়ে না। যেখানে সামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে দ্বন্দ্বের চিত্র তো আর দেখা যায় না। ভাষা যে জানে তাহার পক্ষে ভাব বুঝিতে ক্লেশ নাই, কিন্তু যাহার কাছে ভাষাটাই অপরিচিত, তাহাকে যে প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে মারামারি করিতে হয়।

আমি প্রবন্ধারম্ভে প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের একটুখানি তুলনা করিয়াছি। ইহা আমাকে মানিতে হইবে যে প্রাচীন কালে যে সরল সমগ্রতা মানুষের মধ্যে ছিল, সমাজে ছিল, শিল্পসাহিত্যে ছিল তাহাকে আর আমরা পাইব না। জ্ঞান বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, ধর্ম্ম সমস্তই এখন অত্যন্ত জটিল। কিন্তু তথাপি সেই প্রাচীন আদর্শটিকেই আধুনিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। এ ভয়ানক কঠিন কাণ্ড। মানুষের মধ্যে সকল বৈচিত্র্যের স্থান থাকিবে, অথচ বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্বরূপ কোথাও থাকিবে না; মানুষ একেবারে সরল অখণ্ড মানুষটি হইবে, এ যে ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। অথচ এই শক্তিকেই সহজ করিবার কাজে এই অসাধ্যকেই সাধ্য করিবার কাজে আধুনিক মানুষ লাগিয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে কোন শাখাপথে গেলে কেবল বিশিষ্টতাই জাগিবে, অখণ্ডতা লাভের একমাত্র প্রশস্ত রাজপথ আছে, যেখানে সমস্ত মনুষ্যত্বের পূর্ণ ভাবটি সম্পূর্ণ রকমেই জাগ্রত।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

উৎসবযাত্রী।*

যাদৃক্প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়।
স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রতীতপ্রত্যগ্দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে॥
আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈর্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায়।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়॥

ভাগবত ৮-৩-১৭-১৮।

মহতঃ পরিতঃ প্রসর্পতস্তমসো দর্শনভেদিনো ভিদে।
দিননাথ ইব স্বতেজসা হৃদয়ব্যোম্নি মনাগুদেহি নঃ॥
ন বয়ং তব চর্ম্মচক্ষুষা পদবীমপ্যপবীক্ষিতুং ক্ষমাঃ।
কৃপয়াভয়দেন চক্ষুষা সকলেনেশ বিলোকয়াশু নঃ॥

উপমন্যু।

যিনি স্বয়ং মুক্ত ও পরম করুণাময়, এবং সেই জন্যই আমার ন্যায় পশুগণ প্রপন্ন হইলে যিনি তাহাদের বন্ধনপাশ মোচন করিয়া দেন, এবং যিনি অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত শরীরীর অন্তঃকরণে প্রতীত হইয়া থাকেন, হে ভগবন্, সেই পরম মহান্ তোমাকে নমস্কার! নিজের দেহ-পুত্র, জ্ঞাতি-বন্ধু ও গৃহ-বিত্তে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিরা যাঁহাকে লাভ করিতে পারে না, যিনি গুণ-সঙ্গবিবর্জ্জিত, এবং মুক্তাত্মা ব্যক্তিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণে চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরকে নমস্কার! হে ভগবন্ চতুর্দিকে মহাতিমিরজাল প্রসার লাভ করিয়া দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, অতএব তুমি তাহা দিনকরের ন্যায় স্বকীয় জ্যোতির দ্বারা অপনয়ন করিবার জন্য আমাদের হৃদয়াকাশে ঈষৎ উদিত হও! হে মহেশ্বর, আমরা এই চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা তোমার পথও ত দেখিতে সমর্থ হই না; অতএব সত্বর করুণা করিয়া তুমিই তোমার অভয়প্রদ নয়নের দ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর!

পূর্ব্বাকাশ কিঞ্চিৎ অরুণোজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও পশ্চিম গগণের তিমিরাবরণ তখনও অপগত হয় নাই, বিহঙ্গমেরা কুলায় পরিত্যাগ করিয়া তখনও বহির্গত হয় নাই, কেবল কলকূজনের দ্বারা দিবসলক্ষ্মীর আগমনবাণী ঘোষণা করিতেছিল; ঠিক সেই সময় হইতে আজ এই দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী আশ্রমভূমিতে মঙ্গলশঙ্খঘণ্টাধ্বনির সহিত উৎসব আরব্ধ হইয়া সমগ্র দিবস ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছে, ইহা ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে চরম শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছে; নানা স্থান হইতে সমবেত জনসঙ্ঘের আনন্দকোলাহল এখনও শ্রবণকুহর বধির করিতেছে। কিন্তু আর অধিকক্ষণ নহে, শেষ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতে দেখিতেই জনসঙ্কুল প্রান্তর শূন্য হইয়া যাইবে, রাত্রির বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার গম্ভীরতা ও নিস্তব্ধতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিবে; পরদিন প্রভাতে আর কিছুই নয়ন-গোচর হইবে না। এই উৎসবের কি ইহাই পরিণাম?

আমি জানি এই উৎসবের জন্য কত দিন হইতে কত আলোচনা, কত কল্পনা কত বিবেচনা, কত উদ্যোগ ও কত আয়োজন হইয়াছে। কত জনে কত পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি এই কয়েক ঘণ্টার নৃত্য-গীত বাদ্য-কৌতুকেই পরিসমাপ্ত? সাধারণ উৎসব অপেক্ষা কি ইহার কোনো বিশেষত্ব নাই? যদি তাহাই হয়, যদি আমরা ইহার এইমাত্র প্রয়োজন মনে করিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে আমাদের গুরুতর ভ্রম করা হইতেছে, আমরা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। যিনি এই উৎসবের প্রবর্ত্তয়িতা, তাঁহার হৃদয়ের এই অভিপ্রায় ছিল না; তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন এক, আর আমরা বুঝিতেছি এক; উভয়ের মধ্যে মহান্ ভেদ থাকিয়া গিয়াছে।

প্রদীপের অগ্নিশিখা জ্বলিতে জ্বলিতে যখন কমিয়া হীনপ্রভ হইয়া আসে, তাহার তৈল-বর্ত্তিকা শেষ হইয়া পড়ে, তখন পুনর্ব্বার তাহাকে সমুদ্দীপ্ত করিতে হইলে নূতন তৈল, নূতন বর্ত্তিকার প্রয়োজন হয়; অন্যথা সে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া আর কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, গৃহাভ্যন্তর নিবিড় তিমিরজালে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু স্বল্পমাত্র প্রয়াস করিয়া নূতন তৈল নূতন বর্ত্তিকা সংযোগ করিলে আবার কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ প্রদীপই উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিকের সমস্তই উদ্ভাসিত করিয়া দেয়; এবং ইচ্ছা করিলে তখন সেই দীপ্যমান প্রদীপ হইতে অন্য শত-শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে। এইরূপই দীর্ঘ সংবৎসরকাল ব্যাপিয়া সংসারের বিবিধ কার্য্য বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে ভক্ত সেবকের অপরিণত ক্ষীণদুর্ব্বল ভক্তিশিখা যখন নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া উঠে, হৃদয়মন্দিরে যেন ঘোর তিমিররাশির বিভীষিকা আসিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করে, তখন ভক্তগণসম্মিলনে ভগবদ্গুণকীর্ত্তন ও ভগবচ্চরণ-সেবনরূপ অভিনব তৈল-বর্ত্তিকার ব্যবস্থার জন্য এই উৎসবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভক্তগণ ভগবৎসেবকগণ এই উৎসবের প্রভাবে কালে ক্রমে ক্রমে মহামহোৎসবের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে না হইতেই এই প্রবর্ত্তমান উৎসব বিলীন হইয়া যাইবে, এই রমণীয় জলন্ত দীপাবলী নির্ব্বান হইয়া যাইবে, দিগন্তর অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া ভ্রান্ত পথিকের ভীতি উৎপাদন করিবে, কিন্তু ইহা হইতে শ্রীভগবদনুগ্রহে ভক্তজনের হৃদয়মন্দিরে এমন এক মহোৎসবের উৎপত্তি

* বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমের উৎসবে ৭ই পৌষে পঠিত।

হইবে, যাহার অবসান নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অথবা প্রতিবন্ধ নাই, যাহা স্থির এবং শাশ্বত যাহার মঙ্গলদীপ-জ্যোতি নির্ব্বাণ হইবার নহে, এমন কি ম্লান হইবারও নহে, তাহা স্থির-শান্ত-ভাবে দিনযামিনী জ্বলিতে থাকিবে, সে জ্যোতি ক্ষণিক উৎসবের দীপজ্যোতির ন্যায় উত্তপ্ত নহে, তাহা স্নিগ্ধ ও শীতল—হৃদয়ের সমস্ত তাপকে অপসারিত করিয়া দেয়, আর ভক্ত তখন সেই মহামহোৎসবের দেবতার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া, এবং তাহা দ্বারাই পরম লোক, পরম সম্পৎ, পরম আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থম্মণ্য হন, নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হন, শোক-তাপের অধিকার সীমা অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়। জীবনের যাহা চরম উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার ভাগাদ্বারাই পরিপূর্ণ হয়। পর্ব্বতনির্ঝরপ্রস্রবণের জলপ্রবাহকে মহাসমুদ্রে বহন করাই যেমন স্রোতস্বতীর শেষ কার্য্য, সেইরূপ ভক্তজনকে ঐ মহামহোৎসবে বহিয়া লইয়া যাওয়াই এই উৎসবের পরম প্রয়োজন। ভগবান প্রসন্ন হউন, তিনি করুণা করুন, উৎসবের এই প্রয়োজন যেন সিদ্ধ হয়!

এই শ্রীমন্দিরে এতাদৃশ উৎসব এই নূতন নহে; এবং হে আশ্রমবাসী বালকগণ, বন্ধুগণ ও সমবেত সদাশয় শ্রোতৃমহোদয়গণ, আমরাও সকলে এই উৎসবে নূতন আগমন করি নাই, আমাদের মধ্যে অনেকে বহু বৎসর যাবৎ এই স্থানে বাস করিতেছেন, ও বহু বৎসর হইতে ঠিক এইরূপেই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন; এবং অপরেরাও—যাঁহারা এখানে বাস করেন না, তাঁহারাও—এই বা এতাদৃশ অপর কোন উৎসব অথবা উৎসবসদৃশ কার্য্যে সম্মিলিত হইয়াছেন। আমরা সকলেই এক লক্ষ্যে চলিয়াছি। আমি বলিতেছি "এক লক্ষ্যে," কেননা, দুই লক্ষ্য নাই। নদীসমূহ যেমন—উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম যে-কোন দিকেই যাউক না,—এক অখণ্ড মহাসমুদ্রের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ—যে যেখানেই কেন থাকি না,—সেই এক মহামহোৎসবের দেবতার দিকে চলিয়াছি। চলিতে আরম্ভ করিয়াছি বহু দিন, পথও অতিদীর্ঘ ও দুর্গম সন্দেহ নাই; অতএব লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া সত্বরে সম্ভবপর নহে ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু তথাপি হৃদয়মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হয়, ও হওয়া আবশ্যক—"কতদূর চলিয়াছি—কতদূর অগ্রসর হইয়াছি? এবং কিরূপভাবে অগ্রসর হইতেছি? অথবা, পদক্ষেপ করিতেছি সত্য. কিন্তু কারণবিশেষে পশ্চাদ্দিকে ত ফিরিয়া আসিতেছি না? কিংবা, যথারীতি পদক্ষেপ করা হইতেছে ত?" সামান্য লৌকিক পথের পথিককেও কত সাবধানে, কত বিবেচনায় পদবিক্ষেপ করিতে হয়, অলৌকিক দিব্য পথের পথিককে যে আরো অধিকতর সাবধান, অধিকতর বিবেচক হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমি লৌকিক পথকে "সামান্য" বলিয়াছি, কেননা তাহা বাহ্য। যাহা বাহ্য, তাহা আন্তর অপেক্ষা সহস্রগুণে সুকর—সহজ। কোনো বলশালী পুরুষ হয়ত ধাবমান বেগশালী অশ্বকে প্রতিবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি উদ্দীপ্ত কাম বা ক্রোধের বেগ প্রতিবদ্ধ করিতে হয়ত সমর্থ হইবেন না। কোন বীরপুরুষ সমরভূমিতে সহস্র সহস্র সেনাকে পরাভূত ক'রতে পারেন, কিন্তু তিনি হয়ত হৃদয়ের অসৎ প্রকৃতিগুলিকে নিবৃত্ত করিতে পারেন না। আমাদের সেই মহামহোৎসবের দেবতার দিব্য পথ আন্তর, এবং সেই জন্যই তাহা বাহ্য লৌকিক পথ অপেক্ষা স্বভাবতই দুর্গমতর। হে দিব্য পথের পথিকশ্রেণী, যদি সত্যসত্যই সেই মহামহোৎসব-দেবতাকে লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল বলবান্ হইলে চলিবে না, অতি-বলবান্ হইতে হইবে; বীর হইলে চলিবে না, মহাবীর হইতে হইবে।

আমরা এই দগ্ধ উদরের পূরণের জন্য প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সামান্য-অতিসামান্য ক্ষণিক-অতিক্ষণিক অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত শ্রম ও কত উদ্যোগ করি; কিন্তু হায়! তথাপি হয়ত তাহাও লাভ করিতে পারি না; অভাবে-অভাবে জর্জ্জর হইয়া পড়িতে হয়। আর যে অর্থ অচ্যুত শাশ্বত, যাহার লাভে আর কোন লাভের প্রয়োজন থাকে না, যাহার লাভে নিরবচ্ছিন্ন নিবিড়ানন্দপ্রবাহ বহিতে থাকে, এবং সেই জন্যই যাহার নাম পরমার্থ বা পরম পুরুষার্থ, তাহার জন্য কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ, কত আয়াস, কত উৎসাহ, ও কত অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। হে পরমার্থলাভেচ্ছু হৃদয়, তুমি কখন স্বপ্নেও ভাবিও না, সেই পরমার্থলাভের পথ কুসুমের ন্যায় কোমল, তুমি অনায়াসে অবলীলায় চলিয়া যাইবে। মূঢ়, তুমি চিন্তা করিয়াছ তোমার এই দৈনিক অন্নসংস্থান ও যৎসামান্য লৌকিক বিদ্যার্জ্জন অপেক্ষাও তাহা সুলভ! সান্ধ্যবায়ুসেবনের ন্যায় তজ্জন্য কোনো প্রয়াস করিতে হইবে না, পথ ধরিলেই হইল! পথ ধরিলেই হয় বটে, কিন্তু বস্তুত তাহা ধরা চাই, তাহাতে পদক্ষেপণ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, দাঁড়াইয়া থাকিলে হয় না। মূর্খ, শ্রবণ কর, যাঁহারা সেই পরম পুরুষার্থের সংবাদ বহন করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন, তাঁহারা তাহার পথের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন। সে পথ অনায়াসে অতিক্রম করা যায় না। তাঁহারা বলিয়াছেন—"দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" (কঠ·১·৩·১৪)—মেধাবি-

গণ তাহাকে দুর্গম পথ বলিয়া থাকেন। অতএব হে দুর্গমপথের পথিক, তোমাকে বহু বাধা, বহু বিপত্তি, বহু কণ্টক, বহু গহণ-অরণ্য, ও বহু দস্যু-তস্কর অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। ইহা দুর্ব্বলের কার্য্য নহে। হে যাত্রী, শ্রবণ কর, বিশ্বাস কর, যাঁহারা সেই পথে গমন করিয়া অভীষ্টদেবতার চরণকমললাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী পথিকগণকে সাবধান হইবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (মুণ্ডক-৩-২-৪)। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—"হে দিব্যপথের পথিকশ্রেণি, যদি সত্যসত্যই সেই মহামহোৎসব-দেবতাকে লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল বলবান্ হইলে চলিবে না, অতিবলবান্ হইতে হইবে; বীর হইলে চলিবে না. মহাবীর হইতে হইবে।" এবং সেই-জন্যই বলিতেছিলাম, মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হয় "কত দূর চলিয়াছি—কত দূর অগ্রসর হইয়াছি?"

হে পান্থ, তুমি মনেও স্থান প্রদান করিও না, তোমার এই পথের কণ্টকজাল বা বিপৎসমূহ অপর কেহ আসিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিবে, অথবা অন্য কেহ তৎসমুদয় উদ্ধৃত করিয়া এই পথে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তোমার গমন-সময়ে আর কোন বাধার উদয় হইবে না। এ পথ অতি-অদ্ভুত, এই পথের প্রত্যেক পথিকেরই সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বদাই দস্যুতস্কর প্রভৃতি লাগিয়া আছে, চারিদিকেই তাহারা তোমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সেই দিব্যপথের প্রবেশ-তোরণের পুরোভাগে বিবিধ কণ্টকজাল সমাহৃত করিয়া তাহারা পথিককে আক্রমণ করে, অতএব বহু পথিক সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়; কিন্তু যে সকল বীর্য্যবান্ পথিক বলপ্রভাবে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া পথিমধ্যে প্রবেশ লাভ করেন, তাঁহাদের বাধাশঙ্কা কমিয়া আসে, শত্রুরা তখনও তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারে, এবং তাহাতে তাঁহাদের কাহারও কাহারও অগ্রসর হওয়া প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা তখনো স্বীয় বীর্য্যপ্রদর্শনে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন, তখন আর তাঁহাদের ভয় থাকে না, তাঁহারা তখন মহারাজরাজেশ্বরের প্রাসাদচূড়ায় সমুজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করিতে পান, শত্রুগণ সেই জ্যোতির নিকট পদক্ষেপ করিতে পারে না। হে পথিক, সেই পথ এইরূপই দুর্গম এবং তাহাতে যাইতে হইলে এইরূপই বীরত্বের প্রয়োজন। তোমাকে তাহাতে চলিতে হইবে। সেইজন্যই মনের মধ্যে প্রশ্ন হয় "কতদূর চলিয়াছি, কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, শত্রুকে পরাভূত করিতে পারিয়াছি কি না, কণ্টকজাল উদ্ধৃত হইয়াছে কি না!"

কৃষক, তোমাকে শস্যোৎপাদন করিতেই হইবে, নতুবা তোমার "মহতী বিনষ্টিঃ" (কেন ২-৫)—মহাবিনাশ। তুমি ক্ষেত্র পাইয়াছ, লাঙ্গল পাইয়াছ, বীজ পাইয়াছ, বীজ বপনও করিয়াছ; কিন্তু ক্ষেত্র কর্ষণ কর নাই, তৃণ-কণ্টক অপনয়ন কর নাই, সার প্রদান কর নাই, জলসেক কর নাই, এবং অঙ্কুরের রক্ষণোপায় কর নাই; অথচ তুমি তোমার গৃহদ্বারে বসিয়া প্রভূত শস্যের আশা করিতেছ! যাও যাও ক্ষেত্র কর্ষণ কর, তৃণ-কণ্টক অপনয়ন কর, জলসেচন কর, এবং বৃতিবন্ধন কর। কেবল বীজবপন করিয়া কি হইবে?—হে দিব্যপথের যাত্রী, আমরা কি কেবল কৃষককেই এই উপদেশ দিয়া বিরত হইব, আমরা কি একবার আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিব না? অকৃষ্ট ও অপরিষ্কৃত ক্ষেত্রে বীজবপনকারী কৃষকদের ন্যায় আমরাও ত ব্যর্থ আশায় কালাতিপাত করিতেছি না? আমাদের মহামহোৎসব-দেবতার চরণকমলগামী এই যে হৃদয়পথ—যাহাতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি বলিয়া হয়ত অভিমান করিতেছি, তাহা কি পরিষ্কৃত করিয়াছি? তাহার সমস্ত কণ্টক, সমস্ত শত্রু, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অপসারিত হইয়াছে কি?

একবার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করা যাউক তাহার অবস্থা কি। আমরা আমাদের দৈনিক কার্য্যাবলীর দ্বারা তাহাকে অধিকতর নির্ম্মল বা মলিন করিতেছি, পুণ্য বা পাপের সঞ্চয়ে তাহাকে অধিকতর শুক্ল বা কৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছি। আমরা উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযত করিয়া রাখিতেছি, অথবা সেইদিকে কোনো লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া উদ্দামতর করিয়া তুলিতেছি। ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেমন নির্ব্বাণ না হইয়া ক্রমশই উদ্দীপ্ততর হইয়া উঠে, সেইরূপ ভোগের দ্বারা যাহার কখনো নিবৃত্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর প্রবল বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছা না করিলেও যেন বলপূর্ব্বক লোককে পাপকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই "মহাশনো মহাপাপ্মা" মহাবৈরী কামকে, আমরা প্রশ্রয় প্রদান করিয়া সেবন করিবার ইচ্ছা করিতেছি, অথবা দূরে পরিহার করিবার প্রযত্ন করিতেছি। এই দগ্ধ উদরের জন্য আমরা জীবহিংসাকে অদ্ভুত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কর্ত্তব্যনিশ্চয়ে পোষণ করিতেছি, অথবা পরিত্যাগ করিয়াছি। কত আর বলিব, রাগ, দ্বেষ, লোভ-মোহ, ঈর্ষা-অসূয়া, দম্ভ-দর্প, ও অভিমান প্রভৃতি অন্তঃকরণ হইতে বিলীন হইতেছে, অথবা আরো দৃঢ়মূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

হে মহামহোৎসবদর্শনের যাত্রী, উৎসব-দেবতার হৃদয়-

পথের ইহারাই কণ্টক, ইহারাই শত্রু, ইহারাই বাধা, এবং ইহারাই বিপত্তি; আবার ইহাদেরও শাখা-প্রশাখা, সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে। ইহারা কখনই তোমাকে তোমার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে দিবে না; এমন কি যদি তুমি ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো চেষ্টা না কর, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তুমি তোমার লক্ষ্য দিক্‌ও ভুলিয়া যাইবে; পুরোভাগে মহাশৈলের বাধা-প্রাপ্ত নদী-প্রবাহের ন্যায় তুমি তখন বাধ্য হইয়া পুরোবর্ত্তী পথ পরিত্যাগ করিয়া, গম্য দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে এবং অপরদিকে উদ্দামভাবে ছুটিয়া চলিবে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম ঐ পথ বড় দুর্গম, হৃদয়পথ বড় সহজ নহে। আবার ঐ একটিমাত্র ছাড়া অপর পথও নাই। যদি তুমি মহামহোৎসব দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তোমাকে সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে; হৃদয়-পথকেই পরিষ্কার করিয়া যাইতে হইবে; এবং সকলেই ইহারই দ্বারা গমন করিয়া থাকেন।

এখন ভাবিয়া দেখ, যে পথ এত দুর্গম, তাহাকে সুগম করিয়া লইতে হইলে কত যত্ন, কত প্রয়াস, কত অভ্যাস, কত উদ্যম, কত উৎসাহ, কত শক্তি ও কত অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা। এবং তাহার উপর যদি আমরা সত্বরেই তাহাকে সুগম করিয়া লইতে চাহি, তাহা হইলে কতদূর তীব্র সংবেগ (পাতঞ্জলদর্শন (১-২১) থাকার প্রয়োজন। এই জন্যই মনের মধ্যে প্রশ্ন হয়—"কতদূর চলিয়াছি? কিরূপ চলিতেছি? চলিতেছি ত সত্য, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ত চলিতেছি না?"

কিন্তু যদিও সেই পথ এতাদৃশ দুর্গম, তথাপি চিরদিন সেইরূপ দুর্গম থাকে না। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিজের বল-বীর্য্য ও যত্ন-অভ্যাসে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই—কিঞ্চিৎ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই ক্রমশ তাহা সুগম হইয়া আসে। আমরা যদি আমাদের রাজরাজেশ্বরের মহামহিমান্বিত পবিত্র নাম যথাযথরূপে উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হই,—যদি তাহার মধ্যে কোনোরূপ কপটতা বা প্রতারণা না থাকে, তাহা হইলে দস্যুদল পথ পরিত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দূর-দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করিবে। আমরা যদি সত্য-সত্যই তাঁহাকে শরণ গ্রহণ করি, তাঁহায় প্রপন্ন হই, তাঁহাকে যদি হৃদয়ের সহিত নিবেদন করি—'হে ভুবনেশ্বর, আমি তোমার; আমি তোমার চরণকমলের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি! কিন্তু পথ দুর্গম, তোমার নিকটে যাইতে পারিতেছি না।' তাহা হইলে তিনিই তখন আমাদের নিকট তাঁহার বিজয়িনী সেনা প্রেরণ করিবেন, এবং তাহার আগমনে ক্রমে ক্রমে পথের সমস্ত বাধা সমস্ত বিপত্তি তিরোহিত হইয়া যাইবে। হৃদয় তখন নির্ম্মল হইয়া উজ্জ্বল হইবা পবিত্র হইয়া উঠিবে, এবং আমরাও তখন আমাদের চিরাভিলষিত মহা-মহোৎসব-দেবতার চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিব।

প্রপন্ন না হওয়া পর্য্যন্তই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত খেদ ও যত কষ্ট; কিন্তু একবার প্রপন্ন হইতে পারিলে আর কোন ভয় বা কোনো চিন্তার কারণ থাকে না। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে কতবার কত ভক্তকে শুনাইয়াছেন, তাঁহার ভক্তের কখনো নাশ নাই। আবার ইহাও বলিয়াছেন—"যদি কেহ আমাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করে, তবে পাইবেই, ইহার অন্যথা কখনো হয় না"—(ভক্তিসন্দর্ভ) আবার এক স্থানে বলিয়াছেন—

"যাহারা নিজের স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব, গৃহ-বিত্ত ইহলোক, পরলোক এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি তাহাদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারি?" (ভাগ-৯, ৫, ৬৫)।

হে ভক্তবৎসল, তোমার শ্রীমুখচন্দ্রের আরো কত কত মর্ম্মস্পর্শী মধুর উদার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু হায়! এখনো হৃদয় তোমার চরণকমলের দিকে উন্মুখ হইল না! হে অপরিসীম করুণাসাগর, তোমার পরম করুণার পরিচয় প্রতিপদেই প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি, কিন্তু এই বজ্রকঠোর পাষাণময় হৃদয়ের তথাপি চৈতন্যসঞ্চার হইল না! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এইরূপ কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, আবার এখনো কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রাণ-মন-হৃদয় ভরিয়া তদ্গতভাবে অমৃতমধুর নামগাথা কীর্ত্তনে সমর্থ হইলাম না! ক্ষণিক ভোগবিলাসের চিন্তায় কত সময় যাপন করিতেছি, কিন্তু তোমার শাশ্বতসুখদ চরণারবিন্দ ধ্যান করিবার অবসর হয় না; অবসর হইলেও তোমার চরণারবিন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভোগবিলাসেই ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া যাই! হে অন্তর্য্যামিন্, আমি তোমার দাস না হইয়া কামনার দাস হইয়াছি, এবং তোমার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া কামনার নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছি। হায় রে! কেহ কোন দিন সামান্যমাত্র অর্থ প্রদান করিলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু হে জীবনস্বামী, তুমি যে এই ভূগোলকে ধারণ করিয়া, সমীরণকে সঞ্চারিত করিয়া, মাতার ন্যায় কোমল অঙ্কে আশ্রয় প্রদান করিয়া প্রতিনিয়তই আমাদের জীবনকে রক্ষা করিতেছ, ভূগোল বিধৃত না হইলে, সমীরণ সঞ্চারিত না হইলে, তোমার নিরাতঙ্ক কোমল অঙ্কের আশ্রয় না পাইলে, আমরা যে তৎক্ষণেই মরণপ্রাপ্ত হই, তথাপি তোমার অনুগত হইতে পারিলাম না! কাক-কুক্কুরেরও যে গুণ রহিয়াছে, আমার তাহাও নাই। কামনার কবলে পতিত হইয়া মনুষ্যত্ব

পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি। হে বরপ্রদ, তুমি সকলেরই অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাক, আজ এই অধমেরও অভিলাষ পূর্ণ কর,—এই অধমের হৃদয়ে আর যেন বিষয়-কামনার উদ্রেক না হয়, এবং এই যে বিষয়োপভোগে পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি, তাহা যেন তোমারই চরণকমলে গমন করে। হে পতিতপাবন, এই মহাপতিতকে উদ্ধার করিতে পবিত্র করিতে তোমা ভিন্ন আর কেহ পারিবে না। হে অনাথবন্ধু, আজ এই উৎসববাসরে তোমার চরণপ্রান্তে এই দীনের দ্বিতীয় প্রার্থনা এই,—আমি যেন তোমার ভৃত্যশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া তোমার চরণসেবার অধিকার-সৌভাগ্য লাভ করি, এবং শুষ্ক-কঠোর হৃদয়-ক্ষেত্রকে সরস-কোমল করিয়া তোমার চরণকমলের শুদ্ধা ভক্তির বীজ বপন করিতে পারি। তোমার এই উৎসব-মন্দিরে সমাগত লোকসঙ্ঘ যেন তোমার অনুগ্রহে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। হে রাজরাজেশ্বর, জগতের সমস্ত লোকেরই হৃদয়-বেদিকায় যেন তোমারই রাজসিংহাসন বিরাজিত হয়। সর্ব্বত্রই যেন তোমারই বিজয়বৈজয়ন্তী উত্থিত হইতে থাকে, এবং সকলেই যেন তোমারই বিজয়গাথা গান করে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে কোন এক বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীগ্রহণ করিতে দেখিয়া আদি সমাজের একজন উপাসক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন এবং সেই পত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই পত্রে কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কঠোর ভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত করা সম্ভবপর হইল না।

পত্রলেখক মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আদি সমাজের বেদীতে একদা কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর আচার্য্যেরা বসিয়াছেন। তিনি জানেন আদি ব্রাহ্মসমাজের মাননীয় সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য স্থানের বেদীতে বসিয়া যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজ সেগুলিকে আদরের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ উপদেশ দিবার অধিকার আর কাহারও নাই ইহাই যদি আদি সমাজের মত হইত তবে তাঁহার উপদেশগুলিকে এই সমাজের সাহিত্য বলিয়া গণ্য করা সম্ভবপর হইত না।

বেদীগ্রহণসম্বন্ধে একদিন ব্রাহ্মসমাজে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানি। সে সম্বন্ধে পিতৃদেবের পত্র পাঠ করিলেই জানা যাইবে যে, অব্রাহ্মণ বা উপবীতত্যাগী আচার্য্য বেদীগ্রহণের অধিকারী নহেন এরূপ প্রস্তাব তাঁহার ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ, উপবীতধারী বা উপবীতত্যাগী সকলেই যোগ্যতা অনুসারে বেদীর কার্য্য করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অপরপক্ষে যে অনৌদার্য্য ছিল তাহা তাঁহার ছিল না।

বস্তুত সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ থাকা ভাল কি মন্দ এবং সেই ভেদসূচক চিহ্নধারণ উচিত কি অনুচিত তাহা সমাজতত্ত্বের তর্ক। প্রতিমাপূজার দ্বারা ব্রহ্মের ধারণাকে সঙ্কীর্ণ না করিয়া আত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপাসনার সাধনা করাই ব্রাহ্মের লক্ষণ।

এ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়কে আমরা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন বলিয়াই তৎকালীন হিন্দুসমাজ তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উপবীত ছিল সুতরাং সমাজব্যবহারে তিনি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার এরূপ আচরণ ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া তর্ক করা বাহুল্য কিন্তু এই কারণেই তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না ;এমন কথা কে বলিবে ?

পত্রলেখক মহাশয়ের জাতি কি জানি না, কারণ তিনি নাম দেন নাই। যদি তিনি ব্রাহ্মণ না হন এবং তৎসত্ত্বেও যদি ব্রাহ্মসমাজের উপনিষৎমূলক উপাসনায় যোগ দিতে তাঁহার কোনো বাধা না থাকে তবে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যকেই বা কেন ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও আচার্য্যের মধ্যে শ্রেণীগত কোনো পার্থক্য আছে এমন কথা মনেও করিতে পারি না।

বস্তুত বেদীতে অব্রাহ্মণকে বসিতে দেখিয়া উপাসকের মনে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মোপাসনার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেদনার বিষয় বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেও অনেককে দেখা যায় তাঁহারা অপর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কাহাকেও উপাসনার কার্য্য করিতে দেখিলে মনের মধ্যে সঙ্কোচ ও বিরোধ বোধ করেন। ইহাতে বুঝিতে পারি অনেক সময়ে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মকে পূজা করিতে গিয়া নিজের দলকে পূজা করিয়া বসেন। উপাসক

মহাশয়ের পত্রখানি পড়িয়া আজ আমি ভাবিতেছি আদি ব্রাহ্মসমাজে এত দিন কি আমরা ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রাহ্মণকেই উক্ত আসনে চড়াইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলাম ?

কেবল কৃত্রিম মূর্ত্তি নহে, কৃত্রিম সংস্কারও ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে প্রবল বাধা। কোথাও বা দেখি আমরা "ব্রাহ্ম" নামটাকে একটা সত্যবস্তু মনে করিয়া সেই নামের স্তবগান করিতে বসিয়াছি; কোথাও বা দেখি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট আচার-পদ্ধতিকেই মানুষের আধ্যাত্মিক সত্যের সহিত সমান আসন দিয়া তাহাকেই ব্রহ্মের নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে; কোথাও বা দেখি আচার্য্যের আসনটার প্রতি উপাসকের আসনের অপেক্ষা বিশেষ একটা পবিত্রতার আরোপ করা হইতেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে বেদীর উপরে মানুষের অভিমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে দেবতার পূজার অংশভাগী করিয়া তুলিতেছি। ইহা প্রায়ই দেখা যাইতেছে স্বয়ং সম্প্রদায়ই সেই সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার পূজাকে নানা ছদ্মবেশে যেমন করিয়া খর্ব্ব করে এমন বিরুদ্ধ পক্ষে করে না।

পত্রলেখক মহাশয় আশঙ্কা করিতেছেন আমরা আমাদের পিতৃদেবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বসিয়াছি। সে কথা আমরা স্বীকার করি না। আমরা আমাদের পিতার পথই সাধ্যমত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি—সে পথ সত্যের পথ। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনের সাধনার দ্বারা যে সত্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়া কোন বাহ্য অভ্যাসের সংকীর্ণ স্থূলত্বকেই আমরা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না।

কিছুকাল ধরিয়া আদি সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহাকেও আসন দেওয়া হয় নাই একথা আমরা স্বীকার করি। এই ব্যাপারটাকেই আমরা ব্রাহ্মসমাজের চিরকালীন বলিয়া গণ্য করিতে পারিব না। ইহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ঘাতপ্রতিঘাতের একটি ক্ষণিক পর্য্যায়মাত্র। অপরদিক হইতে উপবীতের প্রতি আঘাত যখন অসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছিল তখন এদিক হইতেও উপবীতের পক্ষে প্রতিঘাত সেইরূপ প্রবলরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। সেই বিরোধের ইতিহাসই ত সেই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই চিরদিন থামিয়া থামিয়া থাকিতে পারে না। য একোঽবর্ণঃ তিনিই ব্রাহ্মসমাজের চিরদিনের এবং তিনিই সমস্ত ক্ষণিক সংঘাত অতিক্রম করিয়া শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে ব্রাহ্মসমাজের বেদী ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসকের আসনে আপনার ধ্রুব অধিকার বিস্তার করিয়া বিরাজ করিবেন ইহাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। তিনি জাতিকুলের অভিমানকে অথবা সাম্প্রদায়িক অহঙ্কারকেই তাঁহার পূজামন্দিরের সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দিয়া কেবল তাঁহার দীনতম অবজ্ঞাভাজন ভক্তেরই হৃদয়ে আপনার আসন খুঁজিবেন ইহাই কি ব্রাহ্মসমাজে আমরা চিরদিন ঘটিতে দিব ? বেদীর কাছে কি আমরা এমন পাহারা রাখিয়া দিব যে সেখান হইতে আমাদের সকলের পিতার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ?

পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন অন্যান্য সমাজের কেহ কেহ এই ঘটনা লইয়া জয়গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন। যদি তাহা সত্য হয়, তবে সে লজ্জা আমাদের নহে, সে তাঁহাদেরই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে পদে পদে "আমরা" ও "তোমরা" বাঁধের দ্বারা বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মকেও সাম্প্রদায়িক জয়পরাজয়ের আস্ফালনের সামগ্রী করিয়া অকারণে যাঁহারা কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করিয়া তোলেন তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রাহ্ম নামটাকে গ্রহণ করিয়া উপবীতধারী অথবা অন্য কাহারও চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের ব্রাহ্ম নামই উপবীতের অপেক্ষা অনেক প্রবল ভেদচিহ্ন, এবং তাহার অহঙ্কারও বড় সামান্য নহে। অহঙ্কারের দ্বারা অহঙ্কারকে মথিত করিয়া তোলা হয়, সেই অহঙ্কারের বাধাই সকলের চেয়ে বড় বাধা এই কথা মনে নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক চাপল্যের মাঝখানে অবিচলিত থাকিয়া আমরা যেন এই প্রার্থনাকেই চিত্তের মধ্যে বিনম্রভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি যে

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম-কথা।

এই আশ্রমের আরম্ভকাল হইতেই এই একটি বিষয়ে চেষ্টা হইয়াছে যে, এখানে অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ অন্য-স্থানের ন্যায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিবেন না,— তাঁহারা ছাত্রদের ভিতরে থাকিয়া সকল কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে যোগ রাখিবেন, এবং যে সাধনা সমস্ত আশ্রমের অবলম্বনীয়, তাহা তাঁহারা কেবল ছাত্রদের কাছে দাবী করিবেন না, কিন্তু নিজেরা সর্ব্বাগ্রে তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ছাত্রগণ তাঁহাদের অনুগামী হইবে। ছাত্রে এবং অধ্যাপকে এই একটি সাধনার যোগ, ভাবের যোগ এখানে স্থাপন করিবার জন্য বরাবর চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইহা এখনও পর্য্যন্ত সার্থক হইয়া উঠে নাই।

অধ্যাপকগণের স্বভাবতই একটা দূরত্ব আছে—বয়সে, জ্ঞানে, সকল বিষয়েই তাঁহারা ছাত্রগণ হইতে স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, তাঁহাদিগকে যখন শাসন করিতে হয়, তখন তাঁহাদের স্বাভাবিক দূরত্বকে আরও একটুখানি দীর্ঘতর করিয়া দেয়। শাসনসম্বন্ধে অনেক রকমের মতামত আছে—পাশ্চাত্যদেশেও কেহ কেহ শাসন জিনিষটাকে একেবারেই বাদ্ দিয়া চলিবার প্রস্তাব করেন —তাঁহারা বলেন ওটা প্রাচীন কালের একটা বর্ব্বরতার সংস্কারমাত্র; মানুষকে যেখানে আমরা বুঝিতে পারি না বা ঠিকমত ঠিক্ জায়গায় ধরিতে পারি না সেখানে তাহাকে আঘাত করিয়া বসি। আবার ভিন্ন মতের লোকেরা বলেন যে, শাসন না হইলে মানুষের স্বাভাবিক বিক্ষিপ্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোনমতেই যায় না—মানুষের নিজেকে নিজেই শাসন করিতে হয়, কিন্তু যখন আপনাকে শাসন করিবার বয়স নয় তখন পিতামাতার, শিক্ষকের ও সমস্ত সমাজের শাসন মানিতেই হয়। শাসন ও নিয়ম আছেই, তাহাকে বাদ্ দিলে ফল কোনকালে ভাল হইতে পারে না।

যাহাই হউক এ সম্বন্ধে যখন মতবৈচিত্র্য আছে এবং পরীক্ষাও চলিতেছে এবং যখন দেখা যায় যে একেবারে শাসন বাদ্ দিয়া শিশুকে মানুষ করা কোথাও সম্ভবপর হয় নাই, তখন শাসন যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে হৃদয়ও কি করিয়া অধিকার করিবেন, সে একটা প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। পিতামাতার স্নেহ নৈসর্গিক, তাঁহারা কঠোর দণ্ড দিলেও শিশু তাঁহাদের স্নেহ সম্বন্ধে উদাসীন হয় না,—তথাপি অতিরিক্ত শাসনে অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতারা ভিতরে যতই স্নেহ করুন, ছেলেকে বাগ্ মানাইতে পারেন না, সে তাঁহাদের আয়ত্তের বাহির হইয়া যায়। যেখানে পিতামাতাসম্বন্ধেই এই ঘটনা ঘটে, সেখানে শুধু শাসনে শিক্ষক যে ছেলেকে আরও কত বিগ্ড়াইয়া দিবেন, তাহাতো বুঝিতেই পারা যাই-তেছে। সুতরাং শাসন কি পরিমাণ হইলে তাহা সীমা ছাড়ায় না এবং শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের হৃদয় কি করিলে পাওয়া যায়, তাহা খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

আশ্রমে এই সমস্যাটি সকলের চেয়ে প্রবল। ইহা দেখা গিয়াছে যে বাহির হইতে শাসন করা সহজ, কিন্তু ভিতর হইতে ছাত্রের সমস্ত হৃদয়মনকে জাগ্রত করিয়া তোলা কোনমতেই সহজ নহে। এ সম্বন্ধে লুব্ধ হইয়া কেবলি ছেলেদের মনকে বেশি করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হইয়া বসে। স্নেহ জিনিষটা মঙ্গল জিনিষটা দৌরাত্ম্য হইলে, যে বেচারার উপর তাহা প্রয়োগ করা হয় সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠে। সেও একটা জুলুম। তা ছাড়া হৃদয়ের দিকে বেশি করিয়া নজর দিতে গেলে, কোন্ সময়ে যে অলক্ষিতে শাসনে শৈথিল্য এবং প্রশ্রয় আসিয়া পড়ে, তাহাও জানা যায় না।

সুতরাং মানুষ তৈরি করা সম্বন্ধে বাঁধা প্রণালী নির্দ্দেশ করা চলেনা। মানুষ তৈরি করা সত্যকারের মানুষের উপরই নির্ভর করে। যাহার হৃদয়মন সত্যভাবে উদ্বোধিত হইয়াছে, অন্যের হৃদয়মনকে তিনিই ঠিক্ মত জাগাইয়া তুলিতে পারেন। শিখা হইতেই শিখা ধরাইতে হয়। জীবন হইতেই জীবনের জন্ম হয়।

কিন্তু এ যে ভয়ানক ফরমাস। এমন শিক্ষক কে কোথায় পাইবে? সেই কারণেই তো ভাল প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য মানুষকে এতই ভাবিতে হয়। এ সম্বন্ধে কি সে রকম কোন প্রণালীই নাই?

একটি প্রণালী এই হইতে পারে যে, অন্যের সম্বন্ধে তুমি যে জিনিষটি চাও নিজে সেই জিনিষটি নিজের মধ্যে পূর্ণভাবে দেখাও। যে অভ্যাসগুলি ছাত্রদের মধ্যে বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা কর, নিজের মধ্যে তাহার কোন শৈথিল্য ঘটিলে চলিবে না। যদি তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে শীলতা হোক্ ইহা চাও, তবে নিজের বাক্য ও ব্যবহারকে একদিনের তরেও শীলতাভ্রষ্ট হইতে দিলে চলিবে না। এমন যদি হয়, তবেই শিশুরা যেমন মায়ের মুখ হইতে ভাষা শিক্ষা করে, ছাত্রেরা সেইরূপ শিক্ষকের জীবন হইতে জীবন লাভ করিবে।

আশ্রমে পুনরায় এইরূপ একটি চেষ্টার সূত্রপাত হইতেছে। এখানে যে নিয়ম-শাসন ছাত্রদের উপরে প্রবর্ত্তিত আছে, কথা হইতেছে যে ছাত্ররা যদি তাহা স্বেচ্ছায় কেহ কেহ গ্রহণ করে, এবং অধ্যাপকগণও কেহ কেহ গ্রহণ করেন তবে সেই একটি কেন্দ্র তৈরি হইয়া উঠিবে, তখন এখানকার আদর্শটি সেইখানেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। একবার ঐরূপ একটি কেন্দ্র গড়িলে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহের ন্যায় ঐ আদর্শ কেন্দ্র হইতে সমস্ত আশ্রম শরীর বল এবং পরিপুষ্টি লাভ করিবে। আশ্রম তখন সত্যসত্যই সাধনার ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

নূতন সেসনে সকল দিক্ দিয়াই নূতন উৎসাহে এবং নবোদ্যমে কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে। নূতন পাঠ্যপুস্তক সকল এবং পাঠপ্রণালী স্থির হইয়াছে; যে সকল পুরাতন নিয়ম ও উদ্যোগ উঠিয়া গিয়াছিল বা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল সেগুলিকে পুনরায় জাগ্রত করা গিয়াছে। পূর্ব্বে সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের সহিত যোগ রাখিবার একটা উদ্যোগ ছিল; ছাত্রগণ তথায় গিয়া গ্রামের বালকগণকে শিক্ষা দিত, রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিত এবং নানা প্রকারে গ্রামগুলির মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিত, পুনরায় সেই কাজটি গৃহীত হইয়াছে এবং বেশ উৎসাহের সঙ্গে চলিতেছে।

৬ই মাঘে মহর্ষির মৃত্যুবাৎসরিক অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মন্দিরে উপাসনা করেন, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী সুন্দর উপদেশে সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষির সাধন-ক্ষেত্র সপ্তপর্ণবৃক্ষনিম্নে তাঁহার "আত্মজীবনী" হইতে কিছু পাঠ হয় ও দ্বিপ্রহরে বালকদিগের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনচরিতটি বলিয়াছিলেন। সন্ধ্যার মন্দিরে পুনরায় উপাসনা হইয়াছিল।

১২ই মাঘেও প্রভাতে ও সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। ১৯এ মাঘ মাঘীপূর্ণিমার দিনে আশ্রমের পরলোকগত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুদিনে অপরাহ্ণে সভা এবং সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র আশ্রমের একটি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুণ্যচরিত শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দলাভ করেন।

অধ্যাপনা এবং পাঠপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে সকল বিবরণ দিব।

শ্রী—

স্তব্ধ উপাসনার মন্দির।

"স্তব্ধ গির্জ্জা" নামে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দির লণ্ডন নগরের জনাকীর্ণ একটি অংশে দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে সঙ্গীত, উপাসনা ইত্যাদি কিছুই হয় না। পথে চলিতে চলিতে যখন যাহার খুসী সে আসিয়া ঐ স্তব্ধ মন্দিরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিয়া যায়—এইজন্যই বাস্তবিক এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা। লণ্ডনে হাজার হাজার ধর্ম্মমন্দির আছে, যেখানে রবিবারে রবিবারে উপাসনা হয়, এ মন্দির সে রকমের নহে। ইহা আমাদের দেশের পান্থশালার মত—ক্লান্ত পথিক সেইখানে আসিয়া বিশ্রাম করে—তবে যে-অন্নপানের জন্য আসে তাহা আধ্যাত্মিক। এই সুন্দর বিশ্রাম-মন্দিরটির কথা প্রথমে Ladies' Home Journal নামক সংবাদপত্রে (আগষ্ট মাসে) প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় উইলিয়াম ই, বার্টন যে শিল্পী এই মন্দিরকে চিত্রে শোভিত করিয়াছিলেন তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং এইজন্য সেই চিত্রকরের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে জানেন। তিনি লিখিতেছেন, "এই মন্দিরের স্থাপয়িত্রী মিসেস্ রাসেল গার্ণে নাম্নিকা এক বিধবা ভদ্রমহিলা। তিনি বৈধব্যাবস্থায় ইটালি ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশীয় কোন কোন ধর্ম্মমন্দিরের প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রসমূহ দেখিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে এই প্রকার কোন ধর্ম্মমন্দির না দেখিয়া দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে সেই সুবৃহৎ নগরের বক্ষের মধ্যে এমন কোন ধর্ম্মমন্দির কেন থাকিবে না যেখানে গান বা উপদেশ ভিন্ন মানুষ কর্ম্ম করিতে করিতে, পথে চলিতে চলিতে খুসীমত আসিয়া বিশ্রাম করিবে, বাইবেলের কথা সকল চিত্রে চক্ষে দেখিতে পাইবে এবং স্তব্ধভাবে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং তাঁহার সত্তার উপলব্ধি করিতে পারিবে।

"এই ভাবিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার একজন স্ত্রী বন্ধুর নিকট স্বীয় চিন্তা জ্ঞাপন করিলেন, আর জিজ্ঞাসা করিলেন যে এমন কোন শিল্পী পাওয়া যাইবে কি না যিনি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। তাঁহার সেই বন্ধু এই প্রকারের একজন শিল্পীর সহিত কিছুকাল পূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ফ্রেডারিক্ শিণ্ডস্। তিনি খুব বিনয়ী এবং ধর্ম্মপ্রাণ চিত্রকর।

"সেই চিত্রকর সম্মত হইলেন। কিন্তু মন্দিরস্থাপনের স্থান নিরূপণের জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে এই প্রকারের একটি মন্দিরস্থাপনের জন্য লণ্ডনের মধ্যে অনেক স্থান পাওয়া

যাইবে। একবার স্থান প্রায় নিরূপিত হইল কিন্তু পুনরায় নানা কারণে সেই স্থানে কার্য্য করা হইল না। লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল—কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। একটি স্থান অনেক কষ্টে মিলিল। স্থানটি হাইড্‌পার্ক নামক একটি বাগানের ভিতরে। সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি ভগ্নপ্রায় দালান এবং সম্মুখে একটি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ছিল। এই স্থানটিই স্থির হইল এবং একটি দলিলপত্রও লিখিত হইল। মিসেস্ গার্গি সেই স্থানে এইরূপ একটি ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিলেন যাহা দিবাভাগে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং তাহাতে কোন প্রকার কৃত্রিম প্রদীপ জ্বালান হইবে না ও কেহ তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাহারা দিবে না।

"দালান যখন উঠিতে লাগিল, তখন কোথায় চিত্র আঁকা হইবে তাহার নক্সা করিতেই সিওস্-এর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। মিসেস্ গার্গি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে মন্দিরটি সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন না, কিন্তু তিনি দেয়ালগুলি এবং কতকগুলি চিত্র সম্পূর্ণ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে ১৮ই মার্চ্চ অনেক দিনের পরিশ্রমের পর সেই মন্দিরের বহির্ভাগ এবং অভ্যন্তরেরও প্রধান চিত্রগুলি শেষ হইল। সেই দিন মিসেস গার্গি এবং মিষ্টার সিওস্ সেই দালানের ভিতরে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি চিত্র সম্পূর্ণ দেখিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা আংশিকরূপে পূর্ণ হইয়াছে এই ভাবিয়া মিসেস্ গার্গির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"শেষ জীবনে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সেইজন্য তিনি সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে পারিতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে গমন করিয়া স্বীয় পরিশ্রমের সাফল্য দর্শন করিতেন, এবং সর্ব্বদাই চিঠি এবং বাক্য দ্বারা চিত্রকরকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করিতেন। অবশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস্ গার্গি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

"দর্শকবৃন্দ মুক্ত দরজার নিকটে আসিলেই দেখিতে পাইবেন একটি প্রস্তরখণ্ডে এই কথাগুলি লিখিত আছে, 'লণ্ডন সহরের কর্ম্মব্যস্ত পথের যাত্রিগণ, ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা, এবং প্রার্থনার জন্য প্রবেশ করুন। এই মন্দিরের প্রাচীরস্থিত চিত্রগুলি মানুষের সহিত ঈশ্বরের অতীত এবং নিত্যকালের সম্বন্ধের কথা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করুক।'

মন্দিরটির মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত ঘর আছে। সেই স্থানেই বসিবার আসন প্রস্তুত আছে। তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে এমন কি পরস্পর গল্প করিতেও কোন নিষেধ নাই। এই ঘরের দেয়ালে কতকগুলি চিত্র আছে। সমস্ত চিত্রের মধ্যস্থলে খৃষ্টের মেষপালকরূপ মূর্ত্তি। খৃষ্ট একটি মেষশাবককে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দুই তিনটি মেষ তাঁহার পায়ের তলায় সোহাগ জানাইতেছে। খৃষ্টানশাস্ত্রে ভগবান পাপীর পরিত্রাতা। খৃষ্ট বলিয়াছেন 'একজন মেষপালকের যদি একশত মেষের মধ্যে নিরানব্বইটা থাকে আর একটি হারাইয়া যায়, তবে কি সে নিরানব্বইটাকে ফেলিয়া একটার অন্বেষণে ছোটে না?' ভগবান সেই যে হারাইয়া গেছে, যে দূরে পড়িয়াছে, তাহারি ভগবান। খৃষ্টের ঐ একটি মেষকে কোলে লইয়া আদর করিবার মূর্ত্তিটি কি করুণাপরিপূর্ণ! ঐ ছবিটি দেখিলে কি সান্ত্বনা মনে জাগে!"

রবিবারে রবিবারে ধর্ম্মমন্দিরে যে উপাসনা হয়, তাহা নিতান্তই একদিনের। এই মন্দিরটি কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মকে মিশাইয়া রাখিয়াছে, কাজ করিতে করিতে একবার গিয়া প্রবেশ এবং পুনরায় কাজে গমন—এই ভাবটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মধ্যাহ্ন।

নিশি দিয়ে গেছে স্নিগ্ধ আঁধারে
বিশ্রাম-উপহার,
তারকাখচিত অঞ্চলে ঢাকা
মোহন স্বপন তার।
উষা দিয়ে গেছে আশাবিকশিত
নবজাগ্রত প্রাণ,
মন্দ মারুত হৃদয়-তন্ত্রে
বাজায়ে গিয়েছে গান।
হে মধ্যাহ্ন, প্রখর দীপ্ত
এই বর দেহ আজ—
শ্রান্তিবিহীন শক্তির সাথে
তুলে লই শিরে কাজ!

ভাদ্র ১৩১৭। শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৭॥০ টাকা।
" চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	...	২৲ "

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	...	৩॥০ টাকা।
" বনমালী চন্দ্র	...	১৲ "
" তুলসীদাস দত্ত	...	২৲ "
বি, সি, ব্যানার্জি এস্কোয়ার	...	২৲ "
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী	...	২৲ "

ক্রোড়পত্র।

ধর্ম্মের নবযুগ।*

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোট ছোট সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এই জন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মত আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্ম্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্ম্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলি তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম্ম, আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম আমাদের আত্মাভিমান বা জাতীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্ম্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্ম্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্ম্মের উপরেই আমাদের নিজের সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় একথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়া ছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্ম্মে এবং পরধর্ম্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনি দেখিনা কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণুপরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনি ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড় কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন, গোত্র সকলেরই এক। এই জন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটিই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্য্যায়ে যেমনি হোকনা

* মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাকালে প্রদত্ত উপদেশ।

কেন, জীবপর্য্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটেনা; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূর কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়াছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্‌ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা প্রশাখায় উজান বহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়ে জীবে সর্ব্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে; যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেইখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল করিয়া দেখিবার উদ্যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্ম্মের তুলনা,—সমস্তই তুলনা। সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎজুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে; আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানীতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারো ধার ধারি না—তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে সে খাঁচার পাখী, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখী। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ঐ খাঁচার লৌহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মত ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জার গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসঙ্গতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতেই পারে না, নিজের শক্তিতে ত নহেই;—সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্যপানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মত নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দ্দিষ্ট খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং এই সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্ম্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্ম্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতি দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্ম্মকে না পাইলে তাহার জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশজুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবলি উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলি সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য্য নিত্যবহমান প্রকাশব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে

বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলি আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলি "শঙ্খের বদলে মুকুতা," স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম্ম। বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সবক'টা পাল তুলিয়া দে,—ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় তর্জ্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে, ওরে দ্বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক! আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে যিনি তাহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্ম্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্ম্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্ত্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্ত্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে;—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না; "তবে বাহিরের লোকের কি গতি হইবে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যায় মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্ম্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক্; মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক; আর সর্ব্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক্ মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে; এমন কি, নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ মূর্ত্তিপূজা, সেইরূপ কালেরই পূজা যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষরূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে, বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া, প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই; মূর্ত্তিপূজা সেই সময়েরই যখন পাঁচসাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম্ম আপন ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সঙ্কীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয়;—যাহারা অলঙ্কারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের সেই অলঙ্কার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জ্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্ম্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্ম্মের সংস্কারকে সঙ্কীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মত মানুষকে চাপিয়া ধরে,—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার

পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্ম্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্ব্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্ম্মের সত্য।

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশের সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্য্যের মত অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্ত্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মত অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহা অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্ম্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সঙ্কোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম ত কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং এষাস্য পরম আনন্দঃ ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে ত আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী ত ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া ত আর কিছুই মিলাইতে পারে না, ভক্তি ছাড়া ত আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজা অর্চ্চনা ক্রিয়া কর্ম্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতিবিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকালপর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিতআনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মত প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াই ত আমাদের নবযুগের ধর্ম্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোন বাহ্যমূর্ত্তিতে নহে, কোন ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুতঃ পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য;—সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্ব্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচারবিচারঅনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুলসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিনা।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একইকালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা। হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা, একথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যত কিছু পাপ যতকিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড় মহত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ :আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য;—তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্যাকেই ম্লান করিয়া দিতেছে। হে ধর্ম্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্ব্বমানবের ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে, মানবের অন্তরাত্মার। অন্তর্গূঢ় এই চিরমঙ্গলটিকে তুমি বীর্য্যের দ্বারা প্রবল কর, পুণ্যের দ্বারা নির্ম্মল কর, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়সঙ্কোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না! অনেক দিন মানুষের ধর্ম্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্চ্ছিত; গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্য্যন্ত কাঁপে নাই;—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক্। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মত শূন্যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্ম্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে আজ লড়াই করিতে হইবে সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক্! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মত নিরানন্দ হইলে চলিবে না; আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলি পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে—আজ কৃপণের মত রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্য্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকভয়কেই ধর্ম্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে;—আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে! আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙ্গিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে;—নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দ্দা, সেদিকে হঠাৎ আলোক-প্রকাশ হইবে; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর, সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্য্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব;—মানুষের চিত্তসাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে ধর্ম্মে কত কত অত্যাশ্চর্য্য অজেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে, তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্তশক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে,—তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে যখন তুমি উদ্বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না—এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নামকরণ। *

এই আনন্দরূপিণী কন্যাটি একদিন কোথা হইতে তাহার মায়ের কোলে আসিয়া চক্ষু মেলিল। তখন তাহার গায়ে কাপড় ছিল না, দেহে বল ছিল না, মুখে কথা ছিল না কিন্তু সে পৃথিবীতে পা দিয়াই এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার প্রবল দাবি জানাইয়া দিল। সে বলিল আমার এই জল, আমার এই মাটি, আমার এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারকা। এত বড় জগৎচরাচরের মধ্যে এই অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটি নূতন আসিয়াছে বলিয়া কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ সে দেখাইল না। এখানে যেন তাহার চিরকালের অধিকার আছে, যেন চিরকালের পরিচয়।

বড়লোকের কাছ হইতে ভালরকমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে নূতন জায়গার রাজপ্রাসাদে আদর অভ্যর্থনা পাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিল উহার ছোট মুঠির মধ্যে একখানি অদৃশ্য পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড় তিনিই নিজের নামসইকরা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুসি হইব।

তাহার পরে কাহার সাধ্য ইহার দ্বার রোধ করে! সমস্ত পৃথিবী তখনি বলিয়া উঠিল, এস, এস, আমি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিব—দূর আকাশের তারাগুলি পর্য্যন্ত ইহাকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল—বলিল, তুমি আমাদেরই একজন। বসন্তের ফুল বলিল আমি তোমার জন্য ফলের আয়োজন করিতেছি, বর্ষার মেঘ বলিল তোমার জন্য অভিষেকের জল নির্ম্মল করিয়া রাখিলাম।

এমনি করিয়া জন্মের আরম্ভেই প্রকৃতির বিশ্বদরবারের দরজা খুলিয়া গেল। মা বাপের যে স্নেহ সেও প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শিশুর কান্না যেমনি আপনাকে ঘোষণা করিল অমনি সেই মুহূর্ত্তেই জলস্থল আকাশ, সেই মুহূর্ত্তেই মা বাপের প্রাণ সাড়া দিল, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

কিন্তু আরো একটি জন্ম ইহার বাকি আছে, এবার ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে জন্ম লইতে হইবে। নামকরণের দিনই সেই জন্মের দিন। একদিন রূপের দেহ ধরিয়া এই কন্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ নামের দেহ ধরিয়া এই কন্যা সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রে পিতামাতা এই শিশুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এ যদি কেবলি ইহার পিতামাতারই হইত তবে ইহার আর নামের দরকার হইত না, তবে ইহাকে নিত্য নূতন নূতন নামে ডাকিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিলনা। কিন্তু এ মেয়েটি না কি শুধু পিতামাতার নহে, এ না কি সমস্ত মানবসমাজের, সমস্ত মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের বিপুল ভাণ্ডার না কি ইহার জন্য প্রস্তুত আছে, সেইজন্য মানবসমাজ ইহাকে একটি নামদেহ দিয়া আপনার করিয়া লইতে চায়।

মানুষের যে শ্রেষ্ঠরূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নামকরণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্ব্বাদ আছে—এই নামটি যেন নষ্ট না হয় ম্লান না

* ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর কন্যার নামকরণ উপলক্ষ্যে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়, এই নামটি যেন মাধুর্য্যে ও পবিত্রতায় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা লাভ করে। যখন ইহার রূপের দেহটি একদিন বিদায় লইবে তখনো ইহার নামের দেহটি মানবসমাজের মর্ম্মস্থানটিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে।

আমরা সকলে মিলিয়া এই কন্যাটির নাম দিয়াছি, অমিতা। অমিতা বলিতে বুঝায় এই যে, যাহার সীমা নাই। এই নামটি ত ব্যর্থ নহে। আমরা যেখানে মানুষের সীমা দেখিতেছি সেইখানেই ত তাহার সীমা নাই। এই যে কলভাষিণী কন্যাটি জানে না যে আজ আমরা ইহাকে লইয়াই আনন্দ করিতেছি, জানে না বাহিরে কি ঘটিতেছে, জানে না ইহার নিজের মধ্যে কি আছে—এই অপরিস্ফুটতার মধ্যেই ত ইহার সীমা নহে। এই কন্যাটি যখন একদিন রমণীরূপে বিকসিত হইয়া উঠিবে তখনি কি এ আপনার চরমকে লাভ করিবে? তখনো এই মেয়েটি নিজেকে যাহা বলিয়া জানিবে এ কি তাহার চেয়েও অনেক বড় নহে! মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয়টি জানিতে পারে, সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা ত আমাদের মর্ত্ত্য বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

আমরা অমিতা নামে সেই অমৃতের পুত্রীকেই আমাদের সমাজে আহ্বান করিলাম। এই নামটিই ইহাকে আপন মানবজন্মের মহত্ব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিক আমরা ইহাকে এই আশীর্ব্বাদ করি।

আমাদের দেশে নামকরণের সঙ্গে আর একটি কাজ আছে সেটি অন্নপ্রাশন। দুটির মধ্যে গভীর একটি যোগ রহিয়াছে। শিশু যে দিন একমাত্র মায়ের কোল অধিকার করিয়াছিল সে দিন তাহার অন্ন ছিল মাতৃস্তন্য। সে অন্ন কাহাকেও প্রস্তুত করিতে হয় নাই—সে একেবারেই তাহার একলার জিনিষ, তাহাতে আর কাহারও অংশ ছিল না। আজ সে নামদেহ ধরিয়া মানুষের সমাজে আসিল তাই আজ তাহার মুখে মানবসাধারণের অন্নকণাটি উঠিল। সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের পাতে পাতে যে অন্নের পরিবেষণ চলিতেছে তাহারই প্রথম অংশ এই কন্যাটি আজ লাভ করিল। এই অন্ন সমস্ত সমাজে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্ দেশে কোন্ চাষা রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া চাষ করিয়াছে, কোন্ বাহক ইহা বহন করিয়াছে, কোন্ মহাজন ইহাকে হাটে আনিয়াছে, কোন্ ক্রেতা ইহা ক্রয় করিয়াছে, কোন্ পাচক ইহা রন্ধন করিয়াছে, তবে এই কন্যার মুখে ইহা উঠিল। এই মেয়েটি আজ মানবসমাজে প্রথম আতিথ্য লইতে আসিয়াছে, এইজন্য সমাজ আপনার অন্ন ইহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতিথিসৎকার করিল। এই অন্নটি ইহার মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে মস্ত একটি কথা আছে। মানুষ ইহার দ্বারাই জানাইল আমার যাহা কিছু আছে তাহাতে তোমার অংশ আমি স্বীকার করিলাম। আমার জ্ঞানীরা যাহা জানিয়াছেন তুমি তাহা জানিবে, আমার মহাপুরুষেরা যে তপস্যা করিয়াছেন তুমি তাহার ফল পাইবে, আমার বীরেরা যে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্ম্মীরা যে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে। এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল—অদ্যকার এই শুভদিনটি তাহার সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক্।

অদ্য আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে, তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা স্নেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলেস্থলে ফলেফুলে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ—অথচ তাহাই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃশ্য হইয়া আপনার বিপুল সৃষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—সেই জ্ঞানপ্রেমকল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মানুষের যথার্থ জগৎ। এই জগতের মধ্যেই মানুষ যথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অনুভব করিয়াছে যে সত্তা অনির্ব্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে। এই জন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অন্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেই জন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্যে সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অন্তরে প্রীতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারই আশীর্ব্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড় আশ্চর্য্য মানুষের এই উপলব্ধি এই পূজা, বড় আশ্চর্য্য মানুষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড় আশ্চর্য্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্বর্ত্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য্য

নহে, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে মানুষের সেই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান। অদ্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মানুষ সকল নামরূপের আধার ও সকল নামরূপের অতীতকে আপনার এই নিতান্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল,—ধন্য হইল এই কন্যাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুফী-গুরু ও সুফী শিষ্য।*

(গুরু)

জগতে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের পদ সর্ব্বোচ্চ,—আর যাঁহারা সাধক গুরুরূপে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করেন ও জনসাধারণকে মহত্ত্বদের পন্থায় ঈশ্বরের অভিমুখে আহ্বান করেন তাঁহারা মহাপুরুষদের পরেই আসন পান। শিষ্যের চিত্তে যাহাতে অনন্তের মহিমা ও একের সৌন্দর্য্য-জ্যোতি সহজআনন্দে প্রতিফলিত হইতে পারে, যাহাতে তাহার দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ও দিব্য প্রেম তাহার নিষ্কপট হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে পারে তজ্জন্য তাহার অন্তঃকরণকে স্বভাবের ও কামনার কলঙ্ক হইতে ক্ষালিত করা গুরুর কর্ত্তব্য। গুরু যখন দেখিবেন যে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি অকপট ইচ্ছার সহিত তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিতেছে তখন তিনি একেবারেই তাহার আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিবেন না; যে পর্য্যন্ত না অনুশোচনা, যথার্থ নির্ভর ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার দ্বারা শিষ্যের প্রকৃত অবস্থা ও তাহার ভারগ্রহণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তিনি সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারেন সে পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবেন।

শিষ্যের শক্তিসম্বন্ধে গুরুকে বিবেচনা করিতে হইবে। গুরু যদি দেখেন যে, যাঁহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিবার ক্ষমতা শিষ্যের আছে তবে তিনি কৌশলে ও সেইরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির অবস্থা সকল বিবৃত করিয়া তাহাকে সেই পথে প্রবৃত্ত করিবেন। আর যদি তিনি দেখেন যে সাধক সাধুদের অনুবর্ত্তী হইবার শক্তি শিষ্যের যথেষ্ট পরিমাণে নাই তবে তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া, উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া এবং স্বর্গ নরকের কথা বলিয়া এই পথে আহ্বান করিবেন। সক্ষম ব্যক্তিকে গুরু বিশুদ্ধ ভক্তিতে ও হৃদয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত করিবেন। শিষ্যের পক্ষে ধনসম্পদ পরিত্যাগ করা অথবা তাহা রক্ষা করাই যদি কল্যাণকর হয় তবে গুরু সেইরূপই বিধান করিবেন। শিষ্যের ধনসম্পত্তি অথবা তাহার সেবাগ্রহণের প্রতি গুরু কোনপ্রকার লোভ প্রকাশ করিবেন না! যে ধর্ম্মশিক্ষাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান মূল্যগ্রহণের দ্বারা তাহার পুণ্যকে যেন গুরু ব্যর্থ না করেন।

ঈশ্বরপ্রেরণা বা দিব্যজ্ঞানের দ্বারা গুরু যদি জানিতে পারেন যে লোকহিতের জন্য শিষ্যের সম্পত্তি গ্রহণ করা আবশ্যক তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। যদি তিনি জানেন যে দত্ত সম্পত্তির জন্য শিষ্যের মনে পরে ক্ষোভ জন্মিতেছে তবে সম্পত্তির একঅংশ তাহাকে ভোগ করিতে অনুমতি দিবেন।

আসক্তিবন্ধন ছেদন ও ত্যাগস্বীকারে আনন্দ থাকা গুরুর পক্ষে অত্যাবশ্যক, যাহাতে তাহার ফলসকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিষ্যের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আন্তরিকতা প্রবলতর হইতে পারে, মোহপাশমোচন তাহার পক্ষে সহজ হয় ও ব্রহ্মচর্য্যের আকাঙ্ক্ষা তাহার চিত্তে একান্ত হইয়া উঠে। গুরু যদি শিষ্যকে কোন সাধনায় বা কোন ত্যাগে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার নিজের অবস্থা এই কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে নিঃসন্দেহে শিষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

যদিচ কেহ কেহ বলেন, সুফীর পক্ষে ধন এবং দারিদ্র্য উভয়ই সমান তথাপি মুর্সীদ (শিষ্য) যথাবিধি তরীকৎ অর্থাৎ ঈশ্বর-সাধনার পথ অবলম্বন করিবে। গুরু যদি দেখেন যে শিষ্যের সংকল্প দুর্ব্বল ও অভ্যস্ত বিষয় পরিহার ও কামনাপরিত্যাগসম্বন্ধে তাহার যথার্থ আগ্রহ নাই তবে তাহার প্রতি তিনি দয়া করিবেন। শিষ্যের শক্তির সীমা বিচার করিয়া তিনি সাধনার কঠোরতা সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিবেন যেন শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য না হয় এবং কালক্রমে গুরুর সঙ্গগুণে সে ফকীর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধলাভ করিতে পারে। তাহার চিত্তে সংকল্প দৃঢ় হইলে পর সম্ভবতঃ সে ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতার গভীর গহ্বর হইতে নিষ্ঠার উচ্চশিখরে উঠিতে পারিবে। কোনো সময়ে একজন ধনীর সন্তান "আম্মেদ কলান্সীর" সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল ও আপনাকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। আম্মেদ তাহার দুর্ব্বলচিত্ততা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য যখনই তিনি কোথাও হইতে সামান্য কিছু পাইতেন তখনই তাহাকে রুটী, মিঠাই, কাবাব ও মিষ্টান্ন কিনিয়া দিতেন এবং বলিতেন:—

"এই ব্যক্তি সম্পদের সচ্ছলতার মধ্যে ছিল অতএব সাধনার পথে ইহাকে দয়ার সহিত চালনা করা কর্ত্তব্য

---

* পারস্য গ্রন্থিকাদের ইংরেজি অনুবাদ হইতে।

এবং ইহাকে ভোগ-সুখ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা উচিত নহে।”

গুরুর বাক্য কামনার কলুষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মুরীদের (শিষ্যের) প্রতি তাহার ফল দর্শে। গুরুবাক্যের ফল শিষ্যের অন্তঃকরণে বীজের ন্যায়; বীজ যদি মন্দ হয় তবে কোন ফলই ফলে না। বাক্য যখন কামনার সহিত জড়িত হয় তখনই তাহা গর্হিত হইয়া উঠে। আপন বাক্যরূপ বীজের কামনারূপ আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া গুরু তাহা শিষ্যের চিত্তক্ষেত্রে রোপণ করিবেন—এবং বিস্মৃতিপাখীদের আক্রমণ ও সয়তানের প্রভাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভার সমর্পণ করিবেন। আত্মাভিমানের বাধাবশতঃ অকপট নিষ্ঠা সহজে লাভ করা যায় না;—যখন ঈশ্বরের গুণ এবং তাঁহার অসীম দয়ার ক্রিয়া শিষ্য লক্ষ্য করিতে পারেন তখনই সেই জ্যোতির উজ্জ্বলতায় কামনার দুষ্টদৃষ্টি ম্লান হইয়া যায়, এবং অহঙ্কারের অন্ধকার তিরোহিত হয়। তখন ঈশ্বরের চিরন্তন দাক্ষিণ্যের তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে তিনি আপনার সত্তাকে এবং বাক্যকে কণামাত্র বলিয়াই অনুভব করেন।

গুরু যখন শিষ্যকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি আপনার অন্তঃকরণকে ঈশ্বরের অভিমুখ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বোধ প্রার্থনা করিবেন, যেন তিনি তাঁহার শ্রোতার সময়ের পূর্ণতা বিধান করিতে পারেন ও তাহার অবস্থার পক্ষে যাহা শ্রেয় তাহা বুঝিতে সমর্থ হন, যেন তাঁহার জিহ্বা ঈশ্বরের বাণীই প্রকাশ করে ও তাঁহার বাক্য যেন কল্যাণকর হইতে পারে।

যদিচ তীরস্থ দর্শকগণ অপেক্ষা ডুবারিই অগ্রে সমুদ্র-গর্ভ হইতে শুক্তি সকল সংগ্রহ করে ও আপনার সঙ্গেই মুক্তা আহরণ করিয়া আনে তথাপি সমুদ্রতল হইতে উঠিয়া যখন সে শুক্তির আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া দেখে তখন তীরবর্ত্তী দর্শকের সহিত তাহার কোনো পার্থক্য থাকে না।

শেখ (গুরু) যদি মুরীদের মধ্যে কোনো সেবার ত্রুটি বা নিয়মের শৈথিল্য দেখেন তবে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিবেন ও দয়ার দ্বারা, বিনয়ের দ্বারা, প্রশ্রয়ের দ্বারা, এবং প্রসন্নতার দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করিবেন। মুরীদ-সম্বন্ধে গুরুর স্বত্ব প্রবল হইলেও তিনি তাহার প্রতি কোনো আশা রাখিবেন না, শিষ্যকে আপন অধিকারে রাখাই যদিচ গুরুর পক্ষে গুরুতর নিয়ম তথাপি মনে-মনে ইহার প্রত্যাশা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে এবং এই অধিকার ত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

কোনো সময়ে, ইজিপ্টে, এক ফকিরদলের সহিত আমি একটি মসজিদে গিয়াছিলাম, সেখানে শেখ আবু বেক্কার বিরাক একটি থামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতেছিলেন। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে শেখের উপাসনা শেষ হইলে আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিব। শেখ উপাসনা অন্তে ঈশ্বরকে নমস্কার করিয়া আসিলে পর আমি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের পূর্ব্বেই তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি বলিলাম:—

“যদি অগ্রে আমি আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিতাম তবেই ভাল হইত।”

শেখ বলিলেন:—

“আমাকে কেহ সম্মাননা করিবেন এই প্রত্যাশার বন্ধনে আমি আমার মনকে কখনো আবদ্ধ রাখি না”।

(শিষ্য)

গুরুসঙ্গযাপনকালে মুরীদ গুরুর প্রতি শিষ্টাচার পালন করিয়া চলিবেন। এই উপায়ে তিনি গুরুর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবেন। শিষ্য যখন বিনয়পরায়ণ হয় তখন সে গুরুর হৃদয়ে প্রীতির আসন অধিকার করে ও এইরূপে সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও প্রিয় হয়, কারণ ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদের হৃদয়ের প্রতি নিয়তই করুণা, অনুগ্রহ ও স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। শিষ্য গুরুর অন্তঃকরণে স্থান পাইলে ঈশ্বরের অনন্ত দাক্ষিণ্যের ও করুণার আশীর্ব্বাদ তাহাকে সতত বেষ্টন করিয়া থাকে এবং গুরু তাহাকে গ্রহণ করিলেই জানা যায় যে সমুদয় শেখ, মহম্মদ ও ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

গুরুর প্রতি বিনয়রক্ষাব্যতীত কেহ গুরুর উপদেশে অধিকার লাভ করিতে পারে না। আচার্য্য ও গুরুকে ভক্তি করাই শিষ্যের একটি মহৎ অধিকার। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই নীতি পালন না করিলে গুরুতর অধর্ম্ম হয়। শাস্ত্রে আছে, যে কেহ গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে সে ঈশ্বরেরও মর্য্যাদা রক্ষা করে না। নিজের পার্ষদ-মণ্ডলীর মধ্যে মহম্মদ যেরূপ, মুরীদগণের মধ্যে শেখও তদ্রূপ। মহম্মদের পন্থা অনুসরণ করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করিবার জন্য শেখ সেই ধর্ম্মপথের পান্থশালায় মহম্মদের প্রতিনিধিরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

গুরুগৃহে বাসকালে শিষ্য পঞ্চদশটি নিয়ম পালন করিবে।

১। উপদেশদান, শিষ্যকে চালনা ও মুরীদের চিত্ত-শুদ্ধিবিষয়ে গুরুর যোগ্যতাসম্বন্ধে শিষ্য সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রক্ষা করিবে।

আপন গুরুঅপেক্ষা অন্যকাহাকেও যদি মুরীদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে তবে প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; এবং সে অবস্থায় গুরুর বাক্য মুরীদের প্রতি আর তেমন প্রভাব করিতে পারে না। যে উপায়ে, গুরুর

বাক্য ও কার্য্যসকল ফলদায়ক হয় তাহা প্রীতি। শিষ্যের প্রেম যতই প্রবলতর হয় গুরুর উপদেশ-গ্রহণসম্বন্ধে তাহার তৎপরতাও সেই পরিমাণে বললাভ করে।

২। গুরুসেবায় স্থিরনিষ্ঠ হইতে হইবে। শিষ্য মনে মনে বলিবেন যে গুরুসেবায় নিষ্ঠা না থাকিলে কখনই দ্বার মুক্ত হইতে পারে না। অতএব হয় আমি সিদ্ধিলাভ করিব নতুবা গুরুর দ্বারের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। এইরূপ নিষ্ঠার লক্ষণই এই যে গুরুকর্ত্তৃক তাড়িত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াও শিষ্য ফিরিয়া যায় না।

আবু হাফ্জ্ হদ্দাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে আবু উস্মান্-ই-হাইরি নিশাপুরে গিয়াছিলেন। আবু হাফ্জের পুণ্যজ্যোতি দেখিয়া উস্মান্ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকটে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আবু হাফ্জ্ এই বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন যে আমাদের সভার মধ্যে তুমি বসিতে পাইবে না।

হাফ্জের দৃষ্টিপথ হইতে আবু উস্মান্ সরিয়া গেলেন ও মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে তাঁহার গৃহদ্বারের সম্মুখে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিবেন যে-পর্য্যন্ত না আবু হাফ্জ্ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন।

আবু হাফ্জ্ যখন তাঁহার ইচ্ছার এইরূপ ঐকান্তিকতার প্রমাণ পাইলেন তখন তিনি তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন, আপনার বিশেষ সঙ্গীদের মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে খালিফা পদে নিযুক্ত করিলেন। ত্রিশ বৎসর পরে আবু হাফ্জের মৃত্যু হইলে পর আবু উস্মান্ শেখের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। শিষ্যকে গুরুর শাসনাধীন থাকিতে হইবে।

নিজের আত্মা ও ধনসম্পদসম্বন্ধে শিষ্যকে গুরুর শাসন স্বীকার ও তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে, কারণ ইহা ব্যতীত তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না এবং তাহার আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া হইবে না।

৪। বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অন্তরে বাহিরে শিষ্য গুরুর কর্ত্তৃত্বের বিরোধী হইবে না।

৫। নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গুরুর ইচ্ছার অনুমোদনব্যতীত শিষ্য ধর্ম্মকর্ম্ম বা সংসারকৃত্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবেও আরম্ভ করিবে না।

গুরুর অনুমতি ব্যতীত শিষ্য খাইবে না, পান করিবে না, ঘুমাইবে না, কোন কিছু গ্রহণ বা দান বা কিছুতে দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না।

৬। শেখের চিত্তভাব বুঝিয়া চলিতে হইবে।

শেখের নিকট যাহা ঘৃণ্য তেমন কোনো বিষয়েই মুরীদ অগ্রসর হইবে না, শেখের করুণা ও মহৎ চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া শিষ্য গুরুর লেশমাত্র অপ্রিয় কার্য্যকেও সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিবে না।

৭। স্বপ্নের তাৎপর্য্য নির্ণয়সম্বন্ধে গুরুর জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে।

জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় শিষ্য যে কোন স্বপ্ন দেখিবেন তৎসমুদয়েরই ব্যাখ্যার জন্য তিনি গুরুর জ্ঞানকে আশ্রয় করিবেন; যেহেতু স্বপ্নের মূলে এমন কোন মন্দ ইচ্ছা কারণরূপে থাকিতেও পারে যেখানে শিষ্যের জ্ঞান প্রবেশ করে না এবং যেখান হইতে অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে।

৮। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা রক্ষা করিবার প্রথা বিশুদ্ধভাবে পালন করিতে হইবে।

গুরুর রসনাকে শিষ্য ঈশ্বরবাক্যের যোগবন্ধনী বলিয়া স্বীকার করিবে এবং জানিবে যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যই প্রকাশ করেন, কামনাশ্রিত বাক্য নহে। শিষ্য গুরুর হৃদয়কে এমন একটি বিদ্যার মুক্তা ও জ্ঞানের মাণিক্যে পূর্ণ বিপুল তরঙ্গময় সমুদ্র বলিয়া গণ্য করিবে যে সমুদ্র হইতে অনন্তের প্রসাদবাত্যার অভিঘাতে সময়ে সময়ে মণিমুক্তারাশির কিছুকিছু তাঁহার রসনাতটে উৎক্ষিপ্ত হয়।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া শিষ্য ঈশ্বরের দ্বারে সত্য অবস্থালাভের জন্য প্রার্থনা করিবে। যে পরিমাণে সে প্রস্তুত হইবে সেই পরিমাণে গোপনলোক হইতে ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হইবে।

নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানের অহঙ্কার ও কপটতা লইয়া শিষ্য গুরুর নিকট আসিবে না, কারণ ইহাতে তাহার ফললাভের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হইয়া যায় এবং গুরুর বাক্যে সে বধির হইয়া থাকে।

৯। স্বর মৃদু করিতে হইবে।

শেখের নিকটে মুরীদ স্বর উচ্চ করিয়া আলাপ করিবে না; কারণ ইহাতে সদাচার নষ্ট ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়।

১০। বাক্যে বা আচরণে শিষ্য কখনো গুরুর সহিত কৌতুক করিবে না। কৌতুকপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধার আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় ও করুণার পথ রুদ্ধ হয়।

১১। শিষ্যকে গুরুর সহিত বাক্যালাপের কালাকাল বিচার করিয়া চলিতে হইবে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে বা সংসারসম্বন্ধে কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিষ্য যদি গুরুকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে তবে প্রথমে সে দেখিবে যে গুরুর অবকাশ আছে কি না। ব্যস্ত হইয়া বা অকস্মাৎ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে না। কথা কহিবার পূর্ব্বে শিষ্য অনুশোচনা প্রকাশ করিবে

ও বাক্যে বিনয়শ্রী রক্ষা করিবার জন্য (কোরাণের উপদেশমত,) মহম্মদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে। অত্যধিক প্রশ্নের দ্বারা লোকেরা মহম্মদকে পীড়িত করিয়া ক্লান্ত করিত সেই জন্য একটি দিব্য বাণী অবতীর্ণ হইয়া কপটীদের সহিত মহম্মদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল।

১২। শিষ্যকে আত্মমর্য্যাদার সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

গুরুকে প্রশ্ন করিবার সময় শিষ্য নিজের মর্য্যাদারক্ষা-সম্বন্ধে সতর্ক হইবে এবং গুরুর সাধনার যে সকল অবস্থা তাহার কাছে অপ্রকাশিত তাহা নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া অনুমান করিবে না। নিজের সাধনদশার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়সম্বন্ধেও শিষ্য অধিক প্রশ্ন করিবে না। সেই বাক্যই ফলদায়ক যাহা শ্রোতার বুদ্ধির মাত্রা-অনুসারে কথিত হয় এবং সেই প্রশ্নই লাভজনক যাহা প্রশ্নকারী উত্তরদাতার পদগৌরব মনে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করে।

১৩। গুরুর সাধনরহস্যসকল গোপন রাখিতে হইবে।

গুরু আপনার যে সকল সাধনাবস্থা গোপন রাখেন শিষ্য তাহা জানিতে পারিলে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য গুরুর অনুমতি প্রার্থনা করিবে না। কারণ যেখানে বিদ্যা পৌঁছিতে পারে না সেখানকার অবস্থা গোপন রাখাই ধর্ম্ম।

১৪। নিজের সাধনার রহস্যসকল গুরুর নিকট শিষ্যকে প্রকাশ করিতে হইবে।

শিষ্য গুরুর নিকট হইতে আপনার সাধনরহস্য গোপন করিবে না। প্রত্যেক অলৌকিক ঘটনা ও ঐশ্বরিক দানকে শিষ্য সরলভাবে গুরুর সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত করিবে।

১৫। গুরুর সম্বন্ধে কোনো কথা লোকের নিকট বলিতে হইলে শিষ্যকে শ্রোতার ধারণাশক্তির পরিমাণ বুঝিয়া বলিতে হইবে; কারণ যাহা দুর্জ্ঞেয়, শ্রোতার বুদ্ধি যেখানে প্রবেশ করে না তাহা শিষ্য ব্যক্ত করিবে না। এরূপ বাক্যে কোনো ফলই দর্শে না অধিকন্তু ইহাতে শেখের প্রতি শ্রোতার শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

আর্ট।*

বোধহয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লইয়া দার্শনিকমহলে যত বাদানুবাদ হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন তত্ত্ব লইয়া হয় নাই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, যেখানে মূর্খতাই স্বর্গ, সেখানে বিজ্ঞ হইতে যাওয়াটাই নির্বুদ্ধিতা। লেসিং, হার্ডার, গ্যয়টে, কাণ্ট, পিয়ের আঁদ্রে, ফিক্তে, শেলিং, হেগেল—বড় বড় সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের এই নামগুলি শ্রবণ করিয়াই সেই প্রবাদবচনটিকে আশ্রয় করিতে হয়। বাপ্‌রে, এত লোকের মোটা মোটা দার্শনিক পুঁথি শেষ করিয়া তবে সৌন্দর্য্য কি তাহা জানা যাইবে! না হয় নাই জানিলাম!

এ কথা শুধু মূর্খেই বলে না। জর্ম্মাণীতে স্যাজ্‌লার, ফ্রান্সে ভেঁরো, ও ইংলণ্ডে নাইট্ সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সঙ্কলনকর্ত্তা হইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। স্যাজ্‌লার তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "Hardly in any sphere of philosophic science can we find such divergent methods of investigation and exposition, amounting even to self-contradiction, as in the sphere of aesthetics" অর্থাৎ আর কোন তত্ত্বশাস্ত্রে এত বিচিত্র এবং অনেক সময় পরস্পরবিরুদ্ধ অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রণালী-বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় না, যেমন সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্রে। ভেঁরো লিখিয়াছেন, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব পাঠ করিয়া শুষ্ক কথার অরণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সমস্তই তখন ফাঁকি বলিয়া বোধ হয়।

সকলেই জানেন যে কবি রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণিমা' বলিয়া একটা কবিতা আছে। কবি একদিন নিঃসঙ্গ প্রবাসে এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় একাকী বসিয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটা ভারীগোচের গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন; অনেকক্ষণ পড়িতে পড়িতে তাঁহার মন এমনি পীড়িত হইল যে, তাঁহার মনে হইল সৌন্দর্য্য, কল্পনা এ সমস্তই মিথ্যা কথা—এই ভাবিয়া তিনি যেমনি প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন, অমনি চারিদিক্ হইতে একটা পুলকিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নার হাসি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—তিনি ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! একটিমাত্র প্রদীপের অন্তরালে সমস্ত বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য লুকানো ছিল—আর তাহাকেই তিনি খুঁজিয়া মরিতে ছিলেন শুষ্কপাতার অক্ষরের মধ্যে?

> "মুগ্ধ কর্ণপুটে
> গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে
> আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
> লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী!"

আমেরিকান্ কবি ওয়াল্ট হুইট্ম্যানের "তৃণদল" নামক কাব্যে একটি কবিতা আছে—The Base of all metaphysics—সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রের ভিত্তি। কবি বলিতেছেন "কাণ্ট, ফিক্তে, শেলিং, হেগেল সমস্ত পড়িয়া, প্লেটো এবং প্লেটোগুরু সক্রেটিস্ এবং সক্রেটিসের চেয়ে যিনি বড়

* বোলপুর বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের সভায় পঠিত।

সেই ভগবান্ খৃষ্টের সমস্ত বাণী ভাল করিয়া পাঠ করিয়া—আমি সক্রেটিস্, খৃষ্ট সকলেরি তলায় কেবল এই জিনিসটি দেখিতে পাইতেছি :

"The dear love of man for his comrade, the attraction of friend for friend,
Of the wellmarried husband and wife, of children and parents,
of city for city, of land for land."

মানুষের তাহার সহচরের প্রতি অনুরাগ, বন্ধুতে বন্ধুতে প্রণয়, স্বামী স্ত্রীর প্রেম, সন্তান ও পিতামাতার ভালবাসা, নগরের জন্য নগরের, একদেশের জন্য অন্য দেশের টান—সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রের ভিত্তিতে ইহাই বিদ্যমান!

এই দুইটি কবিতারই ভিতরকার কথা এই যে, মানুষ কথাকে সত্যের চেয়ে অনেক সময় বেশি আদর করিয়া থাকে, নিজের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে অধিক বিশ্বাস করে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে আবার কোন্ শাস্ত্রে অন্বেষণ করিব? দেখিতে পাওনা যে সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া সে শাস্ত্র লিখিত হইয়া আছে! সেই বিশ্বসৌন্দর্য্যশাস্ত্রের যে বাণী সে কি দার্শনিক নাম ও সংজ্ঞার ন্যায় শুষ্ক, প্রাণহীন বাণী? সে যে অকথিত বাণী—গ্রহেচন্দ্রে সূর্য্যে, আকাশে, বাতাসে, বনগিরিসমুদ্রে, মানবসমাজের সহস্র কর্ম্মকোলাহলে সেই গভীরগম্ভীর পরিপূর্ণ বাণী ডুবিয়া আছে—সেই বাণীরই নানান্ অক্ষর, এই রং, এই গন্ধ, এই স্পর্শ, এই ধ্বনির বিচিত্র স্পন্দনরাজি—এই অক্ষরের সঙ্গে অক্ষর মিলাইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় গূঢ় বিশ্ববাণীকে বিশ্বশাস্ত্রে পাঠ করেন যে সৌভাগ্যবান্, তাঁহার ভাষাও এই পরমনিগূঢ় অনুচ্চারিত ভাষারই সমজাতীয়, ইহা নিশ্চয়। তিনিইতো কবি, তিনিইতো আর্টিষ্ট। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যকে বাদ দিয়া ঘরে বসিয়া যুক্তিতর্কের জালরচনা কখনই সত্য নহে—সে রচনার সঙ্গে বিশ্বরচনার সুর কখনই মেলেনা!

এই জন্যই রস্কিন্ বলিয়াছেন যে All great in art is praise—আর্টের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ বিশ্বসৌন্দর্য্য যে খুব ভাল লাগিয়াছে, সেই কথাটুকু জানাইবার জন্যই ছবি আঁকা, গান গাওয়া, কবিতা রচনা—সেই ক্ষণকালীন্ ভাললাগাকে সমস্ত মানুষের মধ্যে চিরকাল রাখিয়া দিয়া যাইতে পারিবে,—মহৎ আর্টের এই একটিমাত্র আশা।

"তোমার বীণায় কত তার আছে
কতনা সুরে
আমি তারি সাথে আমার তারটি
দিবগো জুড়ে!"

এই যে অনন্ত নীলাম্বরপটে আলোছায়ার সুন্দর সমাবেশে কত বর্ণের কত বিচিত্র আকারের অসংখ্য চিত্ররাজি পৃথিবীমাতার এই বিপুল আর্টগ্যালারিতে শোভমান, মুগ্ধ নেত্র কি তাহারি স্তবে ভরপূর হইয়া, তাহারি রং তাহারি আকার ধার করিয়া ছবি আঁকিয়া, তাহারি পাশে একটুখানি স্থান কামনা করে নাই? সমস্ত বিশ্বচরাচর যে ভাষাশূন্য মহাসামগান করিতেছে—সপ্ত সমুদ্র উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের গর্জ্জনগানে আকাশকে মুখরিত করিতেছে, মহারণ্য প্রবল ঝটিকার মর্ম্মর-মন্দ্রে অপূর্ব্ব সঙ্গীতকে জাগ্রত করিতেছে—মানুষের কণ্ঠের অতি ক্ষীণ সুর কি সেই দিকদিগন্তধ্বনিত বিশ্বসামগানের স্তবে কত ভৈরবী মল্লার কত পূরবী-খাম্বাজের সৃষ্টি করে নাই? সুতরাং মানুষের চিত্রে, সঙ্গীতে, কাব্যে—বিশ্বচিত্র, বিশ্বসঙ্গীত, বিশ্বকবিতার স্তব কেবলি নানারূপে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু রস্কিন্ আর্টের ললাটে আর একটি বিশেষণ জুড়িয়া দিয়াছেন—গ্রেট অর্থাৎ মহৎ। তিনি বলিয়াছেন, আর্টের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। ঐ বিশেষণের দ্বারা তিনি যে সকল শিল্প মানুষের প্রয়োজনে লাগে, তাহাদিগকে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভেদ-রেখা টানিবার আবশ্যকতা নাই। প্রয়োজনের জন্যও যে শিল্পদ্রব্য সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেও এই স্তব আছে। কারণ তাহা প্রয়োজনের নিক্তির মাপেই যে তৈরি হয় তাহা নহে, তাহার মধ্যে বাহুল্যভাগই অনেক সময় বেশি দেখা যায়। লজ্জা নিবারণের জন্য যেটুকু বস্ত্র মানুষের প্রয়োজন, তাহা যেমন তেমন একটুখানি মোটা গোচের চীর হইলেই হইত, অন্নপান যে কোন রকম পাত্রে হইতে পারিত,—কিন্তু সেই বস্ত্রে, সেই থালা ঘটিবাটীতে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ যে কত কারুকার্য্যই ফলাইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে কে বলিবে তাহার মধ্যে কোন স্তব নাই? তবে সে স্তব অজ্ঞাত স্তব—মানুষ জানেও না যে, সে তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জিনিসটাকেও এমন করিয়া গড়িয়াছে যাহাতে তাহা প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে হয়ত প্রয়োজনকে ব্যাহত করিয়াছে বা!

আদিম অসভ্যযুগের অরণ্যচারী মানুষের প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দি। যখন হইতে মানুষ অগ্নিকে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, কুম্ভকারের কুলালে বিচিত্র কুম্ভের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন সেই সকল অসভ্যযুগের কুম্ভ,—পুষ্পপল্লবের রেখার-আকারের, জললহরীর সুন্দর ভঙ্গিমার, হস্তপুটের আশ্চর্য্য নিবেদনের বিমুগ্ধ স্তবের একটি পুষ্পাঞ্জলি কি পূর্ণ করিয়া দেয় নাই?

তন্তুবায়ের তন্ত্রটিও মানুষের কোন্ আদিম কালের

জিনিস তাহা কে জানে? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যে শ্যাম-হরিৎ বসনখানি পরিয়া আছে, নিশ্চয় তাহারি সৌন্দর্য্য-মুগ্ধতা হইতে সূক্ষ্ম বসন বয়নের উৎপত্তি! মানবশরীর কি প্রকৃতির চেয়ে কম সুন্দর—বরং অনেক বেশি সুন্দর, কারণ প্রকৃতির মধ্যে যাহা বিচিত্র হইয়া ছড়াইয়া আছে, সুন্দর মানবশরীরে তাহাই যে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে—সেই জন্যইতো কবিরা সুন্দর শরীরের উপমা সর্ব্বত্র খুঁজিয়া মরেন? সেই শরীরের অপরূপ লাবণ্যকে বিকশিত করিয়া তুলিবে যে বসন, তাহার রূপ কি যেমন তেমন হইতে পারে? তাই সেই বসনের কত সূক্ষ্ম বুনানি, পাড়ে কত রংয়ের খেলা, পরিধানের কত রকমের বিন্যাস! প্যাসিফিক্ সমুদ্রদ্বীপবাসী বর্ব্বরগণ নারিকেলপত্রদ্বারা যে মাদুর বানায়, পাখা তৈরি করে, ঝুড়ি বোনে, তাহার কারুকার্য্য দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঘাসের যে সবুজ মাদুর প্রকৃতিদেবী স্বয়ং বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, পত্রের যে বীজন নিয়তই চলিতেছে, লতাজালে যে সুন্দর চুপড়ি বনলক্ষ্মিগণ স্বহস্তে বয়ন করেন, বর্ব্বরহস্তরচিত সে সমস্ত মাদুর, পাখা, ও চুপড়ি কি না জানিয়া তাহাদেরি স্তব করে নাই? সুতরাং প্রয়োজনের শিল্পই বলি, বা অপ্রয়োজনেরই বলি, শিল্পমাত্রেই একটি অজ্ঞাত স্তব আছে—সে বলিতেছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে! নিতান্ত প্রয়োজনের দ্রব্যেও সেই ভাললাগা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে—নিতান্ত অসভ্য জাতির ব্যবহারের শিল্পেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি রস্কিনের এই সংজ্ঞার অর্থটি পরিষ্কার হইয়াছে। ইহা খুব চমৎকার, কিন্তু তথাপি ইহার একটি দোষ আছে। ইহাতে হঠাৎ এই ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, তবে বুঝি আর্ট কেবল প্রকৃতির অনুকরণ, প্রকৃতির ফটোগ্রাফ মাত্র। আর্ট কি অনুকরণের চেয়ে বড় নয়, তাহা কি স্বাধীন সৃষ্টি নয়?

যেমন ধর, যখন কোন চিত্রকর প্রকৃতির কোন সুন্দর দৃশ্যের ছবি আঁকিতেছে, তখন সে কি যেমনটি দেখিতেছে, তেমনটিই যথাযথভাবে আঁকিয়া যাইবে? তবে না আঁকিলেই হইত, এত মেহন্নত করিয়া আঁকিবার প্রয়োজন কি ছিল? কিন্তু কোন ভাল চিত্রকরই নকল করিয়া আঁকে না। তাহার কারণ, সে যে দৃশ্যটি আঁকিতেছে, তাহা তো শুধু চোখে-দেখা দৃশ্য নয়, তাহা তাহার মনের কল্পনার মধ্যে অনুভূতির মধ্যে যে ভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই দৃশ্যটি সেই ভাবরাগরঞ্জিত দৃশ্য—সুতরাং প্রকৃতিতে যে রাগ আছে, তাহার সঙ্গে হৃদয়ের রাগটিকে মিলাইয়া চিত্রকরকে ছবি আঁকিতে হইতেছে। সে ছবি কেমন করিয়া প্রকৃতির ফটোগ্রাফ হইবে?

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কেবল বাহিরের দৃশ্যমান সৌন্দর্য্যের উপরে কল্পনাও অনুভবের রঞ্জন মিশাইলেই কি সৃজন হইল? কাপড় বুনিল তন্তুবায়, আমি তাহাতে রং দিয়াছি বলিয়াই কি কাপড় আমি তৈরি করিয়াছি বলিতে পারি? সে তো যাহা আছে, তাহারি উপরে খানিকটা কারিকুরি করা মাত্র। সৃজন তাহাকে বলি কেমন করিয়া?

হায়, এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার যে ভগবানের সৃষ্টির উপরেও নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিবার দাবী রাখিবে? তাঁর এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বসৃষ্টি আমাদের চিত্তের ভিতরে আসিয়া রং ধরিতেছে, সেই কল্পনার রঙে অনুভূতির রঙে রাঙিয়া তাহাকেই পুনরায় আমরা আর্টে ব্যক্ত করিতেছি—মাছের তেলেই মাছ ভাজিতেছি—নূতন সৃষ্টি করিবার কথা কোন্ দুঃসাহসী মুখে উচ্চারণ করিবে?

তবে বিশ্বপ্রকৃতির উপর আর্ট এক জায়গায় জিতিয়া আছে। সম্পূর্ণতার যেটি তত্ত্ব, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Ideal, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোথাও নাই, সে তত্ত্বটি আছে কেবল মানুষের অন্তরে। তাহার কারণ, বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতিতে সমস্তই চঞ্চল, সমস্তই অস্থির—সেখানে যে পরিবর্ত্তনই নিয়ম—সকল বস্তুরই অহরহ রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহা ছাড়া সমস্তই সেখানে অপূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া পূর্ণতর অবস্থার দিকে চলিয়াছে বলিয়া—অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া—পূর্ণতাকে একেবারে কোথাও পাইবার জো নাই।

"কাছে যাই যার, দেখিতে দেখিতে
চ'লে যায় সেই দূরে—
হাতে পাই যারে পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে!"

সুতরাং বাহিরে যেখানে সকল জিনিসই পরিবর্ত্তনের মুখে, যেখানে শেষ পরিণাম কোথাও নাই, সেখানে পূর্ণতার আদর্শকে অন্বেষণ করাই বিড়ম্বনা।

সেই কারণে দেখা যায় যে, যে জ্ঞানী বাহিরের বিজ্ঞান-রাজ্যে পূর্ণতার তত্ত্বকে খোঁজেন, তাঁহাকে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পূর্ণতা কোথাও নাই; সমস্তই কেবল অন্তহীন প্রবাহের মধ্যে আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে চলিয়াছে। অসংহত বাষ্পপিণ্ড কোন্ আদিমকালে সংহত গ্রহের আকার লাভ করিয়াছিল, সেই পৃথিবী-গ্রহ ক্রমে ক্রমে আপনার উত্তাপ বিকীরণ করিতে করিতে শৈত্য লাভ করিল, ক্রমে বাষ্প জমাট বাঁধিয়া ধারাবর্ষণে সমস্ত পৃথিবীকে জলময় করিয়া দিল, ক্রমে কখন্ সেই অকূল দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সমুদ্র হইতে দানাবাঁধা স্থলসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল; সেই আদিম অরণ্য এবং মহাকায় ম্যামথ্ ম্যাষ্টোডন্ প্রভৃতি জন্তুর সেই

প্রথম জীবনযাত্রা,—তার পর কত তুষারস্রোত, কত অগ্ন্যুৎপাত, কত পর্ব্বতোচ্ছ্বাস, স্তরে স্তরে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কত জীবধারা এই পৃথিবীর মাটীর উপরে লীলা করিয়া মাটীতেই মিশাইল—শেষে মানুষ হিংস্রজন্তুরাজ্যের মধ্যে নগ্ন অসহায়ভাবে একদা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর হইতে কত নব নব বিকাশের পথে তাহার ইতিহাস অভিব্যক্ত হইয়া চলিল—কত জাতি জাগিল এবং কত জাতি বিলুপ্ত হইল এবং এখনও সমস্ত মানুষ যে কত বিচিত্রতার মধ্য দিয়া যাইবে তাহা কে জানে! সুতরাং বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে সম্পূর্ণতা কোথাও নাই, সম্পূর্ণতা কথাটা একটা আপেক্ষিক কথামাত্র। অমুকের চেয়ে অমুক অবস্থা পূর্ণতর এইটুকুমাত্র জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বলা চলে।

আমি এ প্রসঙ্গ লইয়া বেশি আলোচনা করিতে গেলে অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হইবে। কেবল এইটুকুমাত্র কথা আমাকে বলিতে হয় যে সম্পূর্ণতার আদর্শ যদি আমাদের ভিতরে না থাকে, তবে বাহিরে যে আপেক্ষিক সম্পূর্ণতা দেখিতেছি অর্থাৎ অমুক অবস্থার চেয়ে অমুক অবস্থা সম্পূর্ণতর দেখিতেছি, তাহাও দেখা সম্ভবপর হইত না। আইডিয়ারূপে সম্পূর্ণতার একটি তত্ত্ব আমাদের মনের মধ্যে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং আর্ট প্রকৃতির চেয়ে এই একটি বিষয়ে জিতিয়া আছে যে, আর্টের মধ্যে সেই সম্পূর্ণতার তত্ত্বটি আমরা দেখিতে পাই—আইডিয়াল্‌কে দেখিতে পাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আমি বলিয়াছি যে, আমরা যখন প্রাকৃতিক কোন দৃশ্যের ছবি আঁকি, তখন ফোটোর মত করিয়া আঁকি না, তাহাতে ভাবের রং মিশাই—তার মানে এই যে, যে দৃশ্যটি চোখে দেখি তদপেক্ষা সুন্দরতর দৃশ্যের আভাস দি। কিন্তু সেই সুন্দরতর দৃশ্যের আভাস পাই কোথায়? নিশ্চয় আমার মনের মধ্যে, কারণ বাহিরে তাহাতো কোথাও নাই। তেম্‌নি যখন মানুষের ছবি আঁকি, তখনও চোখেদেখা মানুষের বাহ্য চেহারাটাকেই যথাযথরূপে আঁকি না, কিন্তু যে ভিতরের অদৃশ্য মানুষটিকে দেখি নাই, যে মানুষটির কোন রূপ বাহির হইতে দেখিবার জো নাই, সেই সম্পূর্ণতর মানুষকেই আঁকি।

মনে আছে চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কোন রচনায় পড়িয়া থাকিব যে, যদি তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি আঁকিতে হয়, তবে তিনি বিদ্যাসাগরের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহারই নকল করিবেন না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের অঙ্গের পৌরুষের ও নানা মহত্ত্বের যে একটি পূর্ণ আদর্শ আমাদের মনে বিরাজ করিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা করিবেন। গান্ধারশিল্পে গ্রীক্‌গণ বুদ্ধের তপোমূর্ত্তি আঁকিতে গিয়া অস্থিপঞ্জর বাহিরকরা কঙ্কালসার এক মূর্ত্তি আঁকিয়াছিল, লাহোর মিউজিয়মে আজিও তাহা দেখা যায়, কিন্তু সেই মূর্ত্তিই কি যথার্থ বুদ্ধের মূর্ত্তি? কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধের বাহিরের চেহারাটা হয় ত ঐরূপ কৃশ ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে তো বাহিরের চেহারা—প্রবুদ্ধত্বের শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিটি কোথায়? আমাদের দেশে সেই মূর্ত্তিই আঁকিয়াছে—তাঁহার বাহিরের চেহারার সম্বন্ধে লেশমাত্র চিন্তা করে নাই।

যেমন চিত্রকলায়, তেম্‌নি সঙ্গীতে, তেম্‌নি কবিতায়—সম্পূর্ণতার আদর্শকেই আমরা দেখিতে চাই। এই জন্য সঙ্গীতে দুটি ভাগ আছে, তান এবং সম। তান ব্যাপ্তি, সম সমাপ্তি—তানে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় লহরে লহরে সুরকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, কিন্তু তাহার সমস্ত বিচিত্রতাকে ক্ষণে ক্ষণে সমে পৌছাইয়া দিতেই হইবে—না দিলে সঙ্গীতের সম্পূর্ণতা নাই। ঠিক্ সেই একই জিনিস কাব্যেও দেখা যায়। কেবল ভাবকে রূপ দান কাব্যের একমাত্র কর্ম্ম নহে, কিন্তু যে রূপটি দেওয়া যাইতেছে তাহা যে সত্য, তাহা যে সম্পূর্ণ, এই একটি স্থির নিশ্চয়তা থাকা চাই। যেমন কীট্‌সের Grecian urn—গ্রীক্ মৃৎপাত্রের উপর কবিতাটি। গ্রীক্ মৃৎপাত্রটির গায়ে একটি যজ্ঞোৎসবের ছবি আঁকা ছিল—বনের মধ্যে যুবক যুবতী বালবৃদ্ধ সকলে সমাগত হইয়াছে, কেহ বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ প্রণয়গুঞ্জন করিতেছে, পুরোহিত যজ্ঞবেদিকার কাছে মাল্যমণ্ডিত গোবৎসটিকে লইয়া চলিয়াছে—কোন্ সেই সুদূর অতীতকালের কোন্ একটি বিস্মৃত দিনের ছবি! কিন্তু কবি বলিতেছেন যে সে ছবি অনন্তের মধ্যে অমর হইয়া রহিল—কারণ সৌন্দর্য্যের মৃত্যু নাই—সৌন্দর্য্যই যে সত্য এবং সত্যই যে সৌন্দর্য্য—এই কথাটি সেই চিত্রিত মৃৎপাত্রটি চিরন্তন কাল ধরিয়া জানাইবে। তার মানে ঐ কবিতাটিতে কীট্‌স্ ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের একটি মৃত্যুহীন অনন্ত স্থিতির ভাব অনুভব করিয়াছেন—এই সত্যটির জন্য তাঁহার সৌন্দর্য্যকল্পনা পরিপূর্ণ রূপ পাইয়াছে। ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনকে কীট্‌স্ যদি ঐ কাব্যে না দেখিতেন, তবে তিনি যে সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করিতেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত, তাহা সত্যভ্রষ্ট হইত।

আমাকেও এবার তান ছাড়িয়া সমের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতে হয়—আমারও জাল গুটাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে আমরা দেখিলাম যে আর্টমাত্রেই বিশ্বসৌন্দর্য্যের স্তব, তার পরে দেখিলাম যে তাহাতে আর্ট অনুকরণ হইয়া পড়ে, সৃজন হয় না, এমন আশঙ্কা জাগে—সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানুষের হৃদয়ে এই উভয়ে মিলিয়া আর্টের সৃষ্টি হয় এই কথা বলা গেল—

কিন্তু তাহাও কেমন জোড়াতালির মত শোনায় বলিয়া শেষে দেখিলাম যে আর্টের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতার আদর্শ আছে, তাহাতে সে বাহিরের কেবল চোখে-দেখা মনে-অনুভব-করা অসম্পূর্ণ জিনিসকে সম্পূর্ণতর সুন্দরতর করিয়া প্রকাশ করে। এককথায় সে সুন্দরকে সত্য করিয়া তোলে।

আমি যদিও সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করিয়া প্রবন্ধ সুরু করিয়াছি, তথাপি অভ্যাসদোষে আমি সৌন্দর্য্য-তত্ত্বেরই নানা মতামতের পাকের মধ্যে ঘুরিতেছি—কিন্তু জাল যখন জড়াইয়াছি তখন বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই যে দুই রকমের মত যাহাকে ইংরাজীতে বলে Realism ও Idealism অর্থাৎ আর্টকে বাস্তববিশ্বছবির প্রতিচ্ছবি করিয়া দেখা, এবং আর্টকে অন্তরের সম্পূর্ণতার আদর্শের বাহ্যপ্রকাশ করিয়া দেখা—এই দুই মতই এক একদিক্-ঘ্যাঁষা মত। কারণ,

ভীতর কঁহু তো জগময় লাজৈ
বাহর কঁহুতো ঝূটালো—

যদি বলি যে ভিতরই সত্য, তবে সমস্ত জগৎ যে লজ্জিত হয়, যদি বলি বাহিরই সত্য, তবে যে মিথ্যা হয়। সুতরাং বাহির এবং ভিতর এই দুয়ের সমান সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আর্টের উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির বিচার করার প্রয়োজন। সেই কার্য্যে এখন প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

কিছু পূর্ব্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, বাহিরের জগৎটা পরিবর্ত্তনের জগৎ, বিকাশের জগৎ—সুতরাং একহিসাবে তাহার কোন বাস্তবিক সত্তা নাই। সে কোথাও স্থির হইয়া নাই বলিয়াই আমরাও তাহাকে কোথাও পুরাপুরি ধরিতে পাই না; তাহার যে অংশটুকু আমাদের চেতনাকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে আমরা তাহাকেই জানি। সেই জন্যইতো এক সময়ে এই পরিবর্ত্তমান জগৎটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি বাস্তবিক সত্তা বাহিরে নাই একথা যদি বলি, তবে বাহিরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার এমন একটি চিরন্তন দ্বৈতকে খাড়া করা যায়, যে মানুষের আত্মার আর কোন প্রকাশই থাকে না—শরীর নাই শরীরী আছে, রূপ নাই ভাব আছে, অর্থ নাই বাক্য আছে, ছায়া নাই আলো আছে—এম্নি একটা অদ্ভুত অসঙ্গত কাণ্ড তখন হইয়া উঠে। বাস্তবিক সত্তাকে আমরা সেই জন্য সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হই,—সে ভিতরেও যেমন, বাহিরেও তেম্নি—সমস্ত পরিবর্ত্তন-পরম্পরার মধ্যে সে অচঞ্চল হইয়া অবস্থান করিতেছে—সকল গতি তাহার অনন্ত স্থিতির দ্বারা অধিকৃত—এই কথাকে মানিতে আমরা বাধ্য হই।

কিন্তু এই যাহাকে বাস্তবিক সত্তা বলি, তাহাকে কি আমরা পাই? যদি মাঝে কোন আবরণ না থাকিত, বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমাদের চেতনার যোগ যদি অব্য-বহিত হইত, তবে আর আমাদের আর্টসৃষ্টির প্রয়োজনই হইত না। কেন? না তখন, কিছুই তো আর খণ্ডিত করিয়া জানিতাম না,—আমাদের দৃষ্টি শ্রুতি সমস্তই সর্ব্ব-ত্রই অখণ্ডতাকে পরিপূর্ণতাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু সে অখণ্ড দৃষ্টি আমাদের নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

হাঁরি ব্যার্গসঁ সেইজন্য আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যে, মানুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাস্তবিক সত্তাকে দেখিতে পায় না বলিয়া সে সব জিনিসকেই মোটেমাটে দেখে, শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া দেখে,—প্রত্যেকটি বস্তু যে অন্য যে কোন বস্তু হইতে অনেকগুণে স্বতন্ত্র—সেই স্বাতন্ত্র্যের কোন স্বাদ, কোন পরিচয় মানুষ পায় না। আমরা বস্তুমাত্রকে দেখি না, তাহার উপর যে ল্যাবেল মারা থাকে তাহা দ্বারাই আমরা তাহাকে জানি। শুধু যে বাহিরের বস্তু সম্বন্ধেই এই মোটেমাটে অত্যন্ত সাধারণ করিয়া দেখার অভ্যাস আমাদের হইতেছে তাহা নহে, ভিতরেও আমরা যখন যে অভিজ্ঞতাই লাভ করি না কেন, আমরা সে অভিজ্ঞতার যে একটি বিশেষ রস আছে তাহা বুঝিতেই পারি না, তাহাকেও কোন না কোন গড্ডালিকার মধ্যে ফেলিতে পারিলে আমরা বাঁচি। ব্যক্তির মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব জিনিসটাই এইরূপে চোখ এড়াইয়া যায়। আমা-দের সমস্ত সংস্কারই সাধারণ, অত্যন্ত অভ্যস্ত—আমরা যেমন সকল বাস্তবের বাহিরে, তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বের, নিজত্বেরও বাহিরে পড়িয়া আছি। কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃতি এক এক জনকে এই জীবনের মোটা অত্যন্ত সাধা-রণ ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন—এক এক জন মানুষ স্বাভাবিক এমন দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসে, যাহাতে তাহার কাছে এই সকল স্থূল সংস্কারের আবরণ একেবারে টেঁকে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্যার্গসঁ Realism, Idealism, কোনটাকেই প্রাধান্য দেন্ নাই। তিনি বলেন নাই যে কেবল অন্তরের আদর্শের দিক্ হইতেই আর্টের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। তিনি বরং বলিতেছেন যে চিত্রে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, কাব্যে আর্টের উদ্দেশ্যই ঐ শ্রেণীর মধ্যে, মোটমাটের মধ্যে সাধারণের মধ্যে কিছু না জড়াইয়া রাখিয়া একেবারে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্তাকে অনাবৃত করিয়া প্রকাশ করা। সুতরাং আমরা অন্তরের দিক্ দিয়া যে একটি সম্পূর্ণতার ভাব পাই,

বাহিরের প্রকৃতির উপর তাহাকে চাপাইলেই যে আর্টের সার্থকতা হয় তাহা নহে—বাহিরের উপরকার সংস্কারের স্থূল আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার চিরনূতন অখণ্ড সত্তাকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিলেই আর্টের সার্থকতা।

ব্যার্গসঁর এই ব্যাখ্যাটি অতি চমৎকার। আর্ট সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার আলোচনা অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমরা প্রত্যেক জিনিসকেই নানা সম্বন্ধের মধ্যে জড়াইয়া দেখি—সেই সকল সম্বন্ধের জটিল জটগুলা খুলিয়া যদি তাহাকে তাহার যথার্থ স্বরূপে দেখিতে পারিতাম, তবে সে কি আশ্চর্য্য সুন্দর বলিয়া এক নিমেষেই প্রতিভাত হইত। রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" কবিতায় নারীকে সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে—তাহার চিরন্তন সৌন্দর্য্যে দেখা হইয়াছে। "নহ মাতা, নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী!" একই সময়ে অনেক বস্তুকে সব মন দিয়া সব ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করা যায় না—আর্টকে সেইজন্য তাহার বিষয়কে স্বতন্ত্র করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া লইতেই হয়।

তোমরা আমার কাছে সাহিত্য, বিশেষতঃ ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ। আমার মনে হয় যে সৌন্দর্য্যের বিষয় বল, প্রেমের বিষয় বল—সকল জিনিসকেই এই একান্ত, স্বতন্ত্র, অখণ্ড করিয়া দেখাই সেখানকার সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। সেখানে সর্ব্বত্রই প্রবল হৃদয়াবেগকে কোন বিশেষ একটিমাত্র ক্ষেত্রে একান্ত করিয়া দেখিয়াছে—যেন পৃথিবীর মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে বড় জিনিস! শেক্‌সপীয়রের নাটকের মধ্যে মানব হৃদয়াবেগের কি প্রচণ্ড প্রবল সংঘাত দেখা যায়—হ্যাম্‌লেট্, লীয়র ওথেলো ম্যাক্‌বেথ্ প্রভৃতিতে দ্বিধা, ক্রোধ, সন্দেহ এবং উচ্চাভিলাষ কি ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়াছে! "উত্তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও যেমন আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে মধ্যে মধ্যে ভিতরের সঞ্চিত উত্তাপ একেকবার আপনাকে জানান্ দেয়," সেইরূপ নানাসংস্কারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন মানুষের ভিতরকার প্রবল আবেগগুলিকে চাপাচুপি দিয়া রাখিলেও এক এক সময় সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঝড়ের মত তাহারা গর্জ্জিতে থাকে—তখন তাহাদিগকে প্রশমিত করিবে এমন সাধ্য কাহার আছে? শেক্‌সপীয়রের সৃষ্ট চরিত্রদিগকে যে মানুষ আদর করিয়া আসিয়াছে তাহার কারণ এই, যে সেই সকল চরিত্রের মধ্যে মানুষ আপনারই একটি গভীরতর গোপনতর সত্তাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যে সকল আবেগকে আমরা চাপাদিয়া দিব্য conventional ভাবে চলি, তাহারা যে কত বড়, তাহাদের শক্তি যে কি ভয়ঙ্কর—তাহা মানুষ ঐ সকল নাটকে স্পষ্ট চোখে দেখিয়াছে।

শেক্‌সপীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া রবর্ট ব্রাউনিং পর্য্যন্ত সকল কবিরই মধ্যে এই বিশেষ বিশেষ আবেগের ঘূর্ণিপাক রচনার প্রয়াস দেখিতে পাই। বার্গসঁ যে প্রত্যেক বস্তুকে অত্যন্ত একান্ত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখাই আর্টের চরম উদ্দেশ্য বলিয়াছেন—ইউরোপীয় প্রায় কবিরই মধ্যে সে কথার সাক্ষ্য মিলে। কিন্তু সেই জন্যই এই ঐকান্তিকতাকে বড় বলিয়া মানিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতে হয়। কোন জিনিসকে তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিলে যদি তাহা আর্টের বিষয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই একটা দুর্ব্বলতা আছে—সে স্বতন্ত্র করিয়া এবং মিলিত করিয়া, ব্যষ্টি করিয়া এবং সমষ্টি করিয়া এই দুই ভাবে একই সময়ে কোন জিনিসকে দেখিতে অক্ষম। বিশ্বপ্রকৃতিতে একখণ্ড তৃণও বলে—আমাকে দেখ—এবং সত্যসত্যই তাহার রহস্য অনুধাবন করিয়া একজন মানুষ জীবন কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু সেই তৃণের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন চিত্রইতো বাদ পড়ে না—তৃণই যে বিশ্বের মধ্যে সব হইয়া বসে তাহাতো হয় না। কিন্তু মানুষের শিল্পসাহিত্যেই কেন এ ব্যাপার ঘটে যে সে একটা আবেগকে চিত্রিত করিতে গেলে তাহা এমন প্রবল, এমন একান্ত হইয়া উঠে, যে মনে হয় যেন আর কোথাও কিছু নাই?

এই কারণেই আমাদের দেশ হইতে এই কথাটা ওঠা দরকার হইয়াছে যে, আর্টের চরম উদ্দেশ্য এই যে সে ভিতরকার পরিপূর্ণতার আদর্শের দ্বারা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া সকল জিনিসের অন্তরতম সত্তাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবে—কিন্তু সে সত্তা স্বতন্ত্র হইবে না—তাহা একই কালে স্বতন্ত্র এবং মিলিত, সীম এবং অসীম হইবে। এবং এই সঙ্গে এই কথাও আমাদিগকে বলিতে হইবে যে মানুষের শিল্পসাহিত্য যে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে আজিও সার্থক করিয়াছে তাহা নহে।

একথা কেন বলিতেছি? না,—আর্টের ক্ষেত্রটা কত বড় তাহা চিন্তা করিয়া দেখ—তাহা সমস্ত মানুষ, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি! কিন্তু সেই বৃহৎ ক্ষেত্রে কি আর্ট বিচরণ করিতেছে? মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, বুদ্ধি, হৃদয়—সকল দিকের সঙ্গে কি ইহার মিলন অবারিত হইয়া গিয়াছে?

অথচ বড় শিল্পসাহিত্যের মধ্যে এই একটি বড় প্রসারই আমরা লাভ করি—সেই জন্যই এককালে নয়, কিন্তু সর্ব্বকালেই—একজাতির মধ্যে নয়, কিন্তু সকল জাতির মধ্যেই তাহারা আদৃত হইয়া থাকে। বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বিচিত্র অথচ অখণ্ড, বড় আর্টের মধ্যেও সেইরূপ একটি সরল ঔদার্য্য ও সমগ্রতার আনন্দ বিদ্যমান থাকে। যেমন ধর র‍্যাফেলের ম্যাডোনা কিম্বা খৃষ্টের চিত্র—তাহা

দেখিলে মনে হয়, এই? এই বই নয়? আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি কত আশ্চর্য্যই বা হইবে! তার মানে তাহা আকাশ বাতাসেরই মত সহজ সরল, তাহার মধ্যে কোন কলাচাতুর্য্য নাই। যিশুখৃষ্টের বাণী যেমন সরল অথচ যুগযুগান্তরতৃপ্তিবহ র‍্যাফেলের কিম্বা লিওনার্ডোডা ভিন্সির খৃষ্ট সম্বন্ধীয় চিত্রও সেইরূপ!

যেমন চিত্রে তেমনি বড় কাব্যে। যে কাব্যে আমরা মানবজীবনের প্রসার সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করি, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ যে কাব্যে ঝঙ্কার তোলে, মানবহৃদয়সভায় সেই কাব্য চিরন্তন আসন গ্রহণ করে। বাল্মীকির রামায়ণ, হোমারের ইলিয়াড্, কালিদাসের মেঘদূত, কীট্‌সের কবিতা, সেক্‌সপীয়রের নাটক—এইরূপ কাব্য—তাহা দেশকালের সঙ্কীর্ণ বাধাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

আমি 'পূর্ণিমা' কবিতার কথা দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। অথচ পূর্ণিমাকেই এতক্ষণ আমার এই বাদানুবাদ আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—অর্থাৎ যে চিরপূর্ণিমা চিরকাল মানুষকে ছবি আঁকাইয়াছে, গান গাওয়াইয়াছে, কবিতা লিখাইয়াছে তাহার কথাই আমি কম করিয়া বলিয়াছি। সে চিরপূর্ণিমা কোথায়—সে এই চিরসুন্দর বিশ্বপ্রকৃতি।

আমি বলিয়াছি যে ছোট বড় সকল বিষয়ে মানুষকে এই বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য উৎসব-সভায় বসাইয়া সঙ্কীর্ণতামাত্রের প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া আর্ট এখনও ফেলে নাই। আধুনিক যুগে আর্টের নিকট হইতে মানুষ সেই বড় প্রত্যাশাটি করিয়াছিল। কারণ আধুনিক যুগ সমস্ত মানুষকে সকল ক্ষেত্রে আহ্বান করিবার বড় যুগ। এখন প্রতিরাত্রেই থিয়েটার হইতেছে, মিউজিক হলে গান চলিতেছে, আর্ট এক্‌জিবিসনে নানা চিত্র ও মূর্ত্তি সকল প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু আধুনিক মানুষ সেই বড় কথাটি ভুলিয়া গিয়াছে যে All great in art is praise যে আর্টের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। যিনি যাহাই বলুন সেই ভূমাআর্টিষ্টকে ছাড়াইয়া যাইবার সাধ্য কাহারও নাই। ছবি দেখিতে কোন্ আর্ট গ্যালারিতে যাইব? একবার ঐ রাজপথে বাহির হইয়া দেখত—নীলাম্বরতলে কি বিপুল প্রাণপ্রবাহ চলিয়াছে—ছবির পর ছবি জাগিতেছে, মিলাইতেছে—কেহ বৃদ্ধ, কেহ বালক কেহ যুবা, কেহ বালিকা কেহ তরুণী, কেহ বৃদ্ধা—তাহাদের মুখে জীবনের কত অভিজ্ঞতার চিহ্ন—কত বেদনা, কত আনন্দ, কত করুণা,—এত মানুষের ছবি; নগর ছাড়াইয়া গ্রামে—দেশ হইতে দেশান্তরে, বিশ্বপ্রকৃতির কত বিচিত্র ছবি—কোন্ আর্ট গ্যালারিতে গেলে এই ছবির তুলনা মিলিবে? এই জীবচ্ছবির সঙ্গে কি আর্ট গ্যালারির ছবি মেলে? যদি মেলে ভালই, আর্টে বিশ্বপ্রকৃতিতে সেখানে অভিন্নাত্মা—কিন্তু যদি না মেলে, তবে আর্টকে লইয়া যতই নাচিয়া কুঁদিয়া অস্থির হও, সে চিরন্তন নয় জানিবে। কারণ All great in art is praise—বড় আর্ট তোমাকে বারবার প্রকৃতির মধ্যেই ঠেলিয়া দিবে। তেম্‌নি কোথায় গিয়া সঙ্গীত শুনিব? কোন্ মিউজিক হলে কোন্ বিটোভেন মোজার্টের রচনা? কাণ পাতিয়া শোন দেখি—জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে—কত মানবকণ্ঠে কত পবন প্রচারে, কত বিহঙ্গ কাকলীতে কত পল্লব মর্ম্মরে, কত নদীর কলতানে, সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জনে—সেই সম্মিলিত বিশ্বমহাসঙ্গীতের কাছে কোন্ তানসেন কোন্ মোজার্ট লাগেন? যে সকল লোক পশ্চিম দেশে অধুনা আর্ট আর্ট করিয়া সমস্ত জীবন সৌন্দর্য্যকে সৌখীন্ করিয়া সকল প্রয়োজন হইতে তুলিয়া জীবনের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহারা জানেন না যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি আর্টিষ্ট যিনি কবি, তাঁহার এই বিপুল আর্টগ্যালারিতে কোন ভেদবিভেদ নাই—সেখানে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য্য একত্র মিলিয়া আছে, সেখানে কর্ম্মের সঙ্গে আনন্দ সুগ্রথিত, সেখানে জটিলতা সরলতা সহোদর ভাইয়েরই মত। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, নীতিকে খেদাইয়া, প্রেমকে অপমানিত করিয়া, সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আহ্বান না করিয়া, কেবল সৌন্দর্য্যবিলাস পরিতৃপ্তির যে আর্ট তাহা কখনই সত্য নহে—কাউণ্ট টলস্টয় তাঁহার আর্ট নামক গ্রন্থে এই কথা বলিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্টের তরফ হইতে না বলিয়া, কেবল চারিত্রনীতির দিক্ হইতে বলিবার জন্য তাঁহার বক্তব্য কথাটি মারা গিয়াছে—সে নিতান্ত একদিকঘেঁষা কথা হইয়াছে। ঐ পূর্ণিমার কবি, ঐ Base of all metaphysics এর কবি ঠিকই লিখিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ মানুষকে, প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎকে বাদ্ দিয়া কতগুলি কথা, কিম্বা কতগুলি সেই রকমই নিরর্থক রং আর আকার আর সুর দিয়া যে মানুষ আপনাকে ভুলাইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য। না—আর্টকেই আজ সকল জায়গায় নামিতে হইবে—যেখানে মানুষ কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় প্রয়োজনের দাসত্ব করিয়া মরিতেছে, সেখানে সেই মজুরের জীবনকে একটু নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখাইতে হইবে—যেখানে নীতিবোধ উগ্র, ধর্ম্মভাব শুষ্ক—সেখানে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য, মানুষের প্রেমের সকল লীলাকে আনিয়া নীতিকে সুন্দর ও সৌন্দর্য্যকে নীতিময় করিয়া দিতে হইবে, যেখানে বড় বড় রাষ্ট্রচেষ্টা কেবলি কল গড়িয়া মানুষকে সেই কলের সামিল করিয়া তুলিতেছে, সেখানে আনন্দের হিল্লোল বহাইতে হইবে—আর্টের ক্ষেত্র সমস্তই—ভগবানের

স্বজনের সঙ্গে তাহার একাসন—তাঁহার সমস্ত চেষ্টা যেমন আনন্দরূপ অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে—মানুষেরও এই বিপুল চেষ্টাকে সেই একইরূপ ধারণ করিতে হইবে—যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে নাও হয়, তথাপি কর্ম্মে ও সৌন্দর্য্যে—ধর্ম্মে ও সৌন্দর্য্যে কদাচ বিরোধ যেন না হয়—আধুনিক যুগের আর্ট সেই কথাই বারবার করিয়া জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

নবজীবন।

কে তোমরা চলিয়াছ পথে
সঙ্গীতে মুখর করি পথ?
পুরেছে কি সব মনোরথ?

একি তোমাদের কলগান!
উৎসাহে পূরিল মনপ্রাণ
জীবনের নূতন বারতা
দিল নব পথের সন্ধান!

আমিও গাহিব জয়গান,
যাব আমি তোমাদেরি সাথে
অতীতেরে ফেলিব পশ্চাতে।

কাঁটা যদি বিঁধে পদতলে
চরণে চলিয়া যাব দলে'
শিরে যদি ঝরে বৃষ্টিধারা
ধন্য হ'ব, পুণ্যস্নান বলে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী।

আদি ব্রাহ্মসমাজে অব্রাহ্মণ আচার্য্যের বেদীগ্রহণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন ও তাহার উপসংহারে জানাইয়াছেন "এই পত্রের সদুত্তর না পাইলে অন্য কোনো পত্রিকায় ছাপাইয়া দিব।"

শরৎবাবু কল্পনা করিয়াছেন যে, বেদীর ব্যাপার লইয়া আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার বিরোধ ঘটিয়াছে। এ কথা সত্য নহে এবং ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তিরই বেদীতে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার কোনো জন্মগত পবিত্র অধিকার আছে এরূপ মত আমার দাদার নহে এ সম্বন্ধে পত্রলেখক মহাশয় নিঃসংশয় হইতে পারেন।

পত্রলেখক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "একবার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত বোলপুর-উৎসবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর বেদীতে বসিবার প্রস্তাব হইয়াছিল কি? দ্বিজেন্দ্রবাবু সে সময় কি বলিয়াছিলেন তাহা আপনার স্মরণ আছে কি?"

শ্রীযুক্ত অজিতকুমারের সহিত বড়দাদামহাশয়ের একত্রে বেদীতে বসিবার কোনো প্রস্তাব কোনো উৎসবেই হয় নাই সুতরাং তদুপলক্ষ্যে তিনি কোনো কথাই বলেন নাই। মোটের উপরে ইহাই জানি আচার্য্যের আসনে বসিয়া উপদেশ দিতে বড়দাদামহাশয় বারম্বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, জাতিকুলের কোনো বাধা যে তাহার কারণ নহে এ কথা বলাই বাহুল্য। বিগত ৭ই পৌষের উৎসবে আশ্রমের মন্দিরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার প্রাতঃকালে উপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন—সেই উপাসনা-সভায় বড়দাদামহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং সর্ব্বশেষে তিনিও সমাগত বালকগণকে মুখে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শরৎবাবু লিখিয়াছেন—"কেশববাবু কিছুদিন বেদীতে বসিয়াছিলেন বটে কিন্তু মহর্ষিদেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অল্পদিন পরেই কেশববাবুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।" এ কথা ঠিক নহে। সকলেই জানেন, কেশববাবু বেদীতে উপবীতধারী আচার্য্যদিগকে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই বিচ্ছেদ ঘটে, এবং পিতৃদেবের তৎকালীন পত্রে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে তিনি উভয় পক্ষকেই বেদী দিতে ইচ্ছুক।

রাজনারায়ণবাবু বহু অনুনয়-বিনয়ে বেদীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন একথাটা সমূলক বলিয়া আমি মনে করিনা। তিনি কখনো একলা বেদীতে বসেন নাই ইহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহাদের সময়ে বরাবর দুই অথবা তিনজন আচার্য্য বেদীর কার্য্য করিয়াছেন; ইহাই প্রথা ছিল—অব্রাহ্মণ আচার্য্যকে ব্রাহ্মণের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনধিকারের তীব্রতা দূরকরাই এ প্রথার অভিপ্রায় নহে।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে কোনো বিবাহে আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃদেব তাঁহার বৃত্তি রহিত করিয়াছিলেন এ কথা আমি জানি না; ঈশান বাবু স্বয়ং ইহার উত্তর দিতে পারেন।

শরৎবাবু লিখিতেছেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজ যে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বা আপনার প্রতিষ্ঠিত নহে, এ কথা স্বীকার করেন কি?" তাঁহার এ প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-

সমাজে যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই চিরদিন সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কি না সে তর্কের সময় এখন নহে—কিন্তু কালক্রমে সেই প্রথম-প্রবর্ত্তিত উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে এই পরিবর্ত্তন স্বীকৃত হইয়াছে, এবং রাজা রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীডে এরূপ পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধ নাই।

শরৎবাবু জানিতে চাহিয়াছেন আদিব্রাহ্মসমাজে অধ্যক্ষসভা আছে কি না এবং সেই সভায় বেদীর ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হইয়াছে কি না? অধ্যক্ষসভা নাই, সুতরাং আলোচনার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

গত মাসের পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম যে আমরা পিতৃদেবেরই পন্থা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি—শরৎবাবু মনে করিতেছেন এই উক্তির সহিত আমাদের ব্যবহারের ঐক্য নাই। তিনি আমাদের কথাটি প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। আমাদের কথাটা এই যে, কি রামমোহন রায়, কি মহর্ষি, সমাজকে মারিতে চান নাই, সত্যকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন; ইহাতে যেখানে সমাজের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইয়াছে সেখানে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। আমাদেরও সেই পন্থা। সমাজের সহিত বিরোধ করিতে বসা আমাদের ব্যবসায় নহে, যাহাকে সত্য বলিয়া ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যবহারে পরিণত করিতে পারিলেই আমরা জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিব। সত্যকে না হইলেও সমাজের চলে এ কথা আমরা মনে করিতেও পারি না। জগতের মধ্যে হিন্দুসমাজই কেবল লোকাচারের জালে নিশ্চল হইয়া জড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে তাহার পক্ষে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনাবশ্যক এ বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস নহে। এইজন্য, সমাজকে যদি রক্ষা করিতে চাই তবে তাহার হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কোনোমতে অসত্যের সহিত আপোস করিতে পারিব না। ইহাতে সমস্ত সমাজ যদি আপত্তি প্রকাশ করে তবে সেই আপত্তির কাছে হাল ছাড়িয়া দেওয়াই যে সমাজের সহিত সত্য যোগরক্ষা করা এ কথা কোনোমতেই মানিয়া লইতে পারিব না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণমাত্রই সমাজে শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করা যায় এই অদ্ভুত অসত্যের দ্বারা নানাদিকেই সমাজের অপকার হইতেছে—তথাপি সেই অসত্যকে রক্ষা করিবার সহায়তা করিলে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য করা হইবে এ কথা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বা বহির্গত কোনো সমাজ হইতেই বলা চলে না। বস্তুত সমাজের মতে সম্মতি দিয়া যাওয়া এবং সমাজ যেমনভাবে চলিতেছে তাহাকে বরাবর তেমনি ভাবে চলিতে দেওয়াই যদি সমাজের মঙ্গলসাধন বলিয়া গণ্য করা হয় তবে এ উপলক্ষ্যে রামমোহন রায় ও মহর্ষির দোহাই দিবার কোনো অর্থই নাই।

অথচ হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান কালে অব্রাহ্মণ উপদেষ্টার অভাব নাই। আমরা ত জানি কায়স্থবংশীয় কোনো কোনো মনীষী বেদ উপনিষদ গীতা লইয়া যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাতে হিন্দুসমাজ কিছুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। বস্তুত তাঁহাদের ব্যাখ্যা এমনি গভীর ও উপাদেয় হইতেছে যে গুরুর আসন তাঁহাদের পক্ষে কিছুমাত্র অশোভন হয় নাই। এমন স্থলে কালের স্রোতকে ও সত্যের বেগকে সম্পূর্ণ উজানে ঠেলিয়া একমাত্র আদিব্রাহ্মসমাজেই কি আমরা ধর্ম্মোপদেশকে কেবল জাতিবিশেষের ব্যবসায়ের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া মনের মধ্যে এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকিব যে আর যাহা বাঁচুক আর না বাঁচুক আমরা সমাজ বাঁচাইয়া চলিতেছি!

শরৎবাবু লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ আচার্য্য যখন দুষ্প্রাপ্য নহে তখন অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া হিন্দু-সমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইবার আবশ্যক কি?"

আমি বরঞ্চ সমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে রাজি আছি কিন্তু সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতে সম্মত নহি। অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইলে সমাজ অশ্রদ্ধা করিবে এ কথাকে শ্রদ্ধা করিলে সমাজকে অশ্রদ্ধা করা হয়। যুক্তিহীন অর্থহীন আচারই যে হিন্দুসমাজের প্রকৃতিগত এ কথাকে আমি শেষ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিব। কোনো একটা বিশেষ দুর্গতির দিনে সমাজের লোকে যাহা বলে বা যাহা করে তাহাই যে সেই সমাজের চিরন্তন সত্য এ কথা মান্য করিয়া আমি আপন সমাজের অপমান করিব না। যাহা আমার ধর্ম্মে বলে তাহা আমার সমাজে চলিবে না, মানুষের শুভবুদ্ধিতে যাহাকে শ্রেয় বলে আমার সমাজের মধ্যে তাহার সম্মতি মিলিবে না এ কথা আমি সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধেও অস্বীকার করিব। সমাজের সত্তা ত কেবল একটা সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই বদ্ধ ও খণ্ডিত নহে, তাহার যেমন একটি অতীত আছে তেমনি একটি ভবিষ্যৎ আছে। আজ আমাকে যাহা নিন্দা করিতেছে তাহাই আমার সমাজের নিন্দা নহে, কারণ, আমার ভাবী সমাজও আমার সমাজ। একদিন ইংলণ্ডে রাজবিচার-সভাতেওডাইনী বলিয়া কত নিরপরাধা স্ত্রীলোককে পোড়াইয়া মারিয়াছে, এই নিদারুণ অন্যায়ের প্রতিকারে সেদিন যদি সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে একটিমাত্র ব্যক্তিও দাঁড়াইত তবে সেইব্যক্তিই সমাজের যথার্থ সত্যকে ঘোষণা করিত এবং অদ্যকার সমস্ত ইংলণ্ডসমাজে সেই ব্যক্তির কথাই সমর্থন করিত। সেইদিনের মোহাচ্ছন্ন সমাজই কি সমাজ, আর অদ্যকার মোহমুক্ত সমাজই কি মিথ্যা?

তাই বলিতেছি, কোনমতে ব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া দিলেই অন্ধকার হিন্দুসমাজ যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে তবে সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া মানবসমাজের চিরকালীন সত্যধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিতে পারিব না।

সর্ব্বশেষে শরৎবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছেন :—"আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগরক্ষা করা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হইলে আপনি প্রকাশ্যভাবে সাধারণসমাজে মিলিত হউন, আদিব্রাহ্মসমাজের ভাবকে পরিবর্ত্তন করিবার আপনার অধিকার নাই।"

আমার প্রতি শরৎবাবুর এই উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ কোনো সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে। এই সমাজের সহিত যোগ রাখার কারণে কোনো সমাজের সহিত যোগের বাধা নাই। ইহা বিশেষভাবে উপবীতধারী বা উপবীতহীন বা উপবীতত্যাগীর সমাজ নহে। যদি রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড ভাল করিয়া পড়িয়া দেখেন পত্রলেখক মহাশয় দেখিতে পাইবেন যে, এই ব্রাহ্মসমাজের সভা জগতের সর্ব্বজনের পিতাকে সর্ব্বজনীন প্রণালীতে পূজা করিবার সভা। যিনি যে সম্প্রদায়েই থাকুন্ না, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে যাঁহার যে মতই থাক্না, এই একটি জায়গায় সকলে ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ অধিকারে মিলিতে পারিবেন; এখানে সম্প্রদায়ের ভেদ যেমন গণ্য হইবে না, জাতিকুলের ভেদ তেমনি পরিত্যক্ত হইবে। সমাজে সংসারে মানুষের পার্থক্যের অগণ্য কারণ আছেই এবং থাকিবেই—কিন্তু একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষ আপনার সমস্ত ভেদ মিলাইয়া পাশাপাশি একাসনে বসিতে পারে। আদিব্রাহ্মসমাজ সেই প্রশস্ততম ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা এখানে মানুষকে তাহার আচার ব্যবহার বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করি না—কেবল আমাদের এই আহ্বান যে, সর্ব্বমানবের এক পিতাকে সকল মানুষের সঙ্গে এককণ্ঠে ডাকিবার জন্য এখানে সকলে আগত হও। তাই বলিতেছিলাম যখন এই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগের দ্বারা কোনো সমাজের সঙ্গেই ভেদ ঘটে না তখন বিশেষ ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষভাবে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন আমি লেশমাত্র অনুভব করি না। আমি সকল সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাদের কাছ হইতে আমার যাহা কিছু শিক্ষা করিবার আছে তাহা আমি শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিতে চাই।

এই আদিব্রাহ্মসমাজের ভাবকে পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আমার নাই? নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু এই ভাবকে পরিণত করিয়া তুলিবার অধিকার আমার সম্পূর্ণই আছে। ভাবের পূর্ণবিকাশ এক মুহূর্ত্তেই হয় না। জাগতিক সকল বিকাশেরই যেমন ইতিহাস আছে, ধর্ম্মসমাজে তাহার সত্যভাববিকাশেরও তেমনি ইতিহাস আছে। তাহা প্রথম অবস্থায় অপরিস্ফুট থাকে, ক্রমে পরিস্ফুট হইবার কালে বাহিরের নানা বাধায় তাহাকে আক্রমণ করে, তাহার মূল ভাবটি মাঝে মাঝে বিরোধের ঝড়ের ধূলিতে আচ্ছন্ন ও ম্লান হইয়া যায়। এই বাধাগুলিকে অপসারিত ও আবরণগুলিকে মুক্ত করাকে ভাবের পরিবর্ত্তন করা বলে না—তাহাদিগকে চিরকাল রক্ষা করিলেই ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে। যে বিপ্লব এই বাধাগুলিকে অপসারণ করে তাহাকে সহসা বিরুদ্ধতা বলিয়াই ভ্রম হয় কিন্তু তাহাই যথার্থ আনুকূল্য—তাহা আচ্ছাদনকে আঘাত করিয়া সত্যকেই উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। একদিন যখন আদিসমাজের বেদীতে উপবীতধারী উপবীতহীন ও উপবীতত্যাগী সকলকেই পাশাপাশি বসিতে আহ্বান করা হইয়াছিল সেইদিনই আদিসমাজের ভাবটি যথার্থ প্রকাশ পাইয়াছিল, তার পরে যদি বিবাদের উত্তেজনায় সে ভাব ম্লান হইয়া থাকে তবে পুনর্ব্বার তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে তবেই আদিসমাজের ভাবটিকে রক্ষা করা হইবে।

"নিজের জেদ বজায় করিতে গিয়া" আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বিবাদবিচ্ছেদ সৃষ্টিকরা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া পত্রলেখকমহাশয় আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা আরামের উপদেশ, তাহা বিজ্ঞজনোচিত। সংসারে এরূপ উপদেশ পালন করিবার লোকের অভাব নাই কিন্তু জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা তাঁহারা সমস্ত বিরোধ বিচ্ছেদ, এমন কি, মৃত্যুর মুখেও শেষ পর্য্যন্ত নিজের জেদ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতে পারি এমন সামর্থ্য নাই কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করাও চলিবে না। শরৎবাবু পিতৃদেবের জীবনী যদি পড়িয়া থাকেন তবে দেখিবেন একদা সাংসারিক পরমসঙ্কটের দিনে তিনিও "যুক্তিসঙ্গত" কাজ করেন নাই, তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও প্রবীণ হিতৈষিগণের একান্ত নির্ব্বন্ধসত্ত্বেও তিনি নিজের জেদ বজায় রাখিয়াছিলেন। তখন সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রাচীন সমাজের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল কিন্তু তবু তিনি নিজের সেই জেদ ছাড়েন নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ের জীবনেও আমরা এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। যে জেদ সুবিধার জন্য নহে, স্বার্থের জন্য নহে; যে জেদ আরামের চিরকালীন বেড়া লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমপথে সত্যের ও মঙ্গলের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত করে সেই জেদ রক্ষা করিবার শক্তি যদি কিছুমাত্র লাভ করি তবে

বাহিরের দিকে কর্ম্ম সফল হউক্ আর নিষ্ফল হউক্, প্রশংসাই পাই আর নিন্দাই পাই, জীবনকে কৃতার্থ হইল বলিয়া জ্ঞান করিব।

শরৎবাবুর পত্রখানি আমরা নিম্নে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীশ্রীহরি

শরণং— ২২।২।১২।

পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মহাশয় সমীপেষু—

এই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী" নামক প্রবন্ধটী পড়িয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা আপনাকে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া এই লিপিখানি পাঠ করিয়া পত্রিকায় উত্তর প্রকাশ করিলে বড়ই বাধিত হইব।

১। বিষয়টি আদি ব্রাহ্মসমাজের ঘরের কথা। ইহা লইয়া কাগজে লেখা পড়া করিয়া সাধারণের নিকট আমরা কি হাস্যাস্পদ হইতেছি না?

২। বহুকাল অবধি আদি ব্রাহ্মসমাজে অধ্যক্ষ সভা নাম্নী এক সভা ছিল। এখনও কি সে সভাটি বর্ত্তমান আছে? যদি থাকে তবে কি সে সভায় এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইয়াছিল?

৩। আপনি কি এ সম্বন্ধে আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত লইয়াছিলেন?

৪। একবার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত বোলপুরের উৎসবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর বেদীতে বসিবার প্রস্তাব হইয়াছিল কি? দ্বিজেন্দ্রবাবু সে সময় কি বলিয়াছিলেন তাহা আপনার স্মরণ আছে কি?

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ যে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বা আপনার প্রতিষ্ঠিত নহে এ কথা স্বীকার করেন কি?

৬। আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ৺রাজা রামমোহন রায় যে ট্রষ্টডিড্ করিয়াছিলেন স্বর্গীয় মহর্ষিদেব তাহার একজন ট্রষ্টিমাত্র। একথা জানিয়া শুনিয়া ও সে ডিডের কথা উল্লেখ না করিয়া আপনার পিতৃদেবেরই কথার উল্লেখ করিয়াছেন কেন? যদি ঐ ডিডে অব্রাহ্মণকে বেদী দিবার কথা কিছু না থাকে তবে তাঁহার কার্য্যগুলি আলোচনা করিয়া দেখুন। শূদ্রকে বেদী দিবার কথা দূরে থাকুক তিনি নিজে কখনও বেদীতে বসিতেন না। স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কি আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না?

৭। ১৭৭১ শকে ৺রাজনারায়ণবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। প্রায় ২৫।২৭ বৎসর পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিবার পর রাজনারায়ণবাবু বেদীতে বসিবার জন্য মহর্ষিদেবকে ১৭৯৮ শকে অনুরোধ করেন। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই রাজনারায়ণবাবুকে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ আচার্য্যের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন কিন্তু একেলা বসিবার অনুমতি দেন নাই। তাহাও অল্প দিনের জন্য। কেশব বাবু কিছুদিন বেদীতে বসিয়াছিলেন বটে কিন্তু মহর্ষিদেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অল্প দিন পরেই কেশববাবুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বিবাহ-কালীন আচার্য্যের কার্য্য করায় তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণবাবু ও কেশববাবু সে সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানবাবুর মত প্রকাশ্য সাধারণসমাজভুক্ত ছিলেন না। মহর্ষিদেব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কোন ব্রাহ্মকে কি কখনো আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন? পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণকে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীর নিম্নে বসিয়া বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি কিন্তু বেদীতে বসিবার অধিকার পান নাই। হিন্দু সমাজের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই মহর্ষিদেবের অভিপ্রায় ছিল। আদি সমাজের অন্যান্য আচার্য্যগণ চিরকালই হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন, একথা মহর্ষিদেব বেশ জানিতেন। মহর্ষির এই সকল কার্য্য দেখিলে তাঁহার অভিপ্রায় কি আমরা বুঝিতে পারি না? আপনি একথাগুলি না ভাবিয়া কিরূপে পিতৃপদানুসরণ করিতেছেন তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আর আপনিই পিতৃপদানুসরণ করিতেছেন এবং দ্বিজেন্দ্রবাবু করিতেছেন না একথা কি বলিতে চাহেন? ব্রাহ্মণ আচার্য্য যখন দুষ্প্রাপ্য নহে তখন অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া হিন্দু সমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইবার আবশ্যক কি? আর বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিবার-অধিকার পাইলে শূদ্র মহাশয়েরই বা কি বিশেষ দুর্লভ পদ লাভ হইবে? নিজের জেদ বজায় করিতে গিয়া আত্মীয়স্বজনগণের সহিত বিবাদ ও পুরাতন ব্রাহ্মগণের সহিত বিচ্ছেদ করা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হইতেছে? আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রক্ষা করা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হইলে আপনি প্রকাশ্য ভাবে সাধারণসমাজে মিলিত হউন, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে পরিবর্ত্তন করিবার আপনার অধিকার নাই।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন যে মুমূর্ষু আদি ব্রাহ্মসমাজকে নিষ্ঠুর আঘাতে বিনাশ করিবেন না। যদি সামর্থ্য থাকে তবে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করুন। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপর হিন্দু সমাজের সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। প্রেমের বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া রাখুন, ঘরে বাহিরে অসন্তোষের তুষানল নিভাইয়া দিন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে রক্ষা করুন। এই পত্রের সদুত্তর না পাইলে অন্য কোন পত্রিকায় ছাপাইয়া দিব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বশম্বদ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

রহস্যের সুর।

অমৃতের কুঞ্জে পিক উঠিল গাহিয়া
মেলিল মুকুল আঁখি আলোকে নাহিয়া!
স্নিগ্ধভাতি দীপসম উজ্জলতারক,
—গগনের সুপ্তিকোলে তমঃনিবারক—
ম্লান হয়ে আসে ক্রমে,—পূরব মুখের
পূতহাসি ফুটে উঠে পরম সুখের!
পুলকরোমাঞ্চফুল্ল অনন্তের মাঝে
প্রভাতের রৌদ্ররাগ রিমিঝিমি বাজে।

ধেয়ে আসে বাঁকা পথ ধারাকার হ'য়ে
চ'লে যায় দিশেদিশে জনস্রোত ল'য়ে।
সে যেন আপনা মাঝে কাহারে খুঁজিছে
আপন সুদূর-অর্থ নিজে না বুঝিছে!
কোন্ আদিজনমের কি গান গাহিয়া
বিস্মৃত স্মৃতির ঢেউয়ে চলেছে বাহিয়া!
আজি পিককুহরিত পুষ্পউপবনে
কোন্ আদিরহস্যের সুর জাগে মনে—
বারবার ভুলে যাই—তবু চেতনার
মাঝেমাঝে বাজে তারি অশ্রুতঝঙ্কার!

শ্রীকালিদাস বসু।

বেদান্তবাদ

শ্রীনিম্বার্কদর্শন

(খ)

আজ আমরা এই দর্শনের আর কয়টি অবশিষ্ট প্রধান-প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিব; আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, বন্ধ ও মোক্ষ সম্বন্ধে এই দর্শন কিরূপ মত পোষণ করে।

ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বা সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, ইহা সমস্ত বেদান্তবাদীরই সাধারণ মত। এই দর্শনে ব্রহ্ম চিদচিৎস্বরূপ ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদিগণ আরো বলেন যে, তিনি স্বাভাবিক অনন্ত ও অচিন্ত্য কল্যাণগুণসমূহের আশ্রয়; অতএব তিনি সগুণ সবিশেষ; নির্গুণ নির্বিশেষ নহেন। এস্থানে সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে যে, ব্রহ্ম যদি সগুণ ও সবিশেষ হইলেন, তাহা হইলে "একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম," "এখানে কিছু নানা নাই; যে এখানে নানার ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর নিকট হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়," "নির্গুণ নিষ্কল (নিরংশ) শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন," ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে যে নির্গুণ নির্বিশেষ বলা হয়, তাহার সামঞ্জস্য কোথায়? ইহার উত্তরে তাঁহারা এইরূপ উত্তর করেন:— নির্গুণ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভগবানের সমস্ত গুণেরই নিষেধ হইতেছে,—তাঁহার কোন গুণ নাই, এরূপ বুঝিতে পারা যায় না; কেননা, যদি তাহাই হয়, তবে, তাঁহার যে স্বাভাবিক গুণের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। যাহা যাহার স্বাভাবিক গুণ, তাহার তাহা কিছুতেই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। দহন বা প্রকাশন প্রভৃতি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অগ্নির এই সকল ধর্ম্মকে আমরা কখনো নিষেধ করিতে পারি না,—আমরা বলিতে পারি না যে, অগ্নির এই সকল ধর্ম্ম নাই। এইরূপই, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি প্রভৃতি শব্দে ব্রহ্মের যে সকল গুণের কথা বলা হইয়াছে, যে সকল গুণ স্বাভাবিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে অপলাপ করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মকে নির্গুণও বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে কোন হেয় (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য নিষ্ঠুরত্ব-প্রভৃতি) বা মিথ্যা গুণ নাই; তাঁহার সমস্ত গুণই উপাদেয় কল্যাণ ও সত্য। ব্রহ্মকে যে অজ্ঞেয় বলা হয়, তাহারও তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, তিনি নির্গুণ। ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ প্রভৃতির ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না; কেহ পরিচ্ছিন্ন করিয়া জানাইতে পারে না যে, ব্রহ্মের স্বরূপ এইটুকু এবং তাঁহার গুণ এই কয়টি; কেননা, তাঁহার স্বরূপগুণাদি অনন্ত ও অচিন্ত্য। অতএব যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলিয়া থাকে তাহাদের ইহাই তাৎপর্য্য যে, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ইয়ত্তা করিয়া জানা যায় না। অতএব তিনি সগুণ, তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের একমাত্র রাশিস্বরূপ। সেই গুণসমূহ, যথা, জ্ঞান (অর্থাৎ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ববস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব), শক্তি (অঘটনঘটনায় পটুতরস্বরূপ সামর্থ্য), বল (বিশ্বধারণাদির শক্তি), ঐশ্বর্য্য (বিশ্বনিয়মনশক্তি), তেজঃ (অপরিমিত শ্রমহেতু থাকিলেও শ্রমহীনতা), বীর্য্য (অন্যে অভিভব করিতে পারে না, অথচ অন্যকে অভিভব করিতে পারা যায়, এইরূপ শক্তি), সুশীলত্ব (জাতিপ্রভৃতির মহত্ত্বকে কোন অপেক্ষা না করিয়া অতি মূঢ়েরও সহিত অমায়িকভাবে আলিঙ্গন করা), বাৎসল্য (ভৃত্যের দোষ-অগ্রহণ), মার্দ্দব (আশ্রিতজনের দুঃখে অসহিষ্ণুতা), কারুণ্য (পরদুঃখের অপনয়নস্বভাব) ইত্যাদি। ব্রহ্মে একদিকে যেমন অনন্ত কল্যাণগুণ রহিয়াছে, সেইরূপ অপর দিকে তাঁহাতে রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষের অভাবও রহিয়াছে, তিনি সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষ।

"এই যে আদিত্যের মধ্যে হিরণ্ময় হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ ও নখপ্রান্তপর্য্যন্ত সুবর্ণপুরুষ দৃষ্টিগোচর হন"—ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ অনুসরণ করিয়া এই দর্শনে ব্রহ্মের বিগ্রহ বা শরীর স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শরীর আমাদের শরীরের ন্যায় প্রাকৃত ও অনিত্য নহে, ইহা অপ্রাকৃত ও নিত্য।

বাজসনেয়ি সংহিতার (৩১.২২) একটি মন্ত্র এইরূপ:—"শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার পত্নী, দিন ও রাত্রি তোমার পার্শ্ব, নক্ষত্রসমূহ তোমার রূপ,......।" এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এই দার্শনিকগণ ব্রহ্মকে রমাকান্ত, রমানিবাস প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া পুরুষোত্তম, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পদও ইঁহারা ব্রহ্ম-অর্থে প্রয়োগ করেন।

জীবসম্বন্ধে ইঁহারা বলেন:—জীব দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-

বুদ্ধি ও প্রাণ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন চেতনপদার্থ। ইহা "আমি" এই প্রত্যয়ের বিষয় ও জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্বপ্রভৃতি ইহারই ধর্ম্ম। ইহার স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি সমস্তই পরমেশ্বরের অধীন। ইহা অণুপরিমিত, অনন্তসংখ্যক, এবং প্রতিশরীরে ভিন্ন-ভিন্ন। ইহার বন্ধ ও মুক্তি হইয়া থাকে। স্বয়ং ইহার কোন কর্তৃত্ব নাই, ইঁহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অধীন; তিনিই ইহাকে সাধু বা অসাধু কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তজ্জন্য ইঁহার কোন দোষ হইতে পারে না, কারণ জীবের উৎপত্তি নাই, ইহা অনাদি কাল হইতে রহিয়াছে, অনাদি-ভাবে বীজাঙ্কুরের ন্যায় ইহার ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়াছে, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মকেই অনুসরণ করিয়া পরমেশ্বর তাহার ফল বিধান করিয়া থাকেন। জীব পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা সম্পূর্ণ অভিন্নও নহে; ইহা তাঁহা-হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই; জীবে পরমেশ্বরের স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয়ই রহিয়াছে। ইহা তাঁহার অংশ; কিন্তু খণ্ডরূপ অংশ নহে। তাহা হইলে ব্রহ্মকে যে "নিষ্কল" অর্থাৎ খণ্ডহীন বলা হয়, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। আবার যেমন রাজপুরুষকে রাজার অংশ বলা হয়, জীব ব্রহ্মের সেরূপ অংশও নহে; কেননা, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে জীব অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়ে। অতএব জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ, আর স্বয়ং ব্রহ্ম অংশী। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট নিত্যমুক্ত অংশী ব্রহ্ম হইতে অল্পজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট বন্ধমোক্ষার্হ অংশ জীব ভিন্ন হইলেও অংশের স্থিতিপ্রবৃত্তিপ্রভৃতি অংশীর অধীন হওয়ায় অংশ অংশী হইতে অভিন্ন হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এই জীব অঘটনঘটনপটীয়সী অনাদি মায়া বা প্রকৃতি বা কর্ম্মদ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রদীপকে কোন আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে তাহার প্রভা যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত মায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে জীবের স্বরূপভূত জ্ঞানও সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। জীবের এই সঙ্কুচিতাবস্থার নামই বন্ধ। সঙ্কোচ-কারণ আবরণ বিনষ্ট হইলে প্রদীপপ্রভা যেমন নিজের স্বাভাবিক প্রসার লাভ করে—স্বাভাবিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সঙ্কোচকারণ প্রকৃতির সম্বন্ধ অপগত হইলে জীবের জ্ঞান যে নিজের স্বাভাবিক বিস্তার বা প্রকাশ লাভ করে, তাহারই নাম মোক্ষ। প্রদীপপ্রভার সঙ্কোচ যেমন তাহার স্বাভাবিক নহে, জীবের জ্ঞানেরও সঙ্কোচ সেইরূপ স্বাভাবিক নহে, আবরণসংসর্গে প্রদীপ-প্রভার ন্যায় অনাদিকর্ম্মাত্মক মায়াসংসর্গেই তাহা সঙ্কুচিত হয়। এইজন্য প্রদীপপ্রভার সঙ্কোচের ন্যায় জীবের জ্ঞানসঙ্কোচরূপ বন্ধ স্বরূপত—স্বভাবত বন্ধ নহে। তাহা আগন্তুক নৈমিত্তিকমাত্র। অতএব বন্ধন স্বরূপত না থাকায় মুক্তিও তাহার স্বরূপত নহে ইহা বলিতে পারা যায়; কেননা, যাহার বস্তুত বন্ধন থাকে তাহারই মুক্তি হইতে পারে। এইজন্য জীবের বন্ধন ও মুক্তি বলিলে তাহা ব্যাবহারিকভাবে আপেক্ষিক বা নৈমিত্তিকরূপে বুঝিতে হয়।

বন্ধাবস্থায় জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকায় জীব নিজের স্বরূপ যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহ ভিন্ন ইহা জানিতেও পারা যায় না; "যাঁহাকে ইনি বরণ করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে "তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে" ইত্যাদি বাক্যে বিহিত ধ্যান করিতে পারা যায়, ধ্যান করিতে পারিলে তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাক্ষাৎকার হইলেই কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতির সম্বন্ধরূপ প্রতিবন্ধ বা বাধা নিবৃত্ত হইলে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভগবৎপ্রাপ্তির নামই মোক্ষ।

"মম" (অর্থাৎ "আমার") এই বুদ্ধিতেই লোক বন্ধন-প্রাপ্ত হয়, এবং "ন মম" (অর্থাৎ "আমার নয়") এই বুদ্ধিতে অমৃত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হওয়া আবশ্যক, এবং তাহা হইলেই দেহ ও আত্মার যে "আমার" ও "আমি" জ্ঞান থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। বন্ধাবস্থায় জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া থাকায় জীবের তখন যথার্থ স্বরূপজ্ঞান প্রকাশ পায় না। মুক্তি-অবস্থায় জ্ঞান আর সঙ্কুচিত হইয়া থাকে না, তখন তাহা নিজের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাতেই এই সময়ে জীবের স্বাভাবিক স্বকীয় স্বরূপ আবির্ভূত-প্রকাশিত হয়। জীব সেই সময়ে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, তাহার "আমি" ও "আমার" এই বুদ্ধি থাকে না। "আমি শ্রীভগবানের" এই বলিয়া তখন সে নিজের সহিত ভগবানের সম্বন্ধকে সাক্ষাৎ করে। এই সাক্ষাৎকার হইতেই সে তখন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অনবচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও গুণাদির অনুভব করিতে করিতে অবস্থান করে। ভগবৎপ্রাপ্তি বলিতে এইরূপ অনুভূতির সহিত অবস্থিতিকেই বুঝিতে হয়। এই অবস্থিতি নিরাতিশয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ।

এই ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিরই অপর নাম ভগবদ্ভাবাপত্তি। ভগবদ্ভাব শব্দের অর্থ ভগবানের সাম্য বা সাদৃশ্য। মুক্তাবস্থায় জীবের সহিত ব্রহ্মের বহু সাদৃশ্য থাকে। প্রধানত সাদৃশ্য দ্বিবিধ হইতে পারে,—স্বরূপের সাদৃশ্য ও গুণের সাদৃশ্য। এই অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই একরূপ—জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বরূপ-সাদৃশ্য ইহাদের আছে। আবার এই অবস্থায় জীবের ব্রহ্মেরই ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান থাকায় উভয়ের গুণগত সাদৃশ্যও থাকে। সাদৃশ্য বলিলে উভয় পদার্থের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাংশে ঐক্য বুঝা যায় না, কোন কোন অংশে তাহাদের অনৈক্য অবশ্যই থাকিবে। মুক্তাবস্থায় জীব হইতে ব্রহ্মেরও এইরূপ কোনো কোনো অংশে অনৈক্য থাকে; যথা, ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা বা বিশ্বের নিয়মনকর্তৃত্ব, এই গুণদ্বয় কেবল ব্রহ্মেরই, জীবের নহে।

ভগবৎপ্রাপ্তি বা ভগদ্ভাবাপত্তি নামে যে মুক্তির কথা উক্ত হইল, তাহাই আবার স্থানবিশেষে সাম্য, সাযুজ্য, ব্রহ্ম, অমৃত, মহিমা, ইত্যাদি বহু শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

ভ্রম-সংশোধন।

গত ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় "আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী" শীর্ষক প্রবন্ধে ২৬৪ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের ১১শ ছত্রে "ব্রহ্মের" স্থানে "ব্রাহ্মের" হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম-কথা।

এবার আশ্রমের প্রধান খবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রম হইতে দীর্ঘকালের জন্য বিদায়গ্রহণ। ৪ঠা ফাল্গুন তিনি আশ্রম হইতে বিদায় লইয়াছেন।

বিদ্যালয়ের জন্মকাল হইতে এতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রায় সকল সময়ই আশ্রমে বাস করিয়াছেন,বোধ হয় দুতিন মাসের বেশি কখনই অনুপস্থিত থাকেন নাই। সমস্ত আশ্রমের সকল মানুষ, সকল চিন্তা, সকল কর্ম্ম তাঁহার সঙ্গে এমনি একান্তভাবে জড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁহার সহিত সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদ এখানকার পক্ষে নিদারুণ।

তথাপি আশ্রমবাসী সকলেরই মধ্যে তাঁহার যাত্রায় এই একটি আনন্দ আছে যে তিনি আমাদেরই সকলের হইয়া যাত্রা করিতেছেন—না, সেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া দেখা—কারণ এই যাত্রায় তিনি নানাদেশ হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন তাহা তিনি সমস্ত মানবজাতিরই অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারে রসভাণ্ডারে দান করিয়াই যাইবেন; তিনি কবি, তিনি মনীষী—তিনি যাহা পাইবেন তাহা সকলেরই পাওয়া।

নদীকে অনেক সময় মানুষ আপনার প্রয়োজন সাধনের জন্য বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া লয়—তাহার জলকে নানাপ্রকারে আবিল-মলিন করিয়া তোলে; ভুলিয়া যায় যে নদী প্রয়োজন মিটাইলেও সে কোন ঘাটেই বাঁধা নয়—সে বৃহৎ সভ্যতার ধাত্রীমাতা, সমস্ত দেশের সে নাড়ী; অথচ তাহাও তাহার শেষ পরিচয় নয়,—তাহার শেষ পরিচয় তাহার আশ্চর্য্য অশ্রান্ত গতিবেগে এবং কলধ্বনিমুখর সঙ্গীতে। আমরাও সেইরূপ কবিকে প্রয়োজনের বেড়া দিয়া লইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বড় জোর যে, এই আশ্রমে বসিয়া তিনি দেশহিতকর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু সেই কি তাঁহার শেষ পরিচয়? না—কারণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপ, সকল রস, সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্ম, সকল সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যোগযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দেখাই তাঁহার শেষ পরিচয়—তিনি দেশবিশেষেও আবদ্ধ নন্।

তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নানা উপলক্ষ্যে আমাদিগকে কেবলি বলিয়াছেন যে, তিনি সেই সমস্ত বিশ্বের একটি হাওয়া আমাদের এই আশ্রমের মধ্যে বহাইতে চান। আমরা এই একটুখানি জায়গার মধ্যে আছি, এবং পঠনপাঠন করিতেছি, এ সংস্কারটাকে দূর করিয়া ইহাই আমাদের দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করাইতে চান্ যে আমরা বিশ্বে আছি,—যেখানে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে একটা চিত্তশক্তি অহরহ অদ্ভুত সৃজনকাজে নিযুক্ত হইয়া আছে। সেই বিচিত্র জ্ঞানকর্ম্মপ্রেমের সৃজনের বিরাট ক্ষেত্রে আমরা আছি, সেইখানে কাজ করিতেছি, সেইখানে ভাবিতেছি, সেইখানে জ্ঞানলাভ করিতেছি—এই চেতনাটা যাহাতে বড় হয়—কেবল কতকগুলি বাহিরের শুষ্ক বিধিবিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস যাহাতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া না বসে, তদ্বিষয়ে তিনি যাইবার পূর্ব্বে বারম্বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যাইবার পূর্ব্বে দুএকটি নূতন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। যেমন একটি, ছাত্র-অধ্যাপক সম্মিলনী। তাহার আভাস আমরা গত মাসের আশ্রম-কথায় তত্ত্ববোধিনীর পাঠকবর্গকে দিয়াছি। ছাত্রদের কাজেকর্ম্মে, দিনরাত্রি চালনাটাই যেন বড় হইয়া না উঠে, সাধনাটাই বড় হয়, এইজন্য যথাসম্ভব সকল বিষয়ে তাহাদিগকে অধ্যাপকগণের সহযোগী সহকর্ম্মী করিবার নিমিত্ত তিনি এই সম্মিলনীটি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দুইটা অধিবেশন হইয়াও গিয়াছে এবং কাজকর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যবস্থার নিমিত্ত ইহার অন্তর্গত একটি প্রতিনিধিসভাও স্থাপিত হইয়াছে।

এ প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ নূতন বটে, কিন্তু যদি ইহাকে আমরা ঠিকমত চালনা করিতে পারি—অর্থাৎ এইদিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখি যে কি করিলে ছাত্রদের সকল শক্তি চেতনায় পূর্ণ হয়, অভ্যাসে নহে, কি করিলে অ সঙ্গে তাহাদের সকল সম্বন্ধ ভিতর উঠে, বাহিরের নহে, তবে ক্রমেই বল পাইবে এবং কর্ম্ম যাহা এখন বিক্ষিপ্ত হই অখণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

এ সম্বন্ধে সংবাদদা হইতে যে পত্রটি প দেওয়া গেল। তি শক্তির উপরেই মানুষের ঠিক্ ম সাধন করা য হবে, সেই জায়গা তুল কা

সত্যলোক এইটে তারা এখন থেকে বুঝতে শিখুক। আমাদের দেশে এই জায়গায় ভয়ানক জড়ত্ব এসেছে—আমরা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে আইডিয়াকে সত্য ব'লে জানিনে, আইডিয়ালকে বিশ্বাস করিনে। তাই সকল ভাবই আমাদের কাছে পুতুল হ'য়ে ওঠে। Democracy ওটাও আমাদের একটা পৌত্তলিকতার মধ্যে দাঁড়িয়েছে—আমাদের প্যাট্রিয়টিজম্‌ও তাই। শিশুকাল থেকে প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘনিষ্ঠভাবে সত্য হয়নি ব'লে আমরা অন্য দেশের ভাবের জিনিষ-গুলোকে নিজের জীবনের সঙ্গে সত্যভাবে যুক্ত ক'রে নিতে পারিনে, সমস্তই কেবল বাহ্য পৌত্তলিকতায় এসে পৌঁছায়—কিছুতেই জোর পাইনে—মাটির খেলনা বারবার কেবল ভেঙে ভেঙে যায়।"

ঠিক্ এই কথাগুলিই বিদায়ের দিনেও সকল অধ্যাপক-গণকেও তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় যে জেসুইট্ (Jesuit) পাদ্রীদের কলেজে পড়িয়াছিলেন, যেখানে বড় বড় পণ্ডিতরাও ছোট ক্লাসে শিক্ষাদানের ভার ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণকরিয়া ভগবানের আদেশপালনের ন্যায় তাহা সম্পন্নকরিতেন, সেই উদাহরণটি দিলেন এবং বলিলেন যে সেই বড় একটি সাধনার মধ্যে যদি সমস্ত কাজকর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হয় তবেই আমাদের মধ্যেও আইন বড় না হইয়া আইডিয়া বড় হইয়া উঠিবে। নহিলে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা যতই পাকা হোক্, আসল জিনিষটারই অভাব ঘটিবে। যতদিনপর্য্যন্ত না আমরা ধর্ম্মব্রতের মত, ঈশ্বরের বিধানপালনের মত করিয়া কর্ম্ম করিব, ততদিন আমাদের হং নিয়ম আনন্দরূপ ধারণ করিবে না, তাহার মধ্যে থাকে . ...র শ্রীর আবির্ভাব হইবে না।
কারণ আ
স্বাভাবিক প্রভার লাভ ...য় জাগরণকালে ও রাত্রে শয়নের হয়, সেইরূপ সঙ্কোচকারণ ...ট গায়ক বালকদিগকে লইয়া জীবের জ্ঞান যে নিজের ...ন্মার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। লাভ করে, তাহারই নাম ...ভাঙাইবে এবং ব্রহ্মসঙ্গীত সঙ্কোচ যেমন তাহার স্বাভাবিক ...হইবে। ইহাও একটি সঙ্কোচ সেইরূপ স্বাভাবিক নহে, প্রভার ন্যায় অনাদিকর্ম্মাত্মক মায়া-হয়। এইজন্য প্রদীপপ্রভার সঙ্কো...ন হইয়া গিয়াছে—জ্ঞানসঙ্কোচরূপ বন্ধ স্বরূপত—স্বভাবত ...বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের। আগন্তুক নৈমিত্তিকমাত্র। অতএব বন্ধ...ন করা হয় নাই—থাকায় মুক্তিও তাহার স্বরূপত নহে ইহা যায়; কেননা, যাহার বস্তুত বন্ধন থাকে ...বিশেষ জিনিস। হইতে পারে। এইজন্য জীবের বন্ধন ও মুক্তি ঘটনাগুলি তাহা ব্যাবহারিকভাবে আপেক্ষিক বা নৈমি...ের উদ্দেশ্য বুঝিতে হয়।

বদ্ধাবস্থায় জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকায় জীব নিজের স্বরূ...সঙ্গে যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের ...সং অনুগ্রহ ভিন্ন ইহা জানিতেও পারা যায় না; "যাঁহাকে ইনি বরণ করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন"

বুদ্ধ-উৎসব মন্দ হয় নাই—সায়ংকালে শ্রীভগ-...ত হইবে, জ্যোৎস্নায় মুক্ত প্রান্তরে উপাসনা হইয়াছিল এব...হবে" সকলেরই খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

স্বর্গীয় সুহৃদকুমার সেন গুপ্ত।

গত ২৯এ পৌষে আমরা আমাদের একজন অত্যন্ত প্রিয় আশ্রমবন্ধুকে নিদারুণভাবে হারাইয়াছি। ৺সুহৃদ-কুমার সেন গুপ্ত মাঘোৎসবে যোগদান করিবার জন্ত অপরাহ্নের রেলগাড়িতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন, বর্দ্ধমানে এক্‌স্‌প্রেস ধরিয়া কলিকাতায় শীঘ্র পৌঁছিবার আশায় চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া রেলের তলায় পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে দেবতা মৃত্যুরূপে আমাদের প্রিয়জনকে আপন বক্ষে গ্রহণ করেন আশ্রমবাসীদের সেই দেবতাকে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা আজিও সেই দৃষ্টি লাভ করিতে পারি নাই বলিয়া কেবল দারুণ আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ৺সুহৃদকুমার আমাদের অন্তরের যে কতখানি অধিকার করিয়াছিল তাঁহার এই নিদারুণ মৃত্যুর পরেই তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। এই শোক যে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ও স্নেহময় গুরুজনবর্গ কিরূপে সহ্য করিতেছেন তাহা জানি না।

ভগবান আমাদের পরলোকগত আশ্রমবন্ধুর আত্মাকে পরম শান্তিদান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত জননী পরিজনবর্গ ও বন্ধুগণের হৃদয়ে গভীর সান্ত্বনা প্রদান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

নিম্নে একটি আশ্রম-বালক-কর্তৃক লিখিত সুহৃদের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

শ্রীঃ—

সুহৃদের জীবন আলোচনা করিলে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটি সরলতা ও ব্যাকুলতার মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহাকে কত সময় আমরা উপহাস করিয়াছি। সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। আমরা তাহার সেই ব্যাকুলতাকে কৃত্রিমতা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। আমরা বলিয়াছি "সুহৃদ, কেবল গানের সময় ভাবে মাতোয়ারা হইলে চলিবে না।" সুহৃদ উত্তর করিয়াছে "ঠিক বলিয়াছ ভাই—কেবল গানই গাই দৃঢ় চরিত্র হইল না।" অন্যের পরিহাসে তাহাকে কোনদিনই আমরা লেশমাত্র ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই। তাহাকে দোষ দিব কি, সে যে আপনিই সমস্ত দোষ কবুল করিয়া লইত! কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিয়া বেশী দিন সে চুপ করিয়া থাকিতেই পারিত না। বিবাদ

হইলে অন্যপক্ষের যতই অপরাধ থাক্, সে নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ লইয়া ক্ষমা চাহিত। তাহাকে কেহ কোনদিন গম্ভীর হইতে দেখে নাই। সকল সময়েই সে প্রফুল্ল ও হাসিখুসী। প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই সে ছিল। "সে ছিল" বলিলে ভুল বলা হয়, বলা উচিত সে অগ্রণী রূপে থাকিত। সরলতা ও উৎসাহ তাহার এতই প্রচুর এবং এতই সহজ ছিল।

সুহৃদের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব ছিল এবং ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতাও ছিল। সেই কারণেই তাহার হৃদয় অত সরল, অত মধুর ছিল। তাহার বড় অপরাধ তো আমরা কেহ দেখি নাই—কিন্তু সামান্য অপরাধকেও সে কত বড় করিয়া দেখিত এবং তাহার জন্য কি তীব্র অনুতাপ অন্তরে অনুভব করিত। পাথরের উপরে ধূলা বালি জমিলে তাহা তো তাহাকে বাজে না, কিন্তু ফুলের উপর কি কোন মলিন আবর্জ্জনা সহ্য হয়! তাহার ঈশ্বরভক্তি, তাহার শিশুর মত অকপট প্রাণ, তাহার নির্ম্মল স্বভাব এইজন্যই সামান্য এতটুকু দোষে সে কত বেদনা পাইত।

সে একদিন আমাকে বলিয়াছিল—"ভাই, সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে উপাসনায় গিয়া বসিতাম, সূর্য্যোদয় দেখিয়া উপাসনায় বেশ মন জমিত, কিন্তু এখন সারা উপাসনার সময়টা বাজে কুচিন্তা আসে। গান গাহিলে পূর্ব্বে তবু একটু সরস হইতাম, কিন্তু এখন তাও নয়। এখন অবধি বেড়াইয়া চেড়াইয়া উপাসনা করিব, চক্ষু বুজিয়া ভণ্ডের মত থাকা আর ভাল নয়।"

তাহার সেদিনকার কথার ভিতর এমন একটি ব্যাকুলতা ছিল, যে তাহাকে না দেখিলে সে যে কত অকৃত্রিম তাহা কেহই বুঝিবে না; বানানো কথা সে বলিতেই পারিত না। ভগবান তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাবৃত্তি প্রকাশশক্তি যথেষ্টপরিমাণে দেন নাই—তিনি তাহাকে দিয়াছিলেন শুধু ঐ একান্ত ব্যাকুলভাব, সরল একনিষ্ঠতা।

আমি জানি কোন কোন আশ্রমবাসী তাহাকে ভণ্ড বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক চিঠি লিখিয়াছিল। "আমি যে ভণ্ড ও দুর্ব্বল ইহা তোমরা জান, আমাকে ক্ষমা করিও।" তাহার পত্রের ভিতর এই ছত্রটি লিখিত ছিল।

আরেকটি দিনের কথা মনে আছে। একবার আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপকমহাশয় কলিকাতায় যাওয়াতে অন্য একজন অধ্যাপকমহাশয় ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণী ও তন্নিম্ন শ্রেণী একত্র করিয়া পড়াইবার প্রস্তাব করেন। ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর বালকেরা কেহ কেহ অভিমানপূর্ব্বক ক্লাসে গমন করে নাই, সুহৃদকুমারও লজ্জায় ক্লাসে যাইতে বিলম্ব করিয়াছিল; কিন্তু কিছু সময় পরে আমি তাহাকে একটু বুঝাইয়া বলিলে সে আস্তে আস্তে বলিল "ঠিক বলিয়াছ ভাই, আর দলে ভিড়িব না।" শুধু এই বলা নয়—সে সকলের আগে অধ্যাপকমহাশয়ের নিকটে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

তাহার শরীর অপটু ছিল—তথাপি ব্রতপালনের মত করিয়া কঠিনভাবে জীবনযাপনের জন্য তাহার ব্যগ্রতা দেখা যাইত। সে অনেক আরাম হইতে বঞ্চিত থাকিত, অনেক কঠোর নিয়ম ইচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিত। একজন পণ্ডিত বা মস্ত লোক হইবে সে উচ্চাভিলাষ তাহার ছিল না, সে কেবল চাহিয়াছিল নির্ম্মল হইয়া ভগবানের কাছে আপনাকে নিবেদন করিতে—সেই একটি সহজ সরল ভক্তির মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

২৭।২৮ শে পৌষ পর্য্যন্ত জ্বরে ভুগিয়া সে সারিয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে ১লা মাঘ প্রাতঃকালেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন করিবেন—সেই জন্য সে তাড়াতাড়ি করিয়া ২৯ শে পৌষ সংক্রান্তির দিনে দুপুরের গাড়ীতে রওনা হইল। তাহার কি ব্যাকুলতা! সমস্ত উৎসবটি সে আগাগোড়া থাকিবে, সকলের সঙ্গে ভগবানের নাম করিবে এই তাহার ইচ্ছা। দুপুরের গাড়ীটা অনেক রাত্রে গিয়া পৌঁছায়—সে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পৌঁছিবার জন্য বর্দ্ধমানে একস্‌প্রেস্ (Express) ধরিতে গিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তাহার একটি ক্ষুদ্র দৈনিকলিপি ছিল। তাহার মধ্যে একদিন জন্মদিনউপলক্ষে সে লিখিয়াছে "আমি আজ আঠার বৎসর সমাপ্ত করিয়া ১৯ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। পিতা, ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এই রকমই একদিন সুন্দর প্রভাতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলে। পিতা, তখন আমি কত সুন্দর ছিলাম ও কি পবিত্র ছিলাম, কিন্তু আজ আমার সারা গায়ে ধূলা লাগিয়াছে। হে ভগবান্, আমাকে নির্ম্মল কর।"

আর একদিনকার দৈনিকলিপিতে লিখিয়াছে—"বৎসরের মধ্যে ৩৫০ দিন সুস্থ থাকি আর ১৫ দিন হয়ত অসুস্থ থাকি। আমরা এমনই অধম যে কেবলই সেই ১৫ দিনের কথাই আমরা মনে করি। আর ৩৫০ দিন যে সুস্থ ছিলাম, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই না। আমাদের এত দাবী কিসের?"

ভগবান তাহার ব্যাকুল আত্মাকে স্বক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাহার জীবনের যে একটি আশ্চর্য্য সরল বিশ্বাসী ব্যাকুল ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি তাহাই এই আশ্রমে চিরদিন স্মৃতির সামগ্রী হইয়া রহিল। পবিত্রতা যে কত সুন্দর, নম্রতা যে কত মধুর, তাহা আমরা জানিলাম। ভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা এই যে

তিনিও আমাদিগকে সেই রকম অকৃত্রিম একটি ভক্তি, নিষ্ঠা দিন—আমাদের চরিত্রকে নির্ম্মল করুন।

আশ্রম-বালক।

অগ্নিকাণ্ড।

২২ শে মাঘ রাত্রে আমরা আহার শেষ করিয়া আসিয়া দেখি, দক্ষিণদিকের আকাশ দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিলাম কোথাও আগুন লাগিয়াছে—মনে হইল অত্যন্ত নিকটে বুঝি বা আমাদের অদূরবর্ত্তী ভুবনডাঙ্গাগ্রামে। আমাদের কয়েকজন অধ্যাপকের নায়কতায় আমরা ৩৫ জন ছাত্র আগুন নিভাইবার কাজে বাহির হইলাম। কিছুদূর যাইতেই বুঝা গেল আগুন বোলপুর-বাজারে লাগিয়াছে।

সেখানে গিয়া দেখি, এক ছুতারের ঘরে ও তাহার পশ্চাতের বাড়িতে আগুন ধরিয়াছে, ছুতারের বাড়িতে একঘর তক্তা বোঝাই করা এবং তাহার পিছনের বাড়িতে ছুইগোলা ধান। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, চারিদিকে বিস্তর লোক জমিয়াছে কিন্তু আগুন নিভাইবার জন্য কেহ কিছুমাত্র: চেষ্টা করিতেছেনা। যাঁহাদের বাড়ি কাছাকাছি তাঁহারা নিজ নিজ চালের উপর চার পাঁচ কলস জল লইয়া বসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কাছে কলসি চাহিলাম, তাঁহারা বলিলেন, কলসি বাহির করিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, আর তাহা ঘরে লইতে পারিব না অতএব দিব না! তখন আমরা উপায় না দেখিয়া তামাকের দোকান হইতে জোর করিয়া কয়েকটি টিন লইয়া পাতকুয়া হইতে জল তুলিতে গেলাম। অনেকেই ঘরের পাতকুয়া হইতে জল তুলিতে বারণ করিলেন। তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে জল তুলিলে জল ঘোলা হইয়া যাইবে। আমরা তখন নিকটের পুকুর হইতে ও রাস্তার ধারের একটি পাতকুয়া হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের কয়েকজন জল টানিবার ও অবশিষ্ট কয়েকজন আগুন নিভাইবার ও জিনিষপত্র সরাইবার ভার লইলাম, কেবল নিকটস্থ বাঁধগোড়া স্কুলের তিনজন ছাত্র ও স্থানীয় ছুইজন ভদ্রলোক আমাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন। এ ছাড়া কয়েকজন কাবুলিওয়ালা প্রাণপণ যত্নে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। অনেক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ঐ অগ্নিময় বাড়ির সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলেন, তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে "চল চল নিমন্ত্রণ খাই গিয়া" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; আর যে কয়েকজন লোক ঘুরিতেছিলেন তাঁহাদিগকে আমরা সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেই তাহারা সরিয়া পড়িলেন। অদূরে তখন যাত্রাগান চলিতেছিল, বোধকরি অগ্নিকাণ্ড-কোলাহলে শ্রোতাদের কিছু বিঘ্ন হইতেছিল কিন্তু সঙ্গীত ও ঢোলকের বাদ্য সমতালে চলিতেলাগিল। সেইসময় দারগাবাবু কয়েকজন চৌকিদার লইয়া উপস্থিত হইলেন। চৌকিদারের শাসনে যখন পাড়াপ্রতিবেশীরা আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল তখন আগুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছিল। আমরা কাজ শেষ করিয়া যখন আশ্রমে ফিরিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর; যাত্রা আরম্ভে ভুবনডাঙ্গার কাছে আসিয়া যখন দেখা গেল আগুন বোলপুরেই লাগিয়াছে তখন একবার মনে করিয়াছিলাম সেখানে আমাদের যাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ সেখানে লোকের অভাব নাই; আর আমরা ত সংখ্যায় অতি অল্প, আমাদের দ্বারা বিশেষ কি কাজ হইবে? কিন্তু লোক থাকিয়াও যে লোক না থাকা কাহাকে বলে তাহা এবার আমরা দেখিলাম, এবং ইহাও দেখিলাম বিদেশী কাবুলিওয়ালা বিপন্নকে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে আর পাড়াপ্রতিবেশীর সাড়া নাই। এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য কলসী ব্যবহার করিলে তাহা নষ্ট হইবে এই চিন্তায় প্রতিবেশীর ঘর জ্বলিয়া যাইতে দিতে দ্বিধাবোধ হইল না। অথচ ইহাতে সন্দেহ নাই যে যদি যথাসময়ে আগুন না নিভান হইত তবে বোলপুর-বাজারে অল্পই ঘর রক্ষা পাইত। যাহারা পরের ঘর এমন উদাসীনভাবে পুড়িতে দেখিতে পারে তাহারা নিজের ঘরে নিরাপদবাসের কি যোগ্য?

আশ্রমবাসী।

সংবাদ।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে আমাদের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নানা কারণে আশ্রম হইতে বিদায় লইয়াছেন। তিনি সাত বৎসরেরও উপর এই আশ্রমের সহিত যুক্ত ছিলেন—তাঁহার অমায়িক ও উদার প্রকৃতি, গভীর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন তাঁহাকে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেরি গভীর শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করাতে আশ্রমবাসীমাত্রেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি যেখানেই থাকুন আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, ইহা আমরা নিশ্চয়ই জানি।

জনৈক আশ্রমবাসী।